রচনাবলী

নবম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ
মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ (৩৩০০), ১৩৬৪

সম্পাদক

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুমথনাথ ঘোষ

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

চুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

সিল্ক স্ক্রীন ও

চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ হইতে এস এন রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলি-৯ হইতে পি কে পাল কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

॥ ১ ॥

স্বর্গত সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে আমার সামান্যমাত্র ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। সেইটুকু পুঁজির উপর নির্ভর করে কোন শিল্পীর বা সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা মূর্খতার নামান্তর বলে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক।

তথাপি আমি দাবী করতে পারি যে মুজতবা আলীর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমার মোটামুটি একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে, এবং সে ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা নয়। এমন দাবী আমি কেন করছি সেটা একটু বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন।

ইংরেজী সাহিত্য নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা প্রায়ই একটা প্রবচনের উল্লেখ করে থাকেন যাতে বলা হয়েছে যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব তাঁর স্টাইলের মধ্য দিয়েই সবচেয়ে ভাল ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—সাহিত্যিককে চিনতে হলে তাঁর রচনারীতির বৈশিষ্ট্যটি আগে বোঝা দরকার।

সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার আপ্তবাক্য কথনও সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত হতে পারে না—আলোচ্য প্রবচনটিও আংশিক সত্য মাত্র। দেশে-বিদেশে আমরা এমন বহু লেখকের সন্ধান পাই যাঁদের ব্যক্তিসত্তা ও রচনাশৈলীর মধ্যে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য বা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার এমন সাহিত্যিকেরও অভাব নেই যাঁদের বেলায় উল্লিখিত উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য, যাঁদের রচনার স্টাইলের মধ্যে আত্মপ্রক্ষেপ বা ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একটুও চিন্তা না করেই দুজনের কথা মনে পড়ছে—ইংরেজ কবি শেলী ও বাঙালী কথাসাহিত্যিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৈয়দ মুজতবা আলীকে এই শেষোক্ত সাহিত্যশিল্পিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতে কারও কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। বস্তুতঃ তাঁর ভাষাভঙ্গির এমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে যা বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন লেখকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না—এবং এই বৈশিষ্ট্যটি হল তাঁর ব্যক্তিমানসের প্রতিধ্বনি, যাকে আমি একটু আগেই ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন বলে বর্ণনা করেছি।

এই শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য বা রচনাশৈলী বা স্টাইলের পথ ধরেই আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের দুয়ারে গিয়ে পৌছতে পেরেছি—তাঁর সঙ্গে আমার সত্যকার পরিচয় এই পথেই সম্ভব হয়েছে।

তাই আমি মনে করি, মুজতবা আলীর ভাষাভঙ্গি বা রচনাশৈলীর একটা

যথাযথ বিশ্লেষণ তাঁর অনুরাগী পাঠকদের সামনে তুলে ধরাই আমার, সর্বপ্রধান না হলেও, সর্বপ্রথম কর্তব্য। অবশ্য আমার অক্ষম লেখনী এই কর্তব্য সম্পাদনে কতটা সার্থকতা লাভ করতে পারবে সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই গুরুতর সন্দেহ আছে।

মুজতবা আলীর যে-কোন রচনা, তা সে দীর্ঘায়িত উপন্যাস বা ভ্রমণকথাই হোক বা হ্রস্বকায় গল্প প্রবন্ধ বা রম্যরচনাই হোক, পড়তে গেলে প্রথমেই পাঠকের মনে হবে, এ-লেখা ঠিক আর পাঁচজন সাহিত্যিকের লেখার মত নয়—এ-লেখার ঢঙ্ আলাদা, আর বোধ হয়.সেইজন্যই এর রসও একটু স্বতন্ত্র ধরনের।

সত্যই তাঁর লেখার ঢঙ্ একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব—এ ঢঙ্ বৈঠকী আলাপের ঢঙ্, লিখিত সাহিত্যের রচনারীতিতে এ বস্তু নিতান্তই দুর্লভ। মৌলিক বিচারে মুজতবা আলী প্রধানতঃ একজন শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের আলাপন-শিল্পী—নেহাৎই দৈব-ক্রমে এবং আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এই আলাপনের মাধ্যম হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর লেখনীকে।

বহু পাশ্চাত্ত্য মনীষী বলেন, ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আজকাল আলাপন-শিল্প সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে—পাচজনে একত্র সমবেত হয়ে কেবলমাত্র মানসিক আনন্দ লাভের জন্য কথাবার্তা বলার অভ্যাস ও-সব দেশের মানুষ বর্জন করেছে; এখন মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলে শুধু ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে।—আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাও ঠিক একই রকম। বাঙালী নাকি জাতি-হিসাবে বিষম আড্ডাবাজ! কিন্তু আধুনিক বাঙালী আর আড্ডা দেয় না—আড্ডাবাজের পরিবর্তে সে আজ হয়ে উঠেছে ধান্দাবাজ। কথা বলার আর্ট এবং পরের কথা মন দিয়ে শোনার মত বুদ্ধির ঔদার্য দুইই সে হারিয়ে ফেলেছে।

যে-আড্ডা বাঙালীর জীবনে আজ নেই মুজতবা আলীর রচনায় তারই বিশিষ্ট আস্বাদ ও সৌগন্ধ্য আমরা পেয়ে থাকি। প্রমথ চৌধুরীর (বিশেষতঃ বীরবলের) গল্প-প্রবন্ধাদিতে এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পেয়ে একদা আমরা সচকিত ও পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম—তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আলী সাহেবের আবির্ভাব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোন রচনায় আমরা এই অনবদ্য ঢঙ্‌টির চিহ্নমাত্র দেখতে পাইনি।

সত্যই মুজতবা আলীর রচনারীতির সঙ্গে আড্ডায় সমাদৃত ভাষণভঙ্গির বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এ আড্ডা কি জাতীয় আড্ডা?—নির্দোষ তাস-খেলার ছদ্মবেশে জুয়ার আড্ডা নয়, সংস্কৃতির মুখোশ-পরা সস্তা নাচগান বা

থিয়েটারি রিহার্সালের আড্ডা নয়, পার্কের বেঞ্চে বসে পাড়া-প্রতিবেশীর কুৎসা-কীর্তনের আড্ডাও নয়—এ আড্ডা সুপণ্ডিত বিদগ্ধজনের আড্ডা ; এ আড্ডায় যে-সব আলোচনা হয় তার মধ্যে বিদ্যার কৌলীন্য আছে কিন্তু আস্ফালন নেই, জ্ঞানের গৌরব আছে কিন্তু পেচক-গাম্ভীর্য নেই, সমালোচনা আছে কিন্তু ঈর্ষা বা অসূয়া নেই, রস ও রসিকতা আছে কিন্তু অশ্লীলতা নেই। অর্থাৎ পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে কলকাতায় তথা বাংলাদেশে যে আড্ডা ছিল কিন্তু এখন আর নেই—সেই আড্ডা।

যে আড্ডাধারীটির ভাষাভঙ্গি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে বসেছি, এইবার দেখা যাক কি ভাবে তাঁর রচনায় প্রায় সর্বত্র সত্যকার আড্ডাসুলভ মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

বর্ণনাত্মক কাহিনীমূলক অথবা চিন্তাশীল—রচনা যে-জাতীয়ই হোক না কেন, মুজতবা আলী কখনও নিজেকে তাঁর পাঠকদের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন না। তিনি শিক্ষক-সাহিত্যিক নন, প্রচারক-সাহিত্যিকও নন—তাঁর কাছে আমরা যত কিছুই পাই না কেন, একথা আমাদের তিনি কখনই ভুলতে দেন না যে তিনি আমাদেরই একজন। বেদীর উপর বা বক্তৃতামঞ্চে তাঁর আসন নয়, তিনি নেমে এসে আমাদের সঙ্গে একই ফরাশে বসতে চান।—নইলে আড্ডা জমবে কেমন করে ?

তাঁর বক্তব্য কখনও রেলগাড়ির মত একই লাইন ধরে সিধা পথে এগিয়ে চলে না—ডাইনে-বাঁয়ে বাঁকের পর বাঁক ঘুরে, প্যাঁচের পর প্যাঁচ রচনা করে, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে 'মণ্ডূক-প্লুত' গতিতে, স্বেচ্ছা-সুখে হেলে-দুলে স্বীয় গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছয়। হয়তো বলতে বসেছেন বিদেশে তাঁর ছাত্রজীবনের কথা, কিন্তু কথায় কথায় এসে গেল একটু ইতিহাস, ভাষাতত্ত্বের একটা জটিল সমস্যা, রবীন্দ্রকাব্যের তত্ত্ববিশ্লেষণ, দেশী-বিদেশী কিছু রঙ্গরস, হিন্দু বা ইস্‌লামী ধর্মকথার মর্মার্থ, জার্মান বা ফরাসী গ্রন্থাদি থেকে উদ্ধৃতি, পুরাণকাহিনীর অন্তর্নিহিত রূপকের ব্যাখ্যা, হাফিজ বা সাদীর দুটো-চারটে বয়েৎ, এবং আরও কত কি। এই হল সত্যকার বৈঠকী মেজাজের বাগ্‌ভঙ্গি, খাঁটি আড্ডাবাজির ভাষা। এই হল সৈয়দ মুজতবা আলীর স্টাইলের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। তাঁর লেখা পড়লেই মনে হয় যেন তিনি অখণ্ড অবসর যাপন করছেন, তাই তাঁর বিশ্রম্ভালাপ বিলম্বিতলয়ের আলাপ। যে সব পাঠক সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সর্বদাই অতি-অবহিত আলী সাহেব তাদের জন্য লেখেন না।

মুজতবা আলী ছিলেন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। এই পাণ্ডিত্য কিছু পরিমাণে তাঁর বংশগত ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত, প্রধানতঃ স্বোপার্জিত। পৃথিবীতে পণ্ডিত ব্যক্তির অভাব নেই, এবং তাঁরা লিখেছেনও প্রচুর। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ রচনাই বংশদণ্ডের সঙ্গে তুলনীয়, ইক্ষুদণ্ডের সঙ্গে নয়—প্রাণপণ চিবিয়েও তা থেকে এক ফোঁটা মিষ্টরস নিষ্কাশিত করা যায় না। মুজতবা আলীর লেখায় তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু পাণ্ডিত্য তাঁর রচনামাধুর্যকে কখনও বিন্দুমাত্র ব্যাহত করে না, তাঁর রচনার প্রাঞ্জলতাকে ঘোলা করে তোলে না—তাঁর লেখার জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। তাঁর পাণ্ডিত্যের মধ্যে একই সঙ্গে স্বচ্ছতা বিস্তৃতি ও গভীরতা এই তিন গুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

শেক্‌স্‌পীয়ার সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে তিনি শ্লেষালঙ্কার (Pun) ব্যবহারের সুযোগ কখনও ছাড়তে পারতেন না—আলী সাহেবও রসিকতা করার প্রলোভন সংবরণ করতে পারেন না। মূল বিষয়বস্তু যতই গম্ভীর বা করুণ হোক না কেন, বর্ণনাপ্রসঙ্গে তার মধ্যে কিছু রঙ্গরসের ফোড়ন দিতে না পারলে তাঁর তৃপ্তি হত না—নিজে না হেসে এবং পাঠকদের না হাসিয়ে তিনি থাকতে পারেন না। তাঁর এই সদাপ্রসন্ন 'আমুদে' স্বভাবের জন্যই তাঁর আড্ডায় যোগদান করে আমরা এত আনন্দ পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে যে ভাষাভঙ্গির প্রবর্তন করেছিলেন তৎকালীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেটা আদৌ পছন্দ করেননি—তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সঙ্গে দেশজ শব্দের ও কথ্য ভাষার প্রয়োগ-পদ্ধতির সংমিশ্রণের ফলে ভাষায় যে একটা পেশল বলিষ্ঠতার ও নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার হয় তা তাঁরা সেদিন কিছুই বুঝতে পারেন নি। তাঁদের মতে এই 'গুরুচণ্ডালী' সংমিশ্রণ ভাষার একটা মস্ত বড় ত্রুটি। তাই তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তী লেখকদের 'শবপোড়া মড়াদাহের দল' বলে বিদ্রূপ করতেন। জানি না, মুজতবা আলীর ভাষার সঙ্গে পরিচয় হলে তাঁরা কি বলতেন বা কি ভাবতেন—বোধ হয় কিছুই বলার বা ভাবার সুযোগ পেতেন না, তার আগেই 'ভির্মি' যেতেন। কারণ তাঁর ভাষায় এই জাতীয় সংমিশ্রণের অজস্রতা সত্যই বিস্ময়কর। শুধু সাধু ও দেশী শব্দ নয়, আরবী ফার্সী, উর্দু-হিন্দি, সংস্কৃত-লাতিন, জার্মান-ফরাসী-ইংরেজী, রেঢ়ো-বাঙাল, প্রভৃতি নানা আকর থেকে শব্দ আহরণ করে একসঙ্গে মিশিয়ে তিনি ভাষার এক অভূতপূর্ব ভুনিখিচুড়ি তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে আমরা গুরুচণ্ডালীর apotheosis বা চরম রূপটি দেখতে পাই। তাঁর ভাষার চমকপ্রদ অভিনবত্ব এই বৈশিষ্ট্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। ইচ্ছামত ভাষার সুর-বদল তাল-ফের্তা

অথবা রস-পরিবর্তনের ক্ষমতাও তিনি লাভ করেছেন এই উপাদান-বৈচিত্র্য থেকে।

কোন কোন সমালোচক মুজতবা আলীর রচনায় অসংখ্য ভাষাঘটিত অসঙ্গতি, স্ববিরোধ, এমন কি অশুদ্ধি পর্যন্ত দেখতে পেয়েছেন—বানানে, ব্যাকরণে, উচ্চারণে, প্রতিবর্ণীকরণে (transliteration-এ), বিশিষ্টার্থক বাগ্বিধি (idiom) প্রয়োগে এবং আরও বহু ক্ষেত্রে। তাঁদের অভিযোগটা অবশ্যই সত্য, কিন্তু এর ফলে লেখক হিসাবে আলী সাহেবের মর্যাদা বা উৎকর্ষ কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি না, বরং আমার বিশ্বাস তাঁর রচনার এই 'ত্রুটি'-টুকু তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ দিককে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। তাঁর মনের মধ্যে কোথায় যেন ধৈর্যের একটু অভাব ছিল। লিখতে বসে নিজের বক্তব্য এবং সেই বক্তব্যের সুবিস্তৃত রস-সম্ভাবনা নিয়ে তিনি এমনই মশগুল হয়ে যেতেন যে ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতিকে তিনি হিসাবের মধ্যে ধরতেন না—পিছন ফিরে অশুদ্ধি-সংশোধনের কথা ভাবতেই পারতেন না, যেন একটু মুচকি হেসে বলতেন, 'ক্ষ্যামা দেও ভাই, ও-সব ছোট কথা নিয়ে মগজ ঘামাতে নেই।'—দুবার হাত নেড়ে সব ব্যাপারটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতেন। তুচ্ছ বস্তুর প্রতি এই হালকা অবজ্ঞার মনোভাবকেই বোধ হয় একজন ইংরেজ লেখক 'utter neglect of the non-essential' নামে অভিহিত করেছেন।

এই ছিল যাঁর রচনা-রীতির বিশেষত্ব তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটা যুক্তিসিদ্ধ ধারণা গড়ে তোলা আমার পক্ষে অন্ততঃ খুব কষ্টসাধ্য হয় নি।

ঈষৎ খেয়ালী মজলিসী মেজাজের মানুষটি; কথা বলতে ভালোবাসেন, তবে কথা বলেন প্রধানতঃ কলম দিয়ে; নানা বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী, কিন্তু সে পাণ্ডিত্য খোস-পাঁচড়ার মত সর্বাঙ্গে ফুটে বেরোয় না, আলাপচারির গোলাপবাগে ফুল হয়ে সৌগন্ধ্য ছড়ায়; কথায় কথায় হাসতে জানেন—নিজে হেসে ও পরকে হাসিয়ে আনন্দ পান; নিজেকে নিয়েও অনায়াসে ব্যঙ্গ-কৌতুক করতে পারেন; শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞেয়কে অবজ্ঞা করতে কখনও দ্বিধা করেন না। মুজতবা আলীর রচনায় আপাতদৃষ্ট তিক্ত ব্যঙ্গ-প্রবণতার নিচে আছে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালোবাসা, পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্যের নিচে আছে অকৃত্রিম সরলতা, এবং স্বর্গত পরিমল গোস্বামীর ভাষায়, 'হাল্কা মেজাজের নিচের স্তরে আছে একটি গভীর সংবেদনশীল মন।'

সর্বপ্রকার গোঁড়ামি-বর্জিত এই মানুষটিকে 'মনের মানুষ' হিসাবে পেতে

সকলেরই ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক, এবং আমার বদ্ধমূল ধারণা, পাঠকদের মনের এই ইচ্ছাই সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

। ২ ।

সৈয়দ মুজতবা আলীর অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে অনেককে আমি বলতে শুনেছি যে 'কত না অশ্রুজল', 'পঞ্চতন্ত্র', 'বড়বাবু' প্রভৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রম্যরচনাধর্মী প্রবন্ধগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এঁদের মতে আলী সাহেবের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নাকি এই যে ক্ষুদ্র আধারেই তার দীপ্তি উজ্জ্বলতম রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে।—আমার নিজেরও তাঁর প্রবন্ধাবলী খুবই উপভোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি বলে মনে হয়, কিন্তু তাই বলে এইগুলিই তাঁর রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন একথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর প্রথমতম প্রকাশিত গ্রন্থ 'দেশে বিদেশে'-ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়। প্রকাশের পর প্রথম চৌদ্দ বছরে গ্রন্থের আঠারোটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়—তার পরেও অনেকবার ছাপা হয়েছে। বস্তুতঃ তখনকার দিনে খুব কম পুস্তকই এত অধিকসংখ্যক পাঠকের প্রিয়তম পুস্তকরূপে গণ্য হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছিল।—সেই জনপ্রিয়তার জোয়ারে এখনও ভাঁটা লাগে নি। এখনও যে-সব নূতন নূতন পাঠক-সম্প্রদায় আমাদের দেশে আবির্ভূত হচ্ছেন তাঁরা এ-বই পড়ে নূতন করে চমৎকৃত ও উল্লসিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন।

'দেশে বিদেশে' সম্বন্ধে এর আগে অনেকে অনেক কথা বলে গেছেন—আমি যে নূতন কথা কিছু আপনাদের শোনাতে পারব সে ভরসা রাখি না। আমি শুধু চেষ্টা করব, বইখানির যে-যে অংশ ও যে-যে বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দান করে সেগুলি খুঁজে বের করতে এবং তাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করতে—যাতে আপনারাও আমার আনন্দের অংশীদার হতে পারেন।

গ্রীক চিন্তানায়ক অ্যারিস্টটল্ তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে বলেছেন যে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে সার্থক প্রতিটি নাটক অথবা কাব্য তিনটি সুনির্দিষ্ট পর্বে বিভক্ত হওয়া অবশ্য-প্রয়োজন—আদিপর্ব মধ্যপর্ব ও অন্ত্যপর্ব। 'দেশে বিদেশে' কাব্যও নয় নাটকও নয়, এমন কি উপন্যাসও নয়। তথাপি সতর্কদৃষ্টি পাঠকের পক্ষে এ গ্রন্থেও উল্লিখিত পর্বত্রয়ের সন্ধান পাওয়া মোটেই দুরূহ হবে না—এর আদিপর্বে আছে

পথের কথা, রেলগাড়িতে করে হাওড়া থেকে পেশাওয়ার এবং তারপর মোটর-বাসে পেশাওয়ার থেকে কাবুল; মধ্যপর্বে আছে প্রবাস-জীবনের কাহিনী, প্রথমে শহর থেকে আড়াই মাইল দূরে গ্রামাঞ্চলে, তার পরে খাস কাবুল শহরে বসবাসের বর্ণনা; অন্ত্যপর্বে আছে শিনওয়ারীদের বিদ্রোহ, বাচ্চায়ে শকাও-এর কাবুল আক্রমণ, আফগানিস্থানের নিদারুণ শীতে অনাহারক্লিষ্ট গ্রন্থকার ও মৌলানা জিয়াউদ্দিনের অপরিসীম দুর্দশা, এবং তাঁদের প্রাণ নিয়ে ভারতবর্ষে পলায়নের রোমাঞ্চকর কাহিনী। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে আছে entracte বা বিষ্কম্ভক জাতীয় একটি অধ্যায়; এতে আছে আফ্গানিস্থানের প্রাচীনতম যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত একটা ঐতিহাসিক বিবরণ—অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক।

এই নাটকীয় গঠন-পারিপাট্যের ফলে বইখানি একটা বিচিত্র ধরনের শিল্প-কৃতিত্বে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। গ্রন্থকারের নিজস্ব কল্পনার বা পরিকল্পনার ফলে এটা হয় নি, হয়েছে ইতিহাসের নির্দেশে—মহাকাল যেন নিজের হাতে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে গ্রন্থের বিষয়বস্তুটিকে শিল্পসঙ্গত রূপ দিয়ে গড়ে তুলেছেন। পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে যে গ্রন্থকার নিজেও বোধ হয় লেখা শেষ হবার আগে গ্রন্থের এই স্বয়ংসৃষ্ট গঠন-সৌষ্ঠব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার সুযোগ পান নি।

'দেশে বিদেশে'-র বহিরঙ্গ বিচারে সকলের আগে যে-কথাটা বলা আমার উচিত বলে মনে হয়েছে সেই architectonics বা গঠন-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হল। এর পরেই যা বলতে চাই সেটা আসলে মক্ষিকাবৃত্তি মাত্র—একটা খুঁত অনেকদিন আগেই আমার নজরে পড়েছে বইখানাতে; সামান্য ত্রুটি হলেও এখানে তার উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

'দেশে বিদেশে' কথা দুটোর বাংলা বাগ্বিধি-সঙ্গত অর্থ হল 'স্বদেশের ও বিদেশের নানাস্থানে।' এই রকম 'নানা স্থানে' ভ্রমণের বিবরণ যে বই-এ থাকে একমাত্র সেই বই-এরই নামকরণ করা চলে 'দেশে বিদেশে'। মুজতবা আলীর বইখানি আদৌ ভ্রমণ-বৃত্তান্তই নয়—কোথাও কোন রকম মুসাফিরি তিনি করেন নি। (তৎকালীন) স্বদেশের একটিমাত্র শহরে অর্থাৎ পেশাওয়ারে তিনি ছিলেন মাত্র সাত আট দিন, আর বিদেশে অর্থাৎ আফগানিস্থানে বাস করেছিলেন সামান্য কয়েকটি বছর—তাও একমাত্র রাজধানী কাবুল শহর ও তার প্রান্তবর্তী একটি গ্রাম ছাড়া অন্য কোথাও পদার্পণ করেন নি। এ বই-এর নাম 'কাবুল-প্রবাস' বা ঐরকম একটা কিছু হলে বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হত। কিন্তু

আলীসাহেবের কাছে এ-সব ছিল তুচ্ছ কথা। 'বই-এর একটা নাম দেওয়া নিয়ে কথা, তার আবার সঙ্গত আর অসঙ্গত! ও একটা হলেই হল।'—এই ছিল তাঁর মনোভাব, যাকে আমি পূর্বে 'neglect of the non-essential' বলে বর্ণনা করেছি।

মুজতবা আলীর বর্ণনাশক্তিকে যদি 'অনন্যসাধারণ' বলে অভিহিত করি, অনুগ্রহ করে তাকে অতিকথনের নমুনা মাত্র মনে করবেন না। সব ভাল লেখকই দৃশ্য বা ঘটনাকে বর্ণনার সাহায্যে জীবন্ত করে তুলতে পারেন, মুজতবা আলীও পারেন, কিন্তু তাঁর বর্ণনার চঙ্‌টি অত্যন্ত হালকা—মনে হয় যেন ফাঁকি দিয়ে মনের মধ্যে ছবিটাকে এঁকে দিলেন চিরস্থায়ী কালির আঁচড়ে। এত সহজে এত গভীর ছাপ খুব কম লেখকই রেখে যেতে পারেন। বিদ্যাসাগর মশাই-এর 'জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি'-র বর্ণনার সঙ্গে পাঠানবাড়ীর দাওয়াতে দস্তরখানের দুপাশে বসে নিমন্ত্রণ খাওয়ার বর্ণনার পার্থক্য বুঝতে পারলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কাবুল নদীর পাশে দক্কা দুর্গ, জালালাবাদের পথের পাশে আফগান সরাই-এ রাত্রিযাপন, কাবুলের বাজার, আফগানিস্থানের শীতঋতু এবং শীতান্তে বসন্তের আবির্ভাব, বৃদ্ধ ওস্তাদের গাওয়া ফার্সী গজল, আফগান রাজপরিবারের সঙ্গে মুহম্মদ তর্জীর ও তস্য তিন কন্যার তাৎপর্যময় সম্পর্ক, আমীর আমানুল্লার সদিচ্ছা-প্রণোদিত দ্রুত সমাজ-সংস্কারের ও কুসংস্কার-স্খালনের অকপট কিন্তু মাঝে মাঝে হাস্যকর প্রচেষ্টা এবং তার শোচনীয় পরিণাম, বাচ্চায়ে শকাও-এর কাবুল আক্রমণ ও অধিকার—একের পর এক প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি দৃশ্য আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে অপূর্ব প্রাণশক্তির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ভেসে উঠেছে।—এ বর্ণনার জাত আলাদা।

শুধু বর্ণনায় নয়, চরিত্র-চিত্রাঙ্কনেও মুজতবা আলীর শিল্পপদ্ধতি স্বতন্ত্র। বইখানিকে একটা বিরাট চরিত্র-চিত্রশালা নাম দিলে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না—কিন্তু আর দশজন সাহিত্যিক যে পথে চলেন এ চিত্রশালার চিত্রী সে-পথের পথিক নন। ইনি রঙ-তুলি দিয়ে বড় বড় পটের উপর, তৈলচিত্র আঁকেন না, এঁর আঁকা ছবিতে কয়েকটা সরু-মোটা দ্রুত-টানের রেখার খেলা ছাড়া আর বড় একটা কিছুই থাকে না—অথচ ছবিগুলো ফুটে ওঠে অবিস্মরণীয় রূপ নিয়ে। মানুষের ছবি আঁকার বেলায় মুজতবা আলীর আর্ট পুরোপুরি etching.

সামান্যমাত্র রসিকতায় মুগ্ধ পেশাওয়ারের আহমদ আলী আর কাবুলের

আধ-পাগলা দোস্ত মুহম্মদকে মনে করুন, আর মনে করুন বিদগ্ধভাষাভাষী সংস্কৃত ও আরবীতে সমান পণ্ডিত মীর আস্লমের কথা। রাশিয়ান এম্ব্যাসির সাহিত্য-রসিক তোভারিশ দেমিদফ্‌কেও কি সহজে ভুলতে পারবেন? তা ছাড়া আছেন মোটরবাসের ড্রাইভার সর্দারজী, দক্কা দুর্গের ভারপ্রাপ্ত সরকারী অফিসারটি, রাজনীতির হতভাগ্য শিকার মুইন-উস্-সুলতানে ইনায়েত উল্লা, সেই আফগান চাষীটি নিজের গোপন আভিজাত্য ফাঁস হয়ে যাওয়া মাত্র যার সঙ্গে লেখকের বন্ধুত্ব বন্ধন টুটে গেল, কোমলহৃদয় দানবাকৃতি বল্‌শফ, রাজনীতি জগতের নেপথ্য-চারিণী বুদ্ধিমতী রাণীমা ও বুদ্ধিহীনা সুরাইয়া, জাত্যভিমানের মূর্ত প্রতীক কালা-আদমি-বিদ্বেষী বৃটিশ এম্ব্যাসির স্যার ফ্রান্‌সিস হাম্‌ফ্রিস, শান্তিনিকেতন থেকে আমদানী-হয়ে-আসা তিন বন্ধু, অধ্যাপক বগদানফ, অধ্যাপক বেন্‌ওয়া ও মৌলানা জিয়াউদ্দিন, মায় সেই অজ্ঞাতনামা অতি-অবাধ্য ছাত্রটি যে পরবর্তী কালে বাচ্চায়ে শকাও-এর সৈন্যদলে কর্নেল হয়েছিল এবং যার সাহায্যের ফলেই শীতে ও অনাহারে মৃতপ্রায় মুয়াল্লিম মুজতবা আলীর প্রাণরক্ষা হয়েছিল—কাকে ছেড়ে কার কথা বলব? প্রত্যেকটি চরিত্রই হালকা হাতের আঁকা রেখাচিত্র এবং প্রতিটি চিত্রই মনের উপর গভীর ও চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

উপরের সাপ্‌টা চরিত্র-বর্ণনের মধ্যে ইচ্ছা করেই একটা চরিত্রের উল্লেখ করি নি, কারণ আমি বিশ্বাস করি, আবদুর রহমানের নাম ঐ ফর্দের অন্তর্ভুক্ত করলে শুধু যে অমার্জনীয় অপরাধ হত তাই নয়, এমন পাপাচরণ করা হত যার উপযুক্ত কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। সে শুধু লেখকের পাচক ও ভৃত্য ছিল না, সে ছিল তাঁর শুভানুধ্যায়ী অভিভাবক, অন্তরঙ্গ বন্ধু; উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্র-বিপ্লবে অবিচ্ছেদ্য সাথী, সব আত্মীয়ের চেয়ে পরমাত্মীয়। শেষ বিদায়ের দিন এরোপ্লেন থেকে নিচের দিকে চেয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, দিগন্ত-বিস্তৃত শুভ্র তুষারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আবদুর রহমান তার ময়লা পাগড়ির ন্যাজটি মাথার উপর তুলে দুলিয়ে দুলিয়ে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছে—তখন তাঁর মনে হয়েছিল, 'চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি, আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হৃদয়।' এর চেয়ে বড় সত্যকথা তিনি বই-এর আর কোথাও বলেন নি।

'দেশে বিদেশে' বই-এর কি কোন নায়ক আছে? যদি থাকে তো সে আবদুর রহমান ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

'দেশে বিদেশে'-র গ্রন্থকার যে কত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তা আমার মত নিতান্ত অপণ্ডিত পাঠকের পক্ষেও বোঝা খুব

দুষ্কর নয়। এখানে একটা অসম্পূর্ণ তালিকা দাখিল করেই আমাকে ক্ষান্ত হতে হবে—কোন রকম গভীরতর আলোচনা করার মত বিদ্যা আমার নেই।

ঋগ্বেদ, মহাভারত, গীতা, কুরান, বাইবেল, আবেস্তা, কালিদাস, সাদী, হাফিজ, ওমর খায়াম, শেক্‌স্‌পীয়র, গোটে, হাইনে, দাদু, কবীর, ভারতচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায় পর্যন্ত কত শাস্ত্রগ্রন্থ ও কত কবির রচনাবলী থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে অথবা তাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে এই বই-এর মধ্যে তার আর লেখাজোখা নেই। বিশেষ করে রবীন্দ্রকাব্য তো আলী সাহেবের অস্থিমজ্জায় মিশ্রিত বস্তু—তার উল্লেখ বা তা থেকে উদ্ধৃতি তাঁর কাছে পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নয়, নিভৃততম অনুভূতির প্রকাশ মাত্র।

এ ছাড়া প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভাষা-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, লোকবিশ্বাস, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিদ্যা তিনি অধিগত করেছিলেন, অন্ততঃপক্ষে অধিগত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই সদা-জাগ্রত, সদাজিজ্ঞাসু মনের পরিচয় তাঁর সমস্ত রচনার ন্যায় 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থেও সুপ্রকট।

তাঁর পাণ্ডিত্যের তবু কিছু পরিচয় দেওয়া গেল পাণ্ডিত্যের বিষয়-ও-ক্ষেত্র-বৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখের সাহায্যে। কিন্তু তাঁর রসবোধ ও রসিকতার বেলায় সে চেষ্টাও করব না, পুঁথি বেড়ে যাবার ভয়ে। তাছাড়া এ জাতীয় চেষ্টার কোন প্রয়োজনও নেই। বই পডতে পড়তে পাঠক বহু জায়গায় নিজে না হেসে থাকতে পারবেন না এবং প্রিয়জনকে পড়ে শোনাবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবেন। গ্রন্থ-কার যে সত্যই রসিক ব্যক্তি তা বোঝার জন্য এর চেয়ে বড় আর কি প্রমাণের প্রয়োজন হতে পারে? পুডিং খেতে কেমন হয়েছে যদি বুঝতে চান, নিজে পুডিংটা চেখে দেখুন।

কিন্তু আলোচনার কচ্‌কচি এখন থাক। আসুন—সৈয়দ সাহেবের আঙিনায় পরিপাটি করে দস্তরখান পাতা হয়েছে, চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় সর্ববিধ খানা তৈয়ার—এইবার আপনারা সব বসে পড়ুন; হলপ করে বলতে পারি, কেউ হতাশ হবেন না।

॥ ৩ ॥

'দেশে বিদেশে'-র একচল্লিশ নম্বর অধ্যায়ে কাবুলের জার্মান রাজদূতের সঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর একটা সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে। তা থেকে জানতে পারা যায়, উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য জার্মানীতে যাবার উদ্দেশ্যে জার্মান সরকারের প্রদত্ত কোন একটা বৃত্তি তাঁর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, আলী সাহেব এই

প্রশ্ন করলে রাজদূত জবাব দেন, 'জার্মান সরকার যদি একটি মাত্র বৃত্তি একজন বিদেশীকেও দেন তবে আপনি সেটি পাবেন, আমি কথা দিচ্ছি।'

জার্মান রাজদূত তাঁর কথা রেখেছিলেন, এবং জার্মানীর সরকারী বৃত্তি পেয়ে মুজতবা আলী যথাকালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিলেন।

পূর্বে যে-সব কথা বলেছি তা থেকে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে আলী সাহেব বিষম আড্ডাবাজ মানুষ ছিলেন। অতি সত্বর তিনি বার্লিনেও একটা মনের মত আড্ডা খুঁজে পেলেন। এটি একটি রেস্তোরাঁ, নাম 'হিন্দুস্থান হাউস'। এখানে বার্লিন-প্রবাসী বাঙালীরা দল বেঁধে এসে জড়ো হত স্বদেশী 'ভাত ডাল মাছ তরকারি মিষ্টি' খেতে—এবং জমিয়ে আড্ডা দিতে।

'চাচা-কাহিনী'র চাচা ছিলেন এই ভোজনালয়-তথা-আড্ডাখানার মালিক ও ম্যানেজার। শোনা-কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন গ্যারাণ্টি দিতে পারি না, তবে শুনেছি বার্লিনে এই রেস্তোরাঁটা সত্যই ছিল এবং এই বাঙালী চাচাটিও নাকি লেখকের কল্পনা-সৃষ্ট মানুষ মাত্র নন! অধ্যাপক বিনয় সরকার মশাই নাকি বার্লিনে অবস্থানকালে মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে এখানে আসতেন, এবং অবাঙালী হলেও স্বর্গত রামমনোহর লোহিয়া নিয়মিত হাজিরা দিতেন। আরও শুনেছি, চাচা ছিলেন ভারতবর্ষের কোন এক অতি-পরিচিত ও অতি-সম্মানিত পরিবারের ছেলে—হিট্‌লারের অভ্যুদয়ের পর নাৎসি প্রতিবিপ্লব-প্লাবনের মধ্যে জোয়ারের-স্রোতে-ভেসে-যাওয়া তৃণখণ্ডের মত তিনি কোথায় হারিয়ে যান, আর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

এই আড্ডার 'সবচেয়ে চ্যাংড়া' অর্থাৎ সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন গোলাম মৌলা ওরফে মুজতবা আলী স্বয়ং।

মুজতবা আলী চারখানি উপন্যাস রচনা করেছেন এবং কয়েকটি ছোটগল্পও লিখেছেন—সবগুলিই সুরচিত ও সুখপাঠ্য। তবু আমার মনে হয়, বিশুদ্ধ কল্পনা-ভিত্তিক রচনা তাঁর তেমন খোলতাই হয় না। সত্য কাহিনীর বীজ থেকে অঙ্কুরিত অথবা স্বচক্ষে দেখা মানুষকে ঘিরে আবর্তিত ঘটনাবলী আখ্যানসূত্রে গেঁথে তোলেন তিনি যে-সব রচনায় সেইগুলিই আমার কাছে সবচেয়ে উপভোগ্য বলে মনে হয়। তার অন্যতম কারণ বোধ হয় এই যে, এই জাতীয় রচনাতেই তাঁর বিশিষ্ট ধরনের ভাষাভঙ্গিটি সর্বাপেক্ষা সুপ্রযুক্ত হতে পারে।

'চাচা-কাহিনী'র সব কটি কাহিনীই এইভাবে সত্যকার ঘটনা বা মানুষকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে—অন্ততঃ এই আমার ধারণা।

কিন্তু এ-বইএর এগারোটি কাহিনীর মধ্যে প্রথম পাঁচটিকেই মাত্র সত্য সত্য 'চাচা-কাহিনী' বলে বর্ণনা করা চলে, কারণ এই পাঁচটিই শুধু চাচা নিজের মুখে বলেছেন—এবং এদের সব কটিই জার্মানির ঘটনা। বাকি ছটির বক্তা চাচা নন, লেখক। তাদের মধ্যে মাত্র একটির ঘটনাস্থল জার্মানির মুনিক শহর; দুটি ঘটেছিল প্যারিসে, এবং তিনটি ভারতবর্ষে।—শেষের ছটি কাহিনীর শিল্পমান অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের; প্রথম পাঁচটি, অর্থাৎ যে-কাহিনীগুলির 'আমি' চাচা নিজে এবং যেগুলিকে অবলম্বন করে বই-এর নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলি প্রায় সবই শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের রচনা।

আলোচনার প্রথমাংশে মুজতবা আলীর ভাষাশৈলী ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যে-সব কথা বলা হয়েছে সেগুলো আবার একবার পড়ে নিলেই 'চাচা-কাহিনী'-র আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব কথাই জানা হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন যে এ-বইএর সবচেয়ে ভাল কাহিনীগুলি একটি বিশিষ্ট আড্ডার প্রধান আড্ডাধারীর মুখ দিয়ে মুজতবা আলীর নিজস্ব আড্ডার ভাষাতেই বলানো হয়েছে।

অতঃপর কয়েকটি কাহিনী বেছে নিয়ে সেগুলি সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য মন্তব্যাকারে আপনাদের কাছে পেশ করতে পারলেই আমার 'চাচা-কাহিনী'-সংক্রান্ত আলোচনা শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করি।—

আট নম্বর কাহিনীটি ('রাক্ষসী') মূলতঃ একটা রোমাঞ্চকর বিভীষিকার কাহিনী—বিস্ময় ও আতঙ্কের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার পর মন জুগুপ্সায় শিউরে ওঠে। এ-জাতীয় গল্পের সমঝদারের সংখ্যা খুব কম হওয়াই স্বাভাবিক।—উপক্রমণিকা-পর্বে বর্ণিত পার্শীদের আনন্দ উৎসব ও সামাজিক প্রথা-পদ্ধতির বিবরণটি উপভোগ্য।

দশ নম্বর কাহিনী ('পুনশ্চ') প্যারিসের দুটি সান্ধ্য অভিজ্ঞতার বর্ণনা। প্রথমাংশে লেখক যে-তরুণীটির সাহচর্য লাভ করেছিলেন সে অতি সুনিপুণা gold-digger—ছেড়ে যাবার সময় তাঁকে প্রায় সর্বস্বান্ত করে রেখে গিয়েছিল। এই অংশের বর্ণনাভঙ্গি হাস্যরসাত্মক। দ্বিতীয়াংশে আর একটি অপরূপ সুন্দরী তরুণীর কথা বলা হয়েছে। এও এসে লেখকের ঘাড়ে চেপেছিল—কিন্তু এ ছিল পেশাদার পথচারিণী স্বৈরিণী। এর 'ঘৃণ্য' জীবনের দুঃখ-দুর্দশার সকরুণ আখ্যানেই এ-কাহিনীর উপসংহার।—রস ভাল না জমলেও মনকে বেশ নাড়া দিয়ে যায়।

এক নম্বর কাহিনীতে ('স্বয়ংবরা') একটি দারুণ মতলববাজ মেয়ে-জুয়াচোর

কি ভাবে ফাঁকি দিয়ে চাচাকে বিয়ের ফাঁদে ফেলে স্বকার্য উদ্ধারের আয়োজন করেছিল এবং একটি হকি-খেলোয়াড় মদ্দা-মেয়ের সাহায্যে তিনি শেষ পর্যন্ত কিভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।—বিশেষ কিছু শিল্পমূল্য না থাকলেও রচনাটি পড়ে আনন্দ পাওয়া যায়।

পাঁচ নম্বর কাহিনীটি ('বেলতলাতে দু-দুবার') প্রধানতঃ হাস্যরসাত্মক। তার প্রথমার্ধে অস্কার নামক একটি পাঁড় নাৎসি গুণ্ডাপ্রকৃতির তরুণের যে চরিত্র-চিত্র আঁকা হয়েছে তার অপূর্ব মুন্সিয়ানার তারিফ না করে উপায় নেই। ছোকরা এদিকে খুবই পরোপকারী, তাদের বাড়ীর 'ভাড়াটে অতিথি' (Paying guest) ভারতীয় কালা-আদ্‌মি ('Inder') চাচার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে—তাঁকে ভালও বাসে; কিন্তু হঠাৎ একদিন চাচার কথার মধ্যে কাল্পনিক নাৎসি-অবমাননা আবিষ্কার করে ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে এমন মারমূর্তি ধারণ করল যে তাঁকে বাধ্য হয়ে তাদের বাড়ী ছাড়তে হল। অথচ এর পর একদিন এক মেলার মধ্যে চাচা যখন অন্য এক নাৎসি গুণ্ডার হাতে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হতে চলেছেন তখন এই অস্কারই—মদের নেশায় টং হয়ে থাকা সত্ত্বেও—গায়ে পড়ে এসে তাঁকে বাঁচিয়ে দিল।—পরম উপভোগ্য রচনা।

তৃতীয় কাহিনীর ('মা-জননী') নায়িকা নার্স সিবিলা অবিবাহিতা অবস্থায় সন্তানের মা হয়েছে। সে যে-পরিবারে কাজ করে তার কর্তা-গিন্নি দুজনেই তাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, তাই অনেক চেষ্টা করে ব্যবস্থা করেছেন যাতে শিশুটি কোন ভদ্র পরিবারে পালিত হতে পারে—কিন্তু এই শর্তে যে তার মা আর তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না। সিবিলা প্রথমে রাজী হয়ে শিশুর জন্য গাদা গাদা পোষাক ও খেলনা কিনে নিজের ছ-মাসের মাইনে নিঃশেষ করে দিল, তারপর শেষ পর্যন্ত আত্মসংবরণ করতে না পেরে শিশুটিকে ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।—কানীন সন্তানের মায়ের তীব্র অপত্যস্নেহের এই করুণ কাহিনীটি লেখক অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। সহজে ভুলে যাওয়ার মত রচনা নয়।

চতুর্থ কাহিনীটি ('তীর্থহীনা') অতিমাত্রায় অশ্রুসজল হলেও মর্মস্পর্শী। নায়িকা নেহাৎই ছেলেমানুষ—স্বামী-পরিত্যক্তা ও যক্ষারোগে আক্রান্ত। তারা রোমান ক্যাথলিক—তার মা বিশ্বাস করেন, রাইন নদীর ওপারে সেণ্ট য়ুডাস টাডেয়াসের গির্জায় তীর্থযাত্রা করলে তাঁর মেয়ে নীরোগ হয়ে উঠবে। পথে নিদারুণ ঝড়বৃষ্টির ফলে তীর্থযাত্রীর দল গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারল না, মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হল। মেয়েটি কিছুদিন পরে মারা গেল।—অতি সরল কাহিনী, কিন্তু তার কারুণ্য অবিস্মরণীয়। তীর্থযাত্রার শ্রদ্ধাপূত বর্ণনাটি

চমৎকার—কিন্তু তার সঙ্গে অর্ধপথে আটকে-পড়া তীর্থযাত্রীদের পান-ও-নৃত্যোৎসবের বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত বিস্ময়কর, প্রায় বীভৎসও বলা চলে।

আমার মতে 'চাচা-কাহিনী'-র শ্রেষ্ঠ রচনা দ্বিতীয় কাহিনীটি ('কর্নেল')। কাহিনীর চুম্বকমাত্র দিয়ে তার রসের পূর্ণ স্বরূপ বোঝানো এ-ক্ষেত্রে অসম্ভব, কারণ রচনাটির একমাত্র বিষয়বস্তু একটি চরিত্র। নায়ক অভিজাত প্রাশিয়ান বংশোদ্ভূত, জার্মান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন কর্নেল—কিন্তু জার্মানীর চরম আর্থিক অবসাদের (deflation) ফলে দরিদ্র হয়ে পড়েছেন, এত দরিদ্র যে প্রায় আক্ষরিক অর্থে অনশন এড়াবার জন্য চাচাকে ভাড়াটে অতিথি (Paying guest) হিসাবে গৃহে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন। মহাপণ্ডিত মানুষ, চাচাকে প্রত্যহ গ্যেটে পড়ান—তাছাড়া শুধু সাহিত্য নয়, তাঁর পড়াশুনার পরিধি অতি-বিস্তৃত ; নৃতত্ত্ব, ধর্মনীতি, সমাজবিদ্যা সবই পড়েন, মায় সংস্কৃত মনুসংহিতা গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্রের জার্মান অনুবাদ পর্যন্ত।—কিন্তু জার্মান-জাতিবিশুদ্ধি রক্ষা সম্বন্ধে এবং রক্ত-সংমিশ্রণ ও বর্ণসংকর সৃষ্টির বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব অনমনীয়, কুলিশ-কঠোর। অথচ পরিশীলিত ভাষণে ভদ্রতায় ও নম্রতায় এই স্বল্পভাষী মানুষটির তুলনা নেই। একটি মাত্র ছেলে যুদ্ধে মারা গেছে, আর আছে একটি মাত্র মেয়ে। সেই মেয়ে একদিন বাপের বাড়ীর দরজায় এল নিজের শিশুসন্তানটিকে সঙ্গে নিয়ে। বাপ তাকে সদর থেকেই ফিরিয়ে দিলেন—কঠোর ভাষায় নিষেধ করে দিলেন, আর যেন সে কোনদিন এ বাড়ীতে না আসে। তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে-ছিলেন বলে চাচাকেও বাড়ী থেকে বিদায় করে দিলেন। মেয়ের অপরাধ সে একজন ফরাসী অধ্যাপককে বিয়ে করেছে, অভিজাত প্রাশিয়ান পরিবারে বর্ণসংকর আমদানি করেছে।—যে-কৌলীন্য ও জাত্যাভিমান শুধু পরের অবমাননা ও পরপীড়ন মাত্র করে না, যার শতকরা আশি ভাগই হল আত্ম-নিগ্রহ ও কৃচ্ছ্রসাধন, তার মধ্যে এক ধরনের heroism বা বীরত্ব আছে—কর্নেলের চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক এই কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দেশে বিদেশে

প্রথম খণ্ড

জিন্নতবাসিনী জাহান-আরার স্মরণে

চাঁদনী থেকে ন'সিকে দিয়ে একটা শর্ট কিনে নিয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিচক্ষণ বাঙালীর জন্য ইয়োরোপীয়ন থার্ড নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ভারতের সর্বত্র আনাগোনা করত।

হাওড়া স্টেশনে সেই থার্ডে উঠতে যেতেই এক ফিরিঙ্গী হেঁকে বলল, 'এটা ইয়োরোপীয়নদের জন্য।'

আমি গাঁক গাঁক করে বললুম, 'ইয়োরোপীয়ন তো কেউ নেই। চল, তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।'

এক তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, 'বাঙলা শব্দের অন্ত্যদেশে অনুস্বার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়; ইংরিজী শব্দের প্রাগ্দেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবী ইংরিজী হয়।' অর্থাৎ পয়লা সিলেব্‌লে অ্যাকসেন্ট দেওয়া খারাপ রান্নায় লঙ্কা ঠেসে দেওয়ার মত—সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সোজা বাঙলায় এরি নাম গাঁক গাঁক করে ইংরিজী বলা। ফিরিঙ্গী তালতলার নেটিব, কাজেই আমার ইংরিজী শুনে ভারি খুশী হয়ে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করল। কুলিকে ধমক দেবার ভার ওরি কাঁধে ছেড়ে দিলুম। ওদের বাপখুড়ো মাসীপিসী রেলে কাজ করে—কুলি শায়েস্তায় ওরা ওয়াকিফহাল।

কিন্তু এদিকে আমার ভ্রমণের উৎসাহ ক্রমেই চুবসে আসছিল। এতদিন পাস-পোর্ট জামাকাপড় যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিলুম, অন্য কিছু ভাববার ফুরসৎ পাইনি। গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম যে ভাবনা আমার মনে উদয় হল সেটা অত্যন্ত কাপুরুষজনোচিত—মনে হল, আমি একা।

ফিরিঙ্গীটি লোক ভাল। আমাকে গুম হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলল, 'এত মনমরা হলে কেন? গোয়িঙ ফার?'

দেখলুম বিলিতি কায়দা জানে। 'হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ?' বলল না। আমি যেটুকু বিলিতি ভদ্রস্থতা শিখেছি তার চোদ্দ আনা এক পাদরী সায়েবের কাছ থেকে। সায়েব বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, 'গোয়িঙ ফার?' বললে বাধে না, কারণ উত্তর দেবার ইচ্ছা না থাকলে 'ইয়েস' 'নো' যা খুশী বলতে পার—দুটোর যে কোনো একটাতেই উত্তর দেওয়া হয়ে যায়, আর ইচ্ছে থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু 'হোয়ার আর ইউ গোয়িঙ' যেন ইলিসিয়াম রো'র প্রশ্ন—ফাঁকি দেবার জো নেই। তাই তাতে বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যায়।

তা সে যাই হোক, সায়েবের সঙ্গে আলাপচারি আরম্ভ হল। তাতে লাভও হল। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে প্রকাণ্ড এক চুবড়ি খুলে বলল, তার 'ফিয়াঁসে'

নাকি উৎকৃষ্ট ডিনার তৈরী করে সঙ্গে দিয়েছে এবং তাতে নাকি একটা পুরাদস্তুর পল্টন পোষা যায়। আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম যে আমিও কিছু কিছু সঙ্গে এনেছি, তবে সে নিতান্ত নেটিব বস্তু, হয়ত বড্ড বেশী ঝাল। খানিকক্ষণ তর্কাতর্কির পর স্থির হল সব কিছু মিলিয়ে দিয়ে ব্রাদারলি ডিভিশন করে আ লা কার্ত ভোজন, যার যা খুশী খাবে।

সায়েব যেমন যেমন তার সব খাবার বের করতে লাগল আমার চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জমে যেতে লাগল। সেই শিককাবাব, সেই ঢাকাই পরোটা, মুরগী-মুসল্লম, আলু-গোস্ত। আমিও তাই নিয়ে এসেছি জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে। এবার সায়েবের চক্ষুস্থির হওয়ার পালা। ফিরিস্তি মিলিয়ে একই মাল বেরতে লাগল। এমন কি শিককাবাবের জায়গায় শামীকাবাব নয়, আলু-গোস্তের বদলে কপি-গোস্ত পর্যন্ত নয়। আমি বললুম, 'ব্রাদার, আমার ফিয়াঁসে নেই, এসব জাকারিয়া স্ট্রীট থেকে কেনা।'

একদম হুবহু একই স্বাদ। সায়েব খায় আর আনমনে বাইরের দিকে তাকায়। আমারও আবছা আবছা মনে পড়ল, যখন সওদা করছিলুম তখন যেন এক গাব্দাগোব্দা ফিরিঙ্গী মেমকে হোটেলে যা পাওয়া যায় তাই কিনতে দেখেছি। ফিরিঙ্গীকে বলতে যাচ্ছিলুম তার ফিয়াঁসের একটা বর্ণনা দিতে কিন্তু থেমে গেলুম। কি আর হবে বেচারীর সন্দেহ বাড়িয়ে—তার উপর দোখ বোতল থেকে কড়া গন্ধের কি একটা ঢকঢক করে মাঝে মাঝে গিলছে। বলা তো যায় না, ফিরিঙ্গীর বাচ্চা—কখন রঙ বদলায়।

রাত ঘনিয়ে এল। ক্ষিদে ছিল না বলে পেট ভরে খাইনি, তাই ঘুম পাচ্ছিল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি কাকজ্যোৎস্না। তবুও পষ্ট চোখে পড়ে এ বাঙলা দেশ নয়। সুপারি গাছ নেই, আম-জামে ঘেরা ঠাসবুনুনির গ্রাম নেই, আছে শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া ঘরবাড়ি এখানে সেখানে। উঁচু পাড়িওয়ালা ইঁদারা থেকে তখনো জল তোলা চলছে—পুকুরের সন্ধান নেই। বাঙলা দেশের সোঁদা সোঁদা গন্ধ অনেকক্ষণ হল বন্ধ—দমকা হাওয়ায় পোড়া ধুলো মাঝে মাঝে চড়াৎ করে যেন থাবড়া মেরে যায়। এই আধা আলো অন্ধকারে যদি এদেশ এত কর্কশ তবে দিনের বেলা এর চেহারা না জানি কি রকম হবে। এই পশ্চিম, এই সুজলা সুফলা ভারতবর্ষ? না, তা তো নয়। বঙ্কিম যখন সপ্তকোটি কণ্ঠের উল্লেখ করেছেন তখন সুজলা-সুফলা শুধু বাঙলা দেশের জন্যই। ত্রিংশ কোটি বলে শুকনো পশ্চিমকে ঠাট্টামস্করা করা কাষ্ঠরসিকতা। হঠাৎ দেখি পাড়ার হরেন ঘোষ দাঁড়িয়ে। এ্যা? হাঁ! হরেনই তো! কি করে? মানে? আবার

গাইছে 'ত্রিংশ কোটি, ত্রিংশ কোটি, কোটি, কোটি—'

নাঃ, এ তো চেকার সায়েব। টিকিট চেক করতে এসেছে। 'কোটি কোটি' নয়, 'টিকিট টিকিট' বলে চেঁচাচ্ছে। থার্ড ক্লাস—ইয়োরোপীয়ন হলে কি হবে। রাত তেরটার সময় ঘুম ভাঙিয়ে টিকিট চেক না করলে ও যে নিজেই ঘুমিয়ে পড়বে। ধড়মড় করে জেগে দেখি গাড়ির চেহারা বদলে গিয়েছে। 'ইয়োরোপীয়ন কম্পার্টমেণ্ট' দিশী বেশ ধারণ করেছে—বাক্স তোরঙ্গ প্যাটরা চাঙারি চতুর্দিকে ছড়ানো। ফিরিঙ্গী কখন কোথায় নেবে গিয়েছে টের পাইনি। তার খাবারের চাঙারিটা রেখে গিয়েছে—এক টুকরো চিরকুট লাগানো, তাতে লেখা 'গুড লাক ফর দি লঙ জার্নি।'

ফিরিঙ্গী হোক, সায়েব হোক, তবু তো কলকাতার লোক তালতলা: লোক—ঐ তালতলাতেই ইরানী হোটেলে কতদিন খেয়েছি, হিন্দু বন্ধুদের মোগলাই খানার কায়দাকানুন শিখিয়েছি, স্কোয়ারের পুকুরপাড়ে বসে সাঁতার কাটা দেখেছি, গোরা সেপাই আর ফিরিঙ্গীতে মেম সায়েব নিয়ে হাতাহাতিতে হাততালি দিয়েছি।

আর বাড়িয়ে বলব না। এই তালতলারই আমার এক দার্শনিক বন্ধু একদিন বলেছিলেন যে এমেটিন ইনজেকশন নিলে মানুষ নাকি হঠাৎ অত্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হয়ে যায়, ইংরিজীতে যাকে বলে 'মডলিন'—তখন নাকি পাশের বাড়ির বিড়াল মারা গেলে মানুষ বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বিদেশে যাওয়া আর এমেটিন ইনজেকশন নেওয়া প্রায় একই জিনিস। কিন্তু উপস্থিত সে গবেষণা থাক—ভবিষ্যতে যে তার বিস্তর যোগাযোগ হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভোর কোথায় হল মনে নেই। জুন মাসের গরম পশ্চিমে গৌরচন্দ্রিকা করে নামে না। সাতটা বাজতে না বাজতেই চড়চড় করে টেরচা হয়ে গাড়িতে ঢোকে আর বাকি দিনটা কি রকম করে কাটবে তার আভাস তখনই দিয়ে দেয়। শুনেছি পশ্চিমের ওস্তাদরা নাকি বিলম্বিত একতালে বেশীক্ষণ গান গাওয়া পছন্দ করেন না, দ্রুত তেতালেই তাঁদের কালোয়াতি দেখানোর শখ। আরো শুনেছি যে আমাদের দেশের রাগরাগিণী নাকি প্রহর আর ঋতুর বাছবিচার করে গাওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যায় আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে পশ্চিমের সকাল বেলাকার রোদ্দুর বিলম্বিত আর বাদবাকি দিন দ্রুত।

গাড়ি যেন কালোয়াৎ। উধ্বর্শ্বাসে ছুটেছে, কোনো গতিকে রোদ্দুরের তবলচীকে হার মানিয়ে যেন কোথাও গিয়ে ঠাণ্ডায় জিরোবে। আর রোদ্দুরও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে ততোধিক উধ্বর্শ্বাসে। সে পাল্লায় প্যাসেঞ্জারদের প্রাণ যায়।

ইস্টিশানে ইস্টিশানে সম। কিন্তু গাড়ি থেকেই দেখতে পাই রোদ্দুর প্লাটফর্মের ছাওয়ার বাইরে আগুনয়নে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে—বাঘা তবলচী যে রকম দুই গানের মাঝখানে বাঁয়া-তবলার পিছনে ঘাপটি মেরে চাটিম চাটিম বোল তোলে আর বাঁকা নয়নে ওস্তাদের পানে তাকায়।

কখন খেয়েছি, কখন ঘুমিয়েছি, কোন্ কোন্ ইস্টিশান গেল, কে গেল না তার হিসেব রাখিনি। সে গরমে নেশা ছিল, তা না হলে কবিতা লিখব কেন? বিবেচনা করুন—

দেখিলাম পোড়া মাঠ। যতদূর দিগন্তের পানে
দৃষ্টি যায়—দগ্ধ, ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা। শান্তি নাহি প্রাণে
ধরিত্রীর কোনোখানে। সবিতার ক্রুদ্ধ অগ্নিদৃষ্টি
বর্ষিছে নির্মম বেগে। গুমরি উঠিছে সর্বসৃষ্টি
অরণ্য পর্বত জনপদে। যমুনার শুষ্ক বক্ষ
এ তীর ও তীর ব্যাপী—শুষিয়াছে কোন ক্রুর যক্ষ
তার স্নিগ্ধ মাতৃরস। হাহাকার উঠে সর্বনাশা
চরাচরে। মনে হয় নাই নাই নাই কোনো আশা
এ মরুরে প্রাণ দিতে সুধা-সিক্ত শ্যামলিম ধারে।
বৃত্রের জিঘাংসা আজ পর্জন্যের সর্বশক্তি কাড়ে
বাসব আসবরিক্ত। ধরণীর শুষ্ক স্তনতৃণে
প্রেতযোনি গাভী, বৎস হৃত-আশ ক্লান্ত টেনে টেনে।

কী কবিতা! পশ্চিমের মাঠের চেয়েও নীরস কর্কশ। গুরুদেব যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এ-পদ্য ছাপানো হয় নি। গুরুশাপ ব্রহ্মশাপ।

দুই

গাঁয়ের পাঠশালার বুড়ো পণ্ডিতমশাই হাই তুললেই তুড়ি দিয়ে করুণ কণ্ঠে বলতেন, 'রাধে গো, ব্রজসুন্দরী, পার করো, পার করো।' বড় হয়ে মেলা হিন্দী উর্দু পড়েছি, নানা দেশের নানা লোকের সঙ্গে আলাপচারি হয়েছে কিন্তু 'পার করো, পার করো' বলে ঠাকুরদেবতাকে স্মরণ করতে কাউকে শুনিনি।

শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা পার হয়ে এতদিন বাদে তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম। নামগুলো ছেলেবেলায় মুখস্থ করেছি, ম্যাপে ভালো করে চিনে নিয়েছি আর কল্পনায় দেখেছি তাদের বিরাট তরঙ্গ, খরতর স্রোত। ভেবেছি

আমাদের গঙ্গা পদ্মা মেঘনা বুড়ীগঙ্গা এনাদের কাছে ধূলিপরিমাণ। গাড়ি থেকে তাকিয়ে দেখে বিশ্বাস হয় না, এঁরাই ইতিহাস ভূগোলে নামকরা মহাপুরুষের দল। কোথায় তরঙ্গ আর কোথায় তীরের মত স্রোত! এপার ওপার জুড়ে শুকনো খাঁ-খাঁ বালুচর, জল যে কোথায় তার পাত্তাই নেই, দেখতে হলে মাইক্রোস্কোপ টেলিস্কোপ দুইয়েরই প্রয়োজন। তখন বুঝতে পারলুম, ভবযন্ত্রণা পশ্চিমাদের মনে নদী পার হবার ছবি কেন এঁকে দেয় না। এসব নদীর বেশীর ভাগ পার হবার জন্য ঠাকুরদেবতার তো দরকার নেই, মাঝি না হলেও চলে। বর্ষাকালে কি অবস্থা হয় জানিনে, কিন্তু ঠাকুরদেবতাদের তো আর কিস্তিবন্দি করে মৌসুম-মাফিক ডাকা যায় না; তিন দিনের বর্ষা, তার জন্য বারো মাস চেল্লাচিল্লি করাও ধর্মের খাতে বেজায় বাজে খর্চা।

গাড়ি এর মাঝে আবার ভোল ফিরিয়ে নিয়েছে। দাড়ি লম্বা হয়েছে, টিকি খাটো হয়েছে, নাদুসনুদুস লালাজীদের মিষ্টি মিষ্টি 'আইয়ে বৈঠিয়ে' আর শোনা যায় না। এখন ছ'ফুট লম্বা পাঠানদের 'দাগা, দাগা, দিলতা, রাওড়া', পাঞ্জাবীদের 'তুসি, অসি', আর শিখ সর্দারজীদের জালবন্ধ দাড়ির হরেক রকম বাহার। পুরুষ যে রকম মেয়েদের কেশ নিয়ে কবিতা লেখে এদেশের মেয়েরা বোধ করি সর্দার-জীদের দাড়ি সম্বন্ধে তেমনি গজল গায়; সে দাড়িতে পাক ধরলে মরসিয়া-জারী গানে বার্ধক্যকে বেইজ্জৎ করে। তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি? তেয়োফিল গতিয়েরের এক উপন্যাসে পড়েছি, ফরাসীদেশে যখন প্রথম দাড়িকামানো আরম্ভ হয় তখন এক বিদগ্ধা মহিলা গভীর মনোবেদনা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'চুম্বনের আনন্দ ফরাসী দেশ থেকে লোপ পেল। শ্মশ্রুঘর্ষণের ভিতর দিয়ে প্রেমিকের দুর্বার পৌরুষের যে আনন্দঘন আস্বাদন পেতুম ফরাসী স্ত্রীজাতি তার থেকে চিরতরে বঞ্চিত হল। এখন থেকে ক্লীবের রাজত্ব। কল্পনা করতেও 'ঘেন্নায়' সর্বাঙ্গ রী রী করে ওঠে।'

ভাবলুম, কোনো সর্দারজীকে এ বিষয়ে রায় জাহির করতে বলি। ফরাসী দাড়ি তার গৌরবের মধ্যাহ্নগগনেও সর্দারজীর দাড়িকে যখন হার মানাতে পারেনি তখন এদেশের মহিলামহলে নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে অনেক প্রশস্তি-তারিফ গাওয়া হয়েছে। কিন্তু ভাবগতিক দেখে সাহস পেলুম না। এদেশে কোন্ কথায় কখন যে কার 'সখৎ বেইজ্জতী' হয়ে যায়, আর 'খুনসে' তার 'বদলাই' নিতে হয়, তার হদীস তো জানিনে—তুলনাত্মক দাড়িতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে প্রাণটা কুরবানি দেব নাকি? এরা যখন বেণীর সঙ্গে মাথা দিতে জানে তখন আলবৎ দাড়িবিহীন মুণ্ডও নিতে জানে।

সামনের বুড়ো সর্দারজীই প্রথম আলাপ আরম্ভ করলেন। 'গোয়িঙ ফার ?' নয়, সোজাসুজি 'কঁহা জাইয়েগা ?' আমি ডবল তসলীম করে সবিনয় উত্তর দিলুম—ভদ্রলোক ঠাকুরদার বয়সী আর জবরজঙ্গ দাড়ি-গোঁফের ভিতর অতিমিষ্ট মোলায়েম হাসি। বিচক্ষণ লোকও বটেন, বুঝে নিলেন নিরীহ বাঙালী কৃপাণ বন্দুকের মাঝখানে খুব আরাম বোধ করছে না। জিজ্ঞাসা করলেন পেশাওয়ারে কাউকে চিনি, না, হোটেলে উঠব। বললুম, 'বন্ধুর বন্ধু স্টেশনে আসবেন, তবে তাঁকে কখনো দেখিনি, তিনি যে আমাকে কি করে চিনবেন সে সম্বন্ধে ঈষৎ উদ্বেগ আছে।'

সর্দারজী হেসে বললেন, 'কিছু ভয় নেই, পেশাওয়ার স্টেশনে এক গাড়ি বাঙালী নামে না, আপনি দু'মিনিট সবুর করলেই তিনি আপনাকে ঠিক খুঁজে নেবেন।'

আমি সাহস পেয়ে বললুম, 'তা তো বটেই, তবে কিনা শর্ট পরে এসেছি—'

সর্দারজী এবার অট্টহাস্য করে বললেন, 'শর্টে যে এক ফুট জায়গা ঢাকা পড়ে তাই দিয়ে মানুষ মানুষকে চেনে নাকি ?'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'তা নয়, তবে কিনা ধুতি-পাঞ্জাবী পরলে হয়ত ভালো হত।'

সর্দারজীকে হারাবার উপায় নেই। বললেন, 'এও তো তাজ্জবকী বাৎ— 'পাঞ্জাবী' পরলে বাঙ্গালীকে চেনা যায় ?'

আমি আর এগলুম না। বাঙালী 'পাঞ্জাবী' ও পাঞ্জাবী কুর্তায় কি তফাৎ সে সম্বন্ধে সর্দারজীকে কিছু বলতে গেলে তিনি হয়ত আমাকে আরো বোকা বানিয়ে দেবেন। তার চেয়ে বরঞ্চ উনিই কথা বলুন, আমি শুনে যাই। জিজ্ঞাসা করলুম, 'সর্দারজী শিলওয়ার বানাতে ক'গজ কাপড় লাগে ?'

বললেন, দিল্লীতে সাড়ে তিন, জলন্ধরে সাড়ে চার, লাহোরে সাড়ে পাঁচ, লালামুসায় সাড়ে ছয়, রাওলপিণ্ডিতে সাড়ে সাত, তারপর পেশাওয়ারে এক লম্ফে সাড়ে দশ, খাস পাঠানমুল্লুক কোহাট খাইবারে পুরো থান।'

'বিশ গজ!'

'হ্যাঁ, তাও আবার খাকী শার্টিঙ দিয়ে বানানো।'

আমি বললুম, 'এ রকম একবস্তা কাপড় গায়ে জড়িয়ে চলাফেরা করে কি করে ? মারপিট, খুনরাহাজানির কথা বাদ দিন।'

সর্দারজী বললেন, 'আপনি বুঝি কখনো বায়স্কোপ যান না ? আমি এই বুড়োবয়সেও মাঝে মাঝে যাই। না গেলে ছেলে-ছোকরাদের মতিগতি বোঝবার

উপায় নেই—আমার আবার একপাল নাতি-নাত্নী। এই সেদিন দেখলুম, দু'শো বছরের পুরোনো গল্পে এক মেমসায়েব ফ্রকের পর ফ্রক পরেই যাচ্ছেন, পরেই যাচ্ছেন—মনে নেই, দশখানা না বারোখানা। তাতে নিদেনপক্ষে চল্লিশ গজ কাপড় লাগার কথা। সেই পরে যদি মেমরা নেচেকুঁদে থাকতে পারেন, তবে মদ্দা পাঠান বিশগজী শিলওয়ার পরে মারপিট করতে পারবে না কেন?'

আমি খানিকটা ভেবে বললুম, 'হক কথা; তবে কিনা বাজে খর্চা।'

সর্দারজী তাতেও খুশী নন। বললেন, 'সে হল উনিশবিশের কথা। মাদ্রাজী ধুতি সাত হাত, জোড় আট; অথচ আপনারা দশ হাত পরেন।'

আমি বললুম, 'দশ হাত টেকে বেশী দিন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরা যায়।'

সর্দারজী বললেন, 'শিলওয়ারের বেলাতেও তাই। আপনি বুঝি ভেবেছেন, পাঠান প্রতি ঈদে নূতন শিলওয়ার তৈরী করায়? মোটেই না। ছোকরা পাঠান বিয়ের দিন শ্বশুরের কাছ থেকে বিশগজী একটা শিলওয়ার পায়। বিস্তর কাপড়ের ঝামেলা—এক জায়গায় চাপ পড়ে না বলে বহুদিন তাতে জোড়াতালি দিতে হয় না। ছিঁড়তে আরম্ভ করলেই পাঠান সে শিলওয়ার ফেলে দেয় না, গোড়ার দিকে সেলাই করে, পরে তালি লাগাতে আরম্ভ করে—সে যে-কোনো রঙের কাপড় দিয়েই হোক, পাঠানের তাতে বাছবিচার নেই। বাকী জীবন সে ঐ শিলওয়ার পরেই কাটায়। মরার সময় ছেলেকে দিয়ে যায়—ছেলে বিয়ে হলে পর তার শ্বশুরের কাছ থেকে নূতন শিলওয়ার পায়, ততদিন বাপের শিলওয়ার দিয়ে চালায়।'

সর্দারজী আমাকে বোকা পেয়ে মস্করা করছেন, না সত্যি কথা বলছেন বুঝতে না পেরে বললুম, 'আপনি সত্যি সত্যি জানেন, না আপনাকে কেউ বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেছে?'

সর্দারজী বললেন, 'গভীর বনে রাজপুত্তুরের সঙ্গে বাঘের দেখা—বাঘ বললে 'তোমাকে আমি খাব।' এ হল গল্প, তাই বলে বাঘ মানুষ খায় সেও কি মিথ্যে কথা?'

অকাট্য যুক্তি। পিছনে রয়েছে আবার সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতা, কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বললুম, 'আমরা বাঙালী, পাজামার মর্ম আমরা জানব কি করে? আমাদের হল বিষ্টিবাদলার দেশ, খালবিল পেরতে হয়। ধুতিলুঙ্গী যে রকম টেনে টেনে তোলা যায়, পাজামাতে তো তা হয় না।'

মনে হয় এতক্ষণে যেন সর্দারজীর মন পেলুম। তিনি বললেন, 'হাঁ, বর্মা মালয়েও তাই। আমি ঐ সব দেশে ত্রিশ বৎসর কাটিয়েছি।'

তারপর তিনি ঝাড় বেঁধে নানা রকম গল্প বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য কতটা বানিয়ে বলা সে কথা পরখ করার মত পরশ পাথর আমার কাছে ছিল না, তবে মনে হল ঐ বাঘের গল্পের মতই। দু'চারজন পাঠান ততক্ষণে সর্দারজীর কাছে এসে তাঁর গল্প শুনতে আরম্ভ করেছে—পরে জানলুম এদের সবাই দু'দশ বছর বর্মা মালয়ে কাটিয়ে এসেছে—এদের সামনে সর্দারজী ঠিক তেমনি-ধারা গল্প করে যেতে লাগলেন। তাতেই বুঝলুম, ফাঁকির অংশটা কমই হবে।

আড্ডা জমে উঠল। দেখলুম, পাঠানের বাইরের দিকটা যতই রসকষহীন হোক না কেন, গল্প শোনাতে আর গল্প বলাতে তাদের উৎসাহের সীমা নেই। তর্কাতর্কি করে না, গল্প জমাবার জন্য বর্ণনার রঙতুলিও বড একটা ব্যবহার করে না। সব যেন উড্‌কাটের ব্যাপার—সাদামাটা কাঠখোট্টা বটে, কিন্তু ঐ নীরস নিরলঙ্কার বলার ধরনে কেমন যেন একটা গোপন কায়দা রয়েছে যার জন্য মনের উপর বেশ জোর দাগ কেটে যায়। বেশীর ভাগই মিলিটারী গল্প, মাঝে মাঝে ঘরোয়া অথবা গোষ্ঠী-সংঘর্ষণের ইতিহাস। অনেকগুলো গোষ্ঠীর নামই সেদিন শেখা হয়ে গেল—আফ্রিদী, শিনওয়ারী, খুগিয়ানী আরো কত কি। সর্দারজী দেখলুম এদের হাড়হদ্দ সবকিছুই জানেন, আমার সুবিধের জন্য মাঝে মাঝে টীকাটিপ্পনী কেটে আমাকে যেন আস্তে আস্তে ওয়াকিফহাল করে তুলছিলেন। ফুরসৎমাফিক আমাকে একবার বললেনও, 'ইংরেজ-ফরাসীর কেচ্ছা পড়ে পড়ে তো পরীক্ষা পাস করেছেন, অন্য কোনো কাজে সেগুলো লাগবে না। তার চেয়ে পাঠানদের নামবুনিয়াদ শিখে নিন, পেশাওয়ার খাইবারপাসে কাজে লাগবে।'

সর্দারজী হক কথা বলেছিলেন।

পাঠানদের গল্প আবার শেষ হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে। ভাঙা ভাঙা পশতু উর্দু পাঞ্জাবী মিশিয়ে গল্প শেষ করে বলবে, 'তখন তো আমার কুছ মালুমই হল না, আমি যেন শরাবীর বেহুশীতে মশগুল। পরে সব যখন সাফসফা, বিলকুল ঠাণ্ডা, তখন দেখি বাঁ হাতের দুটো আঙুল উড়ে গিয়েছে। এই দেখুন।' বলে বাইশগজী শিলওয়ারের ভাঁজ থেকে বাঁ হাতখানা তুলে ধরল।

আমি দরদ দেখাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলুম, 'হাসপাতালে কতদিন ছিলেন?'

সুবে পাঠানিস্থান একসঙ্গে হেসে উঠল; বাবুজীর অজ্ঞতা দেখে ভারি খুশী।

পাঠান বলল, 'হাসপাতাল আর বিলায়তী ডাগ্‌দর কহাঁ, বাবুজী? বিবি পট্টি বেঁধে দিলেন, দাদীমা কুচকুচ হলদভী লাগিয়ে দিলেন, মোল্লাজী ফুঁ-ফুঁকার করলেন। অব্ দেখিয়ে, মালুম হয় যেন আমি তিন আঙুল নিয়েই জন্মেছি।'

পাঠানের ভগিনীপতিও গাড়িতে ছিল ; বলল, 'যে-তিনজনের কথা বললে' তাদের ভয়ে অজরঈল (যমদূত) তোমাদের গাঁয়ে ঢোকে না—তোমাকে মারে কে ?' সবাই হাসল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর দাদীজানের কেচ্ছা ওকে বলতে বলুন না। পাহাড়ের উপর থেকে পাথরের পর পাথর গড়িয়ে ফেলে কি রকম করে একটা পুরাদস্তুর গোরা পল্টনকে তিন ঘণ্টা কাবু করে রেখেছিলেন।'

সেদিন গল্পের প্লাবনে রৌদ্র আর গ্রীষ্ম দুই-ই ডুবে গিয়েছিল। আর কী খানাপিনা ! প্রতি স্টেশনে আড্ডার কেউ না কেউ কিছু না কিছু কিনবেই। চা, শরবৎ, বরফজল, কাবাব রুটি, কোনো জিনিসই বাদ পড়ল না। কে দাম দেয়, কে খায় কিচ্ছু বোঝবার উপায় নেই। আমি দু'একবার আমার হিস্সা দেবার চেষ্টা করে হার মানলুম। বারোজন তাগড়া পাঠানের তির্যকব্যূহ ভেদ করে দরজায় পৌঁছবার বহু পূর্বেই কেউ না কেউ পয়সা দিয়ে ফেলেছে। আপত্তি জানালে শোনে না, বলে, 'বাবুজী এই পয়লা দফা পাঠানমুল্লুকে যাচ্ছেন, না হয় আমরা একটু মেহমানদারী করলুমই। আপনি পেশাওয়ারে আড্ডা গাড়ুন, আমরা সবাই এসে একদিন আচ্ছা করে খানাপিনা করে যাবো। আমি বললুম, 'আমি পেশাওয়ারে বেশী দিন থাকব না।' কিন্তু কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো। সর্দারজী বললেন, 'কেন বৃথা চেষ্টা করেন ? আমি বুড়ামানুষ, আমাকে পর্যন্ত একবার পয়সা দিতে দিল না। যদি পাঠানের আত্মীয়তা-মেহমানদারী বাদ দিয়ে এদেশে ভ্রমণ করতে চান, তবে তার একমাত্র উপায় কোনো পাঠানের সঙ্গে একদম একটি কথাও না বলা। তাতেও সব সময় ফল হয় না।'

পাঠানের দল আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আমরা গরীব, পেটের ধান্দায় তামাম দুনিয়া ঘুরে বেড়াই, আমরা মেহমানদারী করব কি দিয়ে ?'

সর্দারজী আমার কানে কানে বললেন, 'দেখলেন বুদ্ধির বহর ? মেহমানদারী করার ইচ্ছাটা যেন টাকা থাকা না-থাকার উপর নির্ভর করে।'

তিন

সর্দারজী যখন চুল বাঁধতে, দাড়ি সাজাতে আর পাগড়ি পাকাতে আরম্ভ করলেন তখনই বুঝতে পারলুম যে পেশাওয়ার পৌঁছতে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি। গরমে, ধুলোয়, কয়লার গুঁড়োয়, কাবাবরুটিতে আর স্নানাভাবে আমার গায়ে তখন আর একরত্তি শক্তি নেই যে বিছানা গুটিয়ে হোল্ডল বন্ধ করি। কিন্তু

পাঠানের সঙ্গে ভ্রমণ করাতে সুখ এই যে, আমাদের কাছে যে কাজ কঠিন বলে বোধ হয় পাঠান সেটা গায়ে পড়ে করে দেয়। গাড়ির ঝাঁকুনির তাল সামলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, উপরের বাঙ্কের বিছানা বাঁধা আর দেশলাইটি এগিয়ে দেওয়ার মধ্যে পাঠান কোনো তফাৎ দেখতে পায় না। বাক্স তোরঙ্গ নাড়াচাড়া করে যেন অ্যাটাচি কেস।

ইতিমধ্যে গল্পের ভিতর দিয়ে খবর পেয়ে গিয়েছি যে পাঠান-মুল্লুকের প্রবাদ, 'দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের।' শুনে গর্ব অনুভব করেছি বটে যে বন্দুকধারী পাঠান কামানধারী ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কিন্তু বিন্দুমাত্র আরাম বোধ করিনি। গাড়ি পেশাওয়ার পৌঁছবে রাত ন'টায়। তখন যে কার রাজত্বে গিয়ে পৌঁছব তাই মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল। বাইরে ঠা ঠা আলো, ন'টা বাজল কি করে, আর পেশাওয়ারে পৌঁছলুমই বা কি করে? একটানা মুসাফিরির ধাক্কায় মন তখন এমনি বিকল হয়ে গিয়েছিল যে শেষের দিকে ঘড়ির পানে তাকানো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলুম। এখন চেয়ে দেখি সত্যি ন'টা বেজেছে। তখন অবশ্য এসব ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে হায়রান হবার ফুরসৎ ছিল না, পরে বুঝতে পারলুম পেশাওয়ার এলাহাবাদের ঘড়িমাফিক চলে বলে কাণ্ডটা খুবই স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক—তখন আবার জুন মাস।

প্ল্যাটফরমে বেশী ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ্য করলুম যে ছ'ফুটী পাঠানদের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাতর নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব নিজের বাঙালিত্ব জাহির করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এসে উত্তম উর্দুতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে এক হাত এগিয়ে দিতেই তিনি তাঁর দু'হাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ—পরম উৎসাহে, গরম সম্বর্ধনায়। সে চাপে আমার হাতের পাঁচ আঙুল তাঁর দুই থাবার ভিতর তখন লুকোচুরি খেলছে। চিৎকার করে যে লাফ দিয়ে উঠিনি তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে তখনো গাড়ির পাঠানের দুটো আঙুল উড়ে যাওয়ার গল্প অবচেতন মনে বাসা বেঁধে অর্ধচেতন সহিষ্ণুতায় আমাকে উৎসাহিত করছিল। তাই সেদিন পাঠানমুল্লুকের পয়লা কেলেঙ্কারি থেকে বাঙালী নিজের ইজ্জৎ বাঁচাতে পারল। কিন্তু হাতখানা কোন্ শুভলগ্নে ফেরৎ পাব সে কথা যখন ভাবছি তখন তিনি হঠাৎ আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে খাস পাঠানী কায়দায় আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর সমানে সমান উঁচু হলে সেদিন কি হত বলতে পারিনে

কিন্তু আমার মাথা তাঁর বুক অবধি পৌঁছয়নি বলে তিনি তাঁর এক কড়া জোরও আমার গায়ে চাপাতে পারছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দু পশতুতে মিলিয়ে যা বলে যাচ্ছিলেন তার অনুবাদ করলে অনেকটা দাঁড়ায়—'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো?' আমি 'জী হাঁ, জী না' করেই যাচ্ছি আর ভাবছি গাড়িতে পাঠানদের কাছ থেকে তাদের আদব-কায়দা কিছুটা শিখে নিলে ভালো করতুম। পরে ওয়াকিফহাল হয়ে জানলুম, বন্ধুদর্শনে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই, দেওয়া কায়দা নয়। উভয় পক্ষ একসঙ্গে প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে যাবেন অন্তত: দু'মিনিট ধরে। তারপর হাত মিলানা, বুক-মিলানা শেষ হলে একজন একটি প্রশ্ন শুধাবেন, 'কি রকম আছেন?' আপনি তখন বলবেন, 'শুকুর, অলহমদুলিল্লা' অর্থাৎ 'খুদাতালাকে ধন্যবাদ, আপনি কি রকম?' তিনি বলবেন, 'শুকুর, অলহমদুলিল্লা।' সর্দিকাশির কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে হলে তখন বলতে পারেন—কিন্তু মিলনের প্রথম ধাক্কায় প্রশ্নতরঙ্গের উত্তর নানা ভঙ্গিতে দিতে যাওয়া 'সখ্‌ৎ বেয়াদবী'!

খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙ্গায় বসালেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না জানেন না, আমি বাঙালী তিনি পাঠান, তবে যে এত সম্বর্ধনা করছেন তার মানে কি? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মত আনন্দ পাঠান অন্য কোনো জিনিসে পায় না—আর সে অতিথি যদি বিদেশী হয় তা হলে তো আর কথাই নেই। তারো বাড়া, যদি সে অতিথি পাঠানের তুলনায় রোগাদুব্‌লা সাড়েপাঁচফুটী হয়। ভদ্রলোক পাঠানের মারপিট করা মানা। তাই সে তার শরীরের অফুরন্ত শক্তি নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। রোগাদুব্‌লা লোক হাতে পেলে আর্তকে রক্ষা করার কৈবল্যানন্দ সে তখন উপভোগ করে—যদিও জানে যে কাজের বেলায় তার গায়ের জোরের কোনো প্রয়োজনই হবে না।

টাঙ্গা তো চলেছে পাঠানী কায়দায়। আমাদের দেশে সাধারণত লোকজন রাস্তা সাফ করে দেয়—গাড়ি সোজা চলে। পাঠানমুল্লুকে লোকজন যার যে রকম খুশী চলে, গাড়ি এঁকে-বেঁকে রাস্তা করে নেয়। ঘণ্টা বাজানো, চিৎকার করা বৃথা। খাস পাঠান কখনো কারো জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। সে 'স্বাধীন', রাস্তা ছেড়ে দিতে হলে তার 'স্বাধীনতা' রইল কোথায়? কিন্তু ঐ স্বাধীনতার

দাম দিতেও সে কসুর করে না। ঘোড়ার নালের চাট লেগে যদি তার পায়ের এক থাবলা মাংস উড়ে যায় তাহলে সে রেগে গালাগালি, মারামারি বা পুলিস ডাকাডাকি করে না। পরম অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি সহকারে ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'দেখতে পাস না?' গাড়োয়ানও স্বাধীন পাঠান—ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলে, 'তোর চোখ নেই?' ব্যস্। যে যার পথে চলল।

দেখলুম পেশাওয়ারের বারো আনা লোক আহমদ আলীকে চেনে, আহমদ আলী বোধ হয় দশ আনা চেনেন। দু'মিনিট অন্তর অন্তর গাড়ি থামান আর পশতু জবানে কি একটা বলেন; তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে জানান, 'আপনার সঙ্গে খেতে বললুম। আপত্তি নেই তো?'

আহমদ আলীর স্ত্রীর সৌভাগ্য বলতে হবে—কারণ তিনিই রাঁধেন পর্দা বলে বাড়েন না—যে তাঁদের বাড়ি স্টেশনের কাছে, না হলে সে রাত্রে আহমদ আলীর বাড়িতে পাঠানমুল্লুকের জিরগা বসে যেত।

সরল পাঠান ও সুচতুর ইংরেজে একটা জায়গায় মিল আছে। পাঠানমাত্রই ভাবে বাঙালী বোমা মারে, ইংরেজেরও ধারণা অনেকটা তাই। আহমদ আলী সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টর। আমি তাঁর বাড়ি পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের ভিতর এক পুলিস এসে আহমদ আলীকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। তিনি সেটা পড়েন আর হাসেন। তারপর তিনি রিপোর্টখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। তাতে রয়েছে আমার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, এবং বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে যে লোকটা বাঙালী—আহমদ আলী যেন উক্ত লোকটার অনুসন্ধান করে সদাশয় সরকারকে তার হাল-হকিকৎ বাৎলান।

আহমদ আলী কাগজের তলায় লিখলেন, 'ভদ্রলোক আমার অতিথি'।

আমি বললুম, 'নাম-ধাম মৎলবটাও লিখে দিন—জানতে চেয়েছে যে।'

আহমদ আলী বলেন, 'কী আশ্চর্য, অতিথির পিছনেও গোয়েন্দাগিরি করব নাকি?'

আমি ভাবলুম পাঠানমুল্লুকে কিঞ্চিৎ বিদ্যা ফলাই। বললুম, 'কর্ম করে যাবেন নিরাসক্ত ভাবে, তাতে অতিথির লাভলোকসানের কথা উঠবে না, এই হল গীতার আদেশ।'

আহমদ আলী বললেন, 'হিন্দুধর্মে শুনতে পাই অনেক কেতাব আছে। তবে আপনি বেছে বেছে একখানা গীতের বই থেকে উপদেশটা ছাড়লেন কেন? তা সে কথা থাক। আমি বিশ্বাস করি কোনো কর্ম না করাতে, সে আসক্তই হোক আর নিরাসক্তই হোক। আমার ধর্ম হচ্ছে উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা।'

'উবুড় হয়ে শুয়ে থাকা' কথাটায় আমার মনে একটু ধোঁকা লাগল। আমরা বলি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকব এবং এই রকম চিৎ হয়ে শুয়ে থাকাটা ইংরেজ পছন্দ করে না বলে 'লাইঙ স্যুপাইন' কর্মটি প্রভুদের পক্ষে অপকর্ম বলে গণ্য হয়। পাঠানে ইংরেজে মিল আছে পূর্বেই বলেছি, ভাবলুম তাই বোধ হয় পাপটা এড়াবার ও আরামটি বজায় রাখার জন্য পাঠান উবুড় হয়ে শুয়ে থাকার কথাটা আবিষ্কার করেছে।

আমার মনে তখন কি দ্বিধা আহমদ আলী আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কি না জানিনে। নিজের থেকেই বললেন, তা না হলে এদেশে রক্ষা আছে! এই তো মাত্র সেদিনের কথা। রাত্রে বেরিয়েছি রোঁদে—মশহুর নাচনেওয়ালী জান্‌কী বাঈ কয়েক দিন ধরে গুম, যদি কোনো পাত্তা মেলে। আমি তো আপন মনে হেঁটে যাচ্ছি—আমার প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে জন আষ্টেক গোরা সেপাই কাঁধ মিলিয়ে রাত্তিরের টহলে কদম কদম এগিয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ একসঙ্গে এক লহমায় অনেকগুলো রাইফেলের কড়াক্-পিঙ্। আমিও তড়াক করে লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লুম, তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে পাশের নর্দমায়। সেখানে উবুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে মাথা তুলে দেখি, গোরার বাচ্চারা সব মাটিতে লুটিয়ে, জন দশেক আফ্রিদী চটপট্ গোরাদের রাইফেলগুলো তুলে নিয়ে অন্তর্ধান। আফ্রিদীর নিশান সাক্ষাৎ যমদূতের ফরমান, মকমল ডিক্রি, কিস্তি বরখেলাপের কথাই ওঠে না।

'তাই বলি, উবুড় হয়ে শুয়ে থাকতে না জানলে কখন যে কোন্ আফ্রিদীর নজরে পড়ে যাবেন বলা যায় না। জান বাঁচাবার এই হল পয়লা নম্বরের তালিম।'

আমি বললুম, 'চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলেই বা দোষ কি?'

আহমদ আলী বললেন, 'উঁহু, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে দেখতে পাবেন খুদাতালার আসমান—সে বড় খাবসুরৎ। কিন্তু মানুষের বদমায়েশীর উপর নজর রাখবেন কি করে? কি করে জানবেন যে ডেরা ভাঙবার সময় হল, আর এখানে শুয়ে থাকলে নয়া ফ্যাসাদে বাঁধা পড়ার সম্ভাবনা? মিলিটারি আসবে, তদারকতদন্ত হবে, আপনাকে পাকড়ে নিয়ে যাবে—তার চেয়ে আফ্রিদীর গুলী ভালো।'

আমি বললুম, 'সে না হয় আমার বেলা হতে পারত। কিন্তু আপনাকে তো রিপোর্ট দিতেই হত।'

আহমদ আলী বললেন, 'তওবা, তওবা। আমি রিপোর্ট করতে যাব কেন? আমার কি দায়? গোরার রাইফেল, আফ্রিদীর তার উপর নজর। যে-জিনিসে

মানুষের জান পোঁতা, তার জন্য মানুষ জান দিতে পারে, নিতেও পারে। আমি সে ফ্যাসাদে কেন ঢুকি? বাঙালী বোমা মারে—কেন মারে খোদায় মালুম, রাইফেলে তো তার শখ নেই—ইংরেজ বোমা খেতে পছন্দ করে না কিন্তু বাঙালীর গোঁ সে খাওয়াবেই। তার জন্য সে জান দিতে কবুল, নিতেও কবুল। আমি কেন ইংরেজকে আপনার হাড়হদ্দের খবর দেব? জান লেনদেনের ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের দূরে থাকা উচিত।'

আমি বললুম, 'হক কথা বলেছেন। রাসেলেরও ঐ মত। ভ্যালুজ নিয়ে নাকি তর্ক হয় না। ইংরেজ পাঠানে বিস্তর মিল দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বাঙালী কেন বোমা মারে সে তো অত্যন্ত সোজা প্রশ্ন। স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীনতা পেয়ে গেলে সেটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাইফেলের প্রয়োজন হয়। তাই বোধ করি স্বাধীন আফ্রিদীর কাছে রাইফেল এত প্রিয়বস্তু।'

আহমদ আলী অনেকক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবলেন। বললেন, 'কি জানি, স্বাধীনতা কিসের জোরে টিকে থাকে? রাইফেলের জোরে না বুকের জোরে। আমি এই পরশু দিনের এক দাঙ্গার কথা ভাবছিলুম। জানেন বোধ হয়, পেশাওয়ারের প্রায় প্রতি পাড়ায় একজন করে গুণ্ডার সর্দার থাকে। দুই পাড়ার গুণ্ডার দলে সেদিন লাগল লড়াই। গোলাগুলির ব্যাপার নয়। হাতাহাতি, জোর ছোরাছুরি। একদল মিনিট দশেক পরে মার সইতে না পেরে দিল ছুট। কিন্তু তাদের সর্দার রইলো দাঁড়িয়ে। সমস্ত দল তখন পড়ল গিয়ে তার ঘাড়ে—মেরে গুঁতিয়ে থেঁৎলে যখন ভাবল সে মরে গিয়েছে, তখন তাকে ফেলে সবাই চলে গেল। কাল তাকে হাসপাতালে দেখে এলুম। অন্তত ছ'মাস লাগবে সারতে—যদি ফাঁড়াটা কাটে। ক'খানা পাঁজর ভেঙেছে, আঁতে ক'টা ফুটো হয়েছে তার হিসেবনিকেশ এখনো শেষ হয়নি।

'কিন্তু আশ্চর্য হলুম দেখে যে লোকটা অতি রোগা টিঙটিঙে, সাড়ে পাঁচফুট হয় কি না হয়। ছোরাও নাকি সে চালাতে জানে না, রাইফেলও সে রাখে না। ব্যস্—ঐ এক চীজ আছে, হিম্মৎ। বিস্তর মার খেয়েছে, অনেকবার। মেরেছে অল্প, মারিয়েছে অনেক, পালায়নি কক্‌খনো। আসামী হয়ে আদালতে এসেছে বহুবার, কখনো ফরিয়াদী হয়নি। বলে, 'পাঁচজনের বিপদ-আপদের ফৈসালা করে দিই আমি, আর আমি যাব আদালতে আমার বিপদ-আপদে কান্নাকাটি শোনাতে!

'আরও আশ্চর্য হলুম দেখে, হাসপাতালে তার ওয়ার্ডে যেন পেশাওয়ারের ফলের বাজার বসে গিয়েছে। কাবুলের আঙুর, কান্দাহারের চেরী, মজার-ই-

শরীফের আখরোট-খোবানী সব মজুদ। ছ'জন পালোয়ান দিনরাত তার খাটের চতুর্দিকে মাটিতে বসে—কি জানি হুজুরের কখন কি দরকার হয়। হুজুর অবশ্যি উপস্থিত জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে সঙ্কটসঙ্কুল খাইবারপাসে।

'কিন্তু আসল কথা, সে এখনো দলের সর্দার। তার ইজ্জৎ বেড়েছে; তার খুশনামে পেশাওয়ারের গুণ্ডামহল গমগম করছে।'

আমি চুপ করে ভাবছি, এমন সময় দেখি আহমদ আলী মূচকি মূচকি হাসছেন। বললেন, 'লোকটার হিম্মৎ ছাড়া নাকি আরো একটা গুণ আছে। যাকে বলে হাজির-জবাব। সব কথার চটপট উত্তর দিতে পারে। শুনলুম চারবার প্রমাণ অভাবে খালাস পেয়ে পাঁচবারের বার যখন হাকিম ইজাজ হুসেন খানের আদালতে উপস্থিত হল, তখন তিনি নাকি চটে গিয়ে বলেছিলেন, 'এই নিয়ে তুই পাঁচবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিস; তোর লজ্জা-শরম নেই?'

'সর্দার নাকি মূচকি হেসে বলেছিল, 'হুজুর প্রমোশন না পেলে আমি কি করব?'

সে রাতে শুতে যাবার আগে মটরুদাকে চিঠিতে লিখলুম, 'চিৎ হয়ে শোবে না, উবুড় হয়ে শোবে। পাঠানমুল্লুকের এই আইন। শিব ঠাকুরের আপন দেশেও এই খবরটি পাঠিয়ে দিয়ো।'

চার

যতই বলি, 'ভাই আহমদ আলী, খুদা আপনার মঙ্গল করবেন, আখেরে আপনি বেহেশ্‌তে যাবেন, আমার যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করে দিন,' আহমদ আলী ততই বলেন, 'বরাদরে আজীজে মন্ (হে আমার প্রিয় ভ্রাতা), ফার্সীতে প্রবাদ আছে, 'দের আয়দ্ দুরুস্ত আয়দ্' অর্থাৎ 'যা কিছু ধীরেসুস্থে আসে তাহাই মঙ্গল-দায়ক'; আরবীতেও আছে, 'অল অজলু মিনা শয়তান' অর্থাৎ কিনা 'হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা'; ইংরেজীতেও আছে—'

আমি বললুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি এই পাঠানের চালে আমার চলবে না। শুনেছি এখান থেকে লাণ্ডিকোটাল যেতে তাদের পনরো দিন লাগে—বাইশ মাইল রাস্তা।'

আহমদ আলী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে বলেছে?'

আমি বললুম, 'কেন, কাল রাত্তিরের দাওয়াতে, রমজান খান, সেই যে বাবরী-চুলওয়ালা, মিষ্টি মিষ্টি মুখ।'

আহমদ আলী বললেন, 'রমজান খান পাঠানদের কি জানে? তার ঠাকুরমা পাঞ্জাবী, আর সে নিজে লাহোরে তিন মাস কাটিয়ে এসেছে। খাস পাঠান কখনো আটক (সিন্ধু নদ) পেরোয় না। তার লাণ্ডিকোটাল থেকে পেশাওয়ার পৌঁছতে অন্তত দু'মাস লাগার কথা। না হলে বুঝতে হবে লোকটা রাস্তার ইয়ার-দোস্তের বাড়ি কাট্ করে এসেছে। পাঠানমুল্লুকের রেওয়াজ প্রত্যেক আত্মীয়ের বাড়িতে তেরাত্তির কাটানো, আর, সব পাঠান সব পাঠানের ভাই-বেরাদর। হিসেব করে নিন।'

কাগজ পেন্সিল ছিল না। বললুম, 'রক্ষে দিন, আমার যে কন্ট্রাক্ট সই করা হয়ে গিয়েছে, আমাকে যেতেই হবে।'

আহমদ আলী বললেন, 'বাস্ না পেলে আমি কি করব?'

'আপনি চেষ্টা করেছেন?'

আহমদ আলী আমাকে হুঁশিয়ার হতে বলে জানালেন, তিনি পুলিসের ইন্সপেক্টর, নানা রকমের উকিল মোক্তার তাঁকে নিত্যি নিত্যি জেরা করে, আমি ও-লাইনে কাজ করে সুবিধা করতে পারব না।

তারপর বললেন, 'পেশাওয়ার ভালো করে দেখে নিন। অনেক দেখবার আছে, অনেক শেখবার আছে। বোখারা সমরকন্দ থেকে সদাগরেরা এসেছে পুস্তীন নিয়ে, তাশকন্দ থেকে এসেছে সামোভার নিয়ে—'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সামোভার কি?'

'রাশান গল্প পড়েন নি? সামোভার হচ্ছে ধাতুর পাত্র—টেবিলে রেখে তাতে চায়ের জল গরম করা হয়। আপনারা যে রকম মিঙ বংশের ভাস্ নিয়ে মাতামাতি করেন, পেশাওয়ার কান্দাহার তাশকন্দ তুল্লা সামোভার নিয়ে সেই-রকম লড়ালড়ি করে, কে কত দাম দিতে পারে। সে কথা আরেক দিন হবে। তারপর শুনুন, মজার-ই-শরীফ থেকে কার্পেট এসেছে, বদখশান থেকে 'লাল' রুবি, মেশেদ থেকে তসবী, আজরবাইজান থেকে—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্।'

'আরো কত কি। তারা উঠেছে সব সরাইয়ে। সন্ধ্যাবেলায় গরম ব্যবসা করে, রাত্তিরে জোর খানাপিনা, গানবাজনা। কত হৈ-হল্লা, খুনখারাবী, কত রকম-বেরকমের পাপ। শোনেননি বুঝি, পেশাওয়ার হাজার পাপের শহর। মাসখানেক ঘোরাঘুরি করুন যে-কোনো সরাইয়ে—ডজনখানেক ভাষা বিনা কসরতে বিনা মেহনতে শেখা হয়ে যাবে। পশতু নিয়ে আরম্ভ করুন, চট করে চলে যাবেন ফার্সীতে, তারপর জগতাইতুর্কী, মঙ্গোল, উসমানলী, রাশান, কুর্দী—

বাকিগুলো আপনার থেকেই হয়ে যাবে। গানবাজনায় আপনার বুঝি শখ নেই —সে কি কথা? আপনি বাঙালী, টাগোর সাহেবের গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার আমি পড়েছি। আহা, কি উম্‌দা বয়েৎ, আমি ফার্সী তর্জমায় পড়েছি। আপনার তো এ সব জিনিসে শখ থাকার কথা। নাই বা থাকল, কিন্তু ইদনজানের গান না শুনে আপনি পেশাওয়ার ছাড়বেন কি করে? পেশাওয়ারী হুরী, বারোটা ভাষায় গান গাইতে পারে। তার গাহক দিল্লী থেকে বাগদাদ অবধি। আপনি গেলে লড়কী বহুৎ খুশ হবে—তার রাজত্ব বাগদাদ থেকে বাঙ্গাল্ অবধি ছড়িয়ে পড়বে।'

আমি আর কি করি। বললুম, 'হবে, হবে। সব হবে। কিন্তু টাগোর সাহেবের কোন্ কবিতা আপনার বিশেষ পছন্দ হয়?'

আহমদ আলী একটু ভেবে বললেন, 'আয় মাদর, শাহজাদা ইমরোজ—'

বুঝলুম, এ হচ্ছে,

'ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর—'

বললুম, 'সে কি কথা, খান সাহেব? এ কবিতা তো আপনার ভালো লাগার কথা নয়। আপনারা পাঠান, আপনারা প্রেমে জখম হলে তো বাঘের মত রুখে দাঁড়াবেন। ঘোড়া চড়ে আসবেন বিদ্যুৎগতিতে, প্রিয়াকে একটানে তুলে নিয়ে কোলে বসিয়ে চলে যাবেন দূরদূরান্তরে। সেখানে পর্বতগুহার নির্জনে আরম্ভ হবে প্রথম মানঅভিমানের পালা, আপনি মাথা পেতে দেবেন তাঁর পায়ের মখমলের চটির নিচে—'

আমাকেই থামতে হল কারণ আহমদ আলী অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক, কারো কথা মাঝখানে কাটেন না। আমি আটকে গেলে পর বললেন, 'থামলেন কেন, বলুন।'

আমি বললুম, 'আপনারা কোন্ দুঃখে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবেন ম্যা ম্যা, মা মা করে।'

আহমদ আলী বললেন, 'হুঁ, এক জর্মন দার্শনিকও নাকি বলেছেন স্ত্রীলোকের কাছে যেতে হলে চাবুকটি নিয়ে যেতে ভুলো না।'

আমি বললুম, 'তওবা তওবা, অত বাড়াবাড়ির কথা হচ্ছে না।'

আহমদ আলী বললেন, 'না, দাদা, প্রেমের ব্যাপারে হয় ইস্‌পার না হয় উস্‌পার। প্রেম হচ্ছে শহরের বড় রাস্তা, বিস্তর লোকজন। সেখানে 'গোল্ডেন মীন' বা 'সোনালী মাঝারি' বলে কোনো উপায় নেই। হয় 'কীপ টু দি রাইট' অর্থাৎ ম্যা ম্যা করে হৃদয়বেদন নিবেদন, না হয়, 'লেফট' অর্থাৎ বজ্রমুষ্টি দিয়ে নীটশে যা বলেছেন। কিন্তু থাক্ না এসব কথা।'

বুঝলুম প্রেমের ব্যাপারে পাঠান নীরব কর্মী। আমরা বাঙালী, দুপুররাত্রে পাড়ার লোককে না জাগিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে পারিনে। আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে আমাকে যেন খুশী করার জন্য আহমদ আলী বললেন, 'পেশাওয়ারের বাজারে কিন্তু কোনো গানেওয়ালী নাচনেওয়ালী ছ'মাসের বেশী টিকতে পারে না। কোনো ছোকরা পাঠান প্রেমে পড়বেই। তারপর বিয়ে করে আপন গাঁয়ে নিয়ে সংসার পাতে।'

'সমাজ আপত্তি করে না? মেয়েটা দুদিন বাদে শহরের জন্য কান্নাকাটি করে না?'

'সমাজ আপত্তি করবে কেন? ইসলামে তো কোনো মানা নেই। তবে দুদিন বাদে কান্নাকাটি করে কি না বলা কঠিন। পাঠান গাঁয়ের কান্না শহরে এসে পৌঁছবে এত জোর গলা ইদনজানেরও নেই। জানকী বাঈয়ের থাকলে আমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হত না। হলপ করে কিছু বলতে পারব না, তবে আমার নিজের বিশ্বাস, বেশীর ভাগ মেয়েই বাজারের হট্টগোলের চেয়ে গ্রামের শান্তিই পছন্দ করে। তার উপর যদি ভালোবাসা পায়, তা হলে তো আর কথাই নেই।'

আমি বললুম, 'আমাদের এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিকও ঐ রকম ধরনের অভিমত দিয়েছেন, মেয়েদের বাজারে বহু খোঁজখবর নিয়ে।'

এমন সময় আহমদ আলীর এক বন্ধু মুহম্মদ জান বাইসিকেল ঠেলে ঠেলে এসে হাজির। আহম্মদ আলী জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাইসিকেল আবার ঘোঁড়া হল কি করে?'

মুহম্মদ জান পাঞ্জাবী। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কেন যে আপনি এদেশে এসেছেন বুঝতে পারিনে। এই পাঠানরা যে কি রকম পাব্লিক নুইসেন্স তার খবর জানতে পারতেন যদি একদিনও আধ ঘণ্টার তরে এ শহরে বাইসিকেল চড়তেন। এক মাইল যেতে না যেতে তিনটে পাংকচার। সব ছোট ছোট লোহার।'

ভদ্রলোক দম নিচ্ছিলেন। আমি দরদ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত লোহা আসে কোথা থেকে?'

মুহম্মদ জান আরো চটে গিয়ে বললেন, 'আমাকে কেন শুধচ্ছেন? জিজ্ঞেস করুন আপনার দিলজানের দোস্ত শেখ আহমদ আলী খান পাঠানকে।'

আহমদ আলী বললেন, 'জানেন তো পাঠানরা বড্ড আড্ডাবাজ। গল্পগুজব না করে সে এক মাইল পথও চলতে পারে না। কাউকে না পেলে সে বসে

যাবে রাস্তার পাশে। মুচীকে বলবে, 'দাও তো ভায়া, আমার পয়জারে গোটা কয়েক পেরেক ঠুকে।' মুচী তখন ঢিলে লোহাগুলো পিটিয়ে দেয়, গোটা দশেক নূতনও লাগিয়ে দেয়। এই রকম শ'খানেক লোহা লাগালে জুতোর চামড়া আর মাটিতে লাগে না, লোহার উপর দিয়েই রাস্তার পাথরের চোট যায়। হাফসোল লাগানোর খরচাকে পাঠান বড্ড ভয় করে কিনা। সেই পেরেক আবার হরেক রকম সাইজের হয়। পাঠানের জুতো তাই লোহার মোজায়িক। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, লোহা ঠোকানো না-ঠোকানো অবান্তর—মুচীর সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য ঐ তার অজুহাত।'

মুহম্মদ খান বললেন, 'আর সেই লোহা ঢিলে হয়ে গিয়ে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।'

আমি বললুম, 'এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল আড্ডা মানুষকে অপকর্ম থেকে ঠেকিয়ে রাখে। এখন দেখতে পাচ্ছি ভুল করেছি।'

আহমদ আলী কাতরস্বরে বললেন, 'আড্ডার নিন্দা করবেন না। বাইসিকেল চড়ার নিন্দা করুন। আপনাকে বলিনি, 'অল অজলু মিনা শয়তান' অর্থাৎ হন্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা। তাই তো বাইসিকেলের আরেক নাম শয়তানের গাড়ি।'

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশাওয়ার দিনের ১১৪ ডিগ্রী ভুলে গিয়ে মোলায়েম বাতাস দিয়ে সর্বাঙ্গের গ্লানি খেদ ঘুচিয়ে দেয়। রাস্তাঘাট যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে হাই তুলে ঘোড়ার গাড়ির খটখটানি দিয়ে তুড়ি দিতে থাকে। পাঠান বাবুরা তখন সাজগোজ করে হাওয়া খেতে বেরোন। পায়ে জরীর পয়জার, পরনে পপলিনের শিলওয়ার—তার ভাঁজ ধারালো ছুরির মত ক্রীজের দুদিক বেয়ে কেতায় কেতায় নেমে এসেছে; মুড়ির ভিতরে লাল সুতোর গোলাপী আভা। গায়ে রঙীন সিল্কের লম্বা শার্ট আর মাথায় যে পাগড়ি তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোনো শিরাভরণের সঙ্গে হয় না। বাঙালীর শিরাভরণ দেখে অভ্যাস নেই; টুপি বলুন, হ্যাট বলুন, সবই যেন তার কাছে অবান্তর ঠেকে, মনে হয় বাইরে থেকে জোর করে চাপানো, কিন্তু মধ্যবিত্ত ও ধনী পাঠানের পাগড়ি দেখে মনে হয় ভগবান মানুষকে মাথাটা দিয়েছেন নিতান্ত ঐ পাগড়ি জড়াবার উপলক্ষ্য হিসাবে।

কামিয়ে-জুমিয়ে গোঁফে আতর মেখে আর সেই ভুবনমোহন পাগড়ি বেঁধে খানসাহেব যখন সাঁঝের ঝোঁকে পেশাওয়ারের রাস্তায় বেরোন, তখন কে বলবে তিনি জাকারিয়া স্ট্রীটের পাঠানের জাতভাই; কোথায় লাগে তাঁর কাছে তখন

হলিউডের ঈভনিঙ ড্রেসপরা হীমেনদের দল ?

ফুরফুরে হাওয়া গাছের মাথায় চিরুনি চালিয়ে, খানসামাদের পাগড়ির চুড়ো দুলিয়ে, ফুলের দোকানে ঝোলানো মালাতে কাঁপন লাগিয়ে আর সর্বশেষে আহমদ আলীর দু'কান-ছোঁয়া গোঁফে হাত বুলিয়ে নামল আমার শ্রান্ত ভালে—তপ্ত গ্রীষ্মের দগ্ধ দিনান্তের সন্ধ্যাকালে। এ যেন বাঙলা দেশের জ্যৈষ্ঠশেষের নববর্ষণ —শীতল জলধারার পরিবর্তে এ যেন মাতৃহস্তের স্নিগ্ধমন্দ মলয়ব্যজন। কোন্ এক নৃশংস ফারাওয়ের অত্যাচারে দিবাভাগে দেশের জনমানব প্রাণীপতঙ্গ দলে দলে ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়ে প্রহর গুনছিল, পশ্চিম-পিরামিডে তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর বাতাস যেন মোজেসের অভয়বাণী দিয়ে গেল—দিকে দিকে নতুন প্রাণের সাড়া—ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর।

কিন্তু জেগে উঠেই মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজন কি আহারের ? রুটি আর কাবাবওয়ালার দোকানের সামনে কী অসম্ভব ভিড়। বোরকাপরা মেয়ে, সবে-হাঁটতে শিখেছে ছেলে, বাঁ হাত মরণের দিকে ডান হাত রুটিওয়ালার দিকে বাড়িয়ে বুড়ো, সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে আহারের সন্ধানে। রুটিওয়ালা সেই ক্ষুধার্তদের শান্ত করার জন্য কাউকে কাতরকণ্ঠে ডাকে 'ভাই' কাউকে 'বরাদর' কাউকে 'জানে মন্' (আমার জান্), কাউকে 'আগা-জান্'—পশতু, পাঞ্জাবী, ফারসী, উর্দু চারটে ভাষায় সে একসঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। ওদিকে তন্দুরের ভিতর লম্বা লোহার আঁকশি চালিয়ে রুটি টেনে টেনে ওঠাচ্ছে রুটি-ওয়ালার ছোকরারা। গনগনে আগুনের টকটকে লাল আভা পড়েছে তাদের কপালে গালে। বড় বড় বাবরীচুলের জুলফি থেকে থেকে চোখমুখ ঢেকে ফেলছে —দুহাত দিয়ে রুটি তুলছে, সরাবার ফুরসৎ নেই। বুড়ো রুটিওয়ালার দাড়ি হাওয়ায় দুলছে, কাজের হিড়িকে তার বজ্রবাঁধন পাগড়ি পর্যন্ত টেরচা হয়ে এক-দিকে নেমে এসেছে—ছোকরাদের কখনও তম্বী করে 'জুদ্ কুন্, জুদ্ কুন্', 'জলদি করো, জলদি করো', খদ্দেরদের কখনও কাকুতি-মিনতি 'হে ভ্রাতঃ, হে বন্ধু, হে আমার প্রাণ, হে আমার দিলজান, সবুর করো, সবুর করো, তাজা গরম রুটি দি বলেই তো এত হাঙ্গাম হুজ্জৎ। বাসী দিলে কি এতক্ষণ তোমাদের দাঁড় করিয়ে রাখতুম ?'

বোরকার আড়াল থেকে কে যেন বলল—বয়স বোঝার জো নেই—'তোর তাজা রুটি খেয়ে খেয়েই তো পাড়ার তিনপুরুষ মরল। তুই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে বাসী খাস। তাই দে না।'

বোরকা পরে, ঐ যা। তা না হলে পাঠান মেয়েও স্বাধীন।

রুটির পর ফুল কিংবা আতর। মনে পড়ল মহাপুরুষ মুহম্মদের একটি বচন—সত্যেন দত্তের তর্জমা—

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি।
জুটে যায় যদি দুইটি পয়সা
ফুল কিনে নিয়ো, হে অনুরাগী।

পাঁচ

পাঠান অত্যন্ত অলস এবং আড্ডাবাজ, কিন্তু আরামপ্রয়াসী নয় এবং যেটুকু সামান্য তার বিলাস, তার খরচাও ভয়ঙ্কর বেশী কিছু নয়। দেশভ্রমণকারী গুণীদের মুখে শোনা যে, যাদের গায়ের জোর যেমন বেশী, তাদের স্বভাবও হয় তেমনি শান্ত। পাঠানদের বেলায়ও দেখলুম কথাটা খাঁটি। কাগজে আমরা হামেশাই পাঠানদের লুটতরাজের কথা পড়ি—তার কারণও আছে। অনুর্বর দেশ, ব্যবসাবাণিজ্য করতে জানে না, পল্টনে তো আর তামাম দেশটা ঢুকতে পারে না, কাজেই লুটতরাজ ছাড়া অন্য উপায় কোথায়? কিন্তু পেটের দায়ে যে অপকর্ম সে করে, মেজাজ দেখাবার জন্য তা করে না। তার আসল কারণ অবশ্য পাঠানের মেজাজ সহজে গরম হয় না—পাঞ্জাবীদের কথা স্বতন্ত্র। এবং হলেও সে চট করে বন্দুকের সন্ধান করে না। তবে সব জিনিসেরই দুটো একটা ব্যত্যয় আছে—পাঠান তো আর খুদ খুদাতালার আপন হাতে বানানো ফিরিস্তা নয়। বেইমান বললে পাঠানের রক্ত খাইবার পাসের টেম্পারেচার ছাড়িয়ে যায়, আর ভাইকে বাঁচাবার জন্য সে অত্যন্ত শান্তমনে যোগাসনে বসে আঙুল গোনে, নিদেন-পক্ষে তাকে ক'টা খুন করতে হবে। কিন্তু হিসেবনিকেশে সাক্ষাৎ বিদ্যেসাগর বলে প্রায়ই ভুল হয় আর দুটো-চারটে লোক বেঘোরে প্রাণ দেয়। তাই নিয়ে তম্বীতম্বা করলে পাঠান সকাতর নিবেদন করে, 'কিন্তু আমার যে চার-চারটে বুলেটের বাজে খরচা হল তার কি? তাদের গুষ্টি-কুটুম কান্নাকাটি করছে, কিন্তু একজনও একবারের তরে আমার বাজে খরচার খেসারতির কথা ভাবছে না। ইনসান বড়ই খুদপরস্ত—সংসার বড়ই স্বার্থপর।

পরন্তু রাতের দাওয়াতে এ রকম নানা গল্প শুনলুম। এসব গল্প বলার অধিকার নিমন্ত্রিত ও রবাহূতদের ছিল। একটা জিনিসে বুঝতে পারলুম যে, এঁদের সকলেই খাঁটি পাঠান।

সে হল তাদের খাবার কায়দা। কার্পেটের উপর চওড়ায় দুহাত, লম্বায় বিশ-ত্রিশহাত—প্রয়োজন মত—একখানা কাপড় বিছিয়ে দেয়। সেই দস্তরখানের দুদিকে সারি বেঁধে এক সারি অন্য সারির মুখোমুখি হয়ে বসে। তারপর সব খাবার মাঝারি সাইজের প্লেটে করে সেই দস্তরখানে সাজিয়ে দেয়; তিন থালা আলু-গোস্ত, তিন থালা শিক-কাবাব, তিন থালা মুর্গী-রোস্ট, তিন থালা সিনা-কলিজা, তিন থালা পোলাও, এই রকম ধারা সব জিনিস একখানা দস্তরখানের মাঝখানে, দুখানা দুই প্রান্তে। বাঙালী আপন আপন থালা নিয়ে বসে; রান্না-ঘরের সব জিনিসই কিছু না কিছু পায়। পাঠানদের বেলা তা নয়। যার সামনে যা পড়ল, তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট। প্রাণ গেলেও কেউ কখনো বলবে না, আমাকে একটু মুর্গী এগিয়ে দাও, কিম্বা আমার শিক-কাবাব খাবার বাসনা হয়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্যি হঠাৎ কেউ দরদ দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'আরে হোথায় দেখো গোলাম মুহম্মদ ঢ্যাড়শ চিবোচ্ছে, ওকে একটু পোলাও এগিয়ে দাও না'—সবাই তখন হাঁ-হাঁ করে সব ক'টা পোলাওয়ের থালা ওর দিকে এগিয়ে দেয়। তারপর মজলিস গালগল্পে ফের মশগুল। ওদিকে গোলাম মুহম্মদ শুকনো পোলাওয়ের মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মারা গেল, না মাংসের থৈ-থৈ ঝোলে ডুবে গিয়ে প্রাণ দিল, তার খবর ঘণ্টাখানেক ধরে আর কেউ রাখে না। এবং লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, পাঠান আড্ডা জমাবার খাতিরে অনেক রকম আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। গল্পের নেশায় বে-খেয়ালে অন্ততঃ আধ ডজন অতিথি স্রেফ্ শুকনো রুটি চিবিয়েই যাচ্ছে, চিবিয়েই যাচ্ছে। অবচেতন ভাবটা এই, পোলাও-মাংস বাছতে হয়, দেখতে হয়, বহুৎ বয়নাক্কা, তাহলে লোকের মুখের দিকে তাকাব কি করে, আর না তাকালে গল্প জমবেই বা কি করে।

অথচ এঁরা সবাই ভদ্রসন্তান, দু' পয়সা কামায়ও বটে। বাড়িতে নিশ্চয়ই পছন্দমাফিক পোলাও-কালিয়া খায়। কিন্তু পাঠান-জীবনের প্রধান আইন, একলা বসে নবাবী খানা খাওয়ার চেয়ে ইয়ারবক্সীর সঙ্গে শুকনো রুটি চিবনো ভালো। ওমর খৈয়ামও বলেছেন,

তব সাথী হয়ে দগ্ধ মরুতে
পথ ভুলে তবু মরি
তোমারে ছাড়িয়ে মসজিদে গিয়া
কী হবে মন্ত্র স্মরি ?

কিন্তু ওমর বুর্জুয়া কবির বিদগ্ধ পদ্ধতিতে আপন বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। পাঠান ভাঙা ভাঙা উর্দুতে ঐ একই আপ্তবাক্য প্রলেতারিয়া কায়দায় জানায়—

'দোস্ত!
তুমহারী রোটি, হমারা গোস্ত!'

অর্থাৎ 'নেমন্তন্ন করেছ সেই আমার পরম সৌভাগ্য। শুধু শুকনো রুটি? কুছ পরোয়া নাহী। আমি আমার মাংস কেটে দেব।'

কাব্যজগতে যে হাওয়া বইছে, তাতে মনে হয়, ওমরের শরাবের চেয়ে মজুরের ধেনোর কদর বেশী।

তবে একটা কথা বলে দেওয়া ভালো। পাঠানের ভিতর বুর্জুয়া প্রলেতারিয়ায় যে তফাৎ, সেটুকু সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক। অনুভূতির জগতে তারা একই মাটির আসনে বসে, আর চিন্তাধারায় যে পার্থক্য সে শুধু কেউ খবর রাখে বেশী, কেউ কম। কেউ সেক্সপীয়র পড়েছে, কেউ পড়েনি। ভালমন্দ বিচার করার সময় দুই দলে যে বিশেষ প্রভেদ আছে, মনে হয়নি। আচার-ব্যবহারে এখনো তারা গুষ্টির ঐতিহ্যগত সনাতন জান-দেওয়া-নেওয়ার পন্থা অনুসরণ করে।

এসব তত্ত্ব আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন ইসলামিয়া কলেজের এক অধ্যাপক। অনেকক্ষণ ধরে নানা রঙ, নানা দাগ কেটে সমাজতাত্ত্বিক পটভূমি নির্মাণ করে বললেন—

'এই ধরুন আমার সহকর্মী অধ্যাপক খুদাবখ্‌শের কথা। ইতিহাসে অগাধ পণ্ডিত। ইহসংসারে সব কিছু তিনি অর্থনীতি দিয়ে জলের মত তরল করে এই তৃষ্ণার দেশে অহরহ ছেলেদের গলায় ঢালছেন। ধর্ম পর্যন্ত বাদ দেন না। যীশু-খ্রীষ্ট তাঁর ধর্ম আরম্ভ করেছিলেন ধনের নবীন ভাগবণ্টনপদ্ধতি নির্মাণ করে; তাতে লাভ হওয়ার কথা গরীবেরই বেশী—তাই সবচেয়ে দুঃখী জেলেরা এসে জুটেছিল তাঁর চতুর্দিকে। মহাপুরুষ মুহম্মদও নাকি সুদ তুলে দিয়ে অর্থবণ্টনের জমিকে আরবের মরুভূমির মত সমতল করে দিয়েছিলেন। এসব তো ইহলোকের কথা—পরলোক পর্যন্ত খুদাবখ্‌শ অর্থনৈতিক র‍্যাঁদা চালিয়ে চিক্কণ মসৃণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু থাক এসব কচকচানি—মোদ্দা কথা হচ্ছে ভদ্রলোক ইতিহাসের দুরবীনে আপন চোখটি এমনি চেপে ধরে আছেন যে অন্য কিছু তার নজরে পড়ে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সকলের মনে গভীর সন্দেহ ছিল।

'মাসখানেক পূর্বে তাঁর বড় ছেলে মারা গেল। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ত, মেধাবী ছেলে, বাপেরই মত পড়াশুনায় মশগুল থাকত। বড় ছেলে মারা গিয়েছে, চোট লাগার কথা, কিন্তু খুদাবখ্‌শ নির্বিকার। সময়মত কলেজে হাজিরা দিলেন। চায়ের সময় আমরা সন্তর্পণে শোক নিবেদন করতে গিয়ে আরেক প্রস্থ লেকচর শুনলুম, জরথুস্ত্র কোন্ অর্থনৈতিক কারণে রাজা গুশ্‌ৎআস্‌প্‌কে তাঁর নূতন ধর্মে

দীক্ষিত করেছিলেন। তিন দিন বাদে দুসরা ছেলে টাইফয়েডে মারা গেল—খুদাবখ্‌শ বৌদ্ধ ধর্মের কি এক পিটক, না খোদায় মালুম কি, তাই নিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। এক মাস যেতে না যেতে স্ত্রী মারা গেলেন পিত্রালয়ে—খুদাবখ্‌শ তখন সিন্ধুর পারে পারে সিকন্দর শাহের বিজয়পন্থার অর্থনৈতিক কারণ অনুসন্ধানে নাক-কান বন্ধ করে তুরীয়ভাব অবলম্বন করেছেন।

'আমরা ততদিনে খুদাবখ্‌শের আশা ছেড়ে দিয়েছি। লোকটা ইতিহাস করে করে অমানুষ হয়ে গিয়েছে এই তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আর পাঠান-সমাজ যখন মনুষ্যজাতির সর্বোচ্চ গৌরবস্থল তখন আর কি সন্দেহ যে খুদাবখ্‌শের পাঠানত্ব সম্পূর্ণ কর্পূর হয়ে গিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক টেলিস্কোপের পাল্লারও বহু উর্ধ্বে দূরদূরান্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত কোন্ সূক্ষ্মলোকে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

'এমন সময় মারা গেল তাঁর ছোট ভাই—পল্টনে কাজ করত। খুদাবখ্‌শের আর কলেজে পাত্তা নেই। আমরা সবাই ছুটে গেলুম খবর নিতে। গিয়ে দেখি এক প্রাগৈতিহাসিক ছেঁড়া গালচের উপর খুদাবখ্‌শ গড়াগড়ি দিচ্ছেন। পুঁথিপত্র, ম্যাপ, কম্পাস চতুর্দিকে ছড়ানো। গড়াগড়িতে চশমার একটা পরকলা ভেঙে গিয়েছে। খুদাবখ্‌শের বুড়া মামা বললেন, দু'দিন ধরে জল স্পর্শ করেননি।

'হাউ হাউ করে কাঁদেন আর বলেন, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।' শোকে যে মানুষ এমন বিকল হতে পারে পূর্বে আর কখনো দেখিনি। আমরা সবাই নানা রকমের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু খুদাবখ্‌শের মুখে ঐ এক কথা, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে।'

'শেষটায় থাকতে না পেরে আমি বললুম, 'আপনি পণ্ডিত মানুষ, শোকে এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? আর আপনার সহ্য করবার ক্ষমতা যে কত অগাধ সে তো আমরা সবাই দেখেছি—দুটি ছেলে, স্ত্রী মারা গেলেন, আপনাকে তো এতটুকু কাতর হতে দেখিনি।'

'খুদাবখ্‌শ আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন আমি বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু মুখে কথা ফুটল। বললেন, 'আপনি পর্যন্ত এই কথা বললেন? ছেলে মরেছিল তো কি? আবার ছেলে হবে। বিবি মরেছেন তো কি? নূতন শাদী করব। কিন্তু ভাই পাব কোথায়?' তারপর আবার হাউ হাউ করে কাঁদেন আর বলেন, 'আমার ভাই মরে গিয়েছে'।'

অধ্যাপক বলা শেষ করলে আমি বললুম, 'লক্ষ্মণের মৃত্যুশোকে রামচন্দ্রও ঐ বিলাপ করেছিলেন।'

আহমদ আলী বললেন, 'লছ্‌মন্? রামচন্দরজী? হিন্দুদের কি একটা গল্প

আছে না? সেইটে আমাদের শুনিয়ে দিন। আপনি কখনো গল্প বলেন না, শুধু শোনেনই।'

ইয়া আল্লা! আদি কবি বাল্মীকি যে গল্প বলেছেন আমাকে সে গল্প নূতন করে আমার টোটাফুটা উর্দু দিয়ে বলতে হবে! নিবেদন করলুম, 'অধ্যাপক খুদাবখ্‌শকে অনুরোধ করবেন। রামায়ণের নাকি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও আছে।'

অধ্যাপক শুধালেন, 'কিন্তু রামচন্দরজী জবরদস্ত লড়নেওয়ালা ছিলেন, নয় কি?'

আমি বললুম, 'আলবৎ।'

অধ্যাপক বললেন, 'ঐ তো হল আসল তত্ত্বকথা। বীরপুরুষ আর বীরের জাতমাত্রই ভাইকে অত্যন্ত গভীর ভাবে ভালবাসে। পাঠানদের মত বীরের জাত কোথায় পাবেন বলুন?'

আমি বললুম, 'কিন্তু অধ্যাপক খুদাবখ্‌শ তো বীরপুরুষ ছিলেন না।'

অধ্যাপক পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললেন, 'সেই তো গুহ্যতর তত্ত্ব। অধ্যাপকি করো আর যাই করো, পাঠানত্ব যাবে কোত্থেকে? অর্থনৈতিক কারণ-ফারণ সব কিছুই অত্যন্ত পাতলা ফিলিম—একটু খোঁচা লাগলেই আসল পেলেট্ বেরিয়ে পড়ে।'

মেজর মুহম্মদ খান বললেন, 'ভাইকে ভালোবাসার জন্য পাঠান হওয়ার কি প্রয়োজন? ইউসুফও (জোসেফ) তো বেনয়ামিনকে (বেনজামিন) ভয়ঙ্কর ভালবাসতেন।'

অধ্যাপক বললেন, 'ইহুদিদের কথা বাদ দিন। আদমের এক ছেলে আরেক ছেলেকে খুন করেনি?'

আমি বললুম, 'কিন্তু পাঠানরা ইহুদিদের হারিয়ে-যাওয়া বারো উপজাতির একটা নয়? কোথায় যেন ঐ রকম একটা থিয়োরি শুনেছি যে সেই উপজাতি যখন দেখল তাদের কপালে শুকনো, মরা আফগানিস্থান পড়েছে তখন হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল—অর্থাৎ ফারসীতে যাকে বলে "ফগান" করেছিল—তাই তো তাদের নাম "আফগান"। আর আপনারা তো আসলে আফগান, এদেশে বসবাস করে হিন্দুস্থানী হয়েছেন।'

অধ্যাপক পণ্ডিতের হাসি হেসে বললেন, 'ত্রিশ বৎসর আগে এ কথা বললে আপনাকে আমরা সাবাসী দিতুম, এখন ওসব বদলে গিয়েছে। তখনো আমরা জানতুম না যে, দুনিয়ার বড় বড় জাতেরা নিজেদের 'আর্য' বলে গৌরব অনুভব করছে। তখনো রেওয়াজ ছিল খানদানী হতে হলে বাইবেলের ইহুদি চিড়িয়া-

থানায় কোনো না কোনো খাঁচায় সিংহ বাঁদর কিছু না কিছু একটা হতেই হবে। এখন সে সব দিন গিয়েছে—এখন আমরা সব্বাই 'আর্য'। বেদফেদ কি সব আছে না?—সেগুলো সব আমরাই আউড়েছি। সিকন্দর শাহকে লড়াইয়ে আমরাই হারিয়েছি আর গান্ধার ভাস্কর্য আমাদেরই কাঁচা বয়সের হাত মক্সোর নমুনা। 'গান্ধার' আর 'কান্দাহার' একই শব্দ। আরবী ভাষায় 'গ' অক্ষর নেই বলে আরব ভৌগোলিকেরা 'ক' ব্যবহার করেছেন।'

পাণ্ডিত্যের অগাধ সাগরে তখন আমার প্রাণ যায়-যায়। কিন্তু বিপদ-আপদে মুস্কিল-আসান হামেশাই পুলিস। আহমদ আলী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রফেসরের ওসব কথা গায়ে মাখবেন না। ইসলামিয়া কলেজের চায়ের ঘরে যে আড্ডা জমে তারি খানিকটে পেতলে নিয়ে তিনি সুন্দর ভাষায় রঙীন গেলাসে আপনাকে ঢেলে দিচ্ছেন। কিন্তু আসল পাঠান এসব জিনিস নিয়ে কক্‌খনো মাথা ঘামিয়ে পাগড়ির প্যাঁচ ঢিলে করে না। আফ্রিদী ভাবে, আফ্রিদী হল দুনিয়ার সেরা জাত; মোমন্দ বলে, বাজে কথা, খুদাতালার খাস পেয়ারা কোনো জাত যদি দুনিয়ায় থাকে তবে সে হচ্ছে মোমন্দ জাত। এমন কি তারা নিজেদের আফগান বলেও স্বীকার করে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই বুঝি আপনারা স্বাধীন আফগানিস্থানের অংশ হতে চান না? ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে স্বাধীন পাঠান হয়ে থাকবেন বলে?'

সব পাঠান একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, 'আলবৎ না; আমরা স্বাধীন ফ্রন্টিয়ার হয়ে থাকব—সে মুল্লুকের নাম হবে পাঠানমুল্লুক।'

অধ্যাপক বললেন, 'পাঠানের সোপবক্স লেকচার শোনেননি বুঝি কখনো। সে বলে, 'ভাই পাঠানসব, এস আমরা সব উড়িয়ে দি; ডিমোক্রেসি, অটোক্রেসি, বুরোক্রেসি, কমুনিজম, ডিক্‌টেটরশিপ—সব সব।' আরেক পাঠান তখন চেঁচিয়ে বলল, 'তুই বুঝি অ্যানার্কিস্ট?' পাঠান বলল, 'না, আমরা অ্যানার্কিও উড়িয়ে দেব।'

অধ্যাপক বললেন, 'বুঝতে পেরেছেন?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তারপর 'না' হয়ে যাবে।' এই তো?'

অধ্যাপক বললেন, 'ঠিক ধরেছেন।'

আমি বললুম, ভারতবর্ষের অংশ যখন হবেন না, তখন দয়া করে রাশানদের আপনারাই ঠেকিয়ে রাখবেন!'

সবাই সমস্বরে বললেন, 'আলবৎ!'

ছয়

পৃথিবীর আর সব দেশে যেতে হলে একখানা পাসপোর্ট যোগাড় করে যে কোনো বন্দরে গিয়ে হাজির হলেই হল। আফগানিস্থান যেতে হলে সেটি হবার যো নেই। পেশাওয়ার পৌঁছে আবার নূতন স্ট্যাম্পের প্রয়োজন। সে-ও আবার তিন দিন পরে নাকচ হয়ে যায়। খাইবারপাসের আশেপাশে কখন যে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগে যায় তার স্থিরতা নেই বলেই এই বন্দোবস্ত। আবার এই তিন দিনের মিয়াদি স্ট্যাম্প সত্ত্বেও হয়ত খাইবারের মুখ থেকে মোটর ফিরিয়ে দিতে পারে—যদি ইতিমধ্যে কোনো বখেড়া লেগে গিয়ে থাকে।

সেই স্ট্যাম্প নিয়ে বাড়ি ফিরছি এমন সময় দেখি হরেক রকম বিদেশী লোকে ভর্তি কতকগুলো বাস্ পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এগুলো কোথায় যাচ্ছে?'

তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'এগুলো কাবুল যায় না।' তারপর অন্য কথা পাড়বার জন্য বললেন, 'বাঙলা দেশের একটা গল্প বলুন না।'

আমি মনে মনে বললুম, আচ্ছা তবে শোন। বাইরে বললুম, 'গল্প বলা আমার আসে না, তবে একটা জিনিসে পাঠানে বাঙালীতে মিল দেখতে পেয়েছি সেইটে আপনাকে বলছি, শুনুন—

'এখানে যে রকম সব কারবার পাঞ্জাবী আর শিখদের হাতে, কলকাতায়ও কারবার বেশীর ভাগ অ-বাঙালীর হাতে। আর বাঙালী যখন ব্যবসা করে তখন তার কায়দাও আজব।

'আমি তখন ইলিয়ট রোডে থাকতুম, সেখানে দোকানপাট ফিরিঙ্গীদের। মুসলমানদের কিছু কিছু দর্জীর দোকান আর লণ্ড্রি, ব্যস্। তার মাঝখানে এক বাঙালী মুসলমান ঝা চকচকে ফ্যান্সি দোকান খুলল। লোকটির বেশভূষা দেখে মনে হল, শিক্ষিত, ভদ্রলোকের ছেলে। স্থির করলুম, সাহস করে দোকান যখন খুলেছে তখন তাকে পেট্রনাইজ করতে হবে।

'জোর গরম পড়েছে—বেলা দুটো। শহরে চকিবাজীর মত ঘুরতে হয়েছে—দেদার সাবান চোখে পড়েছে কিন্তু কিনিনি—ভদ্রলোকের ছেলেকে পেট্রনাইজ করতে হবে।

'ট্রাম থেকে নেমে দোকানের সামনে এসে দেখি ভদ্রলোক নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, পাখিটা খাঁচায় ঘুমচ্ছে, ঘড়িটা পর্যন্ত সেই যে বারোটায় ঘুমিয়ে

পড়েছিল, এখনো জাগেনি।

'আমি মোলায়েম সুরে বললুম, 'ও মশাই, মশাই।'

'ফের ডাকলুম, 'ও সায়েব, সায়েব।'

'কোনো সাড়াশব্দ নেই। বেজায় গরম, আমারও মেজাজ একটু একটু উষ্ণ হতে আরম্ভ করেছে। এবার চেঁচিয়ে বললুম, ও মশাই, ও সায়েব।'

'ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বোয়াল মাছের মত দুই রাঙা টকটকে চোখ সিকিটাক খুলে বললেন, 'আজ্ঞে?' তারপর ফের চোখ বন্ধ করলেন।

'আমি বললুম, 'সাবান আছে? পামওলিভ সাবান?'

'চোখ বন্ধ রেখেই উত্তর দিলেন 'না'।'

'আমি বললুম, 'সে কি কথা, ঐ তো রয়েছে শো-কেসে'।

' 'ও বিক্কিরির না'।—'

তারপর আহমদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'পাঠানরাও বুঝি এই রকম ব্যবসা করে?' তিনি তো খুব খানিকক্ষণ ধরে হাসলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বলুন তো?'

আমি উত্তর দিলুম, 'ঐ যে বললেন এসব বাস্ কাবুল যায় না।'

এবার আহমদ আলী থমকে দাঁড়ালেন। দেয়ালের দিকে ঘুরে, কোমরে দু'হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঠাঠা করে হাসলেন। সে তো হাসি নয়—হাসির ধমক। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি কখন তাঁর হাসি থামবে। উত্তর দিলেন ভালো। বললেন, 'এসব বাস্ খাইবারপাস অবধি গিয়েই ব্যস্।'

আমি শুধালুম, 'এই সামান্য রসিকতায় আপনি এত প্রচুর হাসতে পারেন কি করে?'

'কেন পারব না? হাসি কি আর গল্পে ঠাসা থাকে, হাসি থাকে খুশ-দিলে। আপনাকে বলিনি স্বাধীনতা কোথায় বাসা বেঁধে থাকে? রাইফেলে নয়, বুকের খুনে। একটা গল্প শুনবেন? ঐ দেখছেন, হোথায় চায়ের দোকানী বটতলায় বেঞ্চি পেতে দিয়েছে। চলুন না।'

পাঠান মাত্রই মারাত্মক ডিমোক্র্যাট। নির্জলা টাঙাওয়ালা বিড়িওয়ালার চায়ের দোকান।

আহমদ আলী তাঁর বিশাল বপুখানার ওজন সম্বন্ধে সচেতন বলে খুঁটির উপর ভর দিয়ে বসলেন, আমি আমার তনুখানা, যেখানে খুশী রাখলুম। বললেন—

'ওমর খৈয়ামের এক রাত্রে বড্ড নেশা পেয়েছে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পাঁচখানা রুবাইয়াৎ শেষ না করে উঠবেন না। জানেন তো কি রকম ঠাসবুনুনির

কবিতা—শেষ করতে করতে রাত প্রায় কাবার হয়ে এল। মদের দোকানে যখন পৌঁছলেন তখন ভোর হব-হব। হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'নিয়ে এস তো হে, এক পাত্তর উৎকৃষ্ট শিরাজী!' মদওয়ালা কাচুমাচু হয়ে বলল, 'হুজুর এত দেরিতে এসেছেন, রাত কাবারের সঙ্গে সঙ্গে মদও কাবার হয়ে গিয়েছে।' ওমর নরম হয়ে বললেন, 'শিরাজী নেই তো অন্য কোনো মাল দাও না।' মদওয়ালা বলল, 'শরম কী বাৎ। কিচ্ছু নেই হুজুর।' ওমর বললেন, 'পরোয়া নদারদ, ঐ যে সব এঁটো পেয়ালাগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে সেগুলো ধুয়ে তাই দাও দিকিনি—নেশার জিম্মাদারি আমার'।'

হিম্মতের জিম্মাদারি, হাসির জিম্মাদারি, নেশার জিম্মাদারি কিসে, কার, সে সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বেই দেখতে পেলুম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সেই ভেজাল পাঠান—তাঁর ব্রাত্য-দোষ, তিনি তিন মাস লাহোরে কাটিয়েছিলেন—রমজান খান। আমি আহমদ আলীকে আঙুল দিয়ে দেখালুম। আর যায় কোথায়? 'ও রমজান খান, জানে মন্, বরাদরে মন্, এদিকে এসো।' আমাকে তম্বি করে বললেন, 'আশ্চর্য লোক, আমি না ডাকলে আপনি ওকে যেতে দিতেন? এই গরমে? লোকটা সর্দিগর্মি হয়ে মারা যেত না? আল্লা রসুলের ডর-ভয় নেই?'

রমজান খান এসে বললেন, 'ভগিনীপতির অসুখ, তার করতে যাচ্ছি।' বলেই ঝুপ করে বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। আহমদ আলী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হবে, হবে, সব হবে। টেলিগ্রাফের তার শক্ত মালে তৈরী—দু'চার ঘণ্টায় ক্ষয়ে যাবে না। সুখবর শোনো। সৈয়দ সাহেব একখানা বহুৎ উম্‌দা গল্প পেশ করেছেন।' বলে তিনি আমার কাঁচাসিদ্ধ গল্পে বিস্তর টমাটো-রস আর উস্টার সস্ ঢেলে রমজান খানকে পরিবেশন করলেন। বারে বারে বলেন, 'ও সাবান বিক্‌কিরির না—এ বাস্ কাবুল যায় না। এ যেন বাঙলা দেশের পুব আকাশে সূর্যোদয় আর পেশাওয়ারের পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে গেল। হুবহু একই রঙ।'

রমজান খান বললেন, 'তা তো বুঝলুম। কিন্তু বাঙালী আর পাঠানে একটা জায়গায় সখ্‌ৎ গরমিল আছে।'

আমি শুধালুম, 'কিসে?'

রমজান খান বললেন, 'আমি সিন্ধুনদ পেরিয়ে আহমদ আলীর পাক নজরে যে মহাপাপ করেছি এটা সেই সিন্ধুপারের কাহিনী। তবে আটকের কাছে নয়, অনেক দক্ষিণে—সেখানে সিন্ধু বেশ চওড়া। তারি বালুচরে বসে দুপুর রোদে আটজন পাঠান ঘামছে। উট ভাড়া দিয়ে তারা ছিয়ানব্বুই টাকা পেয়েছে, কিন্তু

কিছুতেই সমানেসমান ভাগ বাঁটোয়ারা করতে পারছে না। কখনো কারো হিস্যায় কম পড়ে যায়, কখনো কিছু টাকা উপরি থেকে যায়। ক্রমাগত নূতন করে ভাগ হচ্ছে, হিসেব মিলছে না, ঘাম ঝরছে আর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গলাও চড়ছে। এমন সময় তারা দেখতে পেল, অন্য পার দিয়ে এক বেনে তার পুঁটলি হাতে করে যাচ্ছে। সব পাঠান একসঙ্গে চেঁচিয়ে বেনেকে ডাকল, এপারে এসে তাদের টাকার ফৈশালা করে দিয়ে যেতে। বেনে হাত-পা নেড়ে বোঝালো অত মেহন্নত তার সইবে না, আর কত টাকা ক'জন লোক তাই জানতে চাইল। চার কুড়ি দশ ও তার উপরে ছয় টাকা আর হিস্যেদার আটজন। বেনে বলল, 'বারো টাকা করে নাও।' পাঠানরা চেঁচিয়ে বলল, 'তুই একটু সবুর কর, আমরা দেখে নিচ্ছি। বখরা ঠিক ঠিক মেলে কি না।' মিলে গেল—সবাই অবাক। তখন তাদের সর্দার চোখ পাকিয়ে বলল, 'এতক্ষণ ধরে আমরা চেষ্টা করলুম, হিসেব মিলল না; এখন মিলল কি করে? ব্যাটা নিশ্চয়ই কিছু টাকা সরিয়ে নিয়ে হিসেব মিলিয়ে দিয়েছে। ওপার থেকে সে যখন হিসেব মেলাতে পারে তখন নিশ্চয়ই কিছু টাকা সরাতেও পারে। পাকড়ো শালাকো!'

রমজান খান বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, পরোপকার করতে গিয়ে বেনের পো'র অবস্থা। ভাগ্যিস সিন্ধু সেখানে চওড়া এবং বেনেরা আর কিছু পারুক না-পারুক ছুটতে পারে আরবী ঘোড়ার চেয়েও তেজে। সে-যাত্রা বেনে বেঁচে গেল।'

আমি বললুম, 'গল্পটি উপাদেয়, কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে মিল-গরমিলের এতে আছে কোন্ চীজ?'

রমজান খান বললেন, 'বাঙালী আপন দেশে ব'সে, এভারেস্টের গায়ে ফিতে না লাগিয়ে, চূড়োয় চড়তে গিয়ে খামখা জান না দিয়ে ইংরেজকে বাৎলে দেয়নি, ঐ দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়?'

আমি বললুম, 'হাঁ, কিন্তু নাম হয়েছে ইংরেজের।'

আহমদ আলী শুধালেন, 'তাই বুঝি বাঙালী চটে গিয়ে ইংরেজকে বোমা মারে?'

আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকে বললুম, 'সেও একটা অতি সূক্ষ্ম কারণ বটে, তবে কিনা শিকদার এভারেস্ট সায়েবকে বোমা মারেননি।'

রমজান খান উষ্মা দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু মারা উচিত ছিল।'

আমি বললুম, 'হুঁ, কিন্তু একটু সামান্য টেকনিকল মুশকিল ছিল। নামকরণ যখন হয় শিকদার তখন কলকাতায় আর মহামান্য স্যার জর্জ লণ্ডনে পেনসন টানছেন। পাল্লাটা—'

পুরো পাঠান এবং নিমপাঠান একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। শুধালেন, 'তার মানে? তবে কি ও লোকটার তদারকিতেও এভারেস্ট মাপা হয়নি?'

আমি বললুম, 'না। কিন্তু আপনারা এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? এই আপনাদের ভাইবেরাদরই কতবার কাবুল দখল করেছেন আমার ঠিক স্মরণ নেই, কিন্তু এই কথাটা মনে গাঁথা আছে যে, নাম হয়েছে প্রতিবারেই ইংরেজের। আর আপনারা যখনই হাত গুটিয়ে বসেছিলেন তখনই হয় ইংরেজ কচুকাটা হয়ে মরেছে, নয় আপনাদের বদনাম দিয়ে নিজের অপমান জ্বালার মত মোটা মোটা মেডেল পরে ঢেকেছে। এই গেলবারে যখন দু'খানা আকবরশাহী কামান আর তিনখানা জাহাঙ্গিরী বন্দুক দিয়ে আমান উল্লা ইংরেজকে তুলোধোনা করে ছাড়লেন, তখন ইংরেজ তামাম দুনিয়াকে ঢাক পিটিয়ে শোনায়নি যে, পাঠানের ফেরেব্বাজিতেই তারা লড়াই হারল?'

রমজান খান বললেন, 'বাঙালী এত খবর রাখে কেন?'

আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে· না করেন, আর গোস্তাকি বেয়াদবি মাফ করেন, তবে সবিনয় নিবেদন, আপনারা যদি একটু বেশী খবর রাখেন তা হলে আমরা নিষ্কৃতি পাই।'

দু'জনেই চুপ করে শুনলেন। তারপর আহমদ আলী বললেন, 'সৈয়দ সাহেব, কিছু মনে করবেন না। আপনারা বোমা মারেন, রাজনৈতিক আন্দোলন চালান, ইংরেজ আপনাদের ভয়ও করে। এসব তো আরম্ভ হয়েছে মাত্র সেদিন। কিন্তু বলুন তো, যেদিন দুনিয়ার কেউ জানত না ফ্রন্টিয়ার বলে এক ফালি পাথরভর্তি শুকনো জমিতে একদল পাহাড়ী থাকে সেদিন ইংরেজ তাদের মেরে শেষ করে দিত না, যদি পারত? ফসল ফলে না, মাটি খুঁড়লে সোনা চাঁদি কয়লা তেল কিছুই বেরোয় না, এক ফোঁটা জলের জন্য ভোর হবার তিন ঘণ্টা আগে মেয়েরা দল বেঁধে বাড়ি থেকে বেরোয়, এই দেশ কামড়ে ধরে পড়ে আছে মূর্খ পাঠান, কত যুগ ধরে, কত শতাব্দী ধরে কে জানে? সিন্ধুর ওপারে যখন বর্ষায় বাতাস পর্যন্ত সবুজ হয়ে যায় তখন তার হাতছানি পাঠান দেখেনি? পুরবৈয়া ভেজা ভেজা হাওয়া অদ্ভুত মিঠে মিঠে গন্ধ নিয়ে আসে, আজ পর্যন্ত কত জাত তার নেশায় পাগল হয়ে পুব দেশে চলে গিয়েছে—যায়নি শুধু মূর্খ আফ্রিদী মোমন্দ।

'লড়াই করে যখন ইংরেজ এদেশকে উচ্ছন্ন করতে পারল না তখন সে প্রলোভন দেখায়নি? লাখ লাখ লোক পল্টনে ঢুকল। ইংরেজের ঝাণ্ডা এদেশে উড়ল বটে, কিন্তু তার রাজত্ব ঐ ঝাণ্ডা যতদূর থেকে দেখা যায় তার চেয়েও কম। আর পল্টনে না ঢুকে পাঠান করতই বা কি? পাঠানমোগল আমলে তাদের

ভাবনা ছিল না। পল্টনের দরওয়াজা খোলা, অথচ মোগলপাঠান এই গরীব দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঢুকে বুড়ার রুটি কাড়তে চায়নি, বউঝিকে বিদেশী হারাম কাপড় পরাতে চায়নি। শাহানশাহ বাদশাহ দীনদুনিয়ার মালিক দিল্লীর তখৎনশীন সরকার-ই-আলা যখন হিন্দুস্থানের গরম বরদাস্ত না করতে পেরে এদেশ হয়ে ঠাণ্ডা সবুজ মোলায়েম কাবুল শহর যেতেন পাঠান তখন তাঁকে একবার তসলীম দিতে আসত। শাহানশাহ খুশ, পাঠান তব্। বাদশাহের মীর-বখশী পিছনের তাঞ্জাম থেকে মুঠা মুঠা আশরফী রাস্তার দুদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন। 'জিন্দাবাদ শাহানশাহ জহানপনা' চিৎকার খাইবারের দুদিকের পাহাড়ে টক্কর খেয়ে খেয়ে আকাশ বিদীর্ণ করে খুদাতালার পা-দানে গিয়ে যখন পৌঁছত তখন সে প্রশংসাধ্বনি লক্ষ কণ্ঠের নয়, কোটি কোটি কণ্ঠের। সে আশরফী আজ নেই, পর্বতগাত্রে প্রশংসারব প্রতিধ্বনিত হয় না, কিন্তু ঐ পাথরের টুকরোগুলো পাষাণ পাঠান আপন ছাতির খুন দিয়ে এখনো স্বাধীন রেখেছে। তাই তার নাম এখনো 'নো ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ড'। পাঠান আর কি করতে পারত, বলুন।'

আমি অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে বার বার আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'আমি সে অর্থে কথাটা বলিনি। আমি ভদ্রসন্তানদের কথা ভাবছিলুম এবং তাঁরাও কিছু কম করেননি। তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ না করলে পাঠান সেপাই হয়তো আমান-উল্লার বিরুদ্ধে লড়ত।'

আহমদ আলী বললেন, 'ভদ্রসন্তানদের কথা বাদ দিন। এই অপদার্থ শ্রেণী যত শীঘ্র মরে ভূত হয়ে অজরঈলের দফতরে গিয়ে হাজিরা দেয় ততই মঙ্গল।'

রমজান খান আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'ভদ্রসন্তানদের লড়ার কায়দা আর পাঠান সিপাহির লড়ার কায়দা তো আর এক ধরনের হয় না। সময় যেদিন আসবে তখন দেখতে পাবেন আমাদের 'অপদার্থ' আহমদ আলী কোন্ দলে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।'

আমি আহমদ আলীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালুম। আহমদ আলী বললেন, 'আমি সব কথা ভালো করে শুনতে পাইনে। একটু কালা—খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

সাত

আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে 'ইয়োম্ উস্ সফ্‌র্, নিস্‌ফ্ উস্ সফ্‌র্'—অর্থাৎ কিনা 'যাত্রার দিনই অর্ধেক ভ্রমণ।' পূর্ব বাঙলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত

আছে। সেখানে বলা হয়, 'উঠোন সমুদ্র পেরলেই আধেক মুশকিল আসান।' আহমদ আলীর উঠোন পেরতে গিয়ে আমার পাক্কা সাতদিন কেটে গেল। আট-দিনের দিন সকালবেলা আহমদ আলী স্বয়ং আমাকে একখানা বাসে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে তাকে আমার জান-মাল বাঁচাবার জন্য বিস্তর দিব্যদিলাশা দিয়ে বিদায় নিলেন। হাওড়া স্টেশনে মনে হয়েছিল 'আমি একা', এখন মনে হল 'আমি ভয়ঙ্কর একা'। 'ভয়ঙ্কর একা' এই অর্থে যে 'নো ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ড'ই বলুন আর খাস আফগানিস্থানই বলুন এসব জায়গায় মানুষ আপন আপন প্রাণ নিয়েই ব্যস্ত। শুনেছি, কাবুলের বাইরেও নাকি পুলিস আছে, কিন্তু আফগান আইনে খুন পর্যন্ত এখনো ঠিক 'কগনিজেবল অফেন্‌স' নয়। রাহাজানির সময় যদি আপনি পাঠানী কায়দায় চটপট উবুড় হয়ে শুয়ে না পড়েন তাহলে সে ভুল অথবা গোঁয়ার্তুমির খেসারতি দেবেন আপনি। রাস্তাঘাটে কি করে চলতে হয় তার তালিম দেওয়া তো আর আফগান সরকারের জিম্মায় নয়। 'কীপ টু দি লেফ্‌ট' তো আর ইংরেজ সরকার আপনাকে ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে শেখায় না। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, আপনি যদি প্রাণটা নিতান্তই দিয়ে দেন তবে আপনার আত্মীয়স্বজন তো রয়েছেন—তাঁরা খুনের বদলাই নিলেই তো পারেন। একটা বুলেটের জন্য তো আর তালুকমুলুক বেচতে হয় না, পারমিটও লাগে না।

সাধারণ লোকের বিবেকবুদ্ধি এসব দেশে এরকম কথাই কয়। তবু আফগানি-স্থান স্বাধীন সভ্য দেশ; আর পাঁচটা দেশ যখন খুন-খারাবির প্রতি এত বেমালুম উদাসীন নয় তখন তাঁদেরও তো কিছু একটা করবার আছে এই ভেবে দু'চারটে পুলিস দু'-একদিন অকুস্থলে ঘোরাঘুরি করে যায়। যদি দেখে আপনার আত্মীয়-স্বজন 'কা তব কান্তা' দর্শনে বুঁদ হয়ে আছেন অথবা শোনে যে খুনী কিম্বা তার সুচতুর আত্মীয়স্বজন আপনার আত্মীয়স্বজনকে চাকচিক্যময় বিশেষ বিরল ধাতু দ্বারা নাক কান চোখ মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, আপনার জীবনের এই তিনদিনের মুসাফিরীতে কে দু' ঘণ্টা আগে গেল, কে দু' ঘণ্টা পরে গেল, কে বিছানায় আল্লা রসুলের নাম শুনে শুনে গেল, কে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে খাবি খেয়ে খেয়ে পাড়ি দিল এসব তাবৎ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, তবে বিবেচনা করুন, মহাশয়, পুলিস কেন মিছে আপনাদের তথা খুনী এবং তস্য আত্মীয়-স্বজনদের মামেলায় আরো ঝামেলা বাড়িয়ে সবাইকে থামকা, বেফায়দা তঙ্গ করবে? নির্বিকল্প বৈরাগ্য তো আর আপনাদের একচেটিয়া কারবার নয়, পুলিসও এই সার্বজনীন সার্বভৌমিক দর্শনে অংশীদার। তবে হাঁ, আলবৎ, এই নশ্বর সংসারে মাঝে মাঝে রুটি-গোস্তেরও প্রয়োজন হয়, সরকার যা দেন

তাতে সব সময় কুলিয়ে ওঠে না, খুনীর আত্মীয়স্বজনকে যখন মেহেরবান খুদাতালা ধনদৌলত দিয়েছেন তখন— ? তখন আফগান পুলিসকে আর দোষ দিয়ে কি হবে !

কিন্তু একটা বিষয়ে আফগান সরকার সচেতন—রাহাজানির যেন বাড়াবাড়ি না হয়। বুখারা সমরকন্দ শিরাজ তেহেরানে যদি খবর রটে যায় যে, আফগানিস্থানের রাজবর্ত্ম অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল তাহলে ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে ও আফগান সরকারের শুল্ক-হংস স্বর্ণডিম্ব প্রসব করা বন্ধ করে দেবে।

ডানদিকে ড্রাইভার শিখ সর্দারজী। বয়স ষাটের কাছাকাছি। কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়ি ও পরে জানতে পারলুম রাতকানা। বাঁ দিকে আফগান সরকারের এক কর্মচারী। পেশাওয়ার গিয়েছিলেন কাবুল বেতারকেন্দ্রের মালসরঞ্জাম ছাড়িয়ে আনবার জন্য। সব ভাষাই জানেন অথচ বলতে গেলে এক ফরাসী ছাড়া অন্য কোনো ভাষাই জানেন না। অর্থাৎ আপনি যদি তাঁর ইংরিজী না বোঝেন তবে তিনি ভাবখানা করেন যেন আপনিই যথেষ্ট ইংরিজী জানেন না, তখন তিনি ফরাসীর যে ছয়টি শব্দ জানেন সেগুলো ছাড়েন। তখনো যদি আপনি তাঁর বক্তব্য না বোঝেন তবে তিনি উর্দু ঝাড়েন। শেষটায় এমন ভাব দেখান যে অশিক্ষিত বর্বরদের সঙ্গে কথা বলবার ঝকমারি আর তিনি কত পোহাবেন ? অথচ পরে দেখলুম ভদ্রলোক অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, বিপন্নের সহায়। তারো পরে বুঝতে পারলুম ভাষা বাবতে ভদ্রলোকের এ দুর্বলতা কেন যখন শুনতে পেলুম যে তিনি অনেক ভাষায় পাণ্ডিত্যের দাবি করে বেতারে চাকরি পেয়েছেন। আমার সঙ্গে দু'দিন একাসনে কাটাবেন—আমি যদি কাবুলে গিয়ে রটাই যে, তিনি গণ্ডূষজলের সফরী তাহলে বিপদআপদের সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁর এ ভয় সম্পূর্ণ অমূলক ছিল—তাঁর অজানতে বড়কর্তাদের সবাই জানতেন, ভাষার খাতে তাঁর জ্ঞানের জমা কতটুকু। তবু যে তিনি চাকরিতে বহাল ছিলেন তার সরল কারণ, অন্য সবাই ভাষা জানতেন তাঁর চেয়েও কম। এ তত্ত্বটি কিন্তু তিনি নিজে বুঝতে পারেননি। সরল প্রকৃতির লোক, নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে এতই ব্যস্ত যে পরের অজ্ঞতা তাঁর চোখে পড়ত না। গুণীরা বলেন, 'চোখের সামনে ধরা আপন বদ্ধমুষ্টি দূরের হিমালয়কে ঢেকে ফেলে।'

বাসের পেটে একপাল কাবুলী ব্যবসায়ী। পেশাওয়ার থেকে সিগারেট, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পেলেট-বাসন, ঝাড়-লণ্ঠন, ফুটবল, বিজলি-বাতির সাজ-সরঞ্জাম, কেতাব-পুঁথি, এক কথায় দুনিয়ার সব জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আফগান শিল্প প্রস্তুত করে মাত্র তিন বস্তু—বন্দুক, গোলাগুলি আর শীতের

কাপড়। বাদবাকি প্রায় সব কিছুই আমদানি করতে হয় হিন্দুস্থান থেকে, কিছুটা রুশ থেকে। এসব তথ্য জানবার জন্য আফগান সরকারের বাণিজ্য-প্রতিবেদন পড়তে হয় না, কাবুল শহরে একটা চক্কর মারলেই হয়।

সে সব পরের কথা।

আগের দিন পেশাওয়ারে ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল—ছায়াতে। এখন বাস্ যাচ্ছে যেখান দিয়ে সেখান থেকে দূরবীন দিয়ে তাকালেও একটি পাতা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। থাকার মধ্যে আছে এখানে ওখানে পাথরের গায়ে হলদে ঘাসের পোঁচ।

হস্টেলে স্টোভ ধরাতে গিয়ে এক আনাড়ী ছোকরা একবার জ্বলন্ত স্পিরিটে আরো স্পিরিট ঢালতে গিয়েছিল। ধপ করে সোতলে স্টোভে সর্বত্র আগুন লেগে ছোকরার ভুরু, চোখের লোম, মোলায়েম গোঁপ পুড়ে গিয়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে এক অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল। এখানে যেন ঠিক তাই। মা ধরণী কখন যেন হঠাৎ তাঁর মুখখানা সূর্যদেবের অত্যন্ত কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেখানে আগুনের এক থাবড়ায় তাঁর চুল ভুরু সব পুড়ে গিয়ে মাটির চামড়া আর ঘাসের চুলের সেই অবস্থা হয়েছে।

এরকম ঝলসে-যাওয়া দেশ আর কখনো দেখিনি। মরুভূমির কথা আলাদা। সেখানে যা কিছু পোড়বার মত সে সব আমাদের জন্মের বহুপূর্বে পুড়ে গিয়ে ছাই হয়ে উড়ে চলে গিয়েছে মরুভূমি ছেড়ে—সার হয়ে নূতন ঘাসপাতা জন্মাবার চেষ্টা আর করেনি। সূর্যদেব সেখানে একচ্ছত্রাধিপতি। এখানে নগ্ন বীভৎস দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব বলা ভুল—এখানে নির্মম কঠোর অত্যাচার। ধরণী এদেশকে শস্য-শ্যামল করার চেষ্টা এখনো সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেননি—প্রতি ক্ষীণ চেষ্টা বারে বারে নির্দয় প্রহারে ব্যর্থ হচ্ছে। পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহী প্রজার কথা মনে পড়ল। বার বার তারা চরের উপর খড়ের ঘর বাঁধে, বার বার জমিদারের লেঠেল সব কিছু পুড়িয়ে দিয়ে ছারখার করে চলে যায়।

পেশাওয়ার থেকে জমরুদ দুর্গ সাড়ে দশ মাইল সমতল ভূমি। সেখানে একদফা পাসপোর্ট দেখাতে হল। তারপর খাইবার গিরিসঙ্কট।

তার বর্ণনা আমি দিতে পারব না, করজোড়ে স্বীকার করে নিচ্ছি। কারণ আমি যে অবস্থায় ঐ সঙ্কট অতিক্রম করেছি সে অবস্থায় পড়লে স্বয়ং পিয়ের লোতি কি করতেন জানিনে। লোতির কথা বিশেষ করে বললুম কারণ তাঁর মত অজানা অচিন দেশের আবহাওয়া শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে গড়ে তোলার মত অসাধারণ ক্ষমতা অন্য কোনো লেখকের রচনায় চোখে পড়ে না। স্বয়ং কবিগুরু

বাঙালীর অচেনা জিনিস বর্ণনা করতে ভালোবাসতেন না। পাহাড় বাঙলা দেশে নেই—তাঁর আড়াই হাজার গানের কোথাও পাহাড়ের বর্ণনা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সমুদ্র বাঙলা দেশের কোল ঘেঁষে আছে বটে কিন্তু সাধারণ বাঙালী সমুদ্র দেখে জগন্নাথের রথ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার মত করে—পুরীতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তাই 'পুরীর সমুদ্র দর্শনে', অথচ তিনি যে লোতির চেয়ে খুব কম সমুদ্র দেখেছিলেন তাও তো নয়। তবু এ সব হল বাঙালীর কিছু কিছু দেখা—সম্পূর্ণ অচেনা জিনিস নয়। কিন্তু শীতের দেশের সবচেয়ে অপূর্ব দর্শনীয় জিনিস বরফপাত, রবীন্দ্রনাথ নিদেনপক্ষে সে সৌন্দর্য পাঁচশ' বার দেখেছেন, একবারও বর্ণনা করেননি।

তবু যদি কেউ বার দশেক সেই গরম সহ্য করে খাইবারপাসের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করে তাহলে আলাদা কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সংসারের সুখদুঃখ অনুভব করা যেন উটের কাঁটাগাছ খাওয়ার মত। ক্ষুধানিবৃত্তির আনন্দ সে তাতে পায় বটে কিন্তু ওদিকে কাঁটার খোঁচায় ঠোঁট দিয়ে দরদর করে রক্তও পড়ে। তাই অনুমান করা বিচিত্র নয় খাইবারের গরম কাঁটা সয়ে গেলে তার থেকে কাব্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করার মত রসও কিঞ্চিৎ বেরতে পারে।

আমি যে বাসে গিয়েছিলুম তাতে কোনোপ্রকারের রস থাকার কথা নয়। সিকন্দরশাহী, বাবুরশাহী রাস্তা দিয়ে তাকে যেতে হবে বলে তার উপযুক্ত মিলিটারী বন্দোবস্ত করেই সে বেরিয়েছে। তার আপাদমস্তক পুরু করোগেটেড টিন দিয়ে ঢাকা এবং নশ্বর ভঙ্গুর কাঁচ সে তার উইণ্ড-স্ক্রীন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। একটা হেড-লাইট কানা, কাঁচের অবগুণ্ঠন নেই। তখনই বুঝতে পারলুম বাইবেলের Song of the Song-এ বর্ণিত এক চোখের মহিমা—

"Thou hast ravished my heart, my spouse, thou hast ravished my heart with one of thine eyes."

যে সমস্যার সমাধান বহুদিন বহু কন্‌কর্ড বহু টীকাটিপ্পনী ঘেঁটেও করতে পারেনি, আজ এক মুহূর্তে সদ্‌গুরুর কৃপায় আর খাইবারী বাসের নিমিত্তে তার সমাধান হয়ে গেল।

দুদিকে হাজার ফুট উঁচু পাথরের নেড়া পাহাড়। মাঝখানে খাইবারপাস। এক জোড়া রাস্তা এঁকেবেঁকে একে অন্যের গা ঘেঁষে চলেছে কাবুলের দিকে। এক রাস্তা মোটরের জন্য, অন্য রাস্তা উট খচ্চর গাধা ঘোড়ার পণ্যবাহিনী বা ক্যারাভানের জন্য। সঙ্কীর্ণতম স্থলে দুই রাস্তায় মিলে ত্রিশ হাতও হবে না। সে রাস্তা আবার মাতালের মত টলতে টলতে এতই এঁকেবেঁকে গিয়েছে যে,

যে-কোনো জায়গায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়।

দ্বিপ্রহর সূর্য সেই নরককুণ্ডে সোজা নেমে এসেছে—তাই নিয়ে চতুর্দিকের পাহাড় যেন লোফালুফি খেলছে। এই গিরিসঙ্কটে আফগানের লক্ষ কণ্ঠ প্রতি-ধ্বনিত হয়ে কোটিকণ্ঠে পরিবর্তিত হত—এই গিরিসঙ্কটে এক মার্তণ্ড ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ মার্তণ্ডে পরিণত হন। তাঁদের কোটি কোটি অগ্নিজিহ্বা আমাদের সর্বাঙ্গ লেহন করে পরিতুষ্ট হন না, চক্ষুর চর্ম পর্যন্ত অগ্নিশলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছেন। চেয়ে দেখি সর্দারজীর চোখ সন্ধ্যাগব স্পর্শ না করেই সন্ধ্যাকাশের মত লাল হয়ে উঠেছে। কাবুলী রুমাল দিয়ে ফেটা মেরে চোখ বন্ধ করেছে। নগ্নচোখে ক'জন লোক ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে পারে?

এই গরমেই কি কান্দাহারের বধূ গান্ধারী অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? কান্দাহার থেকে দিল্লী যেতে হলে তো খাইবারপাস ছাড়া গত্যন্তর নেই। কে জানে, ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, অন্ধ বধূর দুর্দৈব দহন প্রশমিত করার জন্য মহাভারতকার গান্ধারীর অন্ধত্ব বরণের উপাখ্যান নির্মাণ করেননি?

অবাক হয়ে দেখছি সেই গরমে বুখারার পুস্তিন (ফার) ব্যবসায়ীরা দুই ইঞ্চি পুরু লোমওয়ালা চামড়ার ওভারকোট গায়ে দিয়ে খচ্চর খেদিয়ে খেদিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলেছে। সর্দারজীকে রহস্য সমাধানের অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, 'যাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তাদের পক্ষে সত্যই এরকম পুরু জামা এই গরমে আরামদায়ক। বাইরের গরম ঢুকতে পারে না, শরীর ঠাণ্ডা রাখে। ঘাম তো আর এদেশে হয় না, আর হলেই বা কি? এরা তার থোড়াই পরোয়া করে।' এটুকু বলতে বলতেই দেখলুম গরমের হল্কা মুখে ঢুকে সর্দারজীর গলা শুকিয়ে দিল। গল্প জমাবার চেষ্টা বৃথা।

কত দেশের কত রকমের লোক পণ্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। কত ঢঙের টুপি, কত রঙের পাগড়ি, কত যুগের অস্ত্র—গাদাবন্দুক থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম জর্মন মাউজার। দমস্কের বিখ্যাত সুদর্শন তরবারি, সুপারি কাটার জাঁতির মত 'জামধর' মোগল ছবিতে দেখেছিলুম, বাস্তবে দেখলুম হুবহু সেই রকম—গোলাপী সিল্কের কোমরবন্ধে গোঁজা। কারো হাতে কানজোখা পেতলে বাঁধানো লাঠি, কারো হাতে লম্বা ঝকঝকে বর্শা। উটের পিঠে পশমে রেশমে বোনা কত রঙের কার্পেট, কত আকারের সামোভার। বস্তা বস্তা পেস্তা বাদাম আখরোট কিসমিস আলুবুখারা চলেছে হিন্দুস্থানের বিরয়ানি-পোলাওয়ের জৌলুস বাড়াবার জন্য। আরো চলেছে, শুনতে পেলুম, কোমরবন্ধের নিচে, ইজেরের

ভাঙে, পুস্তিনের লাইনিঙের ভিতরে আফিঙ আর হশীশ, না ককেনই, না আরো কিছু।

সবাই চলেছে অতি ধীরে অতি মন্থরে। মনে পড়ল মানস সরোবর-ফের্তা আমার এক বন্ধু বলেছিলেন যে, কঠোর শীতে উঁচু পাহাড়ে যখন মানুষ কাতর হয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে প্রশস্ততম পন্থা অতি ধীর পদক্ষেপে চলা, তাড়িৎগতিতে সে যন্ত্রণা এড়াতে চেষ্টা করার অর্থ সজ্ঞানে যমদূতের হস্তে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ সমর্পণ করা। এও দেখি সেই অভিজ্ঞতার উষ্ণ সমর্থন। সেখানে প্রচণ্ড শীত, এখানে দুর্দান্ত গরম। পাঠান দু'বার বলেছিলেন, আমি তৃতীয়বার সেই প্রবাদ শপথরূপে গ্রহণ করলুম। 'হস্তদন্ত হওয়ার মানে শয়তানের পন্থায় চলা।'

রবীন্দ্রনাথও ঐ রকম কি একটা কথা বলেছেন না, দুঃখ না পেলে দুঃখ ঘুচবে কি করে? তবে কি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, তাড়াতাড়ি করে দুঃখ এড়াবার চেষ্টা করা বৃথা? মেয়াদ পূর্ণ হতে যে সময় লাগবার কথা তা লাগবেই।

খ্রীষ্টও তো বলেছেন—

'Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence [prison] till thou hast paid the uttermost farthing.'

কে বলে বিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ঘটনা ঘটে না? আমার সকল সমস্যা সমাধান করেই যেন ধড়াম করে শব্দ হল। কাবুলী তাড়িৎগতিতে চোখের ফেটা খুলে আমার দিকে বিবর্ণ মুখে তাকাল, আমি সর্দারজীর দিকে তাকালুম। তিনি দেখি অতি শান্তভাবে গাড়িখানা এক পাশে নিয়ে দাঁড় করালেন। বললেন, 'টায়ার ফেঁসেছে। প্রতিবারেই হয়। এই গরমে না হওয়াই বিচিত্র।'

হৃদয়ঙ্গম করলুম, সৃষ্টি যখন তার রুদ্রতম রূপ ধারণ করেন তখন তাড়াতাড়ি করতে নেই। কিন্তু এই গ্রীষ্মে রুদ্র তাঁর প্রসন্ন-কল্যাণ দক্ষিণ মুখ দেখালেই ভক্তের হৃদয় আকৃষ্ট হত বেশী।

প্রয়োজন ছিল না, তবু সর্দারজী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, খাইবার-পাসের রাস্তা দুটো সরকারের বটে, কিন্তু দুদিকের জমি পাঠানের। সেখানে নেমেছ কি মরেছ। আড়ালে আবডালে পাঠান সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে আছে। নামলেই কড়াক্-পিঙ্। তারপর কি কায়দায় সব কিছু হরণ করে তার বর্ণনা দেবার আর প্রয়োজন নেই। শিকারী হরিণ নিয়ে কি করে না-করে সকলেরই জানা কথা—চামড়াটুকুও বাদ দেয় না। এ স্থলে শুনলুম, শুধু যে

হাসিটুকু গুলি খাওয়ার পূর্বে মুখে লেগেছিল সেইটুকু হাওয়ায় ভাসতে থাকে—বাদবাকি উবে যায়।

পাঠান যাতে ঠিক রাস্তার বুকের উপর রাহাজানি না করে তার জন্য খাইবার-পাসের দুদিকে যেখানে বসতি আছে সেখানকার পাঠানদের ইংরেজ দু'টাকা করে বছরে খাজনা দেয়। পরে আরেকটি শর্ত অতি কষ্টে আদায় করেছে। আফ্রিদী আফ্রিদীতে ঝগড়া বাধলে রাস্তার এপারে ওপারে যেন বন্দুক না মারা হয়।

মোটর মেরামত করতে কতক্ষণ লেগেছিল মনে নেই। শুনেছি ভয়ঙ্কর জ্বর হলে রোগীর সময়ের আন্দাজ একেবারে চলে যায়। পরের দিনে যখন সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম চাকা বদলাতে দু'ঘণ্টা লাগল কি করে, তখন সর্দারজী বলে-ছিলেন, সময় নাকি লেগেছিল মাত্র আধ ঘণ্টা।

মোটর আবার চলল। কাবুলীর গলা ভেঙে গিয়েছে। তবু বিড়বিড় করে যা বলছিলেন, তার নির্যাস—

'কিচ্ছু ভয় নেই সায়েব—কালই কাবুল পৌঁছে যাচ্ছি। সেখানে পৌঁছে কব্ করে কাবুল নদীতে ডুব দেব। বরফগলা হিমজল পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, দিল জান কলিজা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নেয়ে উঠে বরফে ঘষে ঘষে আঙুর খাব তামাম জুলাই আগস্ট। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি নয়ানজুলিতে জল জমতে আরম্ভ করবে। অক্টোবরে শীতের হাওয়ায় ঝরা-পাতা কাবুল শহরে হাজারো রঙের গালিচা পেতে দেবে। নবেম্বরে পুস্তিনের জোব্বা বের করব। ডিসেম্বরে বরফ পড়তে শুরু করবে। সেই বরফের ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেরব। উঃ! সে কী শীত, সে কী আরাম!'

আমি বললুম, 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

হঠাৎ দেখি সামনে এ কি! মরীচিকা? সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে গেট কেন? মোটর থামল। পাসপোর্ট দেখাতে হল। গেট খুলে গেল। আফগানিস্থানে ঢুকলুম। বড় বড় হরফে সাইনবোর্ডে লেখা—

It is absolutely forbidden
to cross this border into
Afghan territory.

কাবুলী বললেন, 'দুনিয়ার সব পরীক্ষা পাস করার চেয়ে বড় পরীক্ষা খাইবার-

পাস পাস করা। অল্‌হম্‌দুলিল্লা (খুদাকে ধন্যবাদ)।'

আমি বললুম, 'আমেন।'

আট

খাইবারপাস তো দুঃখে-সুখে পেরলুম এবং মনে মনে আশা করলুম এইবার গরম কমবে। কমল বটে, কিন্তু পাসের ভিতর পিচ-ঢালা রাস্তা ছিল—তা সে সঙ্কীর্ণই হোক আর বিস্তীর্ণই হোক। এখন আর রাস্তা বলে কোনো বালাই নেই। হাজারো বৎসরের লোক-চলাচলের ফলে পাথর এবং অতি সামান্য মাটির উপর যে দাগ পড়েছে তারই উপর দিয়ে মোটর চলল। এ দাগের উপর দিয়ে পণ্যবাহিনীর যেতে আসতে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু মোটর-আরোহীর পক্ষে যে কতদূর পীড়াদায়ক হতে পারে তার খানিকটা তুলনা হয় বীরভূম-বাঁকুড়ায় ডাঙ্গা ও খোয়াইয়ে রাত্রিকালে গোরুর গাড়ি চড়ার সঙ্গে—যদি সে গাড়ি কুড়ি মাইল বেগে চলে, ভিতরে খড়ের পুরু তোষক না থাকে, এবং ছোটবড় নুড়ি দিয়ে ডাঙ্গা-খোয়াই ছেয়ে ফেলা হয়।

আহমদ আলী যাত্রাকলে আমার মাথায় একটা দশগজী বিরাট পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিলেন। খাইবারপাসের মাঝখানে সে পাগড়ি আমাকে সর্দিগর্মি থেকে বাঁচিয়েছিল ; এখন সেই পাগড়ি আমার মাথা এবং গাড়ির ছাতের মাঝখানে বাফার-স্টেট হয়ে উভয় পক্ষকে গুরুতর লড়াই-জখম থেকে বাঁচল।

সর্দারজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, পাগড়ি আর কোনো কাজে লাগে কি না। তিনি বললেন, 'আরো বহু কাজে লাগে কিন্তু উপস্থিত একটার কথা মনে পড়ছে। বিশেষ অবস্থাতে শুধু কলসীতেই চলে ; দড়ি কেনার দরকার হয় না।'

বুঝলুম, রাস্তার অবস্থা, গ্রীষ্মের আতিশয্য আর দ্বিপ্রহরের অনাহার এ-পথের ফুল-টাইম গাহক সর্দারজীকে পর্যন্ত কাবু করে ফেলেছে—তা না হলে এ রকম বীভৎস প্রয়োজনের কথা তাঁর মনে পড়বে কেন ?

দুঃখ হল। ষাট বৎসর বয়স হতে চলল, কোথায় না সর্দারজী দেশের গাঁয়ে তেঁতুলের ছায়ায় নাতি-নাতনীর হাতে হাওয়া খেতে খেতে পল্টনের গল্প বলবেন আর কোথায় আজ এই একটানা আগুনের ভিতর পেশাওয়ার কাবুলে মাকু মারা। কেন এমন অবস্থা কে জানে, কিন্তু দেশ, কাল এবং বিশেষ করে পাত্রের অবস্থা বিবেচনা করে আড্ডা জমাবার রৌদ্রাতুর ক্ষীণাঙ্কুর উপড়ে ফেলতে বেশী টানাহেঁচড়া করতে হল না।

কী দেশ! দুদিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে নুড়ি আর নুড়ি। যেখানে নুড়ি আর নেই সেখান থেকে চোখে পড়ে বহুদূরে আবছায়া আবছায়া পাহাড়। দূর থেকে বলা শক্ত, কিন্তু অনুমান করলুম লক্ষ বৎসরের রৌদ্রবর্ষণে তাতেও সজীব কোনো কিছু না থাকারই কথা। রেডিয়েটারে জল ঢালার জন্য মোটর একবার দাঁড়িয়েছিল; তখন লক্ষ্য করলুম এক কণা ঘাসও দুই পাথরের ফাঁকে কোথাও জন্মায়নি। পোকামাকড়, কোনো প্রকারের প্রাণের চিহ্ন কোথাও নেই—খাবে কি, বাঁচবে কি দিয়ে? মা ধরণীর বুকের দুধ এদেশে যেন সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছে; কোনো ফাটল দিয়ে কোনো বাঁধন ছিঁড়ে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত বেরোয়নি। দিকদিগন্তব্যাপী বিশাল শ্মশানভূমির মাঝখান দিয়ে প্রেতযোনি বর্মধারিণী ফোর্ড গাড়ি চলেছে ছায়াময় সন্তানসন্ততি নিয়ে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, চক্রবালপরিপূর্ণ মহানির্জনতার অদৃশ্য প্রহরীরা হঠাৎ কখন যন্ত্রজনিত ধূম্রপুচ্ছ এই স্বতশ্চলশকট শূন্যে তুলে নিয়ে বিরাট নৈস্তব্ধ্যের যোগভূমি পুনরায় নিরঙ্কুশ করে দেবে।

তারপর দেখি মৃত্যুর বিভীষিকা। প্রকৃতি এই মরুপ্রান্তরে প্রাণ সৃষ্টি করেন না বটে কিন্তু প্রাণ গ্রহণে তিনি বিমুখ নন। রাস্তার ঠিক উপরেই পড়ে আছে উটের এক বিরাট কঙ্কাল। গৃধিনী শকুনি অনাহারে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয়ে এখানে আসে না বলে কঙ্কাল এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েনি। রৌদ্রের প্রকোপে ধীরে ধীরে মাংস শুকিয়ে গিয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পড়েছে। মসৃণ শুভ্র সম্পূর্ণ কঙ্কাল যেন যাদুঘরে সাজানো বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল সামগ্রী হয়ে পড়ে আছে।

লাণ্ডিকোটাল থেকে দক্কা দশ মাইল।

সেই মরুপ্রান্তরে দক্কাদুর্গ অত্যন্ত অবান্তর বলে মনে হল। মাটি আর খড় মিশিয়ে পিটে পিটে উঁচু দেয়াল গড়ে তোলা হয়েছে আশপাশের রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে—ফ্যাকাশে, ময়লা, ঘিনঘিনে হলদে রঙ। দেয়ালের উপরের দিকে এক সারি গর্ত; দুর্গের লোক তারি ভিতর দিয়ে বন্দুকের নল গলিয়ে নিরাপদে বাইরের শত্রুকে গুলী করতে পারে। দূর থেকে সেই কালো কালো গর্ত দেখে মনে হয় যেন অন্ধের উপড়ে-নেওয়া চোখের শূন্য কোটর।

কিন্তু দুর্গের সামনে এসে বাঁ দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। ছলছল করে কাবুল নদী বাঁক নিয়ে এক পাশ দিয়ে চলে গিয়েছেন—ডান দিকে এক ফালি সবুজ আঁচল লুটিয়ে পড়েছে। পলিমাটি জমে গিয়ে যেটুকু মেঠো রসের সৃষ্টি হয়েছে তারি উপরে ভুখা দেশ ফসল ফলিয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম; মনে হল ভিজে সবুজ নেকড়া দিয়ে কাবুল নদী আমার চোখের জ্বালা ঘুচিয়ে দিলেন। মনে হল ঐ সবুজটুকুর কল্যাণে সে-যাত্রা আমার চোখ দুটি বেঁচে

গেল। না হলে দক্কা দুর্গপ্রাকারের অন্ধ কোটর নিয়ে আমাকেও দিশেহারা হয়ে ঐ দেয়ালেরই মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

কাবুলী বললেন, 'চলুন, দুর্গের ভিতরে যাই। পাসপোর্ট দেখাতে হবে। আমরা সরকারী কর্মচারী। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে। তা হলে সন্ধ্যার আগেই জলালাবাদ পৌঁছতে পারব।'

দুর্গের অফিসার আমাকে বিদেশী দেখে প্রচুর খাতির-যত্ন করলেন। দক্কার মত জায়গায় বরফের কল থাকার কথা নয়, কিন্তু যে শরবৎ খেলুম তার জন্য ঠাণ্ডা জল কুঁজোতে কি করে তৈরী করা সম্ভব হল বুঝতে পারলুম না।

অফিসারটি সত্যি অত্যন্ত ভদ্রলোক। আমার কাতর অবস্থা দেখে বললেন, 'আজ রাতটা এখানেই জিরিয়ে যান। কাল অন্য মোটরে আপনাকে সোজা কাবুল পাঠিয়ে দেব।' আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম যে, আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে।

অফিসারটি শিক্ষিত লোক। একলা পড়েছেন, কথা কইবার লোক নেই। আমাকে পেয়ে নির্জনে জমানো তাঁর চিন্তাধারা যেন উপচে পড়ল। হাফিজ-সাদীর অনেক বয়েৎ আওড়ালেন এবং মরুপ্রান্তরে একা একা আপন মনে সেগুলো থেকে নিংড়ে নিংড়ে যে রস বের করেছেন তার খানিকটা আমায় পরিবেষণ করলেন। আমি আমার ভাঙা ভাঙা ফারসীতে জিজ্ঞাসা করলুম, সঙ্গীহীন জীবন কি কঠিন বোধ হয় না? বললেন, 'আমার চাকরি পল্টনের, ইস্তফা দেবার উপায় নেই। কাজেই বাইরের কাবুল নদীটি নিয়ে পড়ে আছি। রোজ সন্ধ্যায় তার পাড়ে গিয়ে বসি আর ভাবি যেন একমাত্র নিতান্ত আমার জন্য সে এই দুর্গের দেয়ালে আঁচল বুলিয়ে চলে গিয়েছে। অন্যায় কথাও নয়। আর দু'চারজন যারা নদীর পারে যায়, তাদের মতলব ঠাণ্ডা হওয়ার। আমিও ঠাণ্ডা হই, কিন্তু শীতকালেও কামাই দিইনে। গোড়ার দিকে আমিও স্বার্থপর ছিলুম, কাবুল নদী আমার কাছে সৌন্দর্য উপভোগের বস্তু ছিল। তার গান শুনতুম, তার নাচ দেখতুম, তার লুটিয়ে-পড়া সবুজ আঁচলের এক প্রান্তে আসন পেতে বসতুম। এখন আমাদের অন্য সম্পর্ক। আচ্ছা বলুন তো, অমাবস্যার অন্ধকারে যখন কিছুই দেখা যায় না, তখন আপনি কখনো নদীর পারে কান পেতে শুয়েছেন?'

আমি বললুম, 'নৌকোতে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছি।'

তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'তা হলে আপনি বুঝতে পারবেন। মনে হয় না কুলকুল শুনে, যেন আর দু'দিন কাটলেই আরেকটু, আর সামান্য একটু অভ্যাস হয়ে গেলেই হঠাৎ কখন এই রহস্যময়ী ভাষার অর্থ সরল হয়ে যাবে? আপনি

ভাবছেন আমি কবিত্ব করছি। আদপেই না। আমার মনে হয় মেঘের ডাক যেমন জলপ্রাণীকে বিদ্যুতের ভয় জানিয়ে দেয়, জলের ভাষাও তেমনি কোনো এক আশার বাণী জানাতে চায়। দূর সিন্ধুপার থেকে সে বাণী উজিয়ে উজিয়ে এসেছে, না কাবুল পাহাড়ের শিখর থেকে বরফের বুকের ভিতর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এখানে এসে গান গেয়ে জেগে উঠেছে, জানিনে।

'এখন বড্ড গরম। শীতকালে যখন আপনার ছুটি হবে তখন এখানে আসবেন। এই নদীর অনেক গোপন খবর আপনাকে বাৎলে দেব। আহারাদি? কিচ্ছু ভাবনা নেই। মুরগী, দুম্বা যা চাই। শাকসব্জী? সে গুড়ে পাথর।'

অফিসার যখন কথা বলছিলেন; তখন আমার এক একবার সন্দেহ হচ্ছিল, একা থেকে থেকে বোধ হয় ভদ্রলোকের মাথা, কেমন জানি, একটুখানি—। কিন্তু কাবুল নদীর সবুজ আঁচল ছেড়ে তিনি যখন অক্লেশে দুম্বার পিঠে সোওয়ার হলেন, তখনই বুঝলুম ভদ্রলোক সুস্থই আছেন। বললেন, 'আমার কাজ পাসপোর্ট সই করা আর কি মাল আসছে-যাচ্ছে তার উপর নজর রাখা। কিছু কঠিন কর্ম নয়, বুঝতেই পারছেন। ওদিকে নূতন বাদশা উঠে পড়ে লেগেছেন আফগানিস্থানকে সজীব সবল করে তোলবার জন্য। অনেক লোক তার চারদিকে জড়ো হয়েছেন। শুনতে পাই কাবুলে নাকি সর্বত্র নূতন প্রাণের সবুজ ঘাস জেগে উঠেছে। কিন্তু এদিকে ইংরেজ দুম্বা, ওদিকে রুশী বকরী। সুযোগ পেলেই কাঁচা ঘাস সাফ করে দিয়ে কাবুলের নেডা পাহাড়কে ফের নেড়া করে দেবে। ভাগ্যিস, চতুর্দিকে খোদায় দেওয়া পাথরের বেডা রয়েছে, তাই রক্ষে। আর রক্ষে এই, দুম্বা আর বকরীতে কোনোদিন মনের মিল হয় না। দুম্বা যদি ঘাসের দিকে নজর দেয় তো বকরী শিঙ উঁচিয়ে লাফ দিয়ে আমুদরিয়া পার হতে চায়। বকরী যদি তেড়িমেড়ি করে, তবে দুম্বা ম্যা ম্যা করে আর সবাইকে জানিয়ে দেয় যে, বকরীর নজর শুধু কাবুলের চাট্টিখানি ঘাসের উপর নয়—তার আসল নজর হিন্দুস্থান, চীন, ইরান সবকটা বড় বড় ধানক্ষেতের উপর।

আমি শুধালুম, 'দুম্বাটা শুধু শুধু ম্যা ম্যা করবে কেন? তারো তো একজোড়া খাসা শিঙ আছে।'

'ছিল। হিন্দুস্থান ভাবে, এখনো আছে, কিন্তু এদেশের পাথরে খামকা গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ভোঁতা করে ফেলেছে। তাই বোধ হয় সেটা ঢাকবার জন্য সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছে—গোরা সেপাইয়ের খানাপিনার জমক-জৌলুস দেখেছেন তো? হিন্দুস্থান সেই সোনালী শিঙের ঝলমলানি দেখে আরো বেশি ভয় পায়। ওদিকে মিশরে সা'দ জগলুল পাশা, তুর্কীতে মুস্তফা কামাল পাশা,

হিজ্‌জাজে ইবনে সউদ, আফগানিস্থানে আমান উল্লা খান দুবার পিঠে কয়েকটা আচ্ছা ডাণ্ডা বুলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোনো জানোয়ারই সহজে ঘায়েল হয় না। জানোয়ার তো?'

আমি আঁৎকে উঠলুম। কী ভয়ঙ্কর সিডিশন! নাঃ, তা তো নয়। মনেই ছিল না যে স্বাধীন আফগানিস্থানে বসে কথা কইছি।

অফিসার বলে যেতে লাগলেন, 'তাই আজ হিন্দুস্থান আফগানিস্থানে মিলে মিশে যে কাজ করতে যাচ্ছে সে বড় খুশীর কথা। কিন্তু আপনাকে বহুত তকলিফ বরদাস্ত করতে হবে। কাবুল শক্ত জায়গা। শহরের চারিদিকে পাথর, মানুষের দিলের ভিতর আরো শক্ত পাথর। শাহানশা বাদশা সেই পাথরের ফাটলে ঘাস গজাচ্ছেন, আপনাকে পানি ঢালতে ডেকেছেন।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'লজ্জা দেবেন না। আমার কাজ অতি নগণ্য।'

অফিসার বললেন, 'তার হিসেবনিকেশ আর-একদিন হবে। আজ আমি খুশী যে এতদিন শুধু পেশাওয়ার পাঞ্জাবের লোক আফগানিস্থানে আসত, এখন দূর বাঙলা মুল্লুকেও আফগানিস্থানের ডাক পৌঁচেছে।'

দেখি সর্দারজী দূর থেকে ইশারায় জানাচ্ছেন, সব তৈরী—আমি এলেই মোটর ছাড়ে।

অফিসার সর্দারজীকে দেখে বললেন, 'অমর সিং বুলানীর গাড়িতে যাচ্ছেন বুঝি? ওর মত হুঁশিয়ার আর কলকব্জায় ওস্তাদ ড্রাইভার এ রাস্তায় আর কেউ নেই। এমন গাড়িও নেই যার গায়ে অমর সিংয়ের দুটো ঠোক্কর, দুটো চারটে কদরের চাঁটি পড়েনি। কোনো বেয়াড়া গাড়ি যদি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করে তবে শেষ দাওয়াই তার ঘোমটা খুলে কানের কাছে বলা, 'ওঝা অমর সিংকে খবর দেওয়া হয়েছে।' আর দেখতে হবে না। সেলফ্-স্টার্টার না, হ্যাণ্ডিল না, হঠাৎ গাড়ি পাঁই পাঁই করে ছুটতে থাকে। ড্রাইভার কোনো গতিকে যদি পিছন দিকে ঝুলে পড়তে পারে তবেই রক্ষা।

'কিন্তু হামেশাই দেখবেন লাইনের সবচেয়ে লজ্‌ঝড় গাড়ি চালাচ্ছে অমর সিং। একটা মজা দেখবেন?' বলে তিনি অমর সিংকে ডেকে বললেন, 'সর্দারজী, আমি একখানা নয়া গাড়ি কিনেছি। সিধা আমেরিকা থেকে আসছে। তুমি চালাবে? তন্‌খা এখন যা পাচ্ছ তাই পাবে।'

অফিসারের নজরে পড়াতে সর্দারজী তো হাসিমুখে এসে সালাম করে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কথা শুনে মুখ গম্ভীর হল। পাগড়ির ন্যাজটা দুহাতে নিয়ে সর্দারজী ভাঁজ করেন আর ভাঁজ খোলেন—নজর ঐদিকে ফেরানো। তারপর

বললেন, 'হুজুরের গাড়ি চালানো বড়ী ইজ্জৎকী বাৎ কিন্তু আমার পুরোনো চুক্তির মিয়াদ এখনো ফুরোয়নি।'

অফিসার বললেন, 'তাই নাকি? বড় আফসোসের কথা। তা সে চুক্তি শেষ হলে আমায় খবর দিয়ো। আচ্ছা তুমি এখন যাও, আমি স্বদে আগাকে (অর্থাৎ আমাকে) পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'দেখলেন তো? নতুন গাড়ি সে চালাতে চায় না। চুক্তি-ফুক্তি সব বাজে কথা। আমার ড্রাইভারের দরকার শুনলে এ লাইনের কোন্ মোটরের গোঁসাই চুক্তির ফপরদালালি করতে পারে বলুন তো! তা নয়। অমর সিং নূতন গাড়ি চালিয়ে সুখ পায় না। পদে পদে যদি টায়ার না ফাটল, এঞ্জিন না বিগড়ল, ছাতখানা উড়ে না গেল, তবে সে মোটর চালিয়ে কি কেরামতি? সে গাড়ি তো বোরকা-পরা মেয়েই চালাতে পারে।

'আমার কি মনে হয় জানেন? বুড়ী মরে গিয়েছে। মোটরের বনেট খুলতে পেলে সে এখন বউয়ের ঘোমটা খোলার আনন্দ পায়। নূতন গাড়িতে তার অজুহাত কোথায়?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বউয়ের ঘোমটা খোলার জন্য আবার অজুহাতের প্রয়োজন হয় নাকি?'

অফিসার বললেন, 'হয়, হয়। রাজাধিরাজের বেলাও হয়। শুনুন, কাবুল-বদখশান আধা হিন্দুস্থানের মালিক হুমায়ুন বাদশা জুবেদীকে কি বলেছেন—

তবু যদি সাধি তোমা' ভিখারীর মত
দেখা মোরে দিতে করুণায়;
বল তুমি, 'রহি অবগুণ্ঠনের মাঝে
এ-রূপ দেখাতে নারি হায়!'
তৃষা আর তৃপ্তি মাঝে র'বে ব্যবধান
অর্থহীন এ অবগুণ্ঠন?
আমার আনন্দ হতে সৌন্দর্য তোমার
দূরে রাখে কোন্ আবরণ।
একি গো সমরলীলা তোমায় আমায়?
ক্ষমা দাও, মাগি পরিহার;
মরমের মর্ম যাহা তাই তুমি মোর
জীবনের জীবন আমার!

—সত্যেন দত্তের অনুবাদ

নয়

আফগানিস্থানের অফিসার যদি কবি হতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে পীর হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তিন-তিনবার চাকা ফাটল, আর এঞ্জিন সর্দারজীর উপর গোসা করে দুবার গুম হলেন। চাকা সারাল হ্যাণ্ডিম্যান—তদারক করলেন সর্দারজী। প্রচুর মেহদি-প্রলেপের সলুশন লাগিয়ে বিবি-জানের কদম মবারক মেরামত করা হল, কিন্তু তাঁর মুখ ফোটাবার জন্য স্বয়ং সর্দারজীকে ওড়না তুলে অনেক কাকুতিমিনতি করতে হল। একবার চটে গিয়ে তিনি হ্যাণ্ডিল মারার ভয়ও দেখিয়েছিলেন—শেষটায় কোন্ শর্তে রফারফি হল, তার খবর আমরা পাইনি বটে, কিন্তু হরেকরকম আওয়াজ থেকে আমেজ পেলুম, বিবিজান অনিচ্ছায় শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন।

জলালাবাদ পৌঁছবার কয়েক মাইল আগে তাঁর কোমরবন্ধ অথবা নীবিবন্ধ, কিম্বা বেল্ট—যাই বলুন, ছিঁড়ে দু'টুকরো হল। তখন খবর পেলুম সর্দারজীও রাতকানা। রেডিয়োর কর্মচারী আমার কানটাকে মাইক্রোফোন ভেবে ফিস ফিস করে প্রচার করে দিলেন, 'অদ্যকার মত আমাদের অনুষ্ঠান এইখানেই সমাপ্ত হল। কাল সকালে সাতটায় আমরা আবার উপস্থিত হব।'

আধ মাইলটাক দূরে আফগান সরাই। বেতারের সায়েব ও আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললুম। বাদবাকি আর সকলে হৈ-হল্লা করে করে গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলল। বুঝলুম, এদেশেও বাস চড়ার পূর্বে সাদা কালিতে কাবিন-নামায় লিখে দিতে হয়, 'বিবিজানের খুশীগমীতে তাঁহাকে স্বহস্তে স্বস্কন্ধে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে গররাজি হইব না।'

সর্দারজী তম্বী করে বললেন, 'একটু পা চালিয়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে সরাইয়ের দরজা বন্ধ করে দেবে।'

সরাই তো নয়, ভীষণ দুশমনের মত দাঁড়িয়ে এক চৌকো দুর্গ। 'কর্মঅন্তে নিভৃত পান্থশালাতে' বলতে আমাদের চোখে যে স্নিগ্ধতার ছবি ফুটে ওঠে এর সঙ্গে তার কোনো সংস্রব নেই। ত্রিশ ফুট উঁচু হলদে মাটির নিরেট চারখানা দেয়াল, সামনের খানাতে এক বিরাট দরজা—তার ভিতর দিয়ে উট, বাস্, ডবল-ডেকার পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভিতরে যাবার সময় মনে হয়, এই শেষ ঢোকা, এ দানবের পেট থেকে আর বেরতে হবে না।

ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। কত শত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত দুর্গন্ধ আমাকে ধাক্কা

মেরেছিল বলতে পারিনে, কিন্তু মনে হল আমি যেন সে ধাক্কায় তিন গজ পিছিয়ে গেলুম। ব্যাপারটা কি বুঝতে অবশ্য বেশী সময় লাগল না! এলাকাটা মৌসুমী হাওয়ার বাইরে, তাই এখানে কখনো বৃষ্টি হয় না—যথেষ্ট উঁচু নয় বলে বরফও পড়ে না। আশেপাশে নদী বা ঝরনা নেই বলে ধোয়ামোছার জন্য জলের বাজে খরচার কথাও ওঠে না। অতএব সিকন্দরশাহী বাজীরাজ থেকে আরম্ভ করে পরশুদিনের আস্ত ভেড়ার পাল যে সব 'অবদান' রেখে গিয়েছে, তার স্থূলভাগ মাঝে মাঝে সাফ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম গন্ধ সর্বত্র এমনি স্তরীভূত হয়ে আছে যে, ভয় হয় ধাক্কা দিয়ে না সরালে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব; ইচ্ছে করলে চামচ দিয়ে কুরে কুরে তোলা যায়। চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল, মাত্র একদিকে একখানা দরজা। বাইরের হাওয়া তারি সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়, অন্যদিকে বেরবার পথ নেই দেখে ঐ জালিয়ানওয়ালাবাগে আর ঢোকে না। সূচীভেদ্য অন্ধকার দেখেছি, এই প্রথম সূচীভেদ্য দুর্গন্ধ শুঁকলুম।

দুর্গপ্রাকারকে পিছনের দেয়ালস্বরূপ ব্যবহার করে চার সারি কুঠরি নয়—খোপ। শুধু দরজার জায়গাটা ফাঁকা। খোপগুলোর তিন দিক বন্ধ—সামনের চত্বরের দিক খোলা। বেতারওয়ালা সরাইয়ের মালিকের সঙ্গে দর-কষাকষি করে আমাদের জন্য একটা খোপ ভাড়া নিলেন—আমার জন্য একখানা দড়ির চারপাইও যোগাড় করা হল। খোপের সামনের দিকে একটু বারান্দা, চারপাই সেখানে পাতা হল। খোপের ভিতর একবার এক লহমার তরে ঢুকেছিলুম—মানুষের কত কুবুদ্ধিই না হয়। ধর্ম সাক্ষী, স্মেলিং সল্টে যার ভিরমি কাটে না, তাকে আধ মিনিট সেখানে রাখলে আর দেখতে হবে না।

কেরোসিন কুপির ক্ষীণ আলোকে যাত্রীরা আপন আপন জানোয়ারের তদারক করছে। উট যদি তাড়া খেয়ে পিছু হটতে আরম্ভ করল, তবে খচ্চরের পাল চিৎকার করে রুটিওয়ালার বারান্দায় ওঠে আর কি। মোটর যদি হেড-লাইট জ্বালিয়ে রাত্রিবাসের স্থান অনুসন্ধান করে, তবে বাদবাকি জানোয়ার ভয় পেয়ে সব দিকে ছুটোছুটি আরম্ভ করে। মালিকেরা তখন আবার চিৎকার করে আপন আপন জানোয়ার খুঁজতে বেরোয়। বিচুলি নিয়ে টানাটানি, রুটির দোকানে দর-কষাকষি, মোটর মেরামতের হাতুড়ি পেটা, মোরগ-জবাইয়ের ঘড়ঘড়ানি, আর পাশের খোপের বারান্দায় খান সায়েবের নাক-ডাকানি। তার নাসিকা আর আমার নাকের মাঝখানে তফাত ছয় ইঞ্চি। শিথান বদল করার উপায় নেই—পা তাহলে পশ্চিম দিকে পড়ে ও মুখ উটের নেজের চামর ব্যজন পায়। আর উট যদি পিছু হটতে আরম্ভ করে, তবে কি হয় না-হয় বলা কিছু

কঠিন নয়। গোমূত্রের মত পবিত্র জিনিসেও প্রপাতস্নানের ব্যবস্থা নেই।

তবে একথা ঠিক, দুর্গন্ধ ও নোংরামি সহ্য করে কেউ যদি সরাইয়ে জ্ঞান অন্বেষণ অথবা আড্ডার সন্ধানে একটা চক্কর লাগায়, তবে তাকে নিরাশ হতে হবে না। আহমদ আলীর ফিরিস্তিমাফিক সব জাত সব ভাষা তো আছেই, তার উপরে গুটিকয়েক সাধুসজ্জন, দু'-একজন হজ-যাত্রী—পায়ে চলে মক্কা পৌঁছবার জন্য তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়েছেন। এঁদের চোখেমুখে কোনো ক্লান্তির চিহ্ন নেই; কারণ এঁরা চলেন অতি মন্দগতিতে এবং নোংরামি থেকে গা বাঁচাবার কায়দাটা এঁরা ফ্রন্টিয়ারেই রপ্ত করে নিয়েছেন। সম্বল-সামর্থ্য এঁদের কিছুই নেই—উপরে আল্লার মরজি ও নিচে মানুষের দাক্ষিণ্য এই দুই-ই তাঁদের নির্ভর।

অনৈসর্গিক পাপের আভাস-ইঙ্গিতও আছে—কিন্তু সেগুলো হির্শফেল্ট্ সায়েবের জিম্মাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

সেই সাত-সকালে পেশাওয়ারে আণ্ডা-রুটি খেয়ে বেরিয়েছিলুম, তারপর পেটে আর কিছু পড়েনি। দক্কার শরবৎ পেট পর্যন্ত পৌঁছয়নি, শুকনো তালু-গলাই তাকে শুষে নিয়েছিল। কিন্তু চতুর্দিকের নোংরামিতে এমনি গা ঘিন ঘিন করছিল যে, কোনো কিছু গিলবার প্রবৃত্তি ছিল না। নিজের আধিক্যেতায় নিজের উপর বিরক্তিও ধরেছিল—'আরে বাপু, আর পাঁচজন যখন দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে খাচ্ছে-দাচ্ছে-ঘুমোচ্ছে, তখন তুমিই বা এমন কোন্ নবাব খাঞ্জা খাঁর নাতি যে, তোমার স্নান না হলে চলে না, মাত্র দু'হাজার বছরের জমানো গন্ধে তুমি ভিরমি যাও। তবু তো জানোয়ারগুলো চত্বরে, তুমি বারান্দায় শুয়ে। মা জননী মেরী সরাইয়েও জায়গা পাননি বলে শেষটায় গাধা-খচ্চরের মাঝখানে প্রভু যীশুর জন্ম দেননি? ছবিতে অবশ্য সায়েবসুবোরা যতদূর সম্ভব সাফসুতরো করে সব কিছু এঁকেছেন, কিন্তু শাকে ঢাকা পড়ে ক'টা মাছ?

'বেৎলেহেমের সরাইয়ে আর আফগানিস্থানের সরাইয়ে কি তফাত? বেৎলেহেমেও বৃষ্টি হয় তিন ফোঁটা আর বরফ পড়ে আড়াই তোলা। কে বললে তোমায় ইহুদি আফগানের চেয়ে পরিষ্কার? আফগানিস্থানের গন্ধে তোমার গা বিড়োচ্ছে, কিন্তু ইহুদির গায়ের গন্ধে বোকা পাঁঠা পর্যন্ত লাফ দিয়ে দরমা ফুটো করে প্রাণ বাঁচায়।'

এ সব হল তত্ত্বজ্ঞানের কথা। কিন্তু মানুষের মনের ভিতর যে রকম গীতাপাঠ হয়, সে রকম বেয়াড়া দুর্যোধনও সেখানে ব'সে। তার শুধু এক উত্তর, 'জানামি ধর্মং, ন চ মে প্রবৃত্তি', অর্থাৎ 'তত্ত্বকথা আর নূতন শোনাচ্ছ কি, কিন্তু ওসবে

আমার প্রবৃত্তি নেই।' তার উপর আমার বেয়াড়া মনের হাতে আরেকখানা খাসা উত্তরও ছিল। 'সর্দারজী ও বনেটবাসিনীতে যদি সাঁঝের ঝোঁকে চলাচলি আরম্ভ না হ'ত তবে অনেক আগেই জলালাবাদের সরকারী ডাকবাঙলোয় পৌঁছে সেখানে তোমাতে-আমাতে স্নানাহার করে এতক্ষণে নরগিস ফুলের বিছানায়, চিনার গাছের দোদুল হাওয়ায় মনের হরিষে নিদ্রা যেতুম না?'

বেয়াড়া মন কিছু কিছু তত্ত্বজ্ঞানেরও সন্ধান রাখে—না হলে বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে এক ঘরে সারাজীবন কাটায় কি করে? ফিস ফিস করে তর্কও জুড়ে দিয়ে বলল, 'মা মেরী ও যীশুর যে গল্প বললে সে হ'ল বাইবেলি কেচ্ছা। মুসলমান শাস্ত্রে আছে, বিবি মরিয়ম (মেরী) খেজুরগাছের তলায় ইসা-মসীহকে প্রসব করেছিলেন।'

বিবেকবুদ্ধি—'সে কি কথা! ডিসেম্বরের শীতে মা মেরী গেলেন গাছতলায়?'

বেয়াড়া মন—'কেন বাপু, তোমার বাইবেলেই তো রয়েছে, প্রভু জন্মগ্রহণ করলে পর দেবদূতেরা সেই সুসমাচার মাঠের মাঝখানে গিয়ে রাখাল ছেলেদের জানালেন। গয়লার ছেলে যদি শীতের রাত মাঠে কাটাতে পারে, তবে ছুতোরের বউই পারবে না কেন, শুনি? তার উপর গর্ভযন্ত্রণা—সর্বাঙ্গে তখন গল গল করে ঘাম ছোটে!'

ধর্ম নিয়ে তর্কাতর্কি আমি আদপেই পছন্দ করিনে। দু'জনকে তুই ধমক দিয়ে চোখ বন্ধ করলুম।

চত্বরের ঠিক মাঝখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত উঁচু একটা প্রহরী শিখর। সেখান থেকে হঠাৎ এক হুঙ্কারধ্বনি নির্গত হয়ে আমার তন্দ্রাভঙ্গ করল। শিখরের চুড়ো থেকে সরাইওয়ালা চেঁচিয়ে বলছিল, 'সরাই যদি রাত্রিকালে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে হে যাত্রীদল, আপন আপন মাল-জান বাঁচাবার জিম্মাদারি তোমাদের নিজের।'

ঐটুকুই বাকি ছিল। সরাইয়ের সব কষ্ট চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিয়েছিলুম ঐ জানটুকু বাঁচাবার আশায়। সরাইওয়ালা সেই জিম্মাদারিটুকুও আমার হাতে ছেড়ে দেওয়ায় যখন আর কোনো ভরসা কোনো দিকে রইল না, তখন আমার মনে এক অদ্ভুত শান্তি আর সাহস দেখা দিল। উর্দুতে বলে, 'নঙ্গেসে খুদাভী ডরতে হ্যায়' অর্থাৎ 'উলঙ্গকে ভগবান পর্যন্ত সমঝে চলেন।' সোজা বাঙলায় প্রবাদটা সামান্য অন্তরূপ নিয়ে অল্প একটু গীতিরসে ভেজা হয়ে বেরিয়েছে, 'সমুদ্রে শয়ন যার শিশিরে কি ভয় তার?'

ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আমার মনে তখন আরও একটা খটকা লাগল। রেডিয়ো-ওয়ালার চোস্ত ফার্সী জানার কথা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ঐ যে সরাইওয়ালা বলল, ' 'মাল-জানের' তদারকি আপন কাঁধে এ কথাটা আমার কানে কেমনতরো নূতন ঠেকলো। সমাসটা কি 'জান-মাল' নয়?'

অন্ধকারে রেডিয়োওয়ালার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই তাঁর কথা অনেকটা বেতারবার্তার মত কানে এসে পৌছল। বললেন, 'ইরানদেশের ফার্সীতে বলে 'জান-মাল', কিন্তু আফগানিস্থানে জান সস্তা, মালের দাম ঢের বেশী। তাই বলে 'মাল-জান'।'

আমি বললুম, 'তাই বোধ করি হবে। ভারতবর্ষেও প্রাণ বেজায় সস্তা—তাই আমরাও বলি, 'ধনে-প্রাণে' মেরো না। 'প্রাণে-ধনে' মেরো না কথাটা কখনো শুনিনি।'

আমাতে বেতারওয়ালাতে তখন একটা ছোটখাটো 'ব্রেন্স্-ট্রাস্ট্' বানিয়ে বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফ্রন্টিয়ারের ওপারে তো শুনেছি জীবন পদে পদে বিশেষ বিপন্ন হয় না। তবে আপনার মুখে এরকম কথা কেন?'

আমি বললুম, 'বুলেট ছাড়া অন্য নানা কায়দায়ও তো মানুষ মরতে পারে। জ্বর আছে, কলেরা আছে, সান্নিপাতিক আছে, আর না খেয়ে মরার রাজকীয় পন্থা তো বারো মাসই খোলা রয়েছে। সে পথ ধরলে দু-দণ্ড জিরোবার তরে সরাই-ই বলুন আর হাসপাতালই বলুন, কোনো কিছুরই বালাই নেই।'

বেতারবাণী হ'ল, 'না খেয়ে মরতে পারাটা তামাম প্রাচ্যভূমির অনবদ্য প্রতিষ্ঠান। একে অজরামর করে রাখার নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার নামান্তর 'হোয়াইট মেনস বার্ডেন'। কিন্তু আফগানরা প্রাচ্যভূমির ছোটজাত বলে নিজের মোট নিজেই বইবার চেষ্টা করে। সাধারণত এই মোট নিয়ে প্রথম কাড়াকাড়ি লাগায় 'ধর্মপ্রাণ' মিশনরীরা, তাই আফগানিস্থানে তাদের ঢোকা কড়া বারণ। কোনো অবস্থাতেই কোনো মিশনরীকে পাসপোর্ট দেওয়া হয় না। মিশনরীর পরে আসে ইংরেজ। তাদেরও আমরা পারতপক্ষে ঢুকতে দিই না—ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের জন্য যে ক'জন ইংরেজের নিতান্ত প্রয়োজন তাদেরি আমরা বড় অনিচ্ছায় বরদাস্ত করেছি।'

এই দুটি খবর আমার কর্ণকুহরে মথি ও মার্ক লিখিত দুই সুসমাচারের ন্যায় মধুসিঞ্চন করল। গুলিস্তান, বোস্তানের খুশবাই হয়ে সকল দুর্গন্ধ মেরে ফেলে আমার চোখে গোলাপী ঘুমের মোলায়েম তন্দ্রা এনে দিল।

'জিন্দাবাদ আফগানিস্থান!'—না হয় থাকলই বা লক্ষ লক্ষ ছারপোকা সে

দেশের চারপাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে জিন্দা হয়ে।

দশ

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল আজান শুনে। নমাজ পড়ালেন বুখারার এক পুস্তিন সদাগর। উৎকৃষ্ট আরবী উচ্চারণ শুনে বিস্ময় মানলুম যে তুর্কীস্থানে এত ভালো উচ্চারণ টিকে রইল কি করে। বেতারওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, 'আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন না।' আমি বললুম, 'কিছু যদি মনে করেন?' আমার এই সঙ্কোচে তিনি এত আশ্চর্য হলেন যে বুঝতে পারলুম, খাস প্রাচ্য দেশে অচেনা অজানা লোককে যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধা নেই। পরে জানলুম, যার সম্বন্ধে কৌতূহল দেখানো হয় সে তাতে বরঞ্চ খুশীই হয়।

মোটরে বসে তারি খেই তুলে নিয়ে আগের রাতের অভিজ্ঞতার জমাখরচা নিতে লাগলুম।

গ্রেট ইস্টার্ন পান্থশালা, আফগান সরাইও পান্থশালা। সরাইয়ের আরাম-ব্যারাম তো দেখা হল—গ্রেট ইস্টার্ন, গ্র্যাণ্ডেরও খবর কিছু কিছু জানা আছে।

মার্ক্‌স্‌ না পড়েও চোখে পড়ে যে সরাই গরীব, হোটেল ধনী। কিন্তু প্রশ্ন তাই দিয়ে কি সব পার্থক্যের অর্থ করা যায়? সরাইয়েও জন আষ্টেক এমন সদাগর ছিলেন যাঁরা অনায়াসে গ্রেট ইস্টার্নের স্যুইট নিতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপচারি হয়েছে। গ্রেট ইস্টার্নের বড়সায়েবদেরও কিছু কিছু চিনি।

কিন্তু আচারব্যবহারে কী ভয়ঙ্কর তফাত। এই আটজন ধনী সদাগর ইচ্ছে করলেই একত্র হয়ে উত্তম খানাপিনা করে জুয়োয় দু'শ' চারশ' টাকা এদিক ওদিকে ছড়িয়ে দিয়ে রাত কাটাতে পারতেন। চাকরবাকর সন্ত্রস্ত হয়ে হুজুরদের হুকুম তামিল করত—সরাইয়ের ভিখিরি ফকিরদের তো ঠেকিয়ে রাখতই, সাধু-সজ্জনদের সঙ্গেও এঁদের কোনো যোগাযোগ হত না।

পৃথক হয়ে আপন আপন দ্বিরদরদস্তম্ভে এঁরা তো বসে থাকলেনই না—আটজনে মিলে 'খানদানী' গোঠও এঁরা পাকালেন না। নিজ নিজ পণ্যবাহিনীর ধনী গরীব আর পাঁচজনের সঙ্গে এঁদের দহরম-মহরম আগের থেকে তো ছিলই, তার উপরে সরাইয়ে আসন পেতে জিরিয়েজুরিয়ে নেওয়ার পর তাঁরা আরো পাঁচজনের তত্ত্বতাবাশ করতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে হরেক রকমের আড্ডা জমে উঠল; ধনী গরীবের পার্থক্য জামা কাপড়ে টিকে থাকল বটে কিন্তু কথাবার্তায় সে সব তফাত রইল না। দু-চারটে মোসাহেব 'ইয়েস্‌মেন' ছিল

সন্দেহ নেই, তা সে গরীব আড্ডা-সর্দারেরও থাকে। ব্যবসাবাণিজ্য, তত্ত্বকথা, দেশ-বিদেশের রাস্তাঘাট-গিরিসঙ্কট, ইংরেজ-রুশের মন-কষাকষি, পাগলা উট কামড়ালে তার দাওয়াই, সর্দারজীর মাথার ছিট, সব জিনিস নিয়েই আলোচনা হল। গরীব ধনী সকলেরই সকল রকম সমস্যা আড্ডার দয়ে মজে কথনো ডুবল কখনো ভাসল; কিন্তু বাকচতুর গরীবও ধনীর পোলাও-কালিয়ার আশায় বেশরম বাঁদরনাচ নাচল না।

ঝগড়া-কাজিয়াও আড্ডার চোখের সামনের চাতালে হচ্ছে। কথাবার্তার খোঁচাখুঁচিতে যতক্ষণ উভয়পক্ষ সন্তুষ্ট ততক্ষণ আড্ডা সে সব দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, কিন্তু মারামারির পূর্বাভাস দেখা দিলেই কেউ-না-কেউ মধ্যস্থ হয়ে বখেড়া ফৈসালা করে দেয়। মনে পড়ল বায়স্কোপের ছবি: সেখানে দুই সায়েবে ঝগড়া লাগে, আর পাঁচজন হটে গিয়ে জায়গা করে দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ায়। দুই সায়েব তখন কোট খুলে ছুঁড়ে ফেলেন, আর সক্কলের দয়ার শরীর, কোটটাকে ধুলোয় গড়াতে দেন না, লুফে নেন। তারপর শুরু হয় ঘুষোঘুষি রক্তারক্তি। পাঁচজন বিনা টিকিটে তামাসা দেখে আর সমস্ত বর্বরতাটাকে 'অন্য লোকের নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার' নাম দিয়ে ক্ষীণ বিবেকদংশনে প্রলেপ লাগায়।

সরাইয়ে কারো কোনো নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নেই। তাই পার্সোনাল ইডিয়সিংক্রেসি বা খেয়ালখুশীর ছিট নিয়ে কেউ সরাইয়ে আশ্রয় নেয় না। অথবা বলতে পারেন, সক্কলেই যে যার খুশীমত কাজ করে যাচ্ছে, আপনি আপত্তি জানাতে পারবেন না, আর আপনি আপনার পছন্দমত যা খুশী করে যাবেন, কেউ বাধা দেবে না। হাতাহাতি না হলেই হল।

তাতে করে ভালো মন্দ দুই-ই হয়। একদিকে যেমন গরম, ধুলো, তৃষ্ণা সত্ত্বেও মানুষ একে অন্যকে প্রচুর বরদাস্ত করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি সকলেই সরাইয়ের কুঠরি-চত্বর নির্মমভাবে নোংরা করে।

একদিকে নিবিড় সামাজিক জীবনযাত্রা, অন্যদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিকাশ। অর্থাৎ 'কমুনিটি সেন্স' আছে কিন্তু 'সিভিক সেন্স' নেই।

ভাবতে ভাবতে দেখি সরাইয়ে এক রাত্রি বাস করেই আমি আফগান তুর্কোমান সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছি। হুঁশিয়ার হয়ে ভিতরের দিকে তাকানো বন্ধ করলুম। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়েই দেখব আর কি? সেই আগের দিনকার জনপদ বা জনশূন্য শিলাপর্বত।

সর্দারজীকে বললুম, 'রাত্তিরে যখন গা বিড়োচ্ছিল তখন একটু সুপুরি পেলে বড় উপকার হত। কিন্তু সরাইয়ে পানের দোকান তো দেখলুম না।'

সর্দারজী বললেন, 'পান কোথায় পাবেন, বাবুসায়েব? পেশাওয়ারেই শেষ পানের দোকান। তার পশ্চিমে আফগানিস্থান, ইরান, ইরাকের কোথাও পান দেখিনি—পল্টনে ড্রাইভারি করার সময় এসব দেশ আমার ঘোরা হয়ে গিয়েছে। পাঠানও তো পান খায় না। পেশাওয়ারের পানের দোকানের গ্রাহক সব পাঞ্জাবী।'

তাই তো। মনে পড়ল, কলুটোলা জাকারিয়া স্ট্রীটে হোটেলের গাড়ি-বারান্দার বেঞ্চে বসে কাবুলীরা শহর রাঙা করে না বটে। আরো মনে পড়ল, দক্ষিণ-ভারতে বর্মা মালয়ে এমন কি খাসিয়া পাহাড়েও প্রচুর পান খাওয়া হয়—যদিও এদের কেউই কাশী-লক্ষ্ণৌয়ের মত তরিবৎ করে জিনিসটার রস উপভোগ করতে জানে না। তবে কি পান অনার্য জিনিস? 'পান' কথাটা তো আর্য—'কর্ণ' থেকে 'কান', 'পর্ণ' থেকে 'পান'। তবে 'সুপারি'? উঁহু, কথাটা তো সংস্কৃত নয়। লক্ষ্ণৌয়ে বলে 'ডলি' অথবা 'ছালিয়া'—সেগুলোও তো সংস্কৃত থেকে আসেনি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে 'গুয়া' কথাটার 'গুবাক' না 'গূবাক' কি একটা সংস্কৃত রূপ আছে না? কিন্তু তাহলেও তো কোনো কিছুর সমাধান হয় না, কারণ পাঞ্জাব দোয়াব এসব উন্নাসিক আর্যভূমি ত্যাগ করে খাঁটি গুবাক হঠাৎ পূর্ববঙ্গে গিয়ে গাছের ডগায় আশ্রয় নেবেন কেন? আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের সব মাঙ্গলিকেই সুপারির প্রয়োজন হয়, কিন্তু গৃহ্যসূত্রের ফিরিস্তিতে গুবাক—গুবাক? নাঃ। মনে তো পড়ে না। তবে কি এ নিতান্তই অনার্যজনসুলভ সামগ্রী? পূর্বপ্রাচ্য থেকে উজিয়ে উজিয়ে পেশাওয়ার অবধি পৌঁচেছে? সাধে বলি, ভারতবর্ষ তাবৎ প্রাচ্য সভ্যতার মিলনভূমি।

ডিমোক্রেসি ডিমোক্রেসি জিগির তুলে বড্ড বেশী চেঁচামেচি করাতে দক্ষিণ-ভারতের এক সাধক বলেছিলেন, 'তাহলে সবাই ঘুমিয়ে পড়। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষে মানুষে ভেদ থাকে না, সবাই সমান।' সেই গরমে বসে বসে তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করলুম। ঝাঁকুনি, ধুলো, কঠিন আসন, ক্ষুধাতৃষ্ণা সত্ত্বেও বেতারকর্তা ও আমার দুজনেরই ঘুম পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাঁর মাথা আমার কাঁধে ঢলে পড়ছিল, আমি তখন শক্ত হয়ে বসে তাঁর ঘুমে তা দিচ্ছিলুম। তারপর হঠাৎ একটা জোর ঝাঁকুনি খেয়ে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে তিনি আমার কাছে মাফ চেয়ে শক্ত হয়ে বসেছিলেন। তখন আমার পালা। শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভদ্রতার বেড়া ভেঙে আমার মাথা তাঁর কাঁধে জিরিয়ে নিচ্ছিল।

চোখ বন্ধ অবস্থায়ই ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রথম পরশ পেলুম; খুলে দেখি সামনে সবুজ উপত্যকা—রাস্তার দুদিকে ফসল ক্ষেত। সর্দারজী পরিচয় করিয়ে দিয়ে

বললেন, 'জলালাবাদ।'

দক্কার পাশেই সেই কাবুল নদীর কৃপায় এই জলালাবাদ শস্যশপশ্যামল। এখানে জমি বোধ হয় দক্কার মত পাথরে ভর্তি নয় বলে উপত্যকা রীতিমত চওড়া —একটু নিচু জমিতে বাস্ নামার পর আর তার প্রসারের আন্দাজ করা যায় না। তখন দুদিকেই সবুজ, আর লোকজনের ঘরবাড়ি। সামান্য একটি নদী ক্ষুদ্রতম সুযোগ পেলে যে কি মোহন সবুজের লীলাখেলা দেখাতে পারে জলালাবাদে তার অতি মধুর তসবির। এমন কি যে দুটো-চারটে পাঠান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের চেহারাও যেন সীমান্তের পাঠানের চেয়ে মোলায়েম বলে মনে হল। লক্ষ্য করলুম, যে পাঠান শহরে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের 'বেপর্দামি'র নিন্দা করে, তারি বউ-ঝি ক্ষেতে কাজ করছে অন্য দেশের মেয়েদেরই মত। মুখ তুলে বাসের দিকে তাকাতেও তাদের আপত্তি নেই। বেতারকর্তাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আমার যতদূর জানা, কোনো দেশের গরীব মেয়েই পর্দা মানে না, অন্ততঃ আপন গাঁয়ে মানে না। শহরে গিয়ে মধ্যবিত্তের অনুকরণে কখনো পর্দা মেনে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টা করে, কখনো কাজ-কর্মের অসুবিধা হয় বলে গাঁয়ের রেওয়াজই বজায় রাখে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আরবের বেদুইন মেয়েরা?'

তিনি বললেন, 'আমি ইরাকে তাদের বিনা পর্দায় ছাগল চরাতে দেখেছি।'

থাক্ উপস্থিত এ সব আলোচনা। গোটা দেশটা প্রথম দেখে নিই, তারপর রীতি-রেওয়াজ ভালো-মন্দের বিচার করা যাবে।

গাড়ি সদর রাস্তা ছেড়ে জলালাবাদ শহরে ঢুকল। কাবুলীরা সব বাসের পেট থেকে বেরিয়ে এক মিনিটের ভিতর অন্তর্ধান। কেউ একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না, বাস ফের ছাড়বে কখন। আমার তো এই প্রথম যাত্রা, তাই সর্দারজীকে শুধালুম, 'বাস্ আবার ছাড়বে কখন?' সর্দারজী বললেন, 'আবার যখন সবাই জড়ো হবে।' জিজ্ঞেস করলুম, 'সে কবে?' সর্দারজী যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি তার কি জানি? সবাই খেয়েদেয়ে ফিরে আসবে যখন তখন।'

বেতারকর্তা বললেন, 'ঠায় দাঁড়িয়ে করছেন কি? আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি শুধালুম, 'আর সব গেল কোথায়? ফিরবেই বা কখন?'

তিনি বললেন, 'ওদের জন্য আপনি এত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন কেন? আপনি তো ওদের মালজানের জিম্মাদার নন।'

আমি বললুম, 'তা তো নই-ই। কিন্তু যেরকম ভাবে হুট্ করে সবাই নিরুদ্দেশ

হল তাতে তো মনে হল না যে ওরা শিগগির ফিরবে। আজ সন্ধ্যায় তা হলে কাবুল পৌঁছব কি করে?'

বেতারকর্তা বললেন, 'সে আশা শিকেয় তুলে রাখুন। এদের তো কাবুল পৌঁছবার কোনো তাড়া নেই। বাস্ যখন ছিল না, তখন ওরা কাবুল পৌঁছত পনেরো দিনে, এখন চার দিন লাগলেও তাদের আপত্তি নেই। ওরা খুশী, ওদের হেঁটে যেতে হচ্ছে না, মালপত্র তদারক করে গাধা-খচ্চরের পিঠে চাপাতে-নামাতে হচ্ছে না, তাদের জন্য বিচুলির সন্ধান করতে হচ্ছে না। জলালাবাদে পৌঁচেছে, এখানে সক্কলেরই কাকা-মামা-শালা, কেউ না কেউ আছে, তাদের তত্ত্বতাবাশ করবে, খাবেদাবে, তারপর ফিরে আসবে।'

আমি চুপ করে গেলুম। দক্কাতে অফিসারকে বলেছিলুম, 'আর পাঁচজনের যা গতি আমারও তাই হবে,' এখন বুঝতে পারলুম সব মানুষই কিছু-না-কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। তফাৎ শুধু এইটুকু কেউ করে জেনে, কেউ না জেনে।

আফগানিস্থানের বড় শহর পাঁচটি। কাবুল, হিরাত, গজনী, জলালাবাদ, কান্দাহার। জলালাবাদ আফগানিস্থানের শীতকালের রাজধানী। তাই এখানে রাজপ্রাসাদ আছে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য খাস পান্থনিবাস আছে।

বেতারবাণী যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু উপস্থিত জলালাবাদের বাজার দেখে আফগানিস্থানের অন্যতম প্রধান নগর সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পেলুম না। সেই নোংরা মাটির দেয়াল, অত্যন্ত গরীব দোকানপাট—সস্তা জাপানী মালে ভর্তি—বিস্তর চায়ের দোকান, আর অসংখ্য মাছি। হিমালয়ের চটিতে মানুষ যে রকম মাছি সম্বন্ধে নির্বিকার, এখানেও ঠিক তাই।

হঠাৎ আখ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। চৌকো চৌকো করে কেটে দোকানের সামনে সাজিয়ে রেখেছে এবং তার উপরে দুনিয়ার সব মাছি বসাতে চেহারাটা চালে-তিলের মত হয়ে গিয়েছে। ঘির্নাপিত ঝেড়ে ফেলে কিনলুম এবং খেয়ে দেখলুম, দেশের আখের চেয়েও মিষ্টি। সাধে কি বাবুর বাদশা এই আখ খেয়ে খুশী হয়ে তার নমুনা বদখশান-বুখারায় পাঠিয়েছিলেন! তারপর দেখি, নোনা ফুটি শশা তরমুজ। ঘন সবুজ আর সোনালী হলদেতে ফলের দোকানে রঙের অপূর্ব খোলতাই হয়েছে—খুশবাই চতুর্দিক মাত করে রেখেছে। দরদস্তুর না করে কিনলেও ঠকবার ভয় নেই। রপ্তানি করার সুবিধে নেই বলে সব ফলই বেজায় সস্তা। বেতারবার্তা জ্ঞান বিতরণ করে বললেন, 'যারা সত্যিকার ফলের

রসিক তারা এখানে সমস্ত গ্রীষ্মকালটা ফল খেয়েই কাটায় আর যারা পাঁড় মেওয়া-খোর তারা শীতকালেও কিসমিস আখরোট পেস্তা বাদামের উপর নির্ভর করে। মাঝে মাঝে রুটি-পনির আর ক্বচিৎ কখনো একটুকরো মাংস। এরাই সব চাইতে দীর্ঘজীবী হয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এদের গায়ে বুলেট লাগেনি বুঝি? জলালাবাদের ফল তা হলে মন্ত্রপূত বলতে হয়।'

বেতারবার্তা বললেন, 'জলালাবাদের লোক গুলী খেতে যাবে কেন? তারা শহরে থাকে, আইনকানুন মানে, হানাহানির কিবা জানে?'

কিন্তু জলালাবাদের যথার্থ মাহাত্ম্য শহরের বাইরে। আপনি যদি ভূবিদ্যার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে চান তবে কিঞ্চিৎ খোঁড়াখুঁড়ি করলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আপনি যদি নৃতত্ত্বের অনুসন্ধান করতে চান তবে চারিদিকের নানা-প্রকারের অনুন্নত উপজাতি আপনাকে দেদার মালমশলা যোগাড় করে দেবে। যদি মার্কস্‌বাদের প্রাচ্যদেশীয় পটভূমি তৈরী করতে চান তবে মাত্র এঙেল্‌সের 'অরিজিন অব দি ফ্যামিলি'খানা সঙ্গে নিয়ে আসুন, বাদবাকি সব এখানে পাবেন—জলালাবাদের গ্রামাঞ্চলে পরিবার-পত্তনের ভিৎ, আর একশ' মাইল দূরে কাবুলে রাষ্ট্রনির্মাণের গম্বুজশিখর বিরাজমান। যদি ঐতিহাসিক হন তবে গান্ধারী, সিকন্দর, বাবুর, নাদিরের বিজয় অভিযান বর্ণনার কতটা খাঁটি কতটা ঝুটা নিজের হাতে যাচাই করে নিতে পারবেন। যদি ভূগোল অর্থনীতির সমন্বয় প্রমাণ করতে চান যে তিন ফোঁটা নদীর জল কি করে নব নব মন্বন্তরের কারণ হতে পারে, তাহলে জলালাবাদে আস্তানা গেড়ে কাবুল নদীর উজান ভাঁটা করুন। আর যদি গ্রীক-ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রয়াগভূমির অনুসন্ধান করেন তবে তার রঙ্গ-ভূমি তো জলালাবাদের কয়েক মাইল দূরে হাদ্দা গ্রামে। ধ্যানী বুদ্ধ, কঙ্কাল-সার বুদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ—যত রকমের মূর্তি চান, গান্ধার-শৈলীর যত উদাহরণ চান সব উপস্থিত। মাটির উপরে কিঞ্চিৎ, ভিতরে প্রচুর। টিপিটাপা দেখামাত্র অজ্ঞ লোকেও বলতে পারে।

আর যদি আপনি পাণ্ডিত্যের বাজারে সত্যিকার দাঁও মারতে চান, তবে দেখুন সিন্ধুর পারে মোন্-জো-দড়ো বেরল, ইউফ্রেটিস টাইগ্রিসের পারে আসিরীয় বেবিলনীয় সভ্যতা বেরল, নীলের পারে মিশরীয় সভ্যতা বেরল—এর সব ক'টাই পৃথিবীর প্রাকআর্য প্রাচীন সভ্যতা। শুনতে পাই, নর্মদার পারে ঐরকম একটা দাঁও মারার জন্য একপাল পণ্ডিত মাথায় গামছা বেঁধে শাবল নিয়ে লেগে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে বাজার কোণঠাসা করতে পারবেন না, উল্টে দেউলে

হবার সম্ভাবনাই বেশী। আর যদি নিতান্তই বরাতজোরে কিছু একটা পেয়ে যান তবে হবেন না হয় রাখাল বাঁড়ুজ্যে। একপাল মার্শাল উড়োউড়ি করছে, ছোঁ মেরে আপনারি কাঁচামাল বিলেত নিয়ে গিয়ে তিনভলুম চামড়ায় বেঁধে আপনারি মাথায় ছুঁড়ে মারবে। শোনেননি, গুণী বলেছেন, 'একবার ঠকলে ঠকের দোষ, দুবার ঠকলে তোমার দোষ।' তাই বলি, জলালাবাদ যান, মোন্-জো-দড়োর কনিষ্ঠ ভ্রাতার উদ্ধার করুন, তাতে ভারতের গর্ব বারো আনা, আফগানিস্থানের চার আনা। বিশেষতঃ যখন আফগানিস্থানে কাক চিল নেই—আপনার মেহন্নতের মাল নিয়ে তারা চুরিচামারি করবে না।

জানি, পণ্ডিত মাত্রই সন্দেহপিশাচ। আপনিও বলবেন, 'না হয় মানলুম, জলালাবাদের জমির শুধু উপরেই নয়, নিচেও বিস্তর সোনার ফসল ফলে আছে, কিন্তু প্রশ্ন, চতুর্দিক থেকে অ্যাদ্দিন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুলির পাল সেখানে ঝামেলা লাগায়নি কেন?'

তার কারণ তো বেতারবাণী বহু পূর্বেই বলে দিয়েছেন। ইংরেজ এবং অন্য হরেক রকম সাদা বুলবুলিকে আফগান পছন্দ করে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাণ্ডিত্যাম্বরে উপস্থিত যে কয়টি পক্ষী উড্ডীয়মান, তাদের সর্বাঙ্গে শ্বেতকুষ্ঠ, এখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আপনার রঙ দিব্য বাদামী, আপনি প্রতিবেশী, আফগান আপনাকে বহু শতাব্দী ধরে চেনে—আপনি না হয় তাকে ভুলে গিয়েছেন, আপনারি জাতভাই বহু ভারতীয় এখনো আফগানিস্থানে ছোটখাটো নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি এমন কি বসবাসও করে, আপনাকে আনাচেকানাচে ঘুরতে দেখলে কাবুলীওয়ালা আর যা করে করুক, আঁৎকে উঠে কোঁৎকা খুঁজবে না।

তবু শুনবেন না? সাধে বলি, সব কিছু পণ্ড না হলে পণ্ডিত হয় না!

এগারো

মোটর ছাড়ল অনেক বেলায়। কাজেই বেলাবেলি কাবুল পৌঁছবার আর কোনো ভরসাই রইল না।

পেশাওয়ার থেকে জলালাবাদ একশ' মাইল, জলালাবাদ থেকে কাবুল আরো একশ' মাইল। শাস্ত্রে লেখে সকালে পেশাওয়ার ছেড়ে সন্ধ্যায় জলালাবাদ পৌঁছবে। পরদিন ভোরবেলা জলালাবাদ ছেড়ে সন্ধ্যায় কাবুল। তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, শাস্ত্র মানে অল্প লোকেই। পরে জানলুম একমাত্র মেল বাস্ ছাড়া আর কেউ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বেগে চলে না।

জলালাবাদের আশেপাশে গাঁয়ের ছেলেরা রাস্তায় খেলাধুলো করছে। তারি এক খেলা মোটরের জন্য রাস্তায় গোলকধাঁধা বানিয়ে দেওয়া। কায়দাটা নূতন। কাবুলীরা যে আগুার মত শক্ত টুপির চতুর্দিকে পাগড়ি জড়ায়, ছোঁড়ারা সেই টুপি এমনভাবে রাস্তায় সাজিয়ে রাখে যে হুঁশিয়ার হয়ে গাড়ি না চালালে দুটো-চারটে থেঁৎলে দেবার সম্ভাবনা। দূর থেকে সেগুলো দেখতে পেলেই সর্দারজী দাড়িগোঁফের ভিতরে বিড়বিড় করে কি একটা গালাগাল দিয়ে মোটরের বেগ কমান। কয়েকবার এ রকম লক্ষ্য করার পর বললুম, 'দিন না দুটো-চারটে থেঁৎলে। ছোঁড়াদের তাহলে আক্কেল হয়।' সর্দারজী বললেন, 'খুদা পনাহ্। এমন কর্ম করতে নেই। আর টায়ার ফাঁসাতে চাইনে।' আমি বুঝতে না পেরে বললুম, 'সে কি কথা, এই টুপিগুলো আপনার টায়ার ছ্যাঁদা করে দেবে?' তিনি বললেন, 'আপনি খেলাটার আসল মর্মই ধরতে পারেননি। টুপির ভিতরে রয়েছে মাটিতে শক্ত করে পোঁতা লম্বা লোহা। যদি টুপি বাঁচিয়ে চলি তবে গাড়ি বাঁচানো হল, যদি টুপি থেঁৎলাই, তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়েও কুড়োল মারা হল।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ ছোকরারা মোটরওয়ালাদের শেখাতে চায়, 'পরের অপকার করিলে নিজের অপকার হয়'।'

সর্দারজী বললেন, 'ওঃ, আপনার কি পরিষ্কার মাথা!'

বেতারবাণী বললেন, 'কিন্তু প্রশ্ন, এই মহান শিক্ষা এল কোথা হতে?'

আমি নিবেদন করলুম, 'আপনিই বলুন।'

তিনি বললেন, 'ছোঁড়াদের খেলাতে রয়েছে, বৌদ্ধধর্মের মহান আদর্শের ভগ্নাবশেষ। জানেন, এককালে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচুর প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল।'

আমি বললুম, 'তাই তো শুনেছি।'

তিনি বললেন, 'শুনেছি মানে? একটুখানি ডাইনে হটলেই পৌঁছবেন হাদ্দায়। সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন কত বৌদ্ধমূর্তি বেরিয়েছে মাটির তলা থেকে। আপনি কি ভাবছেন, সে আমলের লোক নানা রকম মূর্তি জড়ো করে যাদুঘর বানাত?'

এ যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন, 'কণিষ্কের আমলে গান্ধারবাসীরা যাদুঘর নির্মাণ করিত কি না?'

ফেল মারলুম। কিন্তু বাঙালী আর কিছু পারুক না-পারুক, বাজে তর্কে খুব মজবুত। বললুম, 'কিন্তু কাল রাত্রে সরাইয়ে নিজের 'জান-মাল',—থুড়ি, 'মাল-

জান' সম্বন্ধে যে সতর্কতার হুঙ্কার শুনতে পেলুম তা থেকে তো মনে হ'ল না প্রভু তথাগতের সাম্যমৈত্রীর বাণী শুনছি।'

বেতারবার্তা বললেন, 'ঠিক ধরেছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে অহিংস শিশুশাবক ও স্ত্রীলোকের ধর্ম। পূর্ণবয়স্ক, প্রাণবন্ত দুর্ধর্ষ পুরুষের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম।'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।'

সর্দারজী খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'আমি তো গ্রন্থসাহেব মানি কিন্তু একথা বার বার স্বীকার করব যে, এই আধা-ইনসান পাঠান জাতকে কেউ যদি ধর্মের পথে নিয়ে যেতে পারে তবে সে ইসলাম।'

আমি তো ভয় পেয়ে গেলুম। এইবার লাগে বুঝি। 'আধা-ইনসান' অর্থাৎ 'অর্ধ-মনুষ্য' বললে কার রক্ত গরম না হয়। কিন্তু বেতারবাণী অত্যন্ত সৌম্য বৌদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'আপনি বিদেশী এবং আমাদের সকলের চেয়ে বেশী লোক-জনের সংস্রবে এসেছেন, তার উপর আপনি বয়সে প্রবীণ। আপনার এই মত শুনে ভারী খুশী হলুম।'

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কৌতূহল দমন করতে না পেরে গাড়ির ঝড়ঝড়ানির সঙ্গে গলা মিলিয়ে সর্দারজীকে আস্তে আস্তে উর্দুতে শুধালুম, 'এ কি কাণ্ড? আপনি এঁর জাত তুলে এঁকে আধা-ইনসান বললেন আর ইনি খুশী হয়ে আপনাকে তসলীম করলেন!'

সর্দারজী আরো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ইনি চটবেন কেন? ইনি তো কাবুলী।'

আমি আরো সাত হাত জলে। ফের শুধালুম, 'কাবুলী পাঠান নয়?'

সর্দারজী তখন আমার অজ্ঞতা ধরতে পেরে বুঝিয়ে বললেন, 'আফগানিস্থানের অধিবাসী পাঠান। কিন্তু খাস কাবুলের লোক ইরান দেশ থেকে এসে সেখানে বাড়িঘরদোর বেঁধে শহর জমিয়েছে। তাদের মাতৃভাষা ফার্সী। পাঠানের মাতৃভাষা পশতু। বেতারের সায়েব পশতু ভাষার এক বর্ণও বোঝেন না।

আমি বললুম, 'তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু কলকাতার কাবুলীওয়ালারা তো ফার্সী বোঝে না।'

'তার কারণ কলকাতার কাবুলীরা কাবুলের লোক নয়। তারা সীমান্ত, খাইবার, বড় জোর চমন কান্দাহারের বাসিন্দা। খাস কাবুলী পারতপক্ষে কাবুল শহরের সীমানার বাইরে যায় না। যে দু'দশজন যায় তারা সদাগর। তাদেরও পাল্লা ঐ পেশাওয়ার অবধি।'

এত জ্ঞান দান করেও সর্দারজীর আশ মিটল না। আমাকে শুধালেন, 'আপনি 'কাবুলীওয়ালা', 'কাবুলীওয়ালা' বলেন কেন? কাবুলের লোক হয় হবে 'কাবুলী', নয় 'কাবুলওয়ালা' 'কাবুলীওয়ালা' হয় কি করে?'

হকচকিয়ে গেলুম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কাবুলীওয়ালা'। গুরুকে বাঁচাই কি করে? আর বাঁচাতে তো হবেই, কারণ—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥

সামলে নিয়ে বললুম, 'এই আপনি যে রকম 'জওয়াহিরাত' বলেন। 'জওহর হল এক বচন; 'জওয়াহির' বহুবচন। 'জওয়াহিরে' ফের 'আত' লাগিয়ে আরো বহুবচন হয় কি প্রকারে?'

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কিন্তু মাছ দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কি না সে প্রশ্ন অন্য যে কোনো দেশে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিন্তু পাঠানমুল্লুকের আইন, এক খুনের বদলে আরেক খুন। তাই সেযাত্রা সর্দারজীর সামনে ইজ্জত বজায় রেখে ফাঁড়া কাটাতে পারলুম।

অবশ্য দরকার ছিল না। সর্দারজী তখন মোড় নিতে ব্যস্ত। আমি ভাবলুম, ম্যাপে দেখেছি জলালাবাদ থেকে কাবুল সোজা নাকবরাবর রাস্তা—গাড়ি আবার মোড় নিচ্ছে কেন?

বেতারবাণী হল, 'সেই ভালো, আজ যখন কিছুতেই কাবুল পৌঁছনো যাবে না, তখন নিমলার বাগানেই রাত কাটানো যাক।'

দূরে থেকেই সারি সারি চিনার গাছ চোখে পড়ল। সুপারির চেয়ে উঁচু—সোজা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। বুক অবধি ডালপাতা নেই, বাকিটুকু মসৃণ ঘন পল্লবে আন্দোলিত। আমাদের বাঁশপাতার সঙ্গে কচি অশথপাতার সৌন্দর্য মিলিয়ে দিয়ে দীর্ঘ বিনুনির মত যদি কোনো পল্লবের কল্পনা করা যায় তবে তাই হয় চিনারের পাতা। কিন্তু তার দেহটির সঙ্গে অন্য কোনো গাছের তুলনা হয় না। ইরানী কবিরা উচ্ছ্বসিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তম্বঙ্গী তরুণীর রূপভঙ্গিমা রাগরঙ্গিমার সঙ্গে চিনারের দেহসৌষ্ঠবের তুলনা করে এখনো তৃপ্ত হননি। মৃদুমন্দ বাতাসে চিনার যখন তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধীরে মন্থরে আন্দোলিত করে, তখন রসকষহীন পাঠান পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে বারে বারে তার দিকে তাকায়। সুপারির দোলের সঙ্গে এর খানিকটা মিল আছে কিন্তু সুপারির রঙ শ্যামলিমাহীন কর্কশ, আর সমস্তক্ষণ ভয় হয়, এই বুঝি ভেঙে পড়ল।

মনে হয়, মানুষ ছাড়া অন্য যে-কোনো প্রাণী চিনারের দেহচ্ছন্দকে তরুণীর

চেয়ে মধুর বলে স্বীকার করবে।

বেতারওয়ালা ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোনো খবরই রাখেন না। সর্দারজীর কাছ থেকে বেশী আশা করাও অন্যায়, কিন্তু তিনিই বললেন নিমলার বাগান আর তাজমহলের বাগান নাকি একই সময়কার। নিমলার বাগানে যে প্রাসাদ ছিল, সেটি অভিযান আক্রমণ সহ্য না করতে পেরে অদৃশ্য হয়েছে কিন্তু সারিবাঁধানো রমণীয় চিনারগুলো নাকি শাহজাহানের হুকুমে পোতা। সর্দারজীর ঐতিহাসিক সত্যতা এখানে অবশ্য উদ্ভিদবিদ্যা দিয়ে পরখ করে নেবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এই অজানা অচেনা দেশে শাহজাহানের তৈরী তাজের কনিষ্ঠ উদ্যানে ঢুকছি কল্পনা করাতে যে সুখ, উদ্ভিদতত্ত্বের মোহমুদ্গর দিয়ে সে মায়াজাল ছিন্ন করে কি এমন চরম মোক্ষলাভ! বাগানে আর এমন কিছু চারুশিল্পও নেই যার কৃতিত্ব শাহজাহানকে দিয়ে দিলে অন্য কারো ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে। আর এ কথাও তো সত্য যে, শাহজাহানের আসন উঁচু করার জন্য নিমলার বাগানের প্রয়োজন হয় না —এক তাজই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

তবু স্বীকার করতে হবে, অতি অল্প আয়াসের মধ্যে উদ্যানটি প্রাণাভিরাম। চিনারের সারি, জল দিয়ে বাগান তাজা রাখবার জন্য মাঝখানে নালা আর অসংখ্য নরগিস্ ফুলের চারা। নরগিস্ ফুল দেখতে অনেকটা রজনীগন্ধার মত, চারা হুবহু একই রকম অর্থাৎ ট্যুব্‌রোজ জাতীয়। গ্রীক দেবতা নারসিসাস্ নাকি আপন রূপে মুগ্ধ হয়ে সমস্ত দিন নদীর জলে আপন চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। দেবতারা বিরক্ত হয়ে শেষটায় তাঁকে নদীর পারের ফুলগাছে পরিবর্তিত করে দিলেন। এখনো নারসিসাস্ ফুল—ফার্সীতে নরগিস্—ঠিক তেমনি নদীর জলে আপন ছায়ার দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যা কাটল নালার পারে, নরগিস্ বনের এক পাশে, চিনার মর্মরের মাঝখানে। সূর্যাস্তের শেষ আভাটুকু চিনার-পল্লব থেকে মুছে যাওয়ার পর ডাক-বাঙলোর খানসামা আহার দিয়ে গেল। খেয়েদেয়ে সেখানেই চারপাই আনিয়ে শুয়ে পড়লুম।

শেষরাত্রে ঘুম ভাঙল অপূর্ব মাধুরীর মাঝখানে। হঠাৎ শুনি নিতান্ত কানের পাশে জলের কুলুকুলু শব্দ আর আমার সর্বদেহ জড়িয়ে, নাকমুখ ছাপিয়ে কোন্ অজানা সৌরভ সুন্দরীর মধুর নিশ্বাস।

শেষরাত্রে নৌকা যখন বিল ছেড়ে নদীতে নামে তখন যেমন নদীর কুলকুল শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, জানলার পাশে শিউলি গাছ থাকলে শরতের অতি ভোরে যে রকম তন্দ্রা টুটে যায়, এখানে তাই হল কিন্তু দুয়ে মিলে গিয়ে। এ সঙ্গীত

বহুবার শুনেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এহেন সৌরভসোহাগ জীবনে আর কখনো পাইনি।

সেই আধা-আলো-অন্ধকারে চেয়ে দেখি দিনের বেলার শুকনো নালা জলে ভরে গিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে নরগিসের পা ধুয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। বুঝলুম নালার উজানে দিনের বেলায় বাঁধ দিয়ে জল বন্ধ করা হয়েছিল—ভোরের আজানের সময় নিমলার বাগানের পালা; বাঁধ খুলে দিতেই নালা ছাপিয়ে জল ছুটেছে—তারি পরশে নরগিস্ নয়ন মেলে তাকিয়েছে। এর গান ওর সৌরভে মিশে গিয়েছে।

আর যে-চিনারের পদপ্রান্তে উভয়ের সঙ্গীতসৌরভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, সে তার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রভাতসূর্যের প্রথম রশ্মির নবীন অভিষেকের জন্য। দেখতে-না-দেখতে চিনার সোনার মুকুট পরে নিল—পদপ্রান্তে পুষ্পবনের গন্ধধূপে বৈতালিক মুখরিত হয়ে উঠল।

'এদিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার,
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার?'

বারো

ভোরের নমাজ শেষ হতেই সর্দারজী ভেঁপু বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভাবগতিক দেখে মনে হল তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন, আজ সন্ধ্যেয় যে করেই হোক কাবুল পৌঁছবেন।

বেতার-সায়েবের দিলও খুব চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সর্দারজীর সঙ্গে নানা রকম গল্প জুড়ে দিলেন ও আমাকেও আফগানিস্থান সম্বন্ধে নানা কাজের খবর নানা রঙীন গুজব বলে যেতে লাগলেন। তার কতটা সত্য, কতটা কল্পনা কতটা ডাহা মিথ্যে বুঝবার মত তথ্য আমার কাছে ছিল না, কাজেই একতরফা গল্প জমে উঠল ভালোই। তারই একটা বলতে গিয়ে ভূমিকা দিলেন, 'সামান্য জিনিস মানুষের সমস্ত জীবনের ধারা কি রকম অন্য পথে নিয়ে ফেলতে পারে শুনুন!

'প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই নিমলার বাগানেই জন চল্লিশ কয়েদী আর তাদের পাহারাওয়ালারা রাত কাটিয়ে সকালবেলা দেখে একজন কি করে পালিয়েছে। পাহারাওয়ালাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। কাবুল থেকে যতগুলো কয়েদী নিয়ে

বেরিয়েছিল জলালাবাদে যদি সেই সংখ্যা না দেখাতে পারে তবে তাদের যে কি শাস্তি হতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের আইনজ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। কেউ বলল, ফাঁসি দেবে, কেউ বলল, গুলী করে মারবে, কেউ বলল, জ্যান্ত শরীর থেকে টেনে টেনে চামড়া তুলে ফেলবে। জেল যে হবে সে বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, আর আফগান জেলের অবস্থা আর কেউ জানুক না-জানুক তারা বিলক্ষণ জানত। একবার সে-জেলে ঢুকলে সাধারণত কেউ আর বেরিয়ে আসে না—যদি আসে তবে সে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের মুখোমুখি হতে অথবা অন্যের স্কন্ধের উপর সোয়ার হয়ে কফিনের ভিতর শুয়ে শুয়ে। আফগান জেল সম্বন্ধে তাই যেসব কথা শুনতে পাবেন তার বেশীর ভাগই কল্পনা—মরা লোকে তো আর কথা কয় না।

'তা সে যাই হোক, পাহারাওয়ালারা তো ভয়ে আধমরা। শেষটায় একজন বুদ্ধি বাৎলাল যে, রাস্তায় যে-কোনো একটা লোককে ধরে নিয়ে হিসেবে গোঁজামিল দিতে।

'পাছে অন্য লোক জানতে পেরে যায় তাই তারা সাততাড়াতাড়ি নিমলার বাগান ছেড়ে রাস্তায় বেরল। চতুর্দিকে নজর, কাউকে যদি একাএকি পায় তবে তাকে দিয়ে কাজ হাসিল করবে। ভোরের অন্ধকার তখনো কাটেনি। এক হতভাগা গ্রামের রাস্তার পাশের প্রয়োজনীয় কর্ম করতে এসেছিল। তাকে ধরে শিকলি পরিয়ে নিয়ে চলল আর সকলের সঙ্গে জলালাবাদের দিকে।

'সমস্ত রাস্তা ধরে তাকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের সকল রকম ভয় দেখিয়ে পাহারাওয়ালারা শাসিয়ে বলল, জলালাবাদের জেলর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে যেন শুধু বলে, 'মা খু চিহ্‌ল্ ও পঞ্জম্ হস্তম্' অর্থাৎ 'আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের'। ব্যাস্, আর কিছু না।

'লোকটা হয় আকাট মূর্খ ছিল, না হয় ভয় পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, অথবা এও হতে পারে যে সে ভেবে নিয়েছিল যে যদি কোনো কয়েদী পালিয়ে যায়, সকলের পয়লা রাস্তায় যে সামনে পড়ে তাকেই সরকারী নম্বর পুরিয়ে দিতে হয়। অথবা হয়ত ভেবে নিয়েছিল, রাস্তার যে-কোনো লোককে রাজার হাতী যখন মাথায় তুলে নিয়ে সিংহাসনে বসাতে পারে তখন তাকে জেলখানায়ই বা নিয়ে যেতে পারবে না কেন?'

বেতারবাণী বললেন, 'গল্পটা আমি কম করে জন পাঁচেকের মুখে শুনেছি। ঘটনাগুলোর বর্ণনায় বিশেষ ফেরফার হয় না কিন্তু ঐ হতভাগা কেন যে জলালাবাদের জেলরের সামনে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবার চেষ্টা একবারও করল না

সেই বিচিত্র।'

সর্দারজী শুধালেন, 'অন্য কয়েদীরাও চুপ করে রইল ?'

বেতারওয়ালা বললেন, 'তাদের চুপ করে থাকার প্রচুর কারণ ছিল। সব ক'টা কয়েদীই ছিল একই ডাকাত দলের। তাদেরই একজন পালিয়েছে—অন্য সকলের ভরসা সে যদি বাইরে থেকে তাদের জন্য কিছু করতে পারে। তার পালানোতে অন্য সকলের যখন যড় ছিল তখন তারা কিছু বললে তো তাকে ধরিয়ে দেবারই সুবিধে করে দেওয়া হত।

'তা সে যাই হোক, সেই হতভাগা তো জলালাবাদের জাহান্নমে গিয়ে ঢুকল। কিছুদিন যাওয়ার পর আর পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারল কি বোকামিই সে করেছে। তখন একে ওকে বলে কয়ে আলা হজরত বাদশার কাছে সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা দিয়ে সে দরখাস্ত পাঠাবার চেষ্টা করল। কিন্তু জলালাবাদের জেলের দরখাস্ত সহজে হুজুরের কাছে পৌছয় না। জেলরও ভয় পেয়ে গিয়েছে, ভালো করে সনাক্ত না করে বেকসুর লোককে জেলে পোরার সাজাও হয়ত তার কপালে আছে। অথবা হয়ত ভেবেছে, সমস্তটাই গাঁজা, কিম্বা ভেবেছে, জেলের আর পাঁচজনের মত এরও মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

'জলালাবাদের জেলের ভিতরে কাগজ-কলমের ছড়াছড়ি নয়। অনেক ঝুলোঝুলি করে সে দরখাস্ত লেখায়, তারপর সে দরখাস্তের কি গতি হয় তার খবর পর্যন্ত বেচারীর কানে এসে পৌছয় না।

'বিশ্বাস করবেন না, এই করে করে এক মাস নয় দু' মাস নয়, এক বৎসর নয় দু' বৎসর নয়—ঝাড়া ষোলটি বৎসর কেটে গিয়েছে। তার তখন মনের অবস্থা কি হয়েছে বলা কঠিন, তবে আন্দাজ করা বোধ করি অন্যায় নয় যে, সে তখন দরখাস্ত পাঠানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে।

'এমন সময় তামাম আফগানিস্থান জুড়ে খুব বড় একটা খুশীর জশন (পরব) উপস্থিত হল—মুইন-উস-সুলতানের (যুবরাজের) শাদী অথবা তাঁর প্রথম ছেলে জন্মেছে। আমীর হবীব উল্লা খুশীর জোশে অনেক দান-খয়রাত করলেন ও সে খয়রাতির বরসাত রুখাসুখা জেলগুলোতেও পৌছল। শীতকাল ; আমীর তখন জলালাবাদে। ফরমান বেরল, জলালাবাদের জেলর যেন তাবৎ কয়েদীকে হুজুরের সামনে হাজির করে। হুজুর তাঁর বেহদ মেহেরবানি ও মহব্বতের তোড়ে বে-এখতেয়ার হয়ে হুকুম দিয়ে ফেলেছেন যে খুদ তিনি হরেক কয়েদীর ফরিয়াদ-তকলিফের খানাতল্লাশি করবেন।

'বিস্তর কয়েদী খালাস পেল, তারো বেশী কয়েদীর মিয়াদ কমিয়ে দেওয়া

হল। করে করে শেষটায় নিমলার সেই হতভাগা হুজুরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'হুজুর শুধালেন, 'তু কীস্তী', 'তুই কে ?'

'সে বলল, 'মা খু চিহ্‌ল্‌ ও পঞ্জম্‌ হস্তম্‌' অর্থাৎ 'আমি তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরের'।

'হুজুর যতই তার নামধাম কসুরসাজার কথা জিজ্ঞাসা করেন সে ততই বলে সে শুধু পঁয়তাল্লিশ নম্বরের। ঐ এক বুলি, এক জিগির। হুজুরের সন্দেহ হল, লোকটা বুঝি পাগল। ঠাহর করবার জন্য অন্য নানা রকমের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল, সূর্য কোন্‌ দিকে ওঠে, কোন্‌ দিকে অস্ত যায়, মা ছেলেকে দুধ খাওয়ায়, না ছেলে মাকে। সব কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেয় কিন্তু তার নিজের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলে, 'আমি তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরের'।

'ষোল বছর ঐ মন্ত্র জপ করে করে তার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে, তার নাম নেই ধাম নেই, সাকিনঠিকানা নেই, তার পাপ নেই পুণ্য নেই, জেলের ভিতরের বন্ধন নেই, বাইরের মুক্তিও নেই—তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব তার সর্বৈব সত্তা ঐ এক মন্ত্রে, 'আমি পঁয়তাল্লিশ নম্বরের'।

'শত দোষ থাকলেও আমীর হবীব উল্লার একটা গুণ ছিল; কোনো জিনিসের খেই ধরলে তিনি জট না ছাড়িয়ে সন্তুষ্ট হতেন না। শেষটায় সেই ডাকাতদের যে দু'-একজন তখনো বেঁচে ছিল তারাই রহস্যের সমাধান করে দিল।

'শুনতে পাই খালাস পাওয়ার পরও, বাকী জীবন সে ঐ পঁয়তাল্লিশ নম্বরের ভানুমতী কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।'

গল্প শুনে আমার সবশরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পরিপক্ক বৃদ্ধ সর্দারজীর মুখে শুধু 'আল্লা মালিক', 'খুদা বাঁচানেওয়ালা'।

ততক্ষণে চড়াই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কাবুল যেতে হলে যে সাত-আট হাজার ফুট পাহাড় চড়তে হয় নিমলার কিছুক্ষণ পরেই তার আরম্ভ।

শিলেট থেকে যারা শিলঙ গিয়েছেন, দেরাদুন থেকে মুসৌরী, কিম্বা মহাবলেশ্বরের কাছে পশ্চিম ঘাট উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের পক্ষে এ রকম রাস্তার চুলের কাঁটার বাঁক, হাঁসুলি চাকের মোড় কিছু নূতন নয়—নূতনত্বটা হচ্ছে যে, এ রাস্তা কেউ মেরামত করে দেয় না, এখানে কেউ রেলিঙ বানিয়ে দেয় না, হরেক রকম সাইনবোর্ড দুদিকের পাহাড়ে সেঁটে দেয় না, বিশেষ সংকীর্ণ সংকট পেরবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দু'দিকের মোটর আটকানো হয় না। মাটি ধসে রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে যতক্ষণ না জন আষ্টেক ড্রাইভার আটকা পড়ে আপন আপন

শাবল দিয়ে রাস্তা সাফ করে নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতমশায়ের 'রাধে গো ব্রজ-সুন্দরী, পার করো' বলা ছাড়া অন্য কিছু করবার নেই। যাঁরা শীতকালে এ রাস্তা দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মুখে শুনেছি যে রাস্তার বরফও নিজেদের সাফ করতে হয়। অবশ্য বরফ সাফ করাতে আভিজাত্য আছে—শুনেছি স্বয়ং হুমায়ুন বাদশাহ নাকি শের শাহের তাড়া খেয়ে কাবুল না কান্দাহার যাবার পথে নিজ হাতে বরফ সাফ করেছিলেন।

শিলঙ-নৈনিতাল যাবার সময় গাড়ির ড্রাইভার অন্ততঃ এই সান্ত্বনা দেয় যে, দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। এখানে যদি কোনো ড্রাইভার এ রকম কথা বলে তবে আপনাকে শুধু দেখিয়ে দিতে হবে, রাস্তার যে-কোনো এক পাশে, হাজার ফুট গভীর খাদে দুর্ঘটনায় অপমৃত দুটো-একটা মোটরগাড়ির কঙ্কাল। মনে পড়ছে কোন্ এক হিল-স্টেশনের চড়াইয়ের মুখে দেখেছিলুম, ড্রাইভারদের বুকে যমদূতের ভয় জাগাবার জন্য রাস্তার কর্তাব্যক্তিরা একখানা ভাঙা মোটর ঝুলিয়ে রেখেছেন—নিচে বড় বড় হরপে লেখা, 'সাবধানে না চললে এই অবস্থা তোমারও হতে পারে'। কাবুলের রাস্তার মুখে সেরকম ব্যাপক কোনো বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয় না—চোখ খোলা রাখলে দুদিকে বিস্তর প্রাঞ্জল উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

সবচেয়ে চিত্তির যখন হঠাৎ বাঁক নিয়ে সামনে দেখতে পাবেন আধ মাইল লম্বা উটের লাইন। একদিকে পাহাড়ের গা, আর একদিকে হাজার ফুট গভীর খাদ, মাঝখানে গাড়ি বাদ দিয়ে রাস্তার ক্লিয়ারিঙ এক হাত। তার ভিতর দিয়ে নড়বড়ে উট দূরের কথা, শান্ত গাধাও পেরতে পারে না। চওড়া রাস্তার আশায় আধ মাইল লম্বা উটের সারিকে পিছু ঠেলে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। তখন গাড়িই ব্যাক করে চলে উল্টো দিকে। সে অবস্থায় পিছনের দিকে তাকাতে পারেন এমন স্থিতপ্রজ্ঞ, এমন স্নায়ুবিহীন 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা' স্থিতধী মুনিপ্রবর আমি কখনো দেখিনি। সবাই তখন চোখ বন্ধ করে কলমা পড়ে আর মোটর না-থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর চোখ খুলে যা দেখে সেও পিলে-চমকানিয়া। আস্তে আস্তে একটা একটা করে উট সেই ফাঁকা দিয়ে যাচ্ছে, তারপর বলা নেই কওয়া নেই, একটা উট হঠাৎ আধপাক নিয়ে ফাঁকাটুকু চওড়া-চওড়ি বন্ধ করে দেয়। পিছনের উটগুলো সঙ্গে সঙ্গে না থেমে সমস্ত রাস্তা জুড়ে ঝামেলা লাগায়—স্রোতের জলে বাঁধ দিলে যে রকম জল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে উটটা রাস্তা বন্ধ করেছে তাকে তখন সোজা করে ফের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জন পাঁচেক লোক সামনে থেকে টানাটানি করে, আর জন বিশেক পিছন

থেকে চেঁচামেচি হৈ-হল্লা লাগায়। অবস্থাটা তখন অনেকটা ছোট গলির ভিতর আনাড়ি ড্রাইভার মোটর ঘোরাতে গিয়ে আটকা পড়ে গেলে যে রকম হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে সেখানে হাজার ফুট গভীর খাদের ভয় নেই, আর আপনি হয়ত রকে বসে বিড়ি হাতে আণ্ডা-বাচ্চা নিয়ে গুষ্ঠীসুখ অনুভব করছেন।

এই অবস্থায় যদি পিছন থেকে আর এক সার উট এসে উপস্থিত হয় তবে দ'টার সম্পূর্ণ খোলতাই হয়। আধ মাইল ধরে, সমস্ত রাস্তা জুড়ে তখন ঢাকা-দক্ষিণের মেলার গোরুর হাট বসে যায়।

বুখারা-সমরকন্দ, শিরাজ-বদখশান সেই দ'য়ে মজে গিয়ে চিৎকার করে, গালাগাল দেয়, জট খোলে, ফের পাকায়, অস্ত্র সম্বরণ করে, দু'দণ্ড জিরিয়ে নেয়, ঢেলে সেজে ফের গোড়া থেকে ঔড্র কায়দায় আরম্ভ করে—

'ক' রে কমললোচন শ্রীহরি

'খ' রে খগ-আসনে মুরারি

'গ' রে গরুড়—

স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করাই যদি সত্য নিরূপণের একমাত্র উপায় হয়, তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে আমি আজও সেই রাস্তার মাঝখানে মোটরের ভিতর কনুয়ের উপর ভর করে দু' হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছি। জট-পাকানো স্পষ্ট মনে আছে কিন্তু সেটা কি করে খুলল, মোটর আবার কি করে চলল, একদম মনে নেই।

তেরো

ফ্রান্সের বেতারবাণী আরম্ভ হয় 'ইসি পারি' অর্থাৎ 'হেথায় প্যারিস' দিয়ে। কাবুল ইয়োরোপীয় কোনো জিনিস নকল করতে গেলে ফ্রান্সকে আদর্শরূপে মেনে নেয় বলে কাবুল রেডিয়ো দুই সন্ধ্যা আপন অভিজ্ঞান-বাণী প্রচারিত করে 'ইন্ জা কাবুল' অর্থাৎ 'হেথায় কাবুল' বলে।

মোটরেও বেতারবাণী হল 'ইন্ জা কাবুল'। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে বলে বেতারযোগে প্যারিস অথবা কাবুলের যতটা দেখবার সুবিধা হয়, আমার প্রায় ততটাই হল।

হেডলাইটের জোরে কিছু যে দেখব তারও উপায় ছিল না। পূর্বেই বলেছি বাস্‌খানার মাত্র একটি চোখ—সাঁঝের পিদিম দেখাতে গিয়ে সর্দারজী তার উপর আবিষ্কার করলেন যে, সে চোখটিও খাইবারের রৌদ্রদাহনে গান্ধারীর চোখের

মত কানা হয়ে গিয়েছে। সর্দারজীর নিজের জন্য অবশ্য বাসের কোনো চোখেরই প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি রাতকানা। কিন্তু রাস্তার পঁয়তাল্লিশ নম্বরীদের উপকারের জন্য প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে একটা হারিকেন যোগাড় করা হল। হ্যাণ্ডিম্যান সেইটে নিয়ে একটা মাড-গার্ডের উপর বসল।

আমি সভয়ে সর্দারজীকে জিজ্ঞেস করলুম, 'হারিকেনের সামান্য আলোতে আপনার মোটর চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

সর্দারজী বললেন, 'হচ্ছে বই কি, আলোটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ওটা না থাকলে গাড়ি জোর চালাতে পারতুম।' মনে পড়ল, দেশের মাঝিরাও অন্ধকার রাত্রে নৌকার সম্মুখে আলো রাখতে দেয় না।

কিন্তু 'ভাগ্য-বিধাতা' অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তো কবি তাঁরই হাতে গোটা দেশটার ভার ছেড়ে দিয়ে গেয়েছেন—

পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর পন্থা
যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চির-সারথি, তব রথচক্রে
মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

কিন্তু কবির তুলনায় দার্শনিক ঢের বেশী হুঁশিয়ার হয়। তাই বোধ হয় কবির হাতে রাষ্ট্রের কি দুরবস্থা হতে পারে, তারই কল্পনা করে প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে ভালো-মন্দ সব কবিকেই অবিচারে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

এ সব তত্ত্বচিন্তা না করা ছাড়া তখন অন্য কোনো উপায় ছিল না। যদিও কাবুল উপত্যকার সমতল ভূমি দিয়ে তখন গাড়ি চলেছে, তবু দুটো-একটা মোড় সব সময়েই থাকার কথা। সে-সব মোড় নেবার সময় আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করছিলুম এবং সেই খবরটি সর্দারজীকে দেওয়াতে তিনি যা বললেন, তাতে আমার সব ডর-ভয় কেটে গেল। তিনি বললেন, 'আম্মো চোখ বন্ধ করি।' শুনে আমি যা চোখ বন্ধ করলুম তার সঙ্গে গান্ধারীর চোখ বন্ধ করার তুলনা করা যায়।

সেযাত্রা যে কাবুল পৌঁছতে পেরেছিলুম তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে, রগরগে উপন্যাসের গোয়েন্দা শত বিপদেও মরে না—ভ্রমণকাহিনী-লেখকের জীবনেও সেই সূত্র প্রযোজ্য।

'গুমরুক' বা কাস্টম-হাউস তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে—বিছানাখানা পর্যন্ত ছাড়ল না। টাঙ্গা নিয়ে ফরাসী রাজদূতাবাসের দিকে রওয়ানা হলুম—কাবুল শহরে আমার একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি সেখানেই থাকতেন। শান্তিনিকেতনে তিনি আমার ফার্সীর অধ্যাপক ছিলেন ও তখন ফরাসী রাজদূতাবাসে কর্ম করতেন।

টাঙ্গা তিন মিনিট চলার পরেই বুঝতে পারলুম মস্কো রেডিয়ো কোন্ ভরসায় তাবৎ দুনিয়ার প্রলেতারিয়াকে সম্মিলিত হওয়ার জন্য ফতোয়া জারি করে। দেখলুম, কাবুল শহরে আমার প্রথম পরিচয়ের প্রলেতারিয়ার প্রতীক টাঙ্গাওয়ালা আর কলকাতার গাড়িওয়ালায় কোনো তফাত নেই। আমাকে উজবুক পেয়ে সে তার কর্তব্য শেয়ালদার কাপ্তেনদের মত তখনি স্থির করে নিয়েছে।

বেতারওয়ালা তাকে পই পই করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ফরাসী দূতাবাস কি করে যেতে হয়, সেও বার বার 'চশ্ম্', 'বসর্ ও চশ্ম্' অর্থাৎ 'আমার মাথার দিব্যি, আপনার তালিম এবং হুকুম আমার চোখের জ্যোতির ন্যায় মূল্যবান' ইত্যাদি শপথ-কসম খেয়েছিল, কিন্তু কাজের বেলায় দু'মিনিট যেতে না যেতেই সে গাড়ি দাঁড় করায়, বেছে বেছে কাবুল শহরের সবচেয়ে আকাট মূর্খকে জিজ্ঞাসা করে, ফরাসী দূতাবাস কি করে যেতে হয়।

অনেকে অনেক উপদেশ দিলেন। এক গুণী শেষটায় বললেন—'ফরাসী রাজদূতাবাস? সে তো প্যারিসে। যেতে হলে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'বোম্বাই গিয়ে জাহাজ ধরতে হয়। চল হে টাঙ্গাওয়ালা, পেশোয়ার অথবা কান্দাহার—যেটা কাছে পড়ে। সেখান থেকে বোম্বাই।'

টাঙ্গাওয়ালা ঘড়েল। বুঝল,

> 'বাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা,
> আমি ঢাকার বাঙাল নহি গো'

তখন সে লব-ই-দরিয়া, দেহ-আফগানান, শহর-আরা হয়ে ফরাসী রাজদূতাবাস পৌঁছল। কাবুল শহর ছোট—কম করে তিনবার সে আমাকে ঐ রাস্তা দিয়ে আগেই নিয়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে পাহাড়—এর চেয়ে প্যাঁচালো কেপ অব্ গুড হোপ চেষ্টা করলেও হয় না।

আমি কিছু বললে এতক্ষণ ধরে সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে আমার কাঁচা ফার্সী সে বুঝতে পারে না। এবার আমার পালা। ভাড়া দেবার সময় সে যতই নানা রকম যুক্তিতর্ক উত্থাপন করে আমি ততই বোকার মত তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাই আর একঘেয়ে আলোচনায় নূতনত্ব আনবার জন্য তার খোলা হাত থেকে আমারই দেওয়া দু'চার আনা কমিয়ে নিই। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাঙা ফার্সীকে একদম ক্ষুদ বানিয়ে দিয়ে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলি, 'বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি ইমানদার লোক, বিদেশী বলে না জেনে বেশী দিয়ে ফেলেছি, অত বেশী নিতে চাও না। মা শা আল্লা, সোবান আল্লা, খুদা তোমার জিন্দেগী দরাজ

করুন, তোমার বেটাবেটির—'

পয়সা সরালেই সে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠে, আল্লা রসুলের দোহাই কাড়ে, আর ইমান-ইনসাফ সম্বন্ধে সাদী-রুমীর বয়েৎ আওড়ায়। এমন সময় অধ্যাপক বগদানফ এসে সব কিছু রফারফি করে দিলেন।

যাবার সময় সে আমাকে আর এক দফা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেপে নিয়ে অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় শুধাল, 'আপনার দেশ কোথায়?'

বুঝলুম, গয়ার পাণ্ডার মত। ভবিষ্যৎ সতর্কতার জন্য।

কে বলে বাঙালী হীন? আমরা হেলায় লঙ্কা করিনি জয়?

রাতের বেলাই বগদানফ সায়েবের সঙ্গে আলাপ করার সুবিধা। সমস্ত রাত ধরে পড়াশোনা করেন, আর দিনের বেলা যতটা পারেন ঘুমিয়ে নেন। সেই কারণেই বোধ হয় তিনি ভারতবর্ষের সব পাখির মধ্যে পেঁচাকে পছন্দ করতেন বেশী। শান্তিনিকেতনে তিনি যে ঘরটায় ক্লাস নিতেন, নন্দবাবু তারই দেয়ালে একটা পেঁচা এঁকে দিয়েছিলেন। বগদানফ সায়েব তাতে ভারি খুশী হয়ে নন্দবাবুর মেলা তারিফ করেছিলেন।

বগদানফ জাতে রুশ, মস্কোর বাসিন্দা ও কট্টর জারপন্থী। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের সময় মস্কো থেকে পালিয়ে আজরবাইজান হয়ে তেহরান পৌঁছান। সেখান থেকে বসরা হয়ে বোম্বাই এসে বাসা বাঁধেন। ভালো পেহলেভী বা পহ্লবী জানতেন বলে বোম্বাইয়ের জরথুস্ত্রী কামা-প্রতিষ্ঠান তাঁকে দিয়ে সেখানে অনেক পুঁথিপত্রের অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে রুশ পণ্ডিতদের দুরবস্থায় সাহায্য করবার জন্য এক আন্তর্জাতিক আহ্বানে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে সাড়া দেন এবং বোম্বাইয়ে বগদানফের সঙ্গে দেখা হলে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে ফার্সীর অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন।

১৯১৭ সালের পূর্বে বগদানফ রুশের পররাষ্ট্রবিভাগে কাজ করতেন ও সেই উপলক্ষ্যে তেহরানে আট বৎসর কাটিয়ে অতি উৎকৃষ্ট ফার্সী শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পরবর্তীকালে ইরান যান, তখন সেখানে ফার্সীর জন্য অধ্যাপক অনুসন্ধান করলে পণ্ডিতেরা বলেন যে, ফার্সী পড়বার জন্য বগদানফের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পাওয়া অসম্ভব। কাবুলের অন্য জহুরীদের মুখেও আমি শুনেছি যে, আধুনিক ফার্সী সাহিত্যে বগদানফের লিখনশৈলী আপন বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে বিদগ্ধ-

জনের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছে।

ইউরোপীয় বহু ভাষা তো জানতেনই—তাছাড়া জগতাই, উসমানলী প্রভৃতি কতকগুলো অজানা অচেনা তুর্কী ভাষা উপভাষায় 'জবরদস্ত মৌলবী'ও ছিলেন। কাবুলের মত জগাখিচুড়ি শহরের দেশী-বিদেশী সকলের সঙ্গেই তিনি তাদের মাতৃভাষায় দিব্য স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারতেন।

একদিকে অগাধ পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে কুসংস্কারে ভর্তি। বাঁ দিকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের চাঁদ দেখতে পেয়েছেন, না তো গোখরোর ফণায় যেন পা দিয়েছেন। সেই 'দুর্ঘটনা'র তিন মাস পরেও যদি তাঁর পেয়ারা বেরাল বমি করে, তবে ঐ বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে অপয়া চাঁদ দেখাই তার জন্য দায়ী। মইয়ের তলা দিয়ে গিয়েছ, হাত থেকে পড়ে আরশি ভেঙে গিয়েছে, চাবির গোছা ভুলে মেজের উপর রেখেছিলে—আর যাবে কোথায়, সেরাত্রে বগদানফ সাহেব তোমার জন্য এক ঘণ্টা ধরে আইকনের সামনে বিড়বিড় করে নানা মন্ত্র পড়বেন, গ্রীক অর্থডক্স চার্চের তাবৎ সেণ্টদের কাছে কান্নাকাটি করে ধন্না দেবেন, পরদিন ভোরবেলা তোমার চোখেমুখে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিয়ে তিন বৎসর ধরে অপেক্ষা করবেন তোমার কাছ থেকে কোনো দুঃসংবাদ পাবার জন্য। তিন বছর দীর্ঘ মিয়াদ, কিছু-না-কিছু একটা ঘটবেই। তখন বাড়ি বয়ে এসে বগদানফ সায়েব তোমার সামনে মাথা নিচু করে জানুতে হাত রেখে বসবেন, মুখে ঐ এক কথা 'বলিনি, তখনি বলিনি?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'বড় বড় সাধক মহাপুরুষ যেন এক-একটা কাঠের গুঁড়ি হয়ে ভেসে যাচ্ছেন। শত শত কাক তারই উপরে বসে বিনা মেহন্নতে ভবনদী পার হয়ে যায়।'

বগদানফের পাল্লায় পড়লে তিন দিনে দুনিয়ার কুল্লে কুসংস্কারের সম্পূর্ণ তালিকা আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে, এক মাসের ভিতর সেগুলো মানতে আরম্ভ করবেন, দু' মাসের ভিতর দেখতে পাবেন, বগদানফ-কাঠের গুঁড়িতে আপনি একা নন, আপনার এবং সায়েবের পরিচিত প্রায় সবাই তার উপরে বসে বসে ঝিমোচ্ছেন। ঘোর বেলেল্লা দু'-একটা নাস্তিকের কথা অবিশ্যি আলাদা। তারা প্রেম দিলেও কলসীর কানা মারে।

দয়ালু বন্ধুবৎসল ও সদানন্দ পুরুষ। তার মুক্ত হস্তের বর্ণনা করতে গিয়ে ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলেছিলেন, 'ইল্ আশেৎ লে মাশিন আ পের্সে লে মাকারনি।' অর্থাৎ 'মাকারনি' ফুটো করার জন্য তিনি মেশিন কেনেন।' সোজা বাঙলায় 'কাকের ছানা কেনেন'।

কাবুলের বিদেশী দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল ছিলেন বগদানফ সায়েব—একটি আস্ত প্রতিষ্ঠান বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাই তাঁর সম্বন্ধে এত কথা বলতে হল।

চোদ্দ

এক বৃদ্ধা দুঃখ করে বলেছিলেন, 'পালা-পরবে নেমন্তন্ন পেলে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকলে মায়ের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। রেখে গেলে গলার আল, নিয়ে গেলে লোকের গাল।' তারপর বুঝিয়ে বলেছিলেন, বাড়িতে যদি মেয়েকে রেখে যাও তাহলে সমস্তক্ষণ দুর্ভাবনা, ভালো করলুম না মন্দ করলুম; সঙ্গে যদি নিয়ে যাও তবে সক্কলের কাছ থেকে একই গালাগাল, এতদিন ধরে বিয়ে দাওনি কেন?'

দেশভ্রমণে দেখলুম একই অবস্থা। মোকামে পৌঁছেই প্রশ্ন, দেশটার ঐতিহাসিক পটভূমিকা দেব, কি দেব না। যদি না দাও তবে সমস্তক্ষণ দুর্ভাবনা, ভালো করলুম, না, মন্দ করলুম। যদি দাও তবে লোকের গালাগাল নিশ্চিত খেতে হবে। বিশেষ করে আফগানিস্থানের বেলা, কারণ অরক্ষণীয়া কন্যার যে রকম বিয়ে হয়নি, আফগানিস্থানেরও ইতিহাস তেমনি লেখা হয়নি। আফগানিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস পোঁতা আছে সে দেশের মাটির তলায়, আর ভারতবর্ষের পুরাণ-মহাভারতে। আফগানিস্থান গরীব দেশ, ইতিহাস গড়ার জন্য মাটি ভাঙবার ফুরসৎ আফগানের নেই, মাটি যদি সে নিতান্তই খোঁড়ে তবে সে কাবুলী মোন্-জো-দড়ো বের করার জন্য নয়—কয়লার খনি পাবার আশায়। পুরাণ ঘাঁটাঘাঁটি করার মত পাণ্ডিত্য কাবুলীর এখনো হয়নি—আমাদেরই কতটা হয়েছে কে জানে? পুরাণের কতটা সত্যিকার ইতিহাস আর কতটা ইতিহাস-পাগলাদের বোকা বানাবার জন্য পুরাণকারের নির্মম অট্টহাস তারই মীমাংসা করতে অর্ধেক জীবন কেটে যায়।

আফগানিস্থানের অর্বাচীন ইতিহাস নানা ফার্সী পাণ্ডুলিপিতে এদেশে ওদেশে, অন্ততঃ চারখানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এদেশের মাল নিয়ে পণ্ডিতেরা নাড়াচাড়া করেছেন—মাহমুদ, বাবুরের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের পাঠান-তুর্কী-মোগল যুগের ইতিহাস লেখার জন্য। কিন্তু বাবুরের আত্মজীবনী সঙ্গে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় পণ্ডিত—আফগানের কথাই ওঠে না—কাবুল হিন্দুকুশ, বদখশান্ বল্খ, মৈমানা হিরাতে ঘোরাঘুরি করেননি কারণ আফগান ইতিহাস লেখার শিরঃপীড়া নিয়ে ভারতীয় পণ্ডিত এখনও উদ্ব্যস্ত হননি। অথচ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আফগানিস্থানের ইতিহাস না লিখে ভারত-ইতিহাস

লেখবার জো নেই, আফগান রাজনীতি না জেনে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ ঠাণ্ডা রাখবার কোনো মধ্যমনারায়ণ নেই।

গোদের উপর আরেক বিষ-ফোঁড়া—আফগানিস্থানের উত্তর ভাগ অর্থাৎ বল্‌খ্‌-বদখশানের ইতিহাস তার সীমান্ত নদী আমুদরিয়ার (গ্রীক অক্সুস, সংস্কৃত বক্ষু) ওপারের তুর্কীস্থানের সঙ্গে, পশ্চিমভাগ অর্থাৎ হিরাত অঞ্চল ইরানের সঙ্গে, পূর্বভাগ অর্থাৎ কাবুল জলালাবাদ খাস ভারতবর্ষ ও কাশ্মীরের ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানা যুগে নানা রঙ ধরেছে। আফগানিস্থানের তুলনায় সুইটজারল্যাণ্ডের ইতিহাস লেখা ঢের সোজা—যদিও সেখানে তিনটে ভিন্ন জাত আর চারটে ভাষা নিয়ে কারবার।

আর শেষ বিপদ, যে দু'চারখানা কেতাবপত্র আছে সেগুলো খুললেই দেখতে পাবেন, পণ্ডিতেরা সব রামদা উঁচিয়ে আছেন। 'গান্ধার' লিখেই সেই রামদা—'?' —উঁচিয়েছেন অর্থাৎ 'গান্ধার কোথায়'? 'কাম্বোজ' বলেই সেই খড়্গ—'?'— অর্থাৎ 'কাম্বোজ বলতে কি বোঝো'? 'কম্বুকণ্ঠী' বা 'কম্বুগ্রীব' বলতে বোঝায় যার গলায় শাঁখের গায়ের তিনটে দাগ কাটা রয়েছে—যেমনতর বুদ্ধের গলায়। কম্বোজ দেশ কি তবে গিরি উপত্যকায় কণ্ঠী-ঝোলানো দেশ আফগানিস্থান, অথবা কম্বু যেখানে পাওয়া যায় অর্থাৎ সমুদ্র-পারের দেশ বেলুচিস্থান? এমন কি দেশগুলোর নামের পর্যন্ত ঠিক ঠিক বানান নেই, যেমন ধরুন বল্‌খ্‌—কখনো বল্‌হিকা, কখনো বাল্‌হিকা, কখনো বালহীকা। সে কি তবে ফেরদৌসী উল্লিখিত বল্‌খ্‌— যেখানে জরথুস্ত্র রাজা গুশ্‌ৎআস্‌প্‌কে আবেস্তা মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন? সেখান থেকেই কি আজকের দিনের কাবুলীরা জাফরান আর হিঙ নিয়ে আসে? কারণ ঐ দুয়ের নামই তো সংস্কৃতে বাল্‌হিকম্‌।

রাসেল বলেছেন, 'পণ্ডিতজন যে স্থলে মতানৈক্য প্রকাশ করেন, মূর্খ যেন তথায় ভাষণ না করে।'

আমার ঠিক উল্টো বিশ্বাস—আমার মনে হয় ঠিক ঐ জায়গায়ই তার কিছু বলার সুযোগ—পণ্ডিতরা তখন একজোট হতে পারেন না বলে সে বারোয়ারি কিল থেকে নিষ্কৃতি পায়।

পণ্ডিতে মূর্খে মিলে আফগানিস্থান সম্বন্ধে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তার মোটামুটি তত্ত্ব এই—

আর্যজাতি আফগানিস্থান, খাইবার পাস হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল—পামির, দার্দিস্থান বা পৈশাচভূমি কাশ্মীর হয়ে নয়। বোগাজ কো-ই বর্ণিত মিতানি রাজ্য ধ্বংসের পরে যদি এসে থাকে তবে প্রচলিত আফগান কিংবদন্তী যে আফগানরা

ইহুদীদের অন্যতম পথভ্রষ্ট উপজাতি সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। অর্থাৎ কিংবদন্তী দেশ ঠিক রেখেছে কিন্তু পাত্র নিয়ে গোলমাল করে ফেলেছে।

গান্ধারী কান্দাহার থেকে এসেছিলেন। পাঠান মেয়ের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ দেখেই বোধ করি মহাভারতকার তাকে শতপুত্রবতীরূপে কল্পনা করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের ইতিহাস স্পষ্টতর রূপ নিতে আরম্ভ করে। উত্তর-ভারতের ষোলটি রাজ্যের নির্ঘণ্টে গান্ধার ও কাম্বোজের উল্লেখ পাই। তাদের বিস্তৃতি প্রসার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে পণ্ডিতেরা সেই রামদা দেখান।

এ-যুগে এবং তারপরও বহুযুগ ধরে ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে যেরকম কোনো সীমান্তরেখা ছিল না, ঠিক তেমনি আফগান ও ইন্দো-ইরানিয়ান ভূমি পারস্যের মধ্যে কোনো সীমান্তভূমি ছিল না। বক্ষু বা আমুদরিয়ার উভয় পারের দেশকে সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতের অংশরূপে ধরা হয়েছে, প্রাচীন ইরানী সাহিত্যে তাকে আবার ইরানের অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে।

তারপর ইরানী রাজা সায়েরাস (কুরশ) সম্পূর্ণ আফগানিস্থান দখল করে ভারতবর্ষের সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। সিকন্দর শাহের সিন্ধুদেশ জয় পর্যন্ত আফগানিস্থান ও পশ্চিম-সিন্ধু ইরানের অধীনে থাকে।

সিকন্দর উত্তর-আফগানিস্থান হয়ে ভারতবর্ষে ঢোকেন কিন্তু তাঁর প্রধান সৈন্য-দল থাইবারপাস হয়ে পেশাওয়ারে পৌঁছয়। থাইবার পেরোবার সময় সীমান্তের পার্বত্য জাতি পাহাড়ের চূড়াতে বসে সিকন্দরী সৈন্যদলকে এতই উদ্ব্যস্ত করেছিল যে গ্রীক সেনাপতি তাদের শহর গ্রাম জ্বালিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। সিকন্দরের সিন্ধুজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে রকম জোর দাগ কেটে গিয়েছে, তেমনি গ্রীক অধিকারের ফলে আফগানিস্থানও ভৌগোলিক আরিয়া, আরা-খোসিয়া, গেড্রোসিয়া, পারোপানিসোদাই ও দ্রাঙ্গিয়ানা অর্থাৎ হিরাত, বল্‌খ্, কাবুল, গজনী ও কান্দাহার প্রদেশে বিভক্ত হয়ে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক রূপ নিতে আরম্ভ করে।

সিকন্দর শাহের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমস্ত উত্তর-ভারতবর্ষ দখল করে গ্রীকদের মুখোমুখি হন—ফলে হিন্দুকুশের উত্তরের বাল্‌হিক প্রদেশ ছাড়া সমস্ত আফগানিস্থান তাঁর অধীনে আসে। মৌর্যবংশের পতন ও শুঙ্গবংশের অভ্যুদয় পর্যন্ত আফগানিস্থান ভারতবর্ষের অংশ হয়ে থাকে।

ভারতীয় আর্যদের চতুর্বেদ ও ইরানী আর্যদের আবেস্তা একই সভ্যতার বিকাশ। কিন্তু মৌর্যযুগে এক দিকে যেমন বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়,

অন্যদিকে তেমনি ইরানী ও গ্রীক ভাস্কর শিল্প ভারতীয় কলাকে প্রায় সম্পূর্ণ অভিভূত করে ফেলে। অশোকের বিজয়স্তম্ভের মসৃণতা ইরানী ও তার রসবস্তু গ্রীক। সে-যুগের বিশুদ্ধ ভারতীয় কলার যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার আকার রূঢ়, গতি পঙ্কিল কিন্তু সে ভবিষ্যৎ বিকাশের আশায় পূর্ণগর্ভ।

অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মাধ্যন্তিক নামক শ্রমণকে আফগানিস্থানে পাঠান। সমস্ত দেশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল কিনা বলবার উপায় নেই কিন্তু মনে হয় আফগানিস্থানের অনুর্বরতা বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তরায় ছিল বলে আফগান জনসাধারণের পক্ষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। দুই শতাব্দীর ভিতরেই আফগানিস্থানের বহু গ্রীক সিথিয়ান ও তুর্ক বুদ্ধের শরণ নিয়ে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বেদ-আবেস্তার ঐতিহ্য বৌদ্ধধর্মের ভিতর দিয়ে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখে।

উত্তর-আফগানিস্থানের বল্‌খ্ প্রদেশ মৌর্য সম্রাটদের যুগে গ্রীক সাম্রাজ্যের অংশীভূত ছিল। মৌর্যবংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বল্‌খ্ অঞ্চলে গ্রীকদের ভিতর অন্তঃকলহ সৃষ্টি হয় ও বল্‌খের গ্রীকগণ হিন্দুকুশ অতিক্রম করে কাবুল উপত্যকা দখল করে। তারপর পাঞ্জাবে ঢুকে গিয়ে আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। এদের একজন রাজা মেনান্দের (পালি ধর্মগ্রন্থ 'মিলিন্দপঞ্‌হো'র রাজা মিলিন্দ) নাকি পূর্বে পাটলিপুত্র ও দক্ষিণে (আধুনিক) করাচী পর্যন্ত আক্রমণ করেন।

মধ্য ও দক্ষিণ-আফগানিস্থান তথা পশ্চিম-ভারতের গ্রীক রাজাদের কোনো ভালো বর্ণনা পাবার উপায় নেই। শুধু এক বিষয়ে ঐতিহাসিকের তৃষ্ণা তাঁরা মেটাতে জানেন। কাবুল থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বেগ্রাম উপত্যকায় এঁদের তৈরী হাজার হাজার মুদ্রা প্রতি বৎসর মাটির তলা থেকে বেরোয়। খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০ রাজ্যকালের ভিতর অন্তত উনত্রিশজন রাজা ও তিনজন রানীর নামচিহ্নিত মুদ্রা এ-যাবৎ পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর উপরে গ্রীক ও খরোষ্ঠি এবং শেষের দিকের মুদ্রাগুলোর উপরে গ্রীক ও ব্রাহ্মী হরফে লেখা রাজা-রানীর নাম পাওয়া যায়।

এ যুগে রাজায় রাজায় বিস্তর যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল কিন্তু আফগানিস্থান ও পশ্চিম ভারতের যোগসূত্র অটুট ছিল।

আবার দুর্যোগ উপস্থিত হল। আমুদরিয়ার উত্তরের শক জাতি ইউয়ে-চিদের হাতে পরাজিত হয়ে আফগানিস্থান ছেয়ে ফেলল। কাবুল দখল করে তারা দক্ষিণ-পশ্চিম দু'দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ-আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুদেশে তাদের বসতি পাকাপাকি হলে পর এই অঞ্চলের নাম সংস্কৃতে

শকদ্বীপ ও ইরানীতে সকস্তান হয়। বর্বর শকেরা ইরানী, গ্রীক ও ভারতীয়দের সংস্রবে এসে কিছুটা সভ্য হয়েছিল বটে কিন্তু আফগানিস্থানের ইতিহাসে তারা কিছু দিয়ে যেতে পারেনি।

শকদের হারায় ইন্দো-পার্থিয়ানরা। এদের শেষ রাজা গন্ধফারনেস্ নাকি যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য সেন্ট টমাসের হাতে খ্রীষ্টান হন। কিন্তু এই সেন্ট টমাসের হাতেই নাকি আবিসিনিয়াবাসী হাবশীরাও খ্রীষ্টান হয় ও এঁরই কাছে মালাবার ও তামিলনাডের হিন্দুরাও নাকি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। মাদ্রাজের কয়েক মাইল দূরে এক পাহাড়ের উপর সেন্ট টমাসের কবর দেখানো হয়। কাজেই আফগানিস্থানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার বোধ করি বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কুষণ সম্রাটদের ইতিহাস ভারতে অজানা নয়। কুষণ-বংশের দ্বিতীয় রাজা বিম শক এবং ইরানী পার্থিয়ানদের হারিয়ে আফগানিস্থান দখল করেন। কণিষ্ক পশ্চিমে ইরান-সীমান্ত ও উত্তরে কাশগড় খোটান, ইয়ারকন্দ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। পেশাওয়ারের বাইরে কণিষ্ক যে স্তূপ নির্মাণ করিয়ে বুদ্ধের দেহাস্থি রক্ষা করেন, তার জন্য তিনি গ্রীক শিল্পী নিযুক্ত করেন। সে-শিল্পী ভারতীয় গ্রীক না আফগান গ্রীক বলা কঠিন—দরকারও নেই—কারণ পশ্চিম-ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে তখনো সংস্কৃতিগত কোনো পার্থক্য ছিল না।

যে-স্তূপে কণিষ্ক শেষ বৌদ্ধ অধিবেশনের প্রতিবেদন তাম্রফলকে খোদাই করে রেখেছিলেন তার সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। জলালাবাদে যে অসংখ্য স্তূপ এখনো খোলা হয়নি তারই একটার ভিতরে যদি সে প্রতিবেদন পাওয়া যায় তাহলে আফগান ঐতিহাসিকেরা (?) আশ্চর্য হবেন না। কণিষ্ককে যদি ভারতীয় রাজা বলা হয়, তাহলে তাঁকে আফগান রাজা বলতেও কোনো আপত্তি নেই। ধর্মের কথা এখানে অবান্তর—কণিষ্ক বৌদ্ধ হওয়ার বহুপূর্বেই আফগানিস্থান তথাগতের শরণ নিয়েছিল।

ভারতবর্ষে কুষণ-রাজ্য পতনের পরও আফগানিস্থানে কিদার কুষণগণ দু'শ' বছর রাজত্ব করেন।

এ যুগের সবচেয়ে মহৎ বাণী গান্ধার শিল্পে প্রকাশ পায়। ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় যে কলা বৌদ্ধধর্মকে রূপায়িত করে তার শেষ নিদর্শন দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তার যৌবনমধ্যাহ্ন আফগানিস্থান ও পূর্ব-তুর্কীস্থানের ষষ্ঠ শতকের শিল্পে স্বপ্রকাশ। গুপ্তযুগের শিল্পপ্রচেষ্টা গান্ধারের কাছে কতটা ঋণী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। ভারতবর্ষের সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ কখনো কখনো গান্ধার শিল্পের নিন্দা করেছে—যেদিন বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়ে

দেখতে শিখব সেদিন জানব যে, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানকে পৃথক করে দেখা পরবর্তী যুগের কুসংস্কার। বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণায় ভারত অনুভূতির ক্ষেত্রে যে সার্বভৌমিকত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, পরবর্তী যুগে তা আর কখনো সম্ভবপর হয়নি। আফগানিস্থানের ভূগর্ভ থেকে যেমন যেমন গান্ধার শিল্পের নিদর্শন বেরোবে, সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের চারুকলার ইতিহাস লেখা হয়ে ভারতবর্ষকে তার ঋণ স্বীকার করাতে বাধ্য করবে।

ভারতবর্ষে যখন গুপ্ত-সম্রাটদের সুশাসনে সনাতনধর্ম বৈষ্ণব রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল, আফগানিস্থান তখনো বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেনি। মৌর্যদের মত গুপ্তরা আফগানিস্থান জয় করার চেষ্টা করেননি, কিন্তু আফগানিস্থানে পরবর্তী যুগের শক শাসনপতিগণ হীনবল। পঞ্চম শতকের চীন পর্যটক ফা-হিয়েন কাবুল খাইবার হয়ে ভারতবর্ষে আসবার সাহস করেননি, খুব সম্ভব আফগান সীমান্তের অরাজকতা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে অনেক দূরের অনেক কঠিন রাস্তা পামির কাশ্মীর হয়ে ভারতবর্ষ পৌছান।

তারপর বর্বর হূণ অভিযান ঠেকাতে গিয়ে ইরানের রাজা ফিরোজ প্রাণ দেন। হূণ অভিযান আফগানিস্থানের বহু মঠ ধ্বংস করে ভারতবর্ষে পৌছয়—গুপ্ত সম্রাটদের সঙ্গে তাদের যে সব লড়াই হয় সেগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা আছে। এই হূণ এবং আফগানদের সংমিশ্রণের ফলে পরবর্তী যুগে রাজপুত বংশের সূত্রপাত।

সপ্তম শতকে হিউয়েন-সাঙ তাশকন্দ সমরকন্দ হয়ে, আমুদরিয়া অতিক্রম করে কাবুল পৌছন। কাবুল তখন কিছু হিন্দু, কিছু বৌদ্ধ। ততদিন ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের নবজীবন লাভের স্পন্দন কাবুল পর্যন্ত পৌছেছিল। শান্ত ভারতবাসীই যখন বেশীদিন বৌদ্ধধর্ম সইতে পারল না তখন দুর্ধর্ষ আফগানের পক্ষে যে জীবে দয়ার বাণী বলে মেনে চলতে কষ্ট হয়েছিল তাতে বিশেষ সন্দেহ করার কারণ নেই। হিউয়েন-সাঙ কান্দাহার গজনী কাবুলকে ভারতবর্ষের অংশরূপে গণ্য করেছেন।

এখন আরব ঐতিহাসিকদের যুগ। তাঁদের মতে আরবরা যখন প্রথম আফগানিস্থানে এসে পৌছয় তখন সে-দেশ কণিষ্কের বংশধর তুর্কী রাজার অধীনে ছিল। কিন্তু পরে তার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে ব্রহ্মণ্য রাজ্য স্থাপন করেন। ৮৭১ সনে ইয়াকুব-বিন-লয়েস কাবুল দখল করেন। শাহিয়া বংশ তখন পাঞ্জাবে এসে আশ্রয় নেন—শেষ রাজা ত্রিলোচন পাল গজনীর সুলতান মাহমুদের হাতে ১০২১ সনে পরাজিত হন। আফগানিস্থানের শেষ হিন্দু রাজবংশের বাকি

ইতিহাস কাশ্মীরে। কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীতে তাঁদের বর্ণনা আছে।

এখানে এসে ভারতীয় পণ্ডিতগণ এক প্রকাণ্ড ঢেরা কাটেন। আমি পণ্ডিত নই, আমার মনে হয় তার কোনোই কারণ নেই। প্রথম আর্য অভিযানের সময়—কিম্বা তারও পূর্ব থেকে—আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ নানা যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একই ঐতিহ্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখবার চেষ্টা করেছে। যদি বলা হয় আফগানরা মুসলমান হয়ে গেল বলে তাদের অন্য ইতিহাস, তাহলে বলি, তারা একদিন অগ্নি-উপাসনা করেছিল, গ্রীক দেবদেবীর পূজা করেছিল, বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মও গ্রহণ করেছিল। তবুও যখন দুই দেশের ইতিহাস পৃথক করা যায় না, তখন তাদের মুসলমান হওয়াতেই হঠাৎ কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? বুদ্ধের শরণ নিয়ে কাবুলী যখন মগধ-বাসী হয়নি, তখন ইসলাম গ্রহণ করে সে আরবও হয়ে যায়নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে মুসলিম আফগানিস্থান—বিশেষ করে কান্দাহার, গজনী, কাবুল, জলালাবাদ বাদ দিলে ফ্রন্টিয়ার, বান্নু, কোহাট এমন কি পাঞ্জাবও বাদ দিতে হয়।

পার্থক্য তবে কোথায়? যদি কোনো পার্থক্য থাকে, তবে সে শুধু এইটুকু যে, মাহমুদ-গজনীর পূর্বে ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাস নেই, মাহমুদের পরে প্রতি যুগে নানা ভূগোল, নানা ইতিহাস লেখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞান-অজ্ঞানের শক্ত জমি চোরাবালির উপর তো আর ইতিহাসের তাজমহল খাড়া করা হয় না।

মাহমুদের ইতিহাস নূতন করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর সভাপণ্ডিত অল-বীরূনীর কথা বাদ দেবার উপায় নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে ছয়জন পণ্ডিতের নাম করলে অল-বীরূনীর নাম করতে হয়। সংস্কৃত-আরবী অভিধান ব্যাকরণ সে যুগে ছিল না (এখনো নেই), অল-বীরূনী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোনো মাধ্যম ভাষা ছিল না। তৎসত্ত্বেও এই মহাপুরুষ কি করে সংস্কৃত শিখে, হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্য, অলঙ্কার, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন সম্বন্ধে 'তহকীক-ই-হিন্দ' নামক বিরাট গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন সে এক অবিশ্বাস্য প্রহেলিকা।

একাদশ শতাব্দীতে অল-বীরূনী ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ লিখেছিলেন—প্রত্যুত্তরে আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় আফগানিস্থান সম্বন্ধে পুস্তক লেখেননি। এক দারাশীকুহ ছাড়া আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ আরবী ও সংস্কৃতে এরকম অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাতে পারেননি। এই বিংশ শতকেই ক'টি লোক সংস্কৃত আরবী দুই-ই জানেন আঙুলে গুনে বলা যায়।

ভারতবর্ষের পাঠান তুর্কী সম্রাটেরা আফগানিস্থানের দিকে ফিরে তাকাননি, কিন্তু আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। আলাউদ্দীন খিলজীর সভাকবি আমীর খুসরু ফার্সীতে কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর নাম ইরানে কেউ শোনেননি, কিন্তু কাবুল-কান্দাহারে আজকের দিনেও তাঁর প্রতিপত্তি হাফিজ-সাদীর চেয়ে কম নয়। 'ইশকিয়া' কাব্যে দেবলা দেবী ও খিজর খানের প্রেমের কাহিনী পড়েননি এমন শিক্ষিত মৌলবী আফগানিস্থানে আজও বিরল।

আফগানিস্থান—বিশেষ করে গজনীর—দৌত্যে উত্তর-ভারতবর্ষে ফার্সী ভাষা তার সাহিত্যসম্পদ, বাইজনটাইন সেরাসীন ইরানী স্থাপত্য, ইতিহাস-লিখনপদ্ধতি, ইউনানী ভেষজবিজ্ঞান, আরবী-ফার্সী শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদি প্রচলিত হয়ে, নূতন নূতন ধারা বয়ে নব নব বিকাশের পথে এগিয়ে চলল। একদিন আফগানিস্থান গ্রীক ও ভারতবাসীকে মিলিয়ে দিয়ে গান্ধার-কলার সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল, পাঠান-তুর্কী যুগে সেই আফগানিস্থান আরব-ইরানের সঙ্গে ভারতবর্ষের হাত মিলিয়ে দিল।

তারপর তৈমুরের অভিযান।

তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ সমরকন্দ ও হিরাতে নূতন শিল্পপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আফগানিস্থানের হিরাত অতি সহজেই তুর্কী-স্থানের সমরকন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তৈমুরের পুত্র শাহ-রুখ চীন দেশ থেকে শিল্পী আনিয়ে ইরানীদের সঙ্গে মিলিয়ে হিরাতে নবীন চারুকলার পত্তন করেন। তৈমুরের পুত্রবধূ গৌহর শাদ শিক্ষাদীক্ষায় রানী এলিজাবেথ, ক্যাথরিনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন ছিলেন না। তাঁর আপন অর্থে তৈরী মসজিদ-মাদ্রাসা দেখে তৈমুরের প্রপৌত্র বাবুর বাদশাহ চোখ ফেরাতে পারেনি। এখনো আফগানি-স্থানে যেটুকু দেখবার আছে, সে ঐ হিরাতে—যে কয়টি মিনার ইংরেজের বর্বরতা সত্ত্বেও এখনো বেঁচে আছে, সেগুলো দেখে বোঝা যায় মধ্য-এশিয়ার সর্বকলা-শিল্প কী আশ্চর্য প্রাণবলে সম্মিলিত হয়ে এই অনুর্বর দেশে কী অপূর্ব মরূদ্যান সৃষ্টি করেছিল।

অল-বীরূনীর পর গৌহর শাদ, তারপর বাবুর বাদশাহ।

শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতের নির্লজ্জ জাত্যভিমানের চূড়ান্ত প্রকাশ হয় যখন সে বাবরের আত্মজীবনী অপেক্ষা জুলিয়াস সীজারের আত্মজীবনীর বেশী প্রশংসা করে। কিন্তু সে আলোচনা উপস্থিত মুলতুবী থাক।

আফগানিস্থান ভ্রমণে যাবার সময় একখানা বই সঙ্গে নিয়ে গেলেই যথেষ্ট—

সে-বই বাবুরের আত্মজীবনী। বাবুর কান্দাহার গজনী কাবুল হিরাতের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে আজকের আফগানিস্থানের বিশেষ তফাত নেই।

বাবুর ফরগনার রাজা নন, আফগানিস্থানের শাহানশাহ নন, দিল্লীর সম্রাটও নন। আত্মজীবনীর অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পায়, বাবুর এসবের অতীত অত্যন্ত সাধারণ মাটির-গড়া মানুষ। হিন্দুস্থানের নববর্ষার প্রথম দিনে তিনি আনন্দে অধীর, জলালাবাদের আখ খেয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ—সেই আখ আপন দেশ ফরগনায় পোঁতবার জন্য টবে করে হিন্দুকুশের ভিতর দিয়ে চালান করেছেন, আর ঠিক তেমনি হিরাত থেকে গৌহর শাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা টবে করে নিয়ে এসে দিল্লীতে পুঁতে ভাবছেন এর ভবিষ্যৎ কি, এ তরু মঞ্জরিত হবে তো?

হয়েছিল। তাজমহল।

বাবুর ভারতবর্ষ ভালবাসেননি। কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলে বুঝতে পেরেছিলেন, ফরগনা কাবুলের লোভে যে বিজয়ী বীর দিল্লীর তখ্‌ৎ ত্যাগ করে সে মূর্খ। দিল্লীতে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপনা করলেন তিনি আপন প্রাণ দিয়ে, কিন্তু দেহ কাবুলে পাঠাবার হুকুম দিলেন মরবার সময়।

সমস্ত কাবুল শহরে যদি দেখবার মত কিছু থাকে, তবে সে বাবুরের কবর।

হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব। নব মৌর্য সাম্রাজ্য।

নাদির উত্তর-ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করে ফেরার পথে আফগানিস্থানে নিহত হন। লুন্ঠিত ঐশ্বর্য আফগান আহমদ শাহ আবদালীর (সাদদোজাই দুররানী) হস্তগত হয়। ১৭৪৭ সালের সমস্ত আফগানিস্থান নিয়ে সর্বপ্রথম নিজস্ব রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৭৬১ সালে পানিপথ। ১৭৭৩ সালে শিখদের নবজীবন।

ইতিমধ্যে মহাকাল শ্বেতবর্ণ ধারণ করে ভারতবর্ষে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করেছেন। ভারত-আফগানের ইতিহাসে এই প্রথম এক জাতের মানুষ দেখা দিল যে এই দুই দেশের কোনো দেশকেই আপন বলে স্বীকার করল না। এ যেন চিরস্থায়ী তৈমুর-নাদির।

উনবিংশ এবং বিংশ শতকে ইংরেজ হয় আফগানিস্থান জয় করে রাজ্য স্থাপনা করার চেষ্টা করেছে, নয় আফগান সিংহাসনে আপন পুতুল বসিয়ে রুশের মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আফগানিস্থান জয় করা কঠিন না হলেও দখল করা অসম্ভব। বিশেষত 'কাফির' ইংরেজের পক্ষে। আফগান মোল্লার অজ্ঞতা তার পাহাড়েরই মত উঁচু, কিন্তু ইংরেজকে সে বিলক্ষণ চেনে।

ইংরেজের পরম সৌভাগ্য যে, ১৮৫৭ সালে আমীর দোস্ত মুহম্মদ ইংরেজকে দোস্তী দেখিয়েছিলেন। তার চরম সৌভাগ্য যে, ১৯১৫ সালে রাজা মহেন্দ্র-

প্রতাপ আমীর হবীব উল্লাকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করতে পারেননি।

কিন্তু তিন বারের বার বেল টাকে পড়ল। আমান উল্লা ইংরেজকে সামান্য উত্তম-মধ্যম দিয়েই স্বাধীনতা পেয়ে গেলেন। তাই বোধ হয় কাবুলীরা বলে 'খুদা-দাদ' আফগানিস্থান অর্থাৎ 'বিধিদত্ত' আফগানিস্থান।

জিন্দাবাদ খুদা-দাদ আফগানিস্থান!

পনর

বাসা পেলুম কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে খাজামোল্লা গ্রামে। বাসার সঙ্গে সঙ্গে চাকরও পেলুম।

অধ্যক্ষ জিরার জাতে ফরাসী। কাজেই কায়দামাফিক আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর নাম আবদুর রহমান। আপনার সব কাজ করে দেবে—জুতো বুরুশ থেকে খুনখারাবি।' অর্থাৎ ইনি 'হরফন-মৌলা' বা 'সকল কাজের কাজী'।

জিরার সায়েব কাজের লোক, অর্থাৎ সমস্ত দিন কোনো না কোনো মন্ত্রীর দপ্তরে ঝগড়া-বচসা করে কাটান। কাবুলে এরই নাম কাজ। 'ও রভোয়া, বিকেলে দেখা হবে' বলে চলে গেলেন।

কাবুল শহরে আমি দুটি নরদানব দেখেছি। তার একটি আবদুর রহমান—দ্বিতীয়টির কথা সময় এলে হবে।

পরে ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছিলুম—ছ'ফুট চার ইঞ্চি। উপস্থিত লক্ষ্য করলুম লম্বাই মিলিয়ে চওড়াই। দুখানা হাত হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসে আঙুলগুলো দু'কাঁদি মর্তমান কলা হয়ে ঝুলছে। পা দুখানা ডিঙি নৌকার সাইজ। কাঁধ দেখে মনে হল, আমার বাবুর্চি আবদুর রহমান না হয়ে সে যদি আমীর আবদুর রহমান হত, তবে অনায়াসে গোটা আফগানিস্থানের ভার বইতে পারত। এ কান ও কান জোড়া মুখ—হাঁ করলে চওড়াচওড়ি কলা গিলতে পারে। এবড়ো-থেবড়ো নাক—কপাল নেই। পাগড়ি থাকায় মাথার আকার-প্রকার ঠাহর হল না, তবে আন্দাজ করলুম বেবি সাইজের হ্যাটও কান অবধি পৌঁছবে।

রঙ ফর্সা, তবে শীতে গ্রীষ্মে চামড়া চিরে ফেঁড়ে গিয়ে আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের চেহারা ধরেছে। দুই গাল কে যেন থাবড়া মেরে লাল করে দিয়েছে—কিন্তু কার এমন বুকের পাটা? রুজও তো মাখবার কথা নয়।

পরনে শিলওয়ার, কুর্তা আর ওয়াসকিট্।

চোখ দুটি দেখতে পেলুম না। সেই যে প্রথম দিন ঘরে ঢুকে কার্পেটের দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়েছিল, শেষ দিন পর্যন্ত ঐ কার্পেটের অপরূপ রূপ থেকে তাকে বড় একটা চোখ ফেরাতে দেখিনি। গুরুজনদের দিকে তাকাতে নেই, আফগানিস্থানেও নাকি এই ধরনের একটা সংস্কার আছে।

তবে তার নয়নের ভাবের খেলা গোপনে দেখেছি। দুটো চিনেমাটির ডাবরে যেন দুটো পান্তুয়া ভেসে উঠেছে।

জরিপ করে ভরসা পেলুম, ভয়ও হল। এ লোকটা ভীমসেনের মত রান্না তো করবেই, বিপদে-আপদে ভীমসেনেরই মত আমার মুশকিল-আসান হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, এ যদি কোনোদিন বিগড়ে যায়? তবে? কোনো একটা হদিসের সন্ধানে মগজ আতিপাতি করে খুঁজতে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ মনে পড়ল দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকে কুইনিন খেতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কে? কুইনিন সরাবে কে?'

তিনি কুইনিন খাননি। কিন্তু আমি মুসলমান—হিন্দু যা করে, তার উল্টো করতে হয়। তদ্দণ্ডেই আবদুর রহমান আমার মেজর ডোমো, শেফ্ দ্য কুইজিন, ফাই-ফরমাশ-বরদার তিনেক্কেতিন হয়ে একরারনামা পেয়ে বিড়বিড় করে যা বলল, তার অর্থ 'আমার চশম্, শির ও জান দিয়ে হুজুরকে খুশ করার চেষ্টা করব।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'পূর্বে কোথায় কাজ করেছ?'

উত্তর দিল, 'কোথাও না, পল্টনে ছিলুম, মেসের চার্জে। এক মাস হল খালাস পেয়েছি।'

'রাইফেল চালাতে পার?'

একগাল হাসল।

'কি কি রাঁধতে জানো?'

'পোলাও, কুর্মা, কাবাব, ফালুদা—।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফালুদা বানাতে বরফ লাগে। এখানে বরফ তৈরী করার কল আছে?'

'কিসের কল?'

আমি বললুম, 'তাহলে বরফ আসে কোত্থেকে?'

বলল, 'কেন, ঐ পাগমানের পাহাড় থেকে।' বলে জানলা দিয়ে পাহাড়ের বরফ দেখিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু সবচেয়ে উঁচু নীল পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা বরফ দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বরফ আনতে ঐ উঁচুতে চড়তে হয়?'

বলল, 'না সায়েব, এর অনেক নিচে বড় বড় গর্তে শীতকালে বরফ ভর্তি করে রাখা হয়। এখন তাই খুঁড়ে তুলে গাধা বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়।'

বুঝলুম, খবর-টবরও রাখে। বললুম, 'তা আমার হাঁড়িকুড়ি, বাসনকোসন তো কিছু নেই। বাজার থেকে সব কিছু কিনে নিয়ে এসো। রাত্তিরের রান্না আজ আর বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কাল দুপুরের রান্না কোরো। সকালবেলা চা দিয়ো।'

টাকা নিয়ে চলে গেল।

বেলা থাকতেই কাবুল রওনা দিলুম। আড়াই মাইল রাস্তা—মৃদুমধুর ঠাণ্ডায় গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছব। পথে দেখি এক পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিয়ে আবদুর রহমান ফিরে আসছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এত বোঝা বইবার কি দরকার ছিল—একটা মুটে ভাড়া করলেই তো হত।'

যা বলল, তার অর্থ এই, সে যে-মোট বইতে পারে না, সে-মোট কাবুলে বইতে যাবে কে ?

আমি বললুম, 'দুজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে আসতে।'

ভাব দেখে বুঝলুম, অতটা তার মাথায় খেলেনি, অথবা ভাববার প্রয়োজন বোধ করেনি।

বোঝাটা নিয়ে আসছিল জালের প্রকাণ্ড থলেতে করে। তার ভিতর তেল-নুন-লকড়ি সবই দেখতে পেলুম। আমি ফের চলতে আরম্ভ করলে বলল, 'সায়েব রাত্রে বাড়িতেই খাবেন।' যেভাবে বলল, তাতে অচিন দেশের নির্জন রাস্তায় গাঁইগুঁই করা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম না। 'হাঁ হাঁ, হবে হবে' বলে কি হবে ভালো করে না বুঝিয়ে হনহন করে কাবুলের দিকে চললুম।

খুব বেশী দূরে যেতে হল না। লব-ই-দরিয়া অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখি মসিয়ে জিরার টাঙ্গা হাঁকিয়ে টগবগাবগ করে বাড়ি ফিরছেন।

কলেজের বড়কর্তা বা বস্ হিসাবে আমাকে তিনি বেশ দু'-এক প্রস্থ ধমক দিয়ে বললেন, 'কাবুল শহরে নিশাচর হতে হলে যে তাগদ ও হাতিয়ারের প্রয়োজন, সে দুটোর একটাও তোমার নেই।'

বস্কে খুশী করবার জন্য যার ঘটে ফন্দি-ফিকিরের অভাব, তার পক্ষে কোম্পানির কাগজ হচ্ছে তর্ক না করা। বিশেষ করে যখন বসের উত্তমার্ধ তাঁরই পাশে বসে 'উই,'সার্তেনমাঁ, এভিদামাঁ, অর্থাৎ অভি অবশ্য, সার্টেনলি, এভিডেন্টলি, বলে তাঁর কথায় সায় দেন। ইংলণ্ডে মাত্র একবার ভিক্টোরিয়া আলবার্ট আতাৎ

হয়েছিল ; শুনতে পাই ফ্রান্সে নাকি নিত্যি-নিত্যি, ঘরে ঘরে।

বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে ঢুকতেই আবদুর রহমান একটা দর্শন দিয়ে গেল এবং আমি যে তার তম্বীতেই ফিরে এসেছি, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়ে হুট করে বেরিয়ে গেল।

তখন রোজার মাস নয়, তবু আন্দাজ করলুম সেহরির সময় অর্থাৎ রাত দুটোয় খাবার জুটলে জুটতেও পারে।

তন্দ্রা লেগে গিয়েছিল। শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল। আবদুর রহমান মোগল তসবিরের গাড়ু-বদনার সমন্বয় আফতাবে বা ধারাযন্ত্র নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। মুখ ধুতে গিয়ে বুঝলুম, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু কাবুল নদীর বরফ-গলা জলে মুখ কিছুদিন ধরে ধুলে আমার মুখও আফগানিস্থানের রিলিফ ম্যাপের উঁচুনিচুর টক্করের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে।

খানা-টেবিলের সামনে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমার ভৃত্য আগা আবদুর রহমান খান এককালে মিলিটারি মেসের চার্জে ছিলেন।

ডাবর নয়, ছোটখাটো একটা গামলা ভর্তি মাংসের কোরমা বা পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন কাথে সেরখানেক দুম্বার মাংস—তার মাঝে মাঝে কিছু বাদাম কিসমিস লুকোচুরি খেলছে, এক কোণে একটি আলু অপাংক্তেয় হওয়ার দুঃখে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক প্লেটে গোটা আষ্টেক ফুল বোম্বাই সাইজের শামী কাবাব। বারকোশ পরিমাণ থালায় এক ঝুড়ি কোফতা-পোলাও আর তার উপরে বসে আছে একটি আস্ত মুর্গী-রোস্ট।

আমাকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবদুর রহমান তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অভয়বাণী দিল—রান্নাঘরে আরো আছে।

একজনের রান্না না করে কেউ যদি তিনজনের রান্না করে, তবে তাকে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু সে যদি ছ'জনের রান্না পরিবেষণ করে বলে রান্নাঘরে আরো আছে তখন আর কি করার থাকে? অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

রান্না ভালো, আমার ক্ষুধাও ছিল, কাজেই গড়পড়তা বাঙালীর চেয়ে কিছু কম খাইনি। তার উপর অদ্য রজনী প্রথম রজনী এবং আবদুর রহমানও ডাক্তারী কলেজের ছাত্র যে রকম তন্ময় হয়ে মড়া কাটা দেখে, সেই রকম আমার খাওয়ার রকম-বহর দুই-ই তার ডাবর-চোখ ভরে দেখে নিচ্ছিল।

আমি বললুম, 'ব্যস্! উৎকৃষ্ট রেঁধেছ আবদুর রহমান—।'

আবদুর রহমান অন্তর্ধান। ফিরে এল হাতে এক থালা ফালুদা নিয়ে। আমি

সবিনয় জানালুম যে, আমি মিষ্টি পছন্দ করি না।

আবদুর রহমান পুনরপি অন্তর্ধান। আবার ফিরে এল এক ভাবর নিয়ে—পেঁজা বরফের গুঁড়ায় ভর্তি। আমি বোকা বনে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ আবার কি?'

আবদুর রহমান উপরের বরফ সরিয়ে দেখাল নীচে আঙুর। মুখে বলল, 'বাগেবালার বরফী আঙুর—তামাম আফগানিস্থানে মশহুর।' বলেই একখানা সসারে কিছু বরফ আর গোটা কয়েক আঙুর নিয়ে বসল। আমি আঙুর খাচ্ছি, ও ততক্ষণে এক-একটা করে হাতে নিয়ে সেই বরফের টুকরোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘষে—মেয়েরা যে রকম আচারের জন্য কাগজী নেবু পাথরের শিলে ঘষেন। বুঝলুম, বরফ-ঢাকা থাকা সত্ত্বেও আঙুর যথেষ্ট হিম হয়নি বলে এই মোলায়েম কায়দা। ওদিকে তালু আর জিবের মাঝখানে একটা আঙুরে চাপ দিতেই আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিনঝিম করে উঠছে। কিন্তু পাছে আবদুর রহমান ভাবে তার মনিব নিতান্ত জংলী তাই খাইবারপাসের হিম্মৎ বুকে সঞ্চয় করে গোটা আষ্টেক গিললুম। কিন্তু বেশীক্ষণ চালাতে পারলুম না; ক্ষান্ত দিয়ে বললুম, 'যথেষ্ট হয়েছে আবদুর রহমান, এবারে তুমি গিয়ে ভালো করে খাও।'

কার গোয়াল, কে দেয় ধুঁয়ো। এবারে আবদুর রহমান এলেন চায়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। কাবুলী সবুজ চা। পেয়ালায় ঢাললে অতি ফিকে হলদে রঙ দেখা যায়। সে চায়ে দুধ দেওয়া হয় না। প্রথম পেয়ালায় চিনি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় পেয়ালায় তাও না। তারপর ঐ রকম তৃতীয়, চতুর্থ—কাবুলীরা পেয়ালা ছয়েক খায়, অবিশ্যি পেয়ালা সাইজে খুব ছোট, কফির পাত্রের মত।

চা খাওয়া শেষ হলে আবদুর রহমান দশ মিনিটের জন্য বেরিয়ে গেল। ভাবলুম এই বেলা দরজা বন্ধ করে দি, না হলে আবার হয়ত কিছু একটা নিয়ে আসবে। আস্ত উটের রোস্টটা হয়ত দিতে ভুলে গিয়েছে।

ততক্ষণে আবদুর রহমান পুনরায় হাজির। এবার এক হাতে থলে-ভর্তি বাদাম আর আখরোট, অন্য হাতে হাতুড়ি। ধীরে সুস্থে ঘরের এককোণে পা মুড়ে বসে বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়াতে লাগল।

এক মুঠো আমার কাছে নিয়ে এসে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে বলল, 'আমার রান্না হুজুরের পছন্দ হয়নি।'

'কে বলল, পছন্দ হয়নি?'

'তবে ভালো করে খেলেন না কেন?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী আশ্চর্য, তোমার বপুটার সঙ্গে আমার তনুটা

মিলিয়ে দেখো দিকিনি—তার থেকে আন্দাজ করতে পারো না, আমার পক্ষে কি পরিমাণ খাওয়া সম্ভবপর ?'

আবদুর রহমান তর্কাতর্কি না করে ফের সেই কোণে গিয়ে আখরোট বাদামের খোসা ছাড়াতে লাগল।

তারপর আপন মনে বলল, 'কাবুলের আবহাওয়া বড়ই খারাপ। পানি তো পানি নয়, সে যেন গালানো পাথর। পেটে গিয়ে এক কোণে যদি বসল তবে ভরসা হয় না আর কোনো দিন বেরবে। কাবুলের হাওয়া তো হাওয়া নয়—আতসবাজির হল্কা। মানুষের ক্ষিদে হবেই বা কি করে।'

আমার দিকে না তাকিয়েই তারপর জিজ্ঞেস করল, 'হুজুর কখনো পানশির গিয়েছেন ?'

'সে আবার কোথায় ?'

'উত্তর-আফগানিস্থান। আমার দেশ—সে কী জায়গা! একটা আস্ত দুম্বা খেয়ে এক ঢোক পানি খান, আবার খিদে পাবে। আকাশের দিকে মুখ করে একটা লম্বা দম নিন, মনে হবে তাজী ঘোড়ার সঙ্গে বাজী রেখে ছুটতে পারি। পানশিরের মানুষ তো পায়ে হেঁটে চলে না, বাতাসের উপর ভর করে যেন উড়ে চলে যায়।

'শীতকালে সে কী বরফ পড়ে! মাঠ পথ পাহাড় নদী গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যায়, ক্ষেত খামারের কাজ বন্ধ, বরফের তলায় রাস্তা চাপা পড়ে গেছে। কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, বাড়ি থেকে বেরনোর কথাই ওঠে না। আহা সে কি আরাম! লোহার বারকোশে আঙার জ্বালিয়ে তার উপর ছাই ঢাকা দিয়ে কম্বলের তলায় চাপা দিয়ে বসবেন গিয়ে জানলার ধারে। বাইরে দেখবেন বরফ পড়ছে, বরফ পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে—দু দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন ধরে। আপনি বসেই আছেন, বসেই আছেন, আর দেখছেন চে তৌর বর্ফ ববারদ—কি রকম বরফ পড়ে।'

আমি বললুম, 'সাত দিন ধরে জানলার কাছে বসে থাকব ?'

আবদুর রহমান আমার দিকে এমন করুণ ভাবে তাকালো যে, মনে হল এ রকম বেরসিকের পাল্লায় সে জীবনে আর কখনো এতটা অপদস্থ হয়নি। ম্লান হেসে বলল, 'একবার আসুন, জানলার পাশে বসুন, দেখুন। পছন্দ না হয়, আবদুর রহমানের গর্দান তো রয়েছে।'

খেই তুলে নিয়ে বলল, 'সে কত রকমের বরফ পড়ে। কখনো সোজা, ছেঁড়া ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মত, তারি ফাঁকে ফাঁকে আসমান জমিন কিছু কিছু দেখা

যায়। কখনো ঘুরঘুট্টি ঘন,—চাদরের মত নেবে এসে চোখের সামনে পর্দা টেনে দেয়। কখনো বয় জোর বাতাস,—প্রচণ্ড ঝড়। বরফের পাঁজে যেন সে-বাতাস ডাল গলাবার চর্কি চালিয়ে দিয়েছে। বরফের গুঁড়ো ডাইনে বাঁয়ে উপর নিচে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগায়—হু হু করে কখনো একমুখো হয়ে তাজী ঘোড়াকে হার মানিয়ে ছুটে চলে। কখনো সব ঘুটঘুটে অন্ধকার, শুধু শুনতে পাবেন সোঁ—ওঁ—ওঁ—তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে যেন দারুল আমানের এঞ্জিনের শিটির শব্দ। সেই ঝড়ে ধরা পড়লে রক্ষে নেই, কোথা থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, না হয় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবেন বরফের বিছানায়, তারই উপর জমে উঠবে দু'হাত উঁচু বরফের কম্বল—গাদা গাদা, পাঁজা পাঁজা। কিন্তু তখন সে বরফের পাঁজা সত্যিকার কম্বলের মত ওম্ দেয়। তার তলায় মানুষকে দু'দিন পরেও জ্যান্ত পাওয়া গিয়েছে।

'একদিন সকালে ঘুম ভাঙলে দেখবেন বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূর্য উঠেছে—সাদা বরফের উপর সে রোশনির দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় না। কাবুলের বাজারে কালো চশমা পাওয়া যায়, তাই পরে তখন বেড়াতে বেরোবেন। যে হাওয়া দম নিয়ে বুকে ভরবেন তাতে একরত্তি ধুলো নেই, বালু নেই, ময়লা নেই। ছুরির মত ধারালো ঠাণ্ডা হাওয়া নাক মগজ গলা বুক চিরে ঢুকবে, আবার বেরিয়ে আসবে ভিতরকার সব ময়লা ঝেঁটিয়ে নিয়ে। দম নেবেন, ছাতি এক বিঘৎ ফুলে উঠবে—দম ফেলবেন এক বিঘৎ নেমে যাবে। এক এক দম নেওয়াতে এক এক বছর আয়ু বাড়বে—এক একবার দম ফেলাতে একশ'টা বেমারি বেরিয়ে যাবে।

'তখন ফিরে এসে, হুজুর একটা আস্ত দুম্বা যদি না খেতে পারেন তবে আমি আমার গোঁপ কামিয়ে ফেলব। আজ যা রান্না করেছিলুম তার ডবল দিলেও আপনি ক্ষিদের চোটে আমায় কতল করবেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, আবদুর রহমান তোমার কথাই সই। শীতকালটা আমি পানশিরেই কাটাব।'

আবদুর রহমান গদগদ হয়ে বলল, 'সে বড় খুশীর বাৎ হবে হুজুর।'

আমি বললুম, 'তোমার খুশীর জন্য নয়, আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য।'

আবদুর রহমান ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকালো।

আমি বুঝিয়ে বললুম, 'তুমি যদি সমস্ত শীতকালটা জানলার পাশে বসে কাটাও তবে আমার রান্না করবে কে?'

ষোল

শো' কেসে রবারের দস্তানা দেখে এক আইরিশম্যান আরেক আইরিশম্যানকে জিজ্ঞেস করেছিল, জিনিসটা কোন্ কাজে লাগে। দ্বিতীয় আইরিশম্যানও সেই রকম, বলল, 'জানিসনে, এ দস্তানা পরে হাত ধোয়ার ভারী সুবিধে। হাত জলে ভেজে না, অথচ হাত ধোওয়া হল।'

কুঁড়ে লোকের যদি কখনো শখ হয় যে সে ভ্রমণ করবে অথচ ভ্রমণ করার ঝুঁকি নিতে সে নারাজ হয় তবে তার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত পন্থা কাবুলের সংকীর্ণ উপত্যকায়। কারণ কাবুলে দেখবার মত কোনো বালাই নেই।

তিন বছর কাবুলে কাটিয়ে দেশে ফেরবার পর যদি কোনো সবজান্তা আপনাকে প্রশ্ন করেন, 'দেহ্-আফগানান যেখানে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে মিশেছে তার পিছনের ভাঙা মসজিদের মেহরাবের বাঁ দিকে চেনমতিফে ঝোলানো মেডালিয়োনেতে আপনি পদ্মফুলের প্রভাব দেখেছেন?' তা হলে আপনি অম্লান বদনে বলতে পারেন 'না', কারণ ওরকম পুরোনো কোনো মসজিদ কাবুলে নেই।

তবু যদি সেই সবজান্তা ফের প্রশ্ন করেন, 'বুখারার আমীর পালিয়ে আসার সময় জে ইরানী তসবিরের বাণ্ডিল সঙ্গে এনেছিলেন, তাতে হিরাতের জরীন-কলম ওস্তাদ বিহজাদের আঁকা সমরকন্দের পোলো খেলার ছবি দেখেছেন?' আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন 'না' কারণ কাবুল শহরে ওরকম কোনো তসবিরের বাণ্ডিল নেই।

পণ্ডিতদের কথা হচ্ছে না। যে আস্তাবলে সিকন্দর শাহের ঘোড়া বাঁধা ছিল, সেখানে এখন হয়ত বেগুন ফলছে। পণ্ডিতরা কম্পাস নিয়ে তার নিশানা লাগাতে পারলে আনন্দে বিহ্বল। কোথায় এক টুকরো পাথরে বুদ্ধের কোঁকড়া চুলের আড়াই গাছা ঘষে ক্ষয়ে প্রায় হাতের তেলোর মত পালিশ হয়ে গিয়েছে; তাই পেয়ে পণ্ডিত পঞ্চমুখ—পাড়া অতিষ্ঠ করে তোলেন। এঁদের কথা হচ্ছে না। আমি সাধারণ পাঁচজনের কথা বলছি, যারা দিল্লী আগ্রা সেকেন্দ্রার জেল্লাই দেখেছে। তাদের চোখে চটক, বুকে চমক লাগাবার মত রসবস্তু কাবুলে নেই।

কাজেই কাবুলে পৌঁছে কাউকে তুর্কীনাচের চকিবাজি খেতে হয় না। পাথর-ফাটা রোদ্দুরে শুধু পায়ে শান বাঁধানো ছ'ফার্লোঙী চত্বর ঘষ্টাতে হয় না, নাকে মুখে চামচিকে বাদুড়ের থাবড়া খেয়ে খেয়ে পচা বোঁটকা গন্ধে আধা ভিরমি গিয়ে মিনার-শিখর চড়তে হয় না।

আইরিশম্যানের মত দিব্যি হাত ধোওয়া হল, অথচ হাত ভিজল না।

তাই কাবুল মনোরম জায়গা। এবং সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে যে, যা কিছু দেখবার তা বিনা মেহন্নতে দেখা যায়। বন্ধু-বান্ধবের কেউ না কেউ কোনো একটা বাগানে সমস্ত দিন কাটাবার জন্য একদিন ধরে নিয়ে যাবেই।

গুলবাগ কাবুলের কাছেই—হেঁটে, টাঙ্গায়, মোটরে যে কোনো কৌশলে যাওয়া যায়।

তিনদিকে উঁচু দেওয়াল, একদিকে কাবুল নদী; তাতে বাঁধ দিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা পুকুরের মত শান্ত স্বচ্ছ করা হয়েছে। বাগানে অজস্র আপেল-নাসপাতির গাছ, নরগিস্ ফুলের চারা, আর ঘন সবুজ ঘাস। কার্পেট বানাবার অনুপ্রেরণা মানুষ নিশ্চয় এই ঘাসের থেকেই পেয়েছে। সেই নরম তুলতুলে ঘাসের উপর ইয়ার-বক্সী ভালো ভালো কার্পেট পেতে গাব্দাগোব্দা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবেন। পাঁচ মিনিট যেতে না-যেতে সবাই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বেন।

দীর্ঘ তন্বঙ্গী চিনারের ঘন-পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে দেখবেন আস্বচ্ছ ফিরোজা আকাশ। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখবেন কাবুল পাহাড়ের গায়ে সাদা মেঘের হুটোপুটি। কিম্বা দেখবেন হুটোপুটি নয়, একপাল সাদা মেঘ যেন গৌরীশঙ্কর জয় করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কোমর বেঁধে প্ল্যানমাফিক একজন আরেকজনের পিছনে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চূড়ো পেরিয়ে ওদিকে চলে যাবার তাদের মতলব। ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটে চড়ার পর কোন্ এক অদৃশ্য নন্দীর ত্রিশূলে ঘা খেয়ে নেমে আসছে, আবার এগচ্ছে, আবার ধাক্কা খাচ্ছে। তারপর আলাদা ট্যাকটিক চালাবার জন্য দু'তিনজন একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে বিলকুল এক হয়ে গিয়ে নূতন করে পাহাড় বাইতে শুরু করবে। হঠাৎ কখন পাহাড়ের আড়াল থেকে আরেক দল মেঘের চূড়োয় পৌঁছতে পেরে খানিকটা মাথা দেখিয়ে এদের যেন লজ্জা দিয়ে আড়ালে ডুব মারবে।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখবেন চিনারপল্লব, পাহাড় সব কিছু ছাড়িয়ে উর্ধ্বে অতি উর্ধ্বে আপনারই মত নীল গালচেয় শুয়ে একখানা টুকরো মেঘ অতি শান্ত নয়নে নিচের মেঘের গৌরীশঙ্কর-অভিযান দেখছে—আপনারই মত। ওকে 'মেঘদূত' করে হিন্দুস্থান পাঠাবার যো নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হয় যেন বাবুরশাহের আমল থেকে সে ঐখানে শুয়ে আছে, আর কোথাও যাবার মতলব নেই। পানশিরের আবদুর রহমান এরই কাছ থেকে চুপ করে বসে থাকার কায়দাটা রপ্ত করেছে।

নাকে আসবে নানা অজানা ফুলের মেশা গন্ধ। যদি গ্রীষ্মের অন্তিম নিঃশ্বাস হয়, তবে তাতে আরো মেশানো আছে পাকা আপেল, অ্যাপ্রিকটের বাসী বাসী

গন্ধ। তিন পাঁচিলের বন্ধ হাওয়াতে সে গন্ধ পচে গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি নেশার আমেজ লাগায়। চোখ বন্ধ হয়ে আসে—তখন শুনতে পাবেন উপরের হাওয়ার দোলে তরুপল্লবের মর্মর আর নাম-না-জানা পাখির জান-হানা-দেওয়া ক্লান্ত কূজন।

সব গন্ধ ডুবিয়ে দিয়ে অতি ধীরে ধীরে ভেসে আসবে বাগানের এক কোণ থেকে কোর্মা-পোলাও রান্নার ভারী খুশবাই। চোখে তন্দ্রা, জিভে জল। দ্বন্দ্বের সমাধান হবে হঠাৎ গুড়ুম শব্দে, আর পাহাড়ে পাহাড়ে মিনিটখানেক ধরে তার প্রতিধ্বনি শুনে।

কাবুলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় থেকে বেলা বারোটার কামান দাগার শব্দ। সবাই আপন আপন ট্যাঁকঘড়ি খুলে দেখবেন—হাতঘড়ির রেওয়াজ কম—ঘড়ি ঠিক চলছে কিনা। কাবুলে এ রেওয়াজ অলঙ্ঘনীয়। ঘড়ি না-বের-করা স্নবের লক্ষণ.—'আহা যেন একমাত্র ওঁয়ার ঘড়িরই চেক-আপের দরকার নেই—'

যাঁদের ঘড়ি কাঁটায় কাঁটায় বারোটা দেখালো না, তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। কাবুলের কামান নাকি ইহজন্মে কখনো ঠিক বারোটার সময় বাজেনি। কারো ঘড়ি যদি ঠিক বারোটা দেখাল তার তবে রক্ষে নেই। সকলেই তখন নিঃসন্দেহ যে, সে ঘড়িটা দাগী-খুনী—ওঁদের ঘড়ির মত বেনিফিট অব ডাউট পেতে পারে না। গান্ধার শিল্পের বুদ্ধমূর্তির চোখেমুখে যে অপার তিতিক্ষা, তাই নিয়ে সবাই তখন সে ঘড়িটার দিকে করুণ নয়নে তাকাবেন।

মীর আসলম আরবী ছন্দে ফার্সী বলতেন অর্থাৎ আমাদের দেশে ভটচাযরা যে রকম সংস্কৃতের তেলে ডোবানো সপসপে বাঙলা বলে থাকেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভ্রাতঃ, 'চহার-মগজ্-শিকন' কি বস্তু তস্য সন্ধান করিয়াছ কি?'

আমি বললুম, ''চহার' মানে 'চার' আর 'মগজ্' মানে 'মগজ', 'শিকস্তন' মানে 'টুকরো টুকরো করা'। অর্থাৎ যা দিয়ে চারটে মগজ ভাঙা যায়, এই আরবী ব্যাকরণ-ট্যাকরণ কিছু হবে আর কি?'

মীর আসলম বললেন, ''চহার-মগজ' মানে 'চতুর্মস্তিষ্ক' অতি অবশ্য সত্য, কিন্তু যোগরূঢ়ার্থে ঐ বস্তু আক্ষোট অথবা আখরোট। অতএব 'চহার-মগজ্-শিকন' বলতে শক্ত লোহার হাতুড়ি বোঝায়।' তারপর দাগীঘড়িওয়ালা প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আয় বরাদরে আজীজে মন্, হে আমার প্রিয় ভ্রাতঃ, যোগরূঢ়ার্থে ঘটিকাযন্ত্র অথচ ধর্মত কার্যত যে দ্রব্য 'চহার-মগজ্-শিকন' সে বস্তু তুমি তোমার যাবনিক অঙ্গরক্ষার আস্তরণ মধ্যে পরম প্রিয়তমার ন্যায় বক্ষ-সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছ কেন? অপিচ পশ্য, পশ্য, অদূরে উদ্যানপ্রান্তে

পরিচারকবৃন্দ উপর্যুক্ত যন্ত্রাভাবে উপলখণ্ড দ্বারা অক্ষরোট ভগ্ন করিবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হইতেছে। তোমার হৃদয় কি ঐ উপলখণ্ডের ন্যায় কঠিন অথবা বজ্রাদপি কঠোর?'

দাগী ঘড়ি রাখা এমনি ভয়ঙ্কর পাপ যে, প্যারিসফের্তা বাকচতুর সইফুল আলম পর্যন্ত একটা জুতসই উত্তর দিতে পারলেন না। সাদামাটা কি একটা বিড় বিড় করলেন যার অর্থ 'এক মাঘে শীত যায় না'।

মীর আসলম বললেন, 'ঐ সহস্র হস্ত উচ্চ পর্বতশিখর হইতে তথাকথিত দ্বাদশ ঘটিকার সময় এক সনাতন কামান ধূম্র উদ্‌গিরণ করে—কথনো কথনো তজ্জনিত শব্দও কাবুল নাগরিকরাজির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। শুনিয়াছি, একদা দ্বিপ্রহরে তোপচী লক্ষ্য করিল যে, বিস্ফোরকচূর্ণের অনটন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আদেশ করিল সে যেন নগরপ্রান্তের অস্ত্রশালা হইতে প্রয়োজনীয় চূর্ণ আহরণ করিয়া লইয়া আইসে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই সহস্র হস্ত পরিমাণ পর্বত অবতরণ করিল, শ্রান্তি দূরার্থে বিপণি মধ্যে প্রবেশ করত অষ্টাধিক পাত্র চৈনিক যূষ পান করিল প্রয়োজনীয় ধূম্রচূর্ণ আহরণ করত পুনরায় সহস্রাধিক হস্ত পর্বতশিখরে আরোহণ করিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। স্বীকার করি, অপ্রশস্ত দিবালোকেই সেইদিন নাগরিকবৃন্দ কামানধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু ভ্রাতঃ সইফুল আলম, সেইদিনও কি তোমার 'চহার-মগ্‌জ্‌-শিকন' কণ্টকে কণ্টকে দ্বাদশ ঘটিকার লাঞ্ছন অঙ্কন করিয়াছিল?'

আমি বললুম, 'এ রকম ঘড়ি আমাদের দেশেও আছে—তাকে বলা হয়, আঁব-পাড়ার ঘড়ি।'

সইফুল আলম আর মীর আসলম ছাড়া সবাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আঁব' কি? সইফুল আলম বোম্বাই হয়ে প্যারিস যাওয়া-আসা করেছেন। কিন্তু মীর আসলম?

তিনিই বললেন, 'আম্র অতীব সুরসাল ভারতীয় ফলবিশেষ। দ্রাক্ষা আম্রের মধ্যে কাহাকে রাজমুকুট দিব সেই সমস্যা এযাবৎ সমাধান করিতে পারি নাই।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কিন্তু আপনি আম খেলেন কোথায়?'

মীর আসলম বললেন, 'চতুর্দশ বৎসর হিন্দুস্থানের দেওবন্দ রামপুরে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অদ্য তোমার নিকট হইতে এই প্রশ্ন শুনিতে হইল? কিন্তু শোকাতুর হইব না, লক্ষ্য করিয়াছি তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবলা। শুভলগ্নে একদিন তোমাকে ভারত-আফগানিস্থানের সংস্কৃতিগত যোগাযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিব। উপস্থিত পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে তোমার অনুগত ভৃত্য আবদুর

রহমান খান তোমার মুখারবিন্দ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া দণ্ডায়মান।'

কী আপদ, এ আবার জুটল কোত্থেকে?

দেখি হাতে লুঙ্গি তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে। বলল, 'খানা তৈরী হতে দেরি নেই, যদি গোসল করে নেন।'

ইয়ারদোস্তের দু'চারজন ততক্ষণে বাঁধে নেমেছে। সবাই কাবুল-বাসিন্দা, সাঁতার জানেন না, জলে নামলেই পাথরবাটি। মাত্র একজন চতুর্দিকে হাত-পা ছুঁড়ে, বারিমন্থনে গোয়ালন্দী জাহাজকে হার মানিয়ে বিপুল কলরবে ওপারে পৌঁছে হাঁপাচ্ছেন। এপারে অফুরন্ত প্রশংসাধ্বনি, ওপারে বিরাট আত্মপ্রসাদ। কাবুল নদী সেখানটায় চওড়ায় কুড়ি গজও হবে না।

কিন্তু সেদিন গুলবাগে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। কাবুলীরা কখনো ডুব-সাঁতার দেখেনি।

ঐ একটিবারই এপার-ওপার সাঁতার কেটেছিলুম। ও রকম ঠাণ্ডা জল আমাদের দেশের শীতকালের রাতদুপুরে পানাঠাসা এঁদো পুকুরেও হয় না। সেই দু'মিনিট সাঁতার কাটায় খেসারতি দিয়েছিলুম ঝাড়া এক ঘণ্টা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে, দাঁতে দাঁতে কত্তাল বাজিয়ে, সর্ব্বাঙ্গে অশথপাতার কাঁপন জাগিয়ে।

মীর আসলম অভয় দিয়ে বললেন, 'বরফগলা জলে নাইলে নিওমোনিয়ার ভয় নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'মানসসরোবরে ডুব দিয়ে যখন মানুষ মরে না, তখন আর ভয় কিসের?' কিন্তু বুঝতে পারলুম বন্ধু বিনায়ক রাও মসোজী মানস-সরোবরে ডুব দেবার পর কেন তিন ঘণ্টা ধরে রোদ্দুরে ছুটোছুটি করেছিলেন। মানস বিশ হাজার ফুটের কাছাকাছি, কাবুল সাত হাজারও হবে না।

কিন্তু সেদিন মীর আসলম আর সইফুল আলম ছাড়া সক্কলেরই দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছিল যে, আমি মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ায় তখনো প্রাণের ভয়ে কাঁপছি। শেষটায় বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আবার না হয় ডুব-সাঁতার দেখাচ্ছি।'

সবাই 'হাঁ হাঁ, কর কি, কর কি,' বলে ঠেকালেন। অবশ্যমৃত্যুর হাত থেকে এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের জান বাঁচানো অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

তিন টুকরো পাথর, বাগান থেকেই কুড়ানো শুকনো ডাল-পাতা আর দু'-চারটে হাঁড়িবাসন দিয়ে উত্তম রান্না করার কায়দায় ভারতীয় আর কাবুলী রাঁধুনীতে কোনো তফাত নেই। বিশেষত মীর আসলম উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যে গড়ে-ওঠা পণ্ডিত। অর্থাৎ গুরুগৃহে থাকার সময় ইনি রান্না করতে শিখেছিলেন। তাঁর তদারকিতে সেদিনের রান্না হয়েছিল যেন হাফিজের একখানা উৎকৃষ্ট গজল।

যখন ঘুম ভাঙলো, তখন দেখি সমস্ত বাগান নাক ডাকাচ্ছে—একমাত্র হুঁকোটা ছাড়া। তা আমরা যতক্ষণ জেগেছিলুম, সে এক লহমার তরেও নাক ডাকানোতে কামাই দেয়নি। কিন্তু কাবুলী তামাক ভয়ংকর তামাক—সাক্ষাৎ পেল্লাদ মারা গুলী। প্রহ্লাদকে হাতীর পায়ের তলায়, পাহাড় থেকে ফেলে, পাষাণ চাপা দিয়ে মারা যায়নি, কিন্তু এ তামাকে তিনি দুটি দম দিলে আর দেখতে হত না। এ তামাক লোকে যত না খায়, তার চেয়ে বেশী কাশে। ঠাণ্ডা দেশ বলে আফগানিস্থানের তামাক জাতে ভালো, কিন্তু সে তামাককে মোলায়েম করার জন্য চিটে-গুড়ের ব্যবহার কাবুলীরা জানে না, আর মিষ্টি-গরম ধিকিধিকি আগুনের জন্য টিকে বানাবার কায়দা তারা এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি।

পড়ন্ত রোদে দীর্ঘ তরুর দীর্ঘতর ছায়া বাগান জুড়ে ফালি ফালি দাগ কেটেছে। সবুজ কালোর ডোরাকাটা নাদুসনুদুস জেব্রার মত বাগানখানা নিশ্চিন্দি মনে ঘুমোচ্ছে। নরগিস্ ফুল ফোটার তখনো অনেক দেরি, কিন্তু চারা-ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারা যেন রোদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঙা হয়ে উঠেছে। কল্পনা না সত্যি বলতে পারব না, কিন্তু মনে হল যেন অল্প অল্প গন্ধ সেদিক থেকে ভেসে আসছে। রাত্তিরে যে খুশবাইয়ের মজলিশ বসবে, তারি মোহড়ার সেতারে যেন অল্প অল্প পিড়িং পিড়িং মিঠা বোল ফুটে উঠেছে। জলে ছাওয়ায়, মিঠে হাওয়ায় সমস্ত বাগান সুধাশ্যামলিম, অথচ এই বাগানের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে হাজার ফুট উঁচু কালো নেড়া পাথরের খাড়া পাহাড়। তাতে এক ফোঁটা জল নেই, এক মুঠো ঘাস নেই। বুকে একরত্তি দয়ামায়ার চিহ্ন নেই—যেন উলঙ্গ সাধক মাথায় মেঘের জটা বেঁধে কোনো এক মন্বন্তরব্যাপী কঠোর সাধনায় মগ্ন।

পদপ্রান্তে গুলবাগের সবুজপরী কেঁদে কেঁদে কাবুল নদী ভরে দিয়েছে।

ফকীরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাড়ি ফিরে কোনো কাজে মন গেল না। বিছানায় শুয়ে আবদুর রহমানকে বললুম, জানলা খুলে দিতে। দেখি পাহাড়ের চূড়ায় সপ্তর্ষি। 'আঃ' বলে চোখ বন্ধ করলুম। সমস্ত দিন দেখেছি অজানা ফুল, অজানা গাছ, আধাচেনা মানুষ, আর অচেনার চেয়েও পীড়াদায়ক অপ্রিয়দর্শন শুষ্ক কঠিন পর্বত। হঠাৎ চেনা সপ্তর্ষি দেখে সমস্ত দেহমন জুড়ে দেশের চেনা ঘর-বাড়ির জন্য কি এক আকুল আগ্রহের আঁকুবাঁকু ছড়িয়ে পড়ল।

স্বপ্নে দেখলুম, মা এবার নমাজ পড়ে উত্তরের দাওয়ায় বসে সপ্তর্ষির দিকে তাকিয়ে আছেন।

সত্তর

কাবুলে দুই নম্বরের দ্রষ্টব্য তার বাজার। অমৃতসর, আগ্রা, কাশীর পুরোনো বাজার যাঁরা দেখেছেন, এ বাজারের গঠন তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। সরু রাস্তা, দুদিকে বুক-উঁচু ছোট ছোট খোপ। পানের দোকানের দুই বা তিন-ডবল সাইজ। দোকানের সামনের দিকটা খোলা বাক্সের ঢাকনার মত এগিয়ে এসে রাস্তার খানিকটা দখল করেছে। কোনো কোনো দোকানে বাক্সের ডালার মত কব্জা লাগানো, রাত্রে তুলে দিয়ে দোকানের নিচের আধখানা বন্ধ করা যায় —অনেকটা ইংরিজীতে যাকে বলে 'পুটিঙ আপ দি শাটার'।

বুকের নিচ থেকে রাস্তা অবধি কিংবা তারো কিছু নিচে দোকানেরই একতলা গুদাম-ঘর, অথবা মুচির দোকান। কাবুলের যে কোনো বাজারে শতকরা ত্রিশটি দোকান মুচির। পেশাওয়ারে পাঠানরা যদি হপ্তায় একদিন জুতোতে লোহা পোঁতায়, তবে কাবুলে তিন দিন। বেশীরভাগ লোকেরই কাজ-কর্ম নেই—কোনো একটা দোকানে লাফ দিয়ে উঠে বসে দোকানীর সঙ্গে আড্ডা জমায়, ততক্ষণ নিচের অথবা সামনের দোকানের একতলায় মুচি পয়জারে গোটাকয়েক লোহা ঠুকে দেয়।

আপনি হয়ত ভাবছেন যে, দোকানে বসলে কিছু একটা কিনতে হয়। আদপেই না। জিনিসপত্র বেচার জন্য কাবুলী দোকানদার মোটেই ব্যস্ত নয়। কুইক টার্নওভার নামক পাগলা রেসের রেওয়াজ প্রাচ্যদেশীয় কোনো দোকানে নেই। এমন কি কলকাতা থেকেও এই গদাইলস্করী চাল সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। চিৎপুরের শালওয়ালা, বড়বাজারের আতরওয়ালা এখনও এই আরামদায়ক ঐতিহ্যটি বজায় রেখেছে।

সুখদুঃখের নানা কথা হবে—কিন্তু পলিটিক্স ছাড়া। তাও হবে, তবে তার জন্য দোস্তি ভালো করে জমিয়ে নিতে হয়। কাবুলের বাজার ভয়ঙ্কর ধূর্ত—তিন দিন যেতে না যেতেই তামাম বাজার জেনে যাবে আপনি ব্রিটিশ লিগেশনে ঘন ঘন গতায়াত করেন কিনা—ভারতবাসীর পক্ষে রাশিয়ান দূতাবাস অথবা আফগান ফরেন আপিসের গোয়েন্দা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। যখন দোকানী জানতে পারে যে, আপনি হাই-পলিটিক্স নিয়ে বিপজ্জনক জায়গায় খেলাধুলো করেন না, তখন আপনাকে 'বাজার গপ্' বলতে তার আর বাধবে না। আর সে অপূর্ব গপ্—বলশেভিক তুর্কীস্থানের স্ত্রীস্বাধীনতা থেকে আরম্ভ করে, পেশাওয়ারের জানকীবাঈকে ছাড়িয়ে দিল্লীর বড়লাটের বিবিসায়েবের বিনে পয়সায় হীরা-পান্না

বিদেশী কার্পেট। আপনি উঠি উঠি করছিলেন, দোকানদার কিছুতেই ছাড়বে না। হয়ত মোটা রকমের ব্যবসা হবে, খুদা মেহেরবান, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর রসুলেরও আশীর্বাদ রয়েছে, আপনারও যখন ভয়ঙ্কর তাড়া নেই, তখন দাওয়াতটা খেয়ে গেলেই পারেন।

রাস্তায় অনেক অকেজো ছেলে-ছোকরা ঘোরাঘুরি করছে—তাদেরই একটাকে ডেকে বলবে, 'ও বাচ্চা, চাওয়ালাকে বল তো আরেকপ্রস্থ চা দিয়ে যেতে।'

তারপর সেই সব কার্পেটের বস্তা খোলা হবে। কত রঙ, কত চিত্রবিচিত্র নক্সা, কী মোলায়েম স্পর্শসুখ। কার্পেট-শাস্ত্র অগাধ শাস্ত্র—তার কূল-কিনারাও নেই। কাবুলের বাজারে অন্তত ত্রিশ জাতের কার্পেট বিক্রি হয়, তাদের আবার নিজের জাতের ভিতরে বহু গোত্র, বহু বর্ণ। জন্মভূমি, রঙ, নক্সা, মিলিয়ে সরেস নিরেস মালের বাছবিচার হয়। বিশেষ রঙের নক্সা বিশেষ উৎকৃষ্ট পশম দিয়ে তৈরী হয়—সে মালের সস্তা জিনিস হয় না। এককালে বেনারসী শাড়িতে এই ঐতিহ্য ছিল—আড়িবেল শাড়ির বিশেষ নক্সা বিশেষ উৎকৃষ্ট রেশমেই হত—সে নক্সায় নিরেস মাল দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা ছিল না।

আজকের দিনে কাবুলের বাজারে কেনবার মত তিনটে ভালো জিনিস আছে—কার্পেট, পুস্তিন আর সিল্ক। ছোটখাটো জিনিসের ভিতর ধাতুর সামোভার আর জড়োয়া পয়জার। বাদবাকি বিলাতী আর জাপানী কলের তৈরী সস্তা মাল, ভারতবর্ষ হয়ে আফগানিস্থানে ঢুকেছে।

কাবুলের বাজার ক্রমেই গরীব হয়ে আসছে। তার প্রধান কারণ ইরান ও রুশের নবজাগরণ। আমুদরিয়ার ওপারের মালে বাঁধ দিয়ে রাশানরা তার স্রোত মস্কোর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, ইরানীরা তাদের মাল সোজাসুজি ইংরেজ অথবা রাশানকে বিক্রি করে। কাবুলের পয়সা কমে গিয়েছে বলে সে ভারতের মাল আর সে পরিমাণে কিনতে পারে না—আমাদের রেশম মলমল মসলিন শিল্পেরও কিছু মরমর, বেশীর ভাগ ইংরেজ সাত হাত মাটির নিচে কবর দিয়ে শ্রাদ্ধশান্তি করে চুকিয়ে দিয়েছে।

বাবুর বাদশা কাবুলের বাজার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বহু জাতের ভিড়ে কান পেতে যে-সব ভাষা শুনেছিলেন, তার একটা ফিরিস্তিও তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়েছেন ;—

আরবী, ফার্সী, তুর্কী, মোগলী, হিন্দী, আফগানী, পশাঈ, প্রাচী, গেবেরী, বেরেকী ও লাগমানী।

'প্রাচী' হল পূর্ব-ভারতবর্ষের ভাষা, অযোধ্যা অঞ্চলের পূরবীয়া—বাঙলা ভাষা তারই আওতায় পড়ে।

সে সব দিন গেছে; তামাম কাবুলে এখন যুক্তপ্রদেশের তিনজন লোকও আছে কিনা সন্দেহ।

তবু প্রাণ আছে, আনন্দ আছে। বাজারের শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড সরাই। সেখানে সন্ধ্যার নমাজের পর সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য কাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে বেঁচে থাকার মূল চৈতন্যবোধকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের রসগ্রহণ দিয়ে চাঙ্গা করে তোলে। মঙ্গোলরা পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে, ভারী রাইডিং বুট পরে, বাবরী চুলে ঢেউ খেলিয়ে গোল হয়ে সরাই-চত্বরে নাচতে আরম্ভ করে। বুটের ধমক, তালে তালে হাততালি আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুল শহরের চতুর্দিকের পাহাড় প্রতিধ্বনিত করে তীব্র কণ্ঠে আমুদরিয়া পারের মঙ্গোল সঙ্গীত। থেকে থেকে নাচের তালের সঙ্গে ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নিচু করে দেয়, আর কানের দু'পাশের বাবরী চুল সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলে। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু'পা দিয়ে ঘন ঘন ঢেরা কাটে, আর দু'হাত মেলে দিয়ে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনের দিকে ঠেলে বাবরী চুল দিয়ে সবুজ জামা ঢেকে দেয়। কখনো কোমর দু'ভাঁজ করে নিচু হয়ে বিলম্বিত তালে আস্তে আস্তে হাততালি, কখনো দু'হাত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে ঘূর্ণি হাওয়ার চরকিবাজি। সমস্তক্ষণ চক্কর ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।

আবার এই সমস্ত হট্টগোল উপেক্ষা করে দেখবেন, সরাইয়ের এক কোণে কোনো ইরাণী কানের কাছে সেতার রেখে মোলায়েম বাজনার সঙ্গে হাফিজের গজল গাইছে। আর পাঁচজন চোখ বন্ধ করে বুঁদ হয়ে দূর ইরানের গুল বুলবুল আর নিঠুরা নিদয়া প্রিয়ার ছবি মনে মনে এঁকে নিচ্ছে।

আরেক কোণে পীর-দরবেশ চায়ের মজলিসের মাঝখানে দেশ-বিদেশের ভ্রমণ-কাহিনী, মেশেদ-কারবালা, মক্কা-মদিনার তীর্থের গল্প বলে যাচ্ছেন। কান পেতে সবাই শুনছে, বুড়োরা ভাবছে কবে তাদের উপর আল্লার করুণা হবে, মৌলা কবে তাদের মদিনায় ডেকে নিয়ে যাবেন, প্রাণ তো ওষ্ঠাগত,—

লবোঁ পর হৈ দম আয় মুহম্মদ সমহালো,
মেরে মৌলা মুঝে মদিনে বোলা লো!

ঠোঁটের উপর দম এসে গেছে বাঁচাও মুহম্মদ,
হে প্রভু আমায় ডাকো মদিনায়, ধরেছি তোমার পদ।

কেনা পর্যন্ত। সে সব গল্পের কতটা গাঁজা কতটা নীট ঠাহর হবে কিছুদিন পরে, যদি নাক-কান খোলা রাখেন। তখন বাদ দরকসর টাকায় বারো আনা, চোদ্দ আনা ঠিক ঠিক ধরতে পারবেন।

যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তাদের পক্ষে এই 'বাজার গপ্' অতীব অপরিহার্য। মোগল ইতিহাসে পড়েছি, দিল্লীকে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র করে এক কালে সমস্ত ভারতবর্ষ এমন কি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তুর্কীস্থান ইরান পর্যন্ত ভারতীয় হুণ্ডির তাঁবেতে ছিল। গুণীদের মুখে শুনেছি বাঙলার রাজা জগৎশেঠের হুণ্ডি দেখলে বুখারার খান পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে কাঁচা টাকা ঢেলে দিতেন। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ব্যবসা চালু রাখার জন্য ভারতীয় বণিকদের আপন আপন ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত ছিল। তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। হয়ত দিল্লীর শাহানশাহ আহমদাবাদের সুবেদারের (গভর্নর) উপর বীতরাগ হয়ে তাকে ডিসমিসের ফরমান জারী করলেন—সে ফরমান আহমদাবাদ পৌঁছতে অন্তত দিন সাতেক লাগার কথা। ওদিকে সুবেদার হয়ত দু'হাজার ঘোড়া কেনার জন্যে আহমদাবাদী বেনেদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন—ফরমান পৌঁছলে সুবেদার পত্রপাঠ দিল্লী রওনা দেবেন। সে টাকাটা বের করতে বেনেদের তখন ভয়ঙ্কর বেগ পেতে হত—সুবেদার বাদশাহকে খুশী করে নূতন সুবা, নিদেনপক্ষে নূতন জায়গীর না পেলে সে টাকাটা একেবারেই মারা যেত।

তাই যে সন্ধ্যায় বাদশা ফরমানে মোহর বসালেন, সেই সন্ধ্যায়ই বেনেদের দিল্লীর হৌস থেকে আপন ডাকের ঘোড়সওয়ার ছুটত আহমদাবাদে। সেখানকার বিচক্ষণ বেনে বাদশাহী ফরমান পৌঁছবার পূর্বেই সুবেদারের হিসেবে ঢেরা কেটে দিত—পাওনা টাকা যতটা পারত উশুল করত—নূতন ওভারড্রাফ্ট্ কিছুতেই দিত না ও দরকার হলে দেবার দায় এড়াবার জন্য হঠাৎ পালিতাণায় 'তীর্থ-ভ্রমণে' চলে যেত। তিনদিন পর ফরমান পৌঁছলে পর সুবেদারের চোখ খুলত। তখন বুঝতে পারতেন বেনে ধর্মানুরাগী হয়ে পালিতাণার কোন্ তীর্থ করতে চলে গিয়েছিল।

আফগানিস্থানে এখনো সেই অবস্থা। বাদশা কাবুলে বসে কখন হিরাত অথবা বদখশান সুবার কোন্ কর্ণধারের কর্ণ কর্তন করলেন, তার খবর না জেনে বড় ব্যবসা করার উপায় নেই। তাই 'বাজার গপে'র ধারা কখন কোন্‌দিকে চলে, তার দিকে কড়া নজর রাখতে হয়, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির ফিলটার যদি আপনার থাকে, তবে সেই ঘোলাটে 'গপ্' থেকে খাঁটি-তত্ত্ব বের করে আর দশজনের চেয়ে বেশী মুনাফা করতে পারবেন।

আফগানিস্থানের ব্যাঙ্কিং এখনো বেশীর ভাগ ভারতীয় হিন্দুদের হাতে। ভারতীয় বলা হয়ত ভুল, কারণ এদের প্রায় সকলেই আফগানিস্থানের প্রজা। এদের জীবনযাত্রার প্রণালী, সামাজিক সংগঠন, পালাপরব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো গবেষণা করেননি।

আশ্চর্য বোধ হয়। মরা বোরোবোদুর নিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পড়ে, একই ফোটোগ্রাফের বিশখানা হাজা-ভোঁতা প্রিণ্ট দেখে দেখে সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায়, কিন্তু এই জ্যান্ত ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে 'বৃহত্তর ভারতে'র পাণ্ডাদের কোনো অনুসন্ধিৎসা কোনো আত্মীয়তাবোধ নেই।

মৃত বোরোবোদুর গোত্রভুক্ত, জীবন্ত ভারতীয় উপনিবেশ অপাংক্তেয়, ব্রাত্য। ভারতবর্ষের সধবারা তাজা মাছ না খেয়ে শুঁটকি মাছের কাঁটা দাঁতে লাগিয়ে একাদশীর দিনে সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখেন।

কাবুলের বাজার পেশাওয়ারের চেয়ে অনেক গরীব, কিন্তু অনেক বেশী রঙীন। কম করে অন্তত পঁচিশটা জাতের লোক আপন আপন বেশভূষা চালচলন বজায় রেখে কাবুলের বাজারে বেচাকেনা করে। হাজারা, উজবেগ (বাঙলা উজবুক), কাফিরিস্থানী, কিজিলবাশ (ভারতচন্দ্রে কিজিলবাশের উল্লেখ আছে, আর টীকাকার তার অর্থ করেছেন 'একরকম পর্দা' !), মঙ্গোল, কুর্দ—এদের পাগড়ি, টুপি, পুস্তিনের জোব্বা, রাইডিং বুট দেখে কাবুলের দোকানদার এক মুহূর্তে এদের দেশ, ব্যবসা, মুনাফার হার, কঞ্জুশ না দরাজ-হাত চট করে বলে দিতে পারে।

এই সব পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে তারা নির্বিকার চিত্তে রাস্তা দিয়ে চলে। আমরা মারোয়াড়ী কিংবা পাঞ্জাবীর সঙ্গে লেনদেন করার সময় কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, তারা বাঙালী নয়—দু'পয়সা লাভ করার পর কোনো পক্ষই অন্য পক্ষকে নেমন্তন্ন করে বাড়িতে নিয়ে খাওয়ানো তো দূরের কথা, হোটেলে ডেকে নেওয়ার রেওয়াজ পর্যন্ত নেই। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত।

স্বপ্নসম লোকযাত্রা। খাস কাবুলের বাসিন্দারা চিৎকার করে একে অন্যকে আল্লারসুলের ডরভয় দেখিয়ে সওদা করছে, বিদেশীরা খচ্চর গাধা ঘোড়ার পিঠে বসে ভাঙা ভাঙা ফার্সীতে দরকসর করছে, বুখারার বড় কারবারি ধীরে গম্ভীরে দোকানে ঢুকে এমনভাবে আসন নিচ্ছেন যে, মনে হয় বাকী দিনটা ঐখানেই বেচাকেনা, চা-তামাক-পান আর আহারাদি করে রাত্রে সরাইয়ে ফিরবেন—তাঁর পিছনে চাকর হুঁকো-কল্কি সঙ্গে নিয়ে ঢুকছে। তারও পিছনে খচ্চর-বোঝাই

একদিন হয় খাইবারপাসে, নয় হিন্দুকুশে লাগবেই লাগবে। তাই দু'দলের পাঁয়তারা কষার খবর সরজমিনে রাখার জন্য একগাদা রাজদূতাবাস।

তবু পয়লা শরিক আর দুসরা শরিকে দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয়। দুসরা শরিকের অধিকাংশই হয় কারবারি, নয় মাস্টার প্রোফেসর। দু'দলের সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু পয়লা ও তেসরা ও দুসরা-তেসরাতে কখনো কোনো অবস্থাতেই যোগাযোগ হতে পারে না।

যদি কেউ করার চেষ্টা করে, তবে সে স্পাই।

মাত্র একটি লোক নির্ভয়ে কাবুলের সব সমাজে অবাধে গতায়াত করতেন। বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানায় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নাম দোস্ত মুহম্মদ খান—জাতে খাস পাঠান।

প্রথম দিনের পরিচয়ে শেকহ্যাণ্ড করে ইংরেজী কায়দায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হাও ডু ইয়ু ডু?'

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ রাস্তায়। দূরের থেকে কাবুলী কায়দায় সেই প্রশ্নের ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন, 'খুব হাস্তী, জোর হাস্তী' ইত্যাদি, অর্থাৎ 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েননি তো?'

তৃতীয় সাক্ষাৎ তাঁর বাড়িরই সামনে। আমাকে দেখা মাত্র চিৎকার করে বললেন, 'বফরমাইদ, বফরমাইদ (আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক), কদমে তান মবারক (আপনার পদদ্বয় পূতপবিত্র হোক), চশমে তান রওশন (আপনার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বলতর হোক), শানায়ে তান দরাজ (আপনার বক্ষস্কন্ধ বিশালতর হোক)—'

তারপর আমার জন্য যা প্রার্থনা করলেন সেটা ছাপালে এদেশের পুলিস আমাকে জেলে দেবে।

আমি একটু থতমত খেয়ে বললুম, 'কি যা তা সব বলছেন?'

দোস্ত মুহম্মদ চোখ পাকিয়ে তম্বী লাগালেন, 'কেন বলব না? আলবত বলব, একশ' বার বলব। আমি কি কাবুলের ইরানী যে ভদ্রতা করে সব কিছু বলব, সত্যি কথাটি ছাড়া? আমি পাঠান—আমার ঘোড়ার লাগাম নেই, আমার জিভেরও লাগাম নেই।'

ঘরে বসিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন, 'বাড়িঘরদোর গুছিয়ে নিয়েছেন তো? চাকরবাকর? রুটি-গোস্ত? কিছু যদি দরকার হয় আমাকে বলবেন। সব যোগাড় করে দিতে পারি—কাবুলের তখ্‌ৎটি ছাড়া। তাও পারি—কিন্তু মাত্র একটা কিনা, খোঁজ খোঁজ পড়ে যাবে। কিন্তু ওটায়

নজর দিয়ে কোনো লাভ নেই। বড্ড শক্ত ; আমি বসে দেখেছি।'

আমি বললুম, 'কাবুলের সিংহাসনে বসা যে শক্ত, সে তো আর গোপন কথা নয়।'

দোস্ত মুহম্মদ আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি ভয় পেয়ে ভাবলুম বোধ হয় বেফাঁস রসিকতা করে ফেলেছি। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদের উত্তর শুনে অভয় পেলুম। বললেন, 'আহা-হা-হা। বাঁচালে দাদা। তোমার তা হলে রসকষ আছে। তোমার দেশের লোকগুলোর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, বড্ড বেহুল্লোড়, বে-আড্ডা, বেরসিক। কী গম্ভীর মুখ! দেখে মনে হয় হিন্দুস্থান স্বাধীন করার দুর্ভাবনা যেন একমাত্র ওদেরই ঘাড়ে।'

অদ্ভুত লোক। অশ্লীল কথা বললেন রাস্তায় চেঁচিয়ে, চাকরবাকর বন্দোবস্ত করে দেবেন বললেন ঘরের ভিতর বসিয়ে ফিসফিস করে, রসিকতা শুনে যখন খুশী তখন মুখ হল গম্ভীর। ভাবলুম এবার যদি দুটো একটা কটুবাক্য বলি তবে বোধ হয় অট্টহাস্য করে উঠবেন।

ততক্ষণে তিনি একটা কুশনে মাথা দিয়ে কার্পেটের উপর শুয়ে পড়েছেন। চোখ বন্ধ করে বললেন, 'কি খাবে? চা-রুটি, পোলাও-গোস্ত, আঙুর-নাসপতি? যা খুশী। বাজারে সব পাওয়া যায়। বাড়িতে কিছু নেই।'

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'না, না, আছে, আছে। সিগরেট আছে। দাঁড়াও।'

বলে দরজার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে গভীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে সোফার পিছনে হাঁটু গেড়ে সোফা আর দেয়ালের মাঝখানের কার্পেট তুলে এক প্যাকেট সিগারেট বের করলেন।

আমি তো অবাক। সামান্য সিগারেট ; মদের বোতল নয়, প্যারিসের ছবি নয় যে, এত লুকিয়ে রাখবেন। আর কার কাছ থেকেই বা এত লুকোনো?

শুনি দোস্ত মুহম্মদ করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠেছেন, 'ওরে ও হারামজাদা আগা আহমদ, তোকে আমি আজ খুন করব। রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে আয় ব্যাটা। ওরে নেমকহারাম, তোকে খুন করে, আজ আমি গাজী হব, ফাঁসি গিয়ে শহিদ হব।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওঃ! কী পাষণ্ড! দরজা বন্ধ করে, হুড়কো মেরে সিগরেট বের করি, লুকিয়ে রাখি যেন আলাউদ্দীনের পিদিম। তবু ব্যাটা সন্ধান পেয়েছে। আর কী বেহায়া বেশরম! দশটা সিগরেটই মেরে

পুস্তিন ব্যবসায়ীর কুঠরিতে কবির মজলিস। অজাতশ্মশ্রু সুনীলগুম্ফ, কাজল-চোখ, তরুণ কবি মোমবাতির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তুলোট কাগজে লেখা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন। তাঁর এক পদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তামাম মজলিস এক-গলায় পদের পুনরাবৃত্তি করছে—মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়ে মরহাবা, আফরীন, শাবাশ বলে উচ্চকণ্ঠে কবির তারিফ করছে।

চার সর্দারজীতে মিলে একটা পুরানো গ্রামোফোনে নখের মতো পালিশ তিন-খানা রেকর্ড ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজাচ্ছে—

হরদি বোতলাঁ।
ভরদি বোতল।
পাঞ্জাবী বোতলাঁ।
লাল বোতলাঁ।

হায়, কাবুলে বোতল বারণ। কে জানত, শ্রবণেও অর্ধপান!

আর আসল মজলিস বসেছে কুহিস্থানের তাজিকদের আড্ডায়। হেঁড়ে গলায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, দেয়াল-পাথর ফাটিয়ে কোরাস গান,

আয় ফতু, জানে মা—
ফতুজান,
ফতুজান,
বর তু শওম কুরবা—া—া—ন।

কুরবানের 'আ' দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব, অবস্থা ভেদে—সম মেলাবার জন্য। উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি নয়, তবু দরদ আছে,

ওগো ফতুজান,
তুঁহারি লাগিয়া দিল-জান দিয়া
হব আমি কুরবান!

উত্তরে ফতুজান যেন অবিশ্বাসের সুরে বলেছেন,

—চেরা রফতী
হীচ ন্ গুফতী
দূর হিন্দুস্থান?

অর্থাৎ—

কেন গেলে
আমায় ফেলে
দূর হিন্দুস্থান?

সহস্রপাদ বৈষ্ণব পদাবলীতে যখন এ-প্রশ্নের উত্তর নেই, তখন তাজিক ছোকরার লোক-সঙ্গীতে তার উত্তরের আশা করেন কোন্ অভিনব মম্মট? মথুরার সিংহাসন জয় হিন্দুস্থানে রাইফেল ক্রয়, দুটোই বদখদ বেতালা উত্তর। হাজারো যুক্তি দিয়ে গীতা বানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু মথুরাজয়ের যুক্তির হাল যমুনায় পানি পাবে না বলেই তিনি সেটা ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধার দরবারে পেশ করেননি।

বল্হীকের বল্লভও তাই নীরব।

আঠার

কাবুলের সামাজিক জীবন তিন হিস্সায় বিভক্ত। তিন শরিকে মুখ দেখা-দেখি নেই।

পয়লা শরিক খাস কাবুলী; সে-ও আবার দু'ভাগে বিভক্ত—জনানা, মর্দনা। কাবুলী মেয়েরা কট্টর পর্দার আড়ালে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে নিকট আত্মীয় ছাড়া, দেশী-বিদেশী কারো আলাপ হওয়ার জো নেই। পুরুষের ভিতরে আবার দু'ভাগ। একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের মোল্লা সম্প্রদায়, আর অন্যদিকে প্যারিস-বার্লিন-মস্কো ফের্তা এবং তাদের ইয়ারবক্সীতে মেশানো ইয়োরোপীয় ছাঁচে ঢালা তরুণ সম্প্রদায়। একে অন্যকে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু মুখ দেখাদেখি বন্ধ নয়। কারণ অনেক পরিবারেই বাপ মশাই, বেটা মসিয়ো।

দুসরা শরিক ভারতীয় অর্থাৎ পাঞ্জাব, ফ্রন্টিয়ারের মুসলমান ও ১৯২১ সনের খেলাফৎ আন্দোলনের ভারতত্যাগী মুহাজিরগণ। এঁদের কেউ কেউ কাবুলী মেয়ে বিয়ে করেছেন বলে শ্বশুরবাড়ির সমাজের সঙ্গে এঁরা কিছু কিছু যোগাযোগ বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তিসরা শরিক ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, রুশ ইত্যাদি রাজদূতাবাস। আফগানিস্থান ক্ষুদে গরীব দেশ। সেখানে এতগুলো রাজদূতের ভিড় লাগাবার কোনো অর্থনৈতিক কারণ নেই, কিন্তু রাজনৈতিক কারণ বিস্তর। ফরাসী জর্মন ইতালী তুর্ক সব সরকারের দৃঢ়বিশ্বাস, ইংরেজ-রুশের মোষের লড়াই একদিন না

সরল বাঙলায় তর্জমা করলে অর্থ দাঁড়ায়, 'তোর কোমর ভেঙে দু'টুকরো হোক, খুদা তোর দু'চোখ কানা করে দিন, তুই ফুলে উঠে ঢাকের মত হয়ে যা, তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যা।'

আমি কোনো গতিকে সামলে নিয়ে বললুম, 'দোস্ত মুহম্মদ, কি সব আবোল-তাবোল বকছেন?'

দোস্ত মুহম্মদ আমাকে আলিঙ্গন করে দু'গালে দুটো বম্‌শেল চুমো লাগালেন। বললেন, 'আমি কক্ষনো আবোল-তাবোল বকিনে।'

আমি বললুম, 'তবে এসব কি?'

বললেন, 'এসব তোর বালাই কাটাবার জন্য। লক্ষ্য করিসনি, এদেশে বাচ্চাদের সাজিয়ে-গুজিয়ে কপালের একপাশে খানিকটে ভুসো মাখিয়ে দেয়। তোর কপালে তো আর ভুসো মাখাতে পারিনে—তাই কথা দিয়ে সেরে নিলুম। যাকে এত গালাগাল দিচ্ছি, যম তাকে নেবে কেন? পরমায়ু বেড়ে যাবে। বুঝলি?'

লক্ষ্য করলুম গেলবার দোস্ত মুহম্মদ আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছিলেন, এবারে সেটা 'তুই'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফার্সী ভাষায় 'আপনি, তুমি, তুই' তিন বাক্য নেই—আছে শুধু 'শোমা' আর 'তো'। কিন্তু ঐ 'তো' দিয়ে 'তুমি, তুই' দুই-ই বোঝানো যায়—যে রকম ইংরিজীতে যখন বলি, 'ড্যাম ইউ,' তখন তার অর্থ 'আপনি চুলোয় যান,' নয়, অর্থ তখন 'তুই চুলোয় যা'। খাঁটি পাঠান আবার 'শোমা' কথাটাও ব্যবহার করে না, ইংরেজের মত শুধু ঐ এক 'ইউ'ই জানে। বেদুইনের আরবীতেও মাত্র এক 'আনতা'। বোধ হয় পাঠান, ইংরেজ, বেদুইনের ডিমোক্র্যাসি তার সম্বোধনের সমতায় প্রকাশ পেয়েছে।

দোস্ত মুহম্মদ স্মরণ করিয়ে দিলেন প্যারিসফের্তা সইফুল আলমের ছোট ভাইয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন। সইফুল আলম তাঁকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে। গাড়ি তৈরী।

সিগারেট দিয়ে বললুম, 'খান।'

বললেন, 'না। আবদুর রহমানকে বলো তামাক দিতে।'

আমি বললুম, 'আবদুর রহমানকে চেনেন তা হলে!'

বললেন, 'তোমাকে কে চেনে বাপু, তুমি তো দু'দিনের চিড়িয়া। আমাকে কে চেনে বাপু, আমিও তিনদিনের পাখি—যে-পাহাড় থেকে নেমে এসেছি, সে-পাহাড়ের গর্ভে আবার ঢুকে যাব, আগা আহমদের টাকাটা মেরে। আমি কে?

মকতবে আমানিয়ার অধ্যাপক অবশ্যি বটি, কিন্তু ক'টা লোকে জানে। অথচ বাজারে গিয়ে পুছো, দেখবে সবাই জানে, আমি হচ্ছি সেই মূর্খ, যার কাঁধে বন্দুক রেখে আগা আহমদ শিকার করে; অর্থাৎ আগা আহমদের মনিব। তুমি কে? যার কাঁধে আবদুর রহমান বন্দুক রেখেছে—শিকার করে কি না-করে পরে দেখা যাবে। চাকর দিয়ে মনিব চিনতে হয়।'

আমি বললুম, 'বেশক্, বেশক্।' তারপর বাঙলায় বললুম, 'গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

বললেন, 'বুঝিয়ে বল।'

তর্জমা শুনে দোস্ত মুহম্মদ আনন্দে আত্মহারা। শুধু বলেন 'আফরীন, আফরীন, সাবাস, সাবাস, উম্‌দা কবিতা, জরির কলম।' তারপর মুখে মুখে শেষ লাইনের একটা অনুবাদও করে ফেললেন,—

'মনে বুরুৎ, তনে বুরুৎ, বরুৎ সনাক্তদার।'

তারপর বললেন, 'আমি আরবী, ফার্সী আর তুর্কী নিয়ে কিছু কিছু নাড়াচাড়া করেছি, কিন্তু ভাল রসিকতা কোথাও বিশেষ দেখিনি। পদ্যে তো প্রায় নেই-ই। বাঙলায় বুঝি এরকম অনেক মাল আছে?'

আমি বললুম, 'না, মাত্র দুখানা কি আড়াইখানা বই।'

দোস্ত মুহম্মদ নিরাশ হয়ে বললেন, 'তাহলে আর বাঙলা শিখে কি হবে?'

পেশাওয়ারের আহমদ আলী আর কাবুলের দোস্ত মুহম্মদে একটা মিল দেখতে পেলুম—দুজনই অল্প রসিকতায় খুব মুগ্ধ হন। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, আহমদ আলীর জীবনের ধারা বয়ে চলেছে আর পাঁচজনের মত, আর দোস্ত মুহম্মদের জীবন যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। এক পাথর থেকে আরেক পাথরে লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, মাঝখানে রসিকতার সূর্যকিরণ পড়লেই রামধনুর রঙ মেখে নিচ্ছে। দু'-একবার মামুলী দুঃখকষ্টের কথা বলতে গিয়ে দেখলুম, সে সব কথা তার কানে যেন পৌঁচচ্ছেই না। বিলাসব্যসনেও শখ নেই। তিনি যেন সমস্তক্ষণ বোম্বাগড়ের সন্ধানে যেখানে রাজার পিসি পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকেন, যেখানে পণ্ডিতেরা টাকের উপর ডাকের টিকিট আঁটেন।

তাই যখন আমরা বিয়ের মজলিসে গিয়ে কাবুল শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝখানে আসন পেলুম, তখন দোস্ত মুহম্মদের জন্য দুঃখ হল। খানিকক্ষণ পরে দেখি, তিনি চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে কি যেন আপন মনে বলে যাচ্ছেন। তাঁর দিকে একটু ঝুঁকতেই তিনি বললেন, 'ফয়েজ মুহম্মদের গুণে শিক্ষামন্ত্রীর নাম, না শিক্ষামন্ত্রীর পদের জোরে ফয়েজ মুহম্মদের নাম—মুহম্মদ তর্জীর গুণে বিদেশী

দিয়েছে। ওঃ!'

ততক্ষণে আগা আহমদ দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে। কারো দিকে না তাকিয়ে, দোস্ত মুহম্মদের কোনো কথায় সাড়া না দিয়ে সোজা সোফার পিছনে গিয়ে কার্পেটের তলায় আরো বেশীদূর হাত চালিয়ে আরেক প্যাকেট পুরো সিগরেট বের করে আমার হাতে দিল।

বেরবার সময় দোরের গোড়ায় একবার দাঁড়াল। এক ঝলকের তরে দোস্ত মুহম্মদের দিকে তাকিয়ে বলল,—'খালি প্যাকেটটা আমার। লুকিয়ে রেখেছিলুম।'

দোস্ত মুহম্মদের চোখের পাতা পড়ছে না। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'কী অসম্ভব বদমায়েশ! আর আমাকে বেকুব বানাবার কায়দাটা দেখলেন গর্ভ-স্রাবটার! শুধু তাই, নিত্য নিত্য আমাকে বেকুব বানায়!'

তারপর মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আপন মনেই বললেন, 'কিন্তু দাঁড়াও বাচ্চা, স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্‌, কামারের এক ঘা।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর পাঁচ বছরের মাইনে তিনশ' টাকা আমার কাছে জমা আছে। সেই টাকাটা লোপাট মেরে রাইফেল কাঁধে করে একদিন পাহাড়ে উধাও হয়ে যাব; তখন যাদু টেরটি পাবেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কলেজ যাবার সময় ঘরে তালা লাগান?'

তিনি বললেন, 'একদিন লাগিয়েছিলুম। কলেজ থেকে ফিরে দেখি সে তালা নেই, আরেকটা পর্বতপ্রমাণ তালা তার জায়গায় লাগানো। ভাঙবার চেষ্টা করে হার মানলুম। ততক্ষণে পাড়ার লোক জমে গিয়েছে—আগা আহমদের দর্শন নেই। কি আর করি, বসে রইলুম হী-হী শীতে বারান্দায়। হেলে দুলে আগা আহমদ এলেন ঘণ্টাখানেক পরে। পাষণ্ড কি বলল জানো? 'ও তালাটা ভালো নয় বলে একটা ভালো দেখে তালা লাগিয়েছি।' আমি যখন মার মার করে ছুটে গেলুম তখন শুধু বললো, 'কারো উপকার করতে গেলেই মার খেতে হয়।'

আমি বললুম, 'তালা তা হলে আর লাগাচ্ছেন না বলুন।'

'কি হবে? আগা আহমদ আফ্রিদী, ওরা সব তালা খুলতে পারে। জানো, এক আফ্রিদী বাজী ফেলে আমীর হবীব উল্লার নিচের থেকে বিছানার চাদর চুরি করেছিল।'

আমি বললুম, 'তালা যদি না লাগান তবে একদিন দেখবেন আগা আহমদ আপনার দামী রাইফেল নিয়ে পালিয়েছে।'

দোস্ত মুহম্মদ খুশী হয়ে বললেন, 'তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তত কাঁচা ছেলে নই। আগা আহমদের দাদা আমাকে আর বছরে ছ'শ' টাকা দিয়েছিল, ওর জন্য দাঁওমত একটা ভালো রাইফেল কেনার জন্য। এটা সেই টাকায় কেনা কিন্তু আগা আহমদ জানে না। ও যদি রাইফেল নিয়ে উবে যায় তবে আমি তার ভাইকে তক্ষুনি চিঠি লিখে পাঠাব, 'তোমার ভ্রাতৃহস্তে রাইফেল পাঠাইলাম ; প্রাপ্তি-সংবাদ অতি অবশ্য জানাইবা।' তারপর দুই ভায়েতে—'

আমি বললুম, 'সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই।'

দোস্ত মুহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাইফেলের জন্য তারা লড়েছিল?'

আমি বললুম, 'না, সুন্দরীর জন্য।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তওবা। তওবা! স্ত্রীলোকের জন্য কখনো জব্বর লড়াই হয়? মোক্ষম লড়াই হয় রাইফেলের জন্য। রাইফেল থাকলে সুন্দরীর স্বামীকে খুন করে তার বিধবাকে বিয়ে করা যায়। উত্তম বন্দোবস্ত। সে বেহেস্তে গিয়ে হুরী পেল তুমিও সুন্দরী পেলে।'

রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'ভেবো না, লক্ষ্য করিনি যে, তুমি আমাকে 'আপনি' বলছো আর আমি 'তুমি' বলে যাচ্ছি। কিন্তু বেশী দিন চালাতে পারবে না। সমস্ত আফগানিস্থানে আমাকে কেউ 'আপনি' বলে না, ইস্তেক আগা আহমদ পর্যন্ত না।'

টাঙ্গায় চড়বার সময় 'দাঁড়াও' বলে ছুটে গিয়ে একখানা বই নিয়ে এসে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। মন্তব্য প্রকাশ করলেন, 'ভালো বই, কর্সিকা আর আফগানিস্থানে একই রকম প্রতিশোধের ব্যবস্থা।' চেয়ে দেখি 'কলঁবা'।*

উনিশ

দিন দশেক পরে একদিন জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, দোস্ত মুহম্মদ। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে কাবুলী কায়দায় 'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো', বলতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলুম, দোস্ত মুহম্মদ কোনো সাড়া-শব্দ না দিয়ে আপন মনে কি সব বিড়-বিড় করে বলে যাচ্ছেন। কাছে এসে কান পেতে যা শুনলুম, তাতে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। বলছেন, 'কমরক্ত ব শিকনদ, খুদা তোরা কোর সাজদ, ব পুন্দী, ব তরকী ইত্যাদি।'

* 'আগুনের ফুলকি' নাম দিয়ে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন।

কিছুটা পাথর আঁকড়ে ধরে ধরে। দুটো খচ্চর ভেসে গেল জলের তোড়ে, সঙ্গে নিয়ে গেল খাবার-দাবার সব কিছু। দলের সাতজনের মধ্যে দুজন অনাহারে মারা যান।

এসব বর্ণনা আমি যে জীবনে প্রথম শুনলুম তা নয়, কিন্তু এর বর্ণনাতে কোনো রোমান্স মাখানো ছিল না, পর্যটকদের গতানুগতিক দম্ভ ছিল না আর আফগান সরকারের নিরর্থক অসময়ে ট্র্যান্সফার করার বাতিকের বিরুদ্ধে কণামাত্র নালিশ-ফরিয়াদ ছিল না। ভাবখানা অনেকটা 'ছাতা ছিল না তাই বিষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরলুম। কাল আবার বেরতে পারি দরকার হলে—ছাতা যে সঙ্গে নেবই সে রকম কথাও দিচ্ছিনে।' অর্থাৎ আগামী বসন্তে যদি তাকে ফের বদখশান যেতে হয় তবে সে আপত্তি জানাবে না।

অথচ যখন বার্লিনে পড়াশুনা করত তখন তিন বছর ধরে মাসে চারশ' মার্ক খর্চা করে আরামে দিন কাটিয়েছে।

অনেক রাতে খাবার ডাক পড়ল। গরম বাঙলা দেশেই যখন বিয়ের রান্না ঠাণ্ডা হয় তখন ঠাণ্ডা কাবুলে যে বেশীর ভাগ জিনিসই হিম হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

মীর আসলম তাই খানিকটে মাংস এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিঞ্চিৎ শূল্যপক্ক অজমাংস ভক্ষণ কর। আভ্যন্তরিক উষ্মার জন্য ইহাই প্রশস্ততম।'

তারপর দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো জিনিসের অপ্রাচুর্য হয় নাই তো?' দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুয়েম রসীদ—গলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে—গরগরা শুদম—আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।'

কোনো জিনিসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার এই হল ফার্সী সংস্করণ।

আফগান বিয়ের ভোজে যে বিস্তর লোক প্রচুর পরিমাণে খাবে সে কথা কাবুলে না এসেও বলা যায়, কিন্তু তারো চেয়ে বড় তত্ত্বকথা এই যে, যত খাবে তার চেয়ে বেশী ফেলবে, বাঙলা দেশের এই সুসভ্য বর্বরতার সন্ধান আফগানরা এখনো পায়নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর গালগল্প জমলো ভালো করে। শুধু দোস্ত মুহম্মদ কাউকে কিছু না বলে তিনটে কুশনে মাথা দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু আবহাওয়া থেকে অনুমান করলুম যে রেওয়াজ হচ্ছে, হয় মজলিসের পাঁচজনের সঙ্গে গুষ্টিসুখ অনুভব করা, নয় নির্বিকারচিত্তে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়া। বিয়েবাড়ির হৈ-হল্লা, কড়া বিজলি বাতি আফগানের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না।

রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একজন একজন করে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। সইফুল আলম আমাদের আরেক প্রস্থ চা দিয়ে গেলেন। মীর আসলমের ভাষা বিদগ্ধ হতে বিদগ্ধতর হয়ে যখন প্রায় যজ্ঞভস্মের মত পূতপবিত্র হবার উপক্রম করছে, তখন তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। চেয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধ সেতারখানা কোলে তুলে নিয়েছেন।

মীর আসলম আমাকে কানে কানে বললেন, 'তোমার অদৃষ্ট অদ্য রজনীর তৃতীয় যামে সুপ্রসন্ন হইল।'

সমস্ত সন্ধ্যা বৃদ্ধ কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। 'পিড়িং' করে প্রথম আওয়াজ বেরতেই মনে হল, এঁর কিন্তু বলবার মত অনেক কিছু আছে।

প্রথম মৃদু টঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই দোস্ত মুহম্মদও সোজা হয়ে উঠে বসলেন—যেন এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় শুয়ে শুয়ে প্রহর গুনছিলেন।

সেতারের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পূর্বেই বুড়ার গলা থেকে গুঞ্জরণ ধ্বনি বেরল—কিন্তু ভুল করলুম—গলা থেকে নয়, বুক, কলিজা থেকে, তার প্রতি লোম-কূপ ছিন্ন করে যেন সে শব্দ বেরল। সেতার বাঁধা হয়েছিল কোন্ সন্ধ্যায় জানিনে কিন্তু তাঁর গলার আওয়াজ শুনে মনে হল, এঁর সর্বশরীর যেন আর কোনো ওস্তাদের ওস্তাদ বহুকাল ধরে বেঁধে বেঁধে আজ যামিনীর শেষযামে এই প্রথম পরি-পূর্ণতায় পৌঁছালেন।

ওস্তাদী বাজনা নয়—বুড়ার গলা থেকে যে পরী হঠাৎ ডানা মেলে বেরল, সেতারের আওয়াজ যেন তার ছায়া হয়ে গিয়ে তারই নাচে যোগ দিল।

ফার্সী গজল। বুড়ার চোখ বন্ধ; শান্ত-প্রশান্ত মুখচ্ছবি, চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপছে না, ওষ্ঠ-অধরের মৃদু স্ফুরণের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে গম্ভীর নিষ্কম্প গুঞ্জরণ। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সে আওয়াজ যেন বন্ধনমুক্ত আতরের মত সভাস্থল ভরে দিল।

গানের কথা শুনব কি, সেতারের গলায় মিশে গিয়েছে, যেন সন্ধ্যাবেলাকার নীল আকাশ সূর্যাস্তের লাল আবির মেখে নিয়ে ঘন বেগুনী থেকে আস্তে আস্তে গোলাপীর দিকে এগিয়ে চলেছে। আর পাঁচজনের কথা বলতে পারিনে—এ রকমের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। জন্মান্ধ যেন চোখ মেলল সূর্যাস্তের মাঝখানে। আমি তখন রঙের মাঝখানে ডুবে গিয়েছি— সমুদ্র, বেলাভূমি, তরু-পল্লব কিছুই চোখে পড়ছে না।

ধ্বনির ইন্দ্রজালে মোহাচ্ছন্ন করে বৃদ্ধ যেন একমাত্র আমারই কানে কানে তাঁর গোপন মন্ত্র পড়তে লাগলেন,

সচিবের নাম, না বিদেশী সচিবের পদের জোরে মুহম্মদ তর্জীর নাম? বাঙালী কবি লাখ কথার এক কথা বলেছে,

'গোঁপের আমি, গোঁপের তুমি তাই দিয়ে যায় চেনা।'

আমি বললুম, 'চুপ, মন্ত্রীরা সব আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন, শুনতে পেলে আপনাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।'

বললেন, 'হ্যাঁ', তা বটে, বিশেষ করে ঐ ফয়েজটা।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফয়েজ মুহম্মদ খান, মিনিস্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন?'

উত্তর দিলেন, 'না, সিনিস্টার অব পাবলিক ডিস্ট্রাকশন। কত ছেলের মগজ ডেস্ট্রয় করছে। আমাকে মারবে তার আর নূতন কি?'

আমি ভয় পেয়ে 'চুপ চুপ' বলে উজীর সায়েবদের 'জ্ঞানগর্ভ' কথাবার্তায় কান দেবার চেষ্টা করলুম।

দোস্ত মুহম্মদকে দোষ দেওয়া অন্যায়। অনেক ভেবেও কূলকিনারা পাওয়া যায় না যে, এঁরা সব কোন্ গুণে মন্ত্রী হয়েছেন। লেখাপড়ায় এক-একজন যেন বিদ্যাসাগর। দুনিয়ার কোনো খবর রাখার চাড়ও কারো নেই। বেশীর ভাগই একবার দু'বার ইয়োরোপ হয়ে এসেছেন, কিন্তু সেখান থেকে দু'-একটা শক্ত ব্যাধি ছাড়া যে কিছু সঙ্গে এনেছেন, তা তো কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে না। ছোকরা-দের মধ্যে যারা গালগল্পে যোগ দিল, তারা তবু দু'-একটা পাস দিয়ে এসেছে, বুড়োদের যাঁরা অবজ্ঞা অবহেলা সত্ত্বেও মুখ খুললেন, তাঁদের কথাবার্তা থেকে ধরা পড়ে যে, আর কিছু না হোক তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু এই উজীরদের দল না পারে উড়তে, না পারে সাঁতার কাটতে—চলন যেন ব্যাঙের মত, এলোপাতাড়ি, থপথপ। কাবুলের বহু জিনিস, বহু প্রতিষ্ঠান দেখে মনে দুঃখ হয়, কিন্তু এই মন্ত্রি-মণ্ডলীকে দেখে কনফুৎসিয়সের মত বলতে হয়,

'আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র, সংসারে প্রণিপাত।'

সইফুল আলম এসে কানে কানে বললেন, 'একটু বাদে দক্ষিণের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবেন; আমি দোরের গোড়ায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।' দোস্ত মুহম্মদ না শুনেও মাথা নাড়িয়ে প্রকাশ করলেন যে, তিনিও আসছেন।

মজলিস থেকে বেরিয়ে যেন দম ফেলে বাঁচলুম। দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তা ব্ গুলুয়েম রসীদ—গলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, গরগরা শুদম—আমার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।'

সত্যিকারের বিয়ের মজলিসে তখন প্রবেশ পেলুম। সেখানে দেখি, জন-

বিশেক ছোকরা, কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কেউ গড়াগড়ি দিয়ে আড্ডা জমাচ্ছে। একজন গামছা দিয়ে গ্রামোফোনটার মুখ গুঁজে সাউণ্ড-বক্সের পাশে কান পেতে গান শুনছে। জনতিনেক তাস খেলছে। বিদগ্ধ মোল্লা মীর আসলম এক কোণে কি একখানা বই পড়ছেন। আরেক কোণে এক বুড়ো দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন, অথবা ঘুমোচ্ছেন—মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ি, বরফের মত সাদা দাড়ি আর কালো মিশমিশে জোব্বা। শান্ত মুখচ্ছবি—এক পাশে ছোট একখানা সেতার। সব ছেলে-ছোকরার পাল, ঐ মীর আসলম আর সেতারওয়ালা বৃদ্ধ ছাড়া। মজলিসে আসবাবপত্র কিছু নেই, শুধু দামী গালচে আর রঙীন তাকিয়া।

কেউ কেউ 'বফরমাইদ, আসতে আজ্ঞা হোক' বলে অভ্যর্থনা করলেন।

আমি দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এইখানে সোজা এলেই তো হত।'

তিনি বললেন, 'সেটি হবার জো নেই, আসল মজলিসে বসে নাভিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত এখানে প্রোমোশন নদারদ। তা তুমি তো বাপু বেশ চাঁদপানা মুখ করে বসেছিলে। তোমাকে সেখানে উসখুস না করে বসে থাকতে দেখে আমার মনে তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় ভয় জেগেছে। এদেশে উজীর হবার আসল গুণ তোমার আছে—To sit among bores without being bored. কিন্তু খবরদার, সাবধানে পা ফেলে চলো দাদা, নইলে রক্ষে নেই—দেখবে একদিন বলা নেই কওয়া নেই ক্যাঁক করে ধরে নিয়ে উজীর বানিয়ে দিয়েছে।'

সইফুল আলম আমাকে আদর করে বসালেন।

তরুণদের আড্ডা যে উজীরদের মজলিসের চেয়ে অনেক বেশী মনোরঞ্জক তা নয়, তবে এখানে লৌকিকতার তর্জনী নেই বলে যা খুশী করবার অনুমতি আছে। এরা নির্ভয়ে পলিটিক্স পর্যন্ত আলোচনা করে এবং যৌবনের প্রধান ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে কারো মুখে আর কোনো লাগাম থাকে না। কথাবার্তায় ভারতীয় তরুণদের সঙ্গে এদের আসল তফাত এই যে, এদের জীবনে নৈরাশ্যের কোনো চিহ্ন নেই, বর্তমান থেকে পালিয়ে গিয়ে অতীতে আশ্রয় তো এরা খোঁজেই না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা আশা-ভরসা, তাও স্বপ্নেগড়া পরীস্থান নয়। শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে অচেতন এরকম জোয়ান আমি আর কোথাও দেখিনি। এদেরই একজন আর বসন্তে কি করে ট্রান্সফার হয়ে বদখশান থেকে হিন্দুকুশ পার হয়ে কাবুল এসেছিল তার বর্ণনা দিচ্ছিল। সমস্ত দিন হেঁটে মাত্র তিন মাইল রাস্তা এগোতে পেরেছিল, কারণ একই নদীকে ছ'বার পার হতে হয়েছিল, কিছুটা সাঁতরে,

'শবি আগর, শবি আগর, শবি আগর—'

'যদি এক রাত্রের তরে, মাত্র এক রাত্রের তরে, একবারের তরে—'

আমি যেন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, 'কি ? কি ? কি ? এক রাতের তরে, একবারের তরে কি ?' কিন্তু বলার উপায় নেই—দরকারও নেই, গুণী কি জানেন না ?

'আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম্'

'প্রিয়ার অধর থেকে একটি চুম্বন পাই।'

প্রথমবার বললেন অতি শান্তকণ্ঠে, কিন্তু যেন নৈরাশ্য-ভরা সুরে, তারপর নৈরাশ্য যেন কেটে যেতে লাগল, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল, সাহস বাড়তে লাগল, সবশেষে রইল দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাষা, 'পাবোই পাবো, নিশ্চয় পাবো।'

গুণী গাইছেন 'লবে ইয়ার', 'প্রিয়ার অধর' আর আমার বন্ধ চোখের সামনে কালোর মাঝখানে ফুটে ওঠে টকটকে লাল দুটি ঠোঁট, যখন শুনি 'বোসয়ে তলবম্', 'যদি একটি চুম্বন পাই', তখন চোখের সামনে থেকে সব কিছু মুছে যায়, বুকের মাঝখানে যেন তখন শুনতে পাই সেই আশানিরাশার দ্বন্দ্ব, আতুর হিয়ার আকুলি-বিকুলি, আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় প্রত্যয়।

হুঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠলেন, 'জোয়ান শওম।'

'তাহলে আমি জোয়ান হব—একটি মাত্র চুম্বন পেলে লুপ্ত যৌবন ফিরে পাব।'

সভাস্থল যেন তাণ্ডব নৃত্যে ভরে উঠল—দেখি শঙ্কর যেন তপস্যাশেষে পার্বতীকে নিয়ে উন্মত্ত নৃত্যে মেতে উঠেছেন। হুঙ্কারের পর হুঙ্কার—'জোয়ান শওম', 'জোয়ান শওম'। কোথায় বৃদ্ধ সেতারের ওস্তাদ—দেখি সেই জোয়ান মঙ্গোল। লাফ দিয়ে তিন হাত উপরে উঠে শূন্যে দু'-পা দিয়ে ঘন ঘন চেরা কাটছে, আর দু'-হাত মেলে বুক চেতিয়ে মাথা পিছনে ছুঁড়ে কালো বাবরী চুলের আবর্তের ঘূর্ণি লাগিয়েছে।

দেখি তাজমহলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন শাহজাহান আর মমতাজ। হাত ধরাধরি করে। নবীন প্রাণ, নূতন যৌবন ফিরে পেয়েছেন, শতাব্দীর বিচ্ছেদ শেষ হয়েছে।

শুনি সঙ্গীত তরঙ্গের কলকল্লোল জাহ্নবী। সগররাজের সহস্র সন্তান নবীন প্রাণ নবীন যৌবন ফিরে পেয়ে উল্লাসধ্বনি করে উঠেছে।

কিন্তু গুণী, যৌবন পেয়েছে, প্রিয়ার প্রসাদ পেয়েছে, চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে—অথচ কবিতার পদ যে এখনো অগ্রগামী—

'শবি আগর, আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম
জোয়ান শওম—'
আজি এ নিশীথে প্রিয়া-অধরেতে চুম্বন যদি পাহ
জোয়ান হইব—

তারপর, তারপর কি ?

শুনি অবিচল দৃঢ়কণ্ঠে অদ্ভুত শপথ গ্রহণ,—

'জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম'

'এই জীবন তাহলে আবার দোহরাতে, দু'বার করতে রাজী আছি। একটি চুম্বন দাও, তাহলে আবার সেই অসীম বিরহের তপ্ত দীর্ঘ অন্তবিহীন পথ ক্ষত-বিক্ষত রক্তসিক্ত পদে অতিক্রম করবার শক্তি পাব। আসুক না আবার সেই দীর্ঘ বিচ্ছেদ, তোমার অবহেলার কঠোর কঠিন দাহ!

'আমি প্রস্তুত, আমি শপথ করছি,

—'জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম!'

'গোড়া হতে তবে এ-জীবন দোহরাই।' '

আমি মনে মনে মাথা নিচু করে বললুম, 'ক্ষমা করো গুণী, ক্ষমা করো কবি। শিখরে পৌঁছে উদ্ধত প্রশ্ন করেছিলুম, পদ এখনো অগ্রগামী, যাবো কোথায়। তুমি যে আমাকে হঠাৎ সেখান থেকে শূন্যে তুলে নিতে পারো, তোমার গানের পরী যে আমাকেও নীলাম্বরের মর্মমাঝে উধাও করে নিয়ে যেতে পারে, তার কল্পনাও যে করতে পারিনি।'

বারে বারে ঘুরে ফিরে গুণীর আকূতি-কাকুতি 'শবি আগর', 'যদি এক রাতের তরে', আর সেই দৃঢ় শপথ 'জিন্দেগী দুবারা কুনম', 'এ-জীবন দোহরাই'—গানের বাদবাকি এই দুই বাক্যেই বারে বারে সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে স্বপ্রকাশ হচ্ছে। কখনো শুনি 'শবি আগর' কখনো শুধু 'দুবারা কুনম'—'শবি আগর', 'দুবারা কুনম'।

পশ্চিমের সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও পুবের আকাশ অনেকক্ষণ ধরে লাল রঙ ছাড়ে না—কখন গান বন্ধ হয়েছিল বলতে পারিনে। হঠাৎ ভোরের আজান কানে গেল, 'আল্লাহু আকবর', 'খুদাতালা মহান' মাভৈ, মাভৈ, ভয় নেই, ভয় নেই, তোমার সব কামনা পূর্ণ হবে।

'ওয়া লাল আখিরাতু খাইরুন লাকা মিনাল্ উলা'
'অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো হবে তো ভবিষ্যৎ।'*

---

* কুরান শরীফ ৯৩, ৪।

চোখ মেলে দেখি কবি নেই। মোল্লা মীর আসলম পাথরের মত বসে আছেন, আর দোস্ত মুহম্মদ দু'-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছেন।

বিশ

দরজা খাঁখাঁ করছে। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। আসবাবপত্র সব অন্তর্ধান। কার্পেটের উপর অ্যাটাচিকেসে মাথা রেখে দোস্ত মুহম্মদ শুয়ে। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, 'বোরো, গুমশো'—'বেরিয়ে যা, পালা এখান থেকে।'

দোস্ত মুহম্মদের রকমারি অভ্যর্থনা সম্ভাষণে ততদিনে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। কাছে গিয়ে বললুম, 'জিনিসপত্র সব কি হল? আগা আহমদ যে ভারী ভারী টেবিল চেয়ার, কোচ সোফা পর্যন্ত সরাবে ততটা আঁচ করতে পারিনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বিড়বিড় করে বললেন, 'সব ব্যাটা চোর, সব শালা চোর, কোনো ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই, কাবুল থেকে প্যারিস পর্যন্ত।'

আমি বললুম, 'বড় অন্যায় কথা। চুরি করল আগা আহমদ, দোষ ছড়ালো প্যারিস পর্যন্ত।'

বললেন, 'কী মুশকিল, আগা আহমদ চুরি করলে তার পিছনে আমি রাইফেল কাঁধে করে বেরতুম না? না বেরলে আফ্রিদী সমাজে আমার জাত-ইজ্জত থাকত? নিয়েছে ব্যাটা লার্ফো?'

'সে আবার কে?'

'পর্শু এসে পৌঁচেছে, ফরাসীর অধ্যাপক। লব্-ই-দরিয়ায় বাসা বেঁধেছে—বেশ বাড়িখানা। আফগান সরকারের যত আদিখ্যেতা-আত্তি সব বিদেশীদের জন্য।'

আমি বললুম, 'চোর কে, তার সাকিন-ঠিকানা সব যখন জানেন তখন মাল উদ্ধার—'

বললেন, 'আইনে দেয় না—বেচারী দুঃখ করছিল কোথাও আসবাবপত্র পাচ্ছে না। আমি বললুম আমার বাড়িতে বিস্তর আছে—ফরাসী জানো তো, বুক দ্য ম্যোবল, ফুল দ্য ম্যোবল, তা দ্য ম্যোবল, ব্যাটাকে দেখিয়ে দিলুম 'বিস্তর মাল' কত বিচিত্র কায়দায় ফরাসীতে বলা যায়। শুনে ব্যাটা দুসরা আফগান লড়াইয়ের গোরা সেপাইয়ের মত কচুকাটা হয়ে শুয়ে পড়ল।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'শুয়ে পড়ল কোথায়, এসে তো দিব্যি সব কিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল।'

দোস্ত মুহম্মদ আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'তওবা তওবা, নিজে এলে কি আর সব নিয়ে যেত—দেখত না ভিটেতে কবুতর চরার মত অবস্থা হয়ে উঠেছে। আমিই সব পাঠিয়ে দিলুম।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'বেশ করেছ, এখন মরো হিমে শুয়ে—'

এক লাফ দিয়ে দোস্ত মুহম্মদ আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বলিনি বলিনি, তখন বলিনি, পারবিনি রে, পারবিনি—তোকে 'আপনি' বলা ছাড়তেই হবে। কিন্তু তুই ভাই রেকর্ড ব্রেক করেছিস—ঝাড়া পনরো দিন 'আপনি' চালিয়েছিস।'

আমি বললুম, 'বেশ বেশ। কিন্তু স্বেচ্ছায় যখন সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছ তখন দুনিয়াসুদ্ধ লোককে 'চোর চামার' বলে কটুকাটব্য করছিলে কেন?'

'কাউকে বলবিনে, শুনেই ভুলে যাবি? তবে বলি শোন। তুই যখন ঘরে ঢুকলি তখন দেখলুম তোর মুখ বড্ড ভার। হয়ত দেশের কথা ভাবছিলি, নয় কাল রাত্তিরের গানের খোয়ারি কাটিয়ে উঠতে পারিসনি—কেন যে ক্যাপারা এরকম ভূতুড়ে গান গায়? তা সে যাক্‌গে। কিন্তু তোর মুখ দেখে মনে হল তুই বড্ড বেজার। তাই যা-তা সব বানিয়ে, তোকে চটিয়ে সব কথা ভুলিয়ে দিলুম। দেখলি কায়দাখানা!'

আমি বললুম, 'খুব দেখলুম, আমাকে বেকুব বানালে। তোমাকে বেকুব বানায় আগা আহমদ, আর তুমি বেকুব বানালে আমাকে। তা নূতন কিছু নয়—আমাদের দেশে একটা দোহা আছে—

শমনদমন রাবণ আর রাবণদমন রাম,
শশুরদমন শাশুড়ী আর শাশুড়ীদমন হাম্‌।'

ঢিলে গল্প, কাঁচা রসিকতা। কিন্তু দোস্ত মুহম্মদ নবীনের মত, 'যাহা পায় তাহাই খায়,' মুখে হাসি লেগেই আছে।

আমি বললুম, 'সব বুঝেছি, কিন্তু একটা খাট তো অন্তত কেনো, মাটিতে শোবে নাকি?'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তবে আসল কথাটা এই বেলা শোনো; বিলিতী আসবাবপত্রে আমি কখনো আরাম বোধ করিনি—দশ বৎসর চেষ্টা করার পরও। অথচ পয়সা দিয়ে কিনেছি, ফেলতে গেলে লাগে। এতদিনে যখন সুযোগ মিলল তখন নূতন করে জঞ্জাল জুটোব কেন? এইবার আরাম করে পাঠানী কায়দায়

ঘরময় মই চষে বেড়াব—খাট থেকে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙবার আর ভয় নেই।'

আমি বললুম, 'কর্মরত ন শিকনদ', তোমার কোমর ভেঙে দু' টুকরো না হোক।'

কথা ছিল দু'জনে একসঙ্গে বগদানফ সাহেবের বাড়ি যাব।

পূর্বেই বলেছি ফরাসী দূতাবাসে বগদানফ সায়েবের বৈঠকখানা ছিল বিদেশী মহলের কেন্দ্রভূমি। বাগান থেকেই শব্দ শুনে তার আভাস পেলুম। ঘরে ঢুকে দেখি একপাল সায়েব মেম।

আমাকে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে বগদানফ সায়েব চোস্ত ফরাসী ভাষায় দুরুস্ত ফরাসী কায়দায় বললেন, 'পেরমেতে মওয়া ল্য প্লেজির দ্য ভু প্রেজাঁতে—অনুমতি যদি দেন তবে আপনাদের সামনে অমুককে নিবেদন করে বিমলানন্দ উপভোগ করি।'

তারপর এক-একজন করে সকলের নাম বলে যেতে লাগলেন। আমি বলি, 'হাড়ুডু', তাঁদের কেউ বলেন, 'আঁশাতে', কেউ বলেন, 'শার্মে', কেউ বলেন, 'রাভি'। অর্থাৎ আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কেউ হয়েছেন enchanted, কেউ charmed, কেউ বা ravished। একেই বলে ফরাসী ভদ্রতা। এঁরা যখন গ্রেতা গার্বো বা মার্লেনে দীতরিশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি সত্যি enchanted হন তখন কি বলেন তার সন্ধান এখনো পাইনি।

মসিয়ো লাফোঁ গল্পের ছেঁড়া সুতোর খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'তারপর বাদশা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ফরাসী শিখতে ছ'মাসের বেশী সময় লাগার কথা নয়।' আমি বললুম, 'না হুজুর, অন্তত দু'বছর লাগার কথা।'

বগদানফ সায়েব বললেন, 'করেছেন কি? বাদশাহের কোনো কথায় না বলতে আছে? দিবা-দ্বিপ্রহরে, প্রখর রৌদ্রালোকে যদি হুজুর বলেন 'পশ্য, পশ্য, নীলাম্বরের ললাটদেশে চন্দ্রমা কি প্রকারে শ্বেতচন্দন প্রলেপ করেছেন।' আপনি তখন প্রথম বলবেন, 'হুজুরের যে পূতপবিত্র পদদ্বয় অনাদি কাল থেকে অসীম কাল পর্যন্ত মণি-মাণিক্যবিজড়িত সিংহাসনে বিরাজমান এ-গোলাম সেই পদরজস্পর্শ লাভের আশায় কুরবানী হতে প্রস্তুত।' তারপর বলবেন—'

বাধা দিয়ে মাদাম লাফোঁ বললেন, 'সম্পূর্ণ মন্ত্রোচ্চারণে যদি ভুলচুক হয়ে যায়? দৈর্ঘ্য তো কিছু কম নয়।'

বগদানফ সায়েব সদয় হাসি হেসে বললেন, 'অল্প-স্বল্প রদবদল হলে আপত্তি নেই। 'মণি-মাণিক্যের' বদলে 'হীরা-জওহর' বলতে পারেন, 'পদরজে'র পরিবর্তে 'পদধূলি' বললেও বাধবে না।'

'তারপর বলবেন, 'হুজুরের কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,—চন্দ্রমা সত্যই কি অপূর্ব বেশ ধারণ করেছেন এবং নক্ষত্রমণ্ডলী কতই না নয়নাভিরাম।' '

ইতালির সিন্নোরা দিগাদো জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কি ভদ্রতা বজায় রেখে হুজুরকে সত্যি কথা জানাবার কোনো উপায়ই নেই? এই মনে করুন মসিয়ো লাফোঁ যদি সত্যি সত্যি জানাতে চান যে, ফরাসী শিখতে দু'বছর লাগে?'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে, বাদশা যখন বলবেন ছ'মাস আপনি তখন বলবেন, 'নিশ্চয়ই, হুজুর, ছ'মাসেই হয়। দু'বছরে আরো ভালো হয়।' হুজুরেরও তো কাণ্ডজ্ঞান আছে। আপনার ভদ্রতাসৌজন্যের আতর তিনি শুঁকবেন, গায়ে মাখবেন, তাই বলে তো আর গিলবেন না।'

মসিয়ো লাফোঁ বললেন, 'এ সব বাড়াবাড়ি।'

বগদানফ বললেন, 'নিশ্চয়ই; বাড়াবাড়িরই আরেক নাম superfluity। আর পোয়েট টেগোর—আমাদের তিনি গুরুদেব—' বলেই তিনি প্রফেসর বেনওয়া ও আমার দিকে একবার বাও করলেন—'তিনি বলেন, 'আর্টের সৃষ্টি হয়েছে সুপার-ফ্লুয়িটি থেকে।' আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা বোঝাতে গিয়ে তিনি শাস্ত্রী মশায়কে কি একটা চমৎকার তুলনা দিয়েছিলেন না?'

আমি বললুম, 'কাঠের ডাণ্ডা লাগানো টিনের কেনেস্তারায় করে রাধু মালীর নাইবার জল আনার মধ্যে আর নন্দলাল কর্তৃক চিত্রবিচিত্রিত মৃৎপাত্র ভরে ষোড়শী তন্বঙ্গী সুন্দরীর জল আনার মধ্যে যে সুপারফ্লুয়িটির তফাত তাই আর্ট।'

বগদানফ সায়েব উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'শুধু আর্ট? দর্শন, বিজ্ঞান, সব কিছু—কলচর বলতে যা কিছু বুঝি। সবই সুপারফ্লুয়িটি থেকে, বাড়াবাড়ি থেকে।'

অধ্যাপক ভ্যাঁসাঁ বললেন, 'কিন্তু এই কলচর যখন চরমে পৌঁছয় তখন গুরু-চণ্ডালে এত পার্থক্য হয়ে যায় যে, বাইরের শত্রু এসে যখন আক্রমণ করে তখন সে দেশের সব শ্রেণী এক হয়ে দাঁড়াতে পারে না বলে স্বাধীনতা হারায়। যেমন ইরান।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষ।'

পোলিশ মহিলা মাদাম ভরভচিয়েভিচি বললেন, 'কিন্তু ইংরেজ? তারা তো সভ্য, তাদের গুরুচণ্ডালেও তফাত অনেক, কিন্তু তারা তো সব সময় এক হয়ে লড়তে পারে।'

বগদানফ জিজ্ঞেস করলেন, 'কাদের কথা বললেন, মাদাম?'

'ইংরেজের।'

'ঐ যারা ইয়োরোপের পশ্চিমে একটা ছোট দ্বীপে থাকে?'

মজলিসে ইংরেজ কেউ ছিল না। সবাই ভারী খুশী। আমি মনে মনে বললুম, 'আমাদের দেশেও বলে 'চক্ষুরা'।'

অধ্যাপক ভ্যাঁসাঁ বললেন, 'বগদানফ ঠিকই অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। ইংরেজদের ভিতর অনেক খানদানী বংশ আছে সত্যি কিন্তু গুরুচণ্ডালে যে বৈদগ্ধ্যের পার্থক্য হবে, সে কোথায়? ওদের তো থাকার মধ্যে আছে এক সাহিত্য। সঙ্গীত নেই, চিত্রকলা নেই, ভাস্কর্য নেই, স্থপতি নেই। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে পার্থক্য হবে তার অনুভূতিগত উপকরণ কোথায়? অথচ ফ্রান্সে এসব উপকরণ প্রচুর; তাই দেখুন ফরাসীরা এক হয়ে লড়তে জানে না, শান্তির সময় রাজ্য পর্যন্ত চালাতে পারে না। যে দেশে আছি তার নিন্দে করতে নেই, কিন্তু দেখুন, এক ফোঁটা দেশ অথচ স্বাধীন।'

মাদাম ভরভচিয়েভিচি বললেন, 'এ দেশেও তো মোল্লা আছে।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিছু ভয় নেই মাদাম। মোল্লাদের আমি বিলক্ষণ চিনি। ওদের বেশীর ভাগ যেটুকু শাস্ত্র জানে আপনাকে সেটুকু আমি তিন দিনেই শিখিয়ে দিতে পারব। কিন্তু মেয়েদের মোল্লা হওয়ার রেওয়াজ নেই।'

মাদাম চটে গিয়ে বললেন, 'কেন নেই?'

দোস্ত মুহম্মদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাড়ি গজায় না বলে।'

ভ্যাঁসাঁ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'মোল্লাই হন আর যাই হন, এ দেশের মেয়ে হয়ে জন্মালে যে আপনাকে বোরকার আড়ালে থাকত হত। আমাদের ক্ষেতিটা বিবেচনা করুন।'

সবাই একবাক্যে

'Oui, Madame,
Si, si, Madame,
Certainement, Madame.'

কোরাস সমাপ্ত হলে দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'কিন্তু পর্দা-প্রথা ভালো।'

যেন আটখানা অদৃশ্য তলোয়ার খোলার শব্দ শুনতে পেলুম; চোখ বন্ধ করে দেখি দোস্ত মুহম্মদের মুণ্ডটা গড়িয়ে গড়িয়ে আফ্রিদী মুল্লুকের দিকে চলেছে।

নাঃ! কল্পনা। শুনি দোস্ত মুহম্মদ বলছেন, 'ধর্মত বলুন তো মশায়রা, মাদাম ভরভচিয়েভিচি, মাদাম লাফোঁ, সিন্যোরা দিগাদোর মত সুন্দরী সংসারে কয়টি? বেশীর ভাগই তো কুচ্ছিত। পাইকারী পর্দা চালালে তাহলে ক্ষতির

চেয়ে লাভ বেশী নয় কি ?'

মহিলারা কথঞ্চিৎ শান্ত হলেন।

কিন্তু মাদাম ভরভচিয়েভিচি পোলিশ,—উষ্ণ রক্ত। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর পুরুষদের সবাই বুঝি খাপসুরত এ্যাডনিস ? তারাই বা বোরকা পরে না কেন, শুনি।'

দোস্ত মুহম্মদ বললেন, 'তাই তো পুরুষদের দিকে মেয়েদের তাকানো বারণ।'

মজলিসে হট্টগোল পড়ে গেল। মেয়েরা খুশী হলেন, না ব্যাজার হলেন ঠিক বোঝা গেল না। কুয়াশা কাটিয়ে সিন্নোরা দিগাদো দোস্ত মুহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুন্দরীর অপ্রাচুর্য বলেই কি আপনি বিয়ে করেননি ?'

দোস্ত মুহম্মদ একটুখানি হাঁ করে বাঁ হাত দিয়ে ডান দিকের গাল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'তা নয়। আসল কথা হচ্ছে, কোনো একটি সুন্দরীকে বেছে নিয়ে যদি তাকে বিয়ে করি তবে তার মানে কি এই নয় যে, আমার মতে দুনিয়ার আর সব মেয়ে তার তুলনায় কুচ্ছিত! একটি সুন্দরীর জন্য দুনিয়ার সব মেয়েকে এ রকম বে-ইজ্জৎ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।'

সবাই খুশী। আমি বিশেষ করে। পাহাড়ী আফগান বিদগ্ধ ভ্যাঁসাঁকে শিভালরিতে ঘায়েল করে দিল বলে।

ইরানী রাজদূতাবাসের আগা আদিব এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন, বললেন, 'তবেই আফগানিস্থানের হয়েছে। ইরানী কায়দার নকল করে আফগানিস্থানেরও কপাল ভাঙবে। ইরান কিন্তু ইতিমধ্যে হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছে। শাহ-বাদশাহের সঙ্গে কথা বলবার যে সব কায়দা বগদানফ সায়েব বললেন সেগুলো তিনি দশ বছর আগে ইরানে শিখেছিলেন। এখন আর সেদিন নেই। সব রকম এটিকেটের বিরুদ্ধে সেখানে এখন জোর আন্দোলন আর ঠাট্টামস্করা চলছে। ঘরে ঢোকার সময় যে সামান্য ভদ্রতা একে অন্যকে দেখায় তার বিরুদ্ধে পর্যন্ত এখন কবিতা লেখা হয়। শুনে শুনে একটা তো আমারই মুখস্থ হয়ে গিয়েছে ; আপনারা শোনেন তো বলি।'

সবাই উৎসাহের সঙ্গে রাজী হলেন।

আগা আদিব বেশ রসিয়ে রসিয়ে আবৃত্তি করে গেলেন—

'খুদা তুমি দিলে বহুৎ জ্ঞান,
শেষ রহস্য এই বারেতে কর সমাধান।
ইরান দেশের লোক

কসম খেয়ে বলতে পারি নয় এরা উজবোক্।
বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে, সাহস আছে ঢের
সিঙি লড়ে, মোকাবেলা করে ইংরেজের।
তবে কেন ঢুকতে গেলেই ঘরে
সবাই এমন ঠেলাঠেলি করে?
দোরের গোড়ায় থমকে দাঁড়ায় ভিতর পানে চায়,
'আপনি চলুন', 'আপনি ঢুকুন', দাঁড়িয়ে কিন্তু ঠায়।
হাসি-খুশী বন্ধ হঠাৎ গল্প যে যায় থেমে
ঠেলাঠেলির মধ্যিখানে উঠছে সবাই ঘেমে।
অবাক হয়ে ভাবি সবাই কেন এমন করে,
দিবা-দ্বিপ্রহরে
কি করে হয় ঘরের মাঝে ভূত?
তবে কি যমদূত?
সলমনের জিন্?
কিম্বা গিলটিন?
ঢুকলে পরেই কপাৎ করে কেটে দেবে গলা,
তাই দেখে কি দোরে এসে বন্ধ সবার চলা?'

একুশ

কাবুলের রাস্তাঘাট, বাজারহাট, উজীরনাজির, গুরুচণ্ডালের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল বটে, কিন্তু গোটা দেশের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার আশা দেখলুম কম, আর নগর জনপদ উভয় ক্ষেত্রে যে-সব অদৃশ্য শক্তি শান্তির সময় মন্দ গতিতে এবং বিদ্রোহবিপ্লবের সময় দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে সেগুলোর তাল ধরা বুঝলুম আরো শক্ত, প্রায় অসম্ভব।

আফগানিস্থানের মেরুদণ্ড তৈরী হয়েছে জনপদবাসী আফগান উপজাতিদের নিয়ে, অথচ তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা, আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো কেতাব লেখা হয়নি; কাবুলে এমন কোনো গুণীরও সন্ধান পাইনি যিনি সে সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করুন আর নাই করুন অন্তত একটা মোটামুটি বর্ণনাও দিতে পারেন। ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কাবুলীরা প্রায়ই বলেন, 'তারপর শিনওয়ারীরা বিদ্রোহ করল', কিন্তু যদি

তখন প্রশ্ন করেন, বিদ্রোহ করল কেন, তবে উত্তর পাবেন, 'মোল্লারা তাদের খ্যাপালো বলে', কিন্তু তারপরও যদি প্রশ্ন শুধান যে, উপজাতিদের ভিতরে এমন কোন্ অর্থ নৈতিক বা রাজনৈতিক উষ্ণ বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল যে, মোল্লাদের ফুলকি দেশময় আগুন ধরাতে পারল তা'হলে আর কোনো উত্তর পাবেন না। মাত্র একজন লোক—তিনিও ভারতীয়—আমাকে বলেছিলেন, 'মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, বিদেশের পণ্যবাহিনীকে লুটতরাজ না করলে গরীব আফগানের চলে না বলে সভ্যদেশের ট্রেড-সাইক্লের মত তাদেরও বিপ্লব আর শান্তির চড়াই-ওতরাই নিয়ে জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ করতে হয়।'

গ্রামের অবস্থা যেটুকু শুনতে পেলুম তার থেকে মনে হল শান্তির সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে সহরবাসীর মাত্র এইটুকু যোগাযোগ যে, গ্রামের লোক শহরে এসে তাদের ফসল, তরকারি, দুম্বা, ভেড়া বিক্রয় করে সস্তা দরে, আর সামান্য যে দু'-একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য না কিনলেই নয়, তাই কেনে আক্রা দরে। সভ্যদেশের শহরবাসীরা বাদবাকির বদলে গ্রামের জন্য ইস্কুল, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট বানিয়ে দেয়। কাবুলের গ্রামে সরকারী কোনো প্রতিষ্ঠান নেই বললেই হয়। কতকগুলো ছেলে সকালবেলা গাঁয়ের মসজিদে জড়ো হয়ে গলা ফাটিয়ে আমপারা (কোরানের শেষ অধ্যায়) মুখস্থ করে—এই হল বিদ্যাচর্চা। তাদের তদারক করনেওয়ালা মোল্লাই গাঁয়ের ডাক্তার। অসুখ-বিসুখে তাবিজ-কবচ তিনিই লিখে দেন। ব্যামো শক্ত হলে পানি-পড়ার বন্দোবস্ত, আর মরে গেলে তিনিই তাকে নাইয়ে ধুইয়ে গোর দেন। মোল্লাকে পোষে গাঁয়ের লোক।

খাজনা দিয়ে তার বদলে আফগান গ্রাম যখন কিছুই ফেরত পায় না তখন যে সে বড় অনিচ্ছায় সরকারকে টাকাটা দেয় এ কথাটা সকলেই আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেন, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

দেশময় অশান্তি হলে আফগান-গাঁয়ের সিকি পয়সার ক্ষতি হয় না—বরঞ্চ তার লাভ। রাইফেল কাঁধে করে জোয়ানরা তখন লুটে বেরোয়—'বিধিদত্ত' আফগানিস্থানের অশান্তিও বিধিদত্ত, সেই হিড়িকে দু'পয়সা কামাতে আপত্তি কি? ফ্রান্স-জর্মনিতে লড়াই লাগলে যে রকম জর্মনরা মার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, 'নাখ্ পারিজ, নাখ্ পারিজ,' 'প্যারিস চলো, প্যারিস চলো', আফগানরা তেমনি বলে, 'বিআ ব্ কাবুল, ব্ রওম্ ব্ কাবুল,' 'কাবুল চলো, কাবুল চলো।'

শহরে বসে আছেন বাদশা। তাঁর প্রধান কর্ম আফগান উপজাতির লুণ্ঠনলিপ্সাকে দমন করে রাখা। তার জন্য সৈন্য দরকার, সৈন্যকে মাইনে দিতে হয়,

গোলাগুলীর খর্চা তো আছেই। শহরের লোক তার খানিকটা যোগায় বটে কিন্তু মোটা টাকাটা আসে গাঁ থেকে।

তাই এক অদ্ভুত অচ্ছেদ্য চক্রের সৃষ্টি হয়। খাজনা তোলার জন্য সেপাই দরকার, সেপাই পোষার জন্য খাজনার দরকার। এ-চক্র যিনি ভেদ করতে পারেন তিনিই যোগীবর, তিনিই আফগানিস্থানের বাদশা। তিনি মহাপুরুষ সন্দেহ নেই ; যে আফগানের দাঁতের গোড়া ভাঙবার জন্য তিনি শিলনোড়া কিনতে চান সেই আফগানের কাছ থেকেই তিনি সে পয়সা আদায় করে নেন।

ঘানি থেকে যে তেল বেরোয়, ঘানি সচল রাখার জন্য সেটুকু ঐ ঘানিতেই ঢেলে দিতে হয়।

সামান্য যেটুকু বাঁচে তাই দিয়ে কাবুল শহরের জৌলুশ।

কিন্তু সে এতই কম যে, তা দিয়ে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তোলা যায় না, শিক্ষা-দীক্ষার জন্য ব্যাপক কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যায় না। কাজেই কাবুলে শিক্ষিত সম্প্রদায় নেই বললেও চলে।

কিন্তু তাই বলে কাবুল সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বর্বর একথা বলা ভুল। কাবুলের মোল্লা সম্প্রদায় ভারতবর্ষ-আফগানিস্থানের যোগাযোগের ভগ্নাবশেষ।

কথাটা বুঝিয়ে বলতে হয়।

কাবুলের দরবারী ভাষা ফার্সী, কাজেই সাধারণ বিদেশীর মনে এই বিশ্বাস হওয়াই স্বাভাবিক যে, কাবুলের সংস্কৃতিগত সম্পর্ক ইরানের সঙ্গে। কিন্তু ইরান শীয়া মতবাদের অনুরাগী হয়ে পড়ায় সুন্নী আফগানিস্থান শিক্ষা দীক্ষা পাওয়ার জন্য ইরান যাওয়া বন্ধ করে দিল। অথচ দেশ গরীব, আপন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার মত সামর্থ্যও তার কোনো কালে ছিল না।

এদিকে পাঠান, বিশেষ করে মোগল যুগে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য দিল্লী লাহোরে ইসলাম ধর্মের সুন্নী শাখার নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল। শিক্ষাদানের মাধ্যম ফার্সী ; কাজেই দলে দলে কাবুল-কান্দাহারের ধর্মজ্ঞানপিপাসু ছাত্র ভারতবর্ষে এসে এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ; পূর্ববর্তী যুগে কাবুলীরা বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য তক্ষশিলায় আসত—আফগানিস্থানে যে-সব প্রাচীন প্রাচীর-চিত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলো অজন্তার ঐতিহ্যে আঁকা, চীন বা ইরানের প্রভাব তাতে নগণ্য।

এই ঐতিহ্য এখনো লোপ পায়নি। কাবুলের উচ্চশিক্ষিত মৌলবীমাত্রই ভারতে শিক্ষিত ও যদিও ছাত্রাবস্থায় ফার্সীর মাধ্যমে এদেশে জ্ঞানচর্চা করে গিয়ে-

ছেন, তবু সঙ্গে সঙ্গে দেশজ উর্দু ভাষাও শিখে নিয়ে গিয়েছেন। গ্রামের অর্ধ-শিক্ষিত মোল্লাদের উপর এঁদের প্রভাব অসীম এবং গ্রামের মোল্লাই আফগান জাতির দৈনন্দিন জীবনের চক্রবর্তী।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত জগৎ ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিন্দায় পঞ্চমুখ। এঁরা নাকি সর্বপ্রকার প্রগতির শত্রু, এঁদের দৃষ্টি নাকি সব সময় অতীতের দিকে ফেরানো এবং সে অতীতও নাকি মানুষের সুখদুঃখে মেশানো, পতন-অভ্যুদয়ে গড়া অতীত নয়, সে অতীত নাকি আকাশকুসুমজাত সত্যযুগের শাস্ত্রীয় অচলায়তনের অন্ধ প্রাচীর নিরুদ্ধ।

তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্রের পুস্তক লিখতে বসিনি, কাজেই পৃথিবীর সর্ব ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নিন্দা বা প্রশংসা করা আমার কর্ম নয়। কিন্তু আফগান মোল্লার একটি সাফাই না গাইলে অন্যায় করা হবে।

সে-সাফাই তুলনা দিয়ে পেশ করলে আমার বক্তব্য খোলসা হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কর্ণধার ছিলেন মৌলবী-মোল্লা, শাস্ত্রী-ভটচায। কিন্তু এঁরা দেশের লোককে উত্তেজিত করে ইংরেজের উচ্ছেদ সাধন করতে পারেন নি অথচ আফগান মোল্লার কট্টর দুশমনও স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ইংরেজকে তিন-তিনবার আফগানিস্থান থেকে কান ধরে বের করবার জন্য প্রধানত দায়ী আফগান মোল্লা।

আহা, আহা! এর পর আর কি বলা যেতে পারে আমি তো ভেবেই পাই না। এর পর আর আফগান মোল্লার কোন্ দোষ ক্ষমা না করে থাকা যায়? কমজোর কলম আফগান মোল্লার তারিফ গাইবার মত ভাষা খুঁজে পায় না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছেন এমন লোক আফগানিস্থানে দু'ডজন হবেন কিনা সন্দেহ। দেশে যখন শান্তি থাকে তখন এঁদের দেখে মনে হয়, এঁরাই বুঝি সমস্ত দেশটা চালাচ্ছেন; অশান্তি দেখা গেলেই এঁদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এঁদের সঙ্গে আলাপচারি হল; দেখলুম প্যারিসে তিন বৎসর কাটিয়ে এসে এঁরা মার্সেল প্রুস্ত্, আঁদ্রে জিদের বই পড়েননি, বার্লিন-ফের্তা ড্যুরারের নাম শোনেননি, রিলকের কবিতা পড়েননি। মিল্‌টন্ বাল্মীকি মিলিয়ে মধুসূদন যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তারই মত গ্যোটে ফিরদৌসী মিলিয়ে কাব্য রচনা করার মত লোক কাবুলে জন্মাতে এখনো ঢের বাকি।

তাহলে দাঁড়ালো এই:—বিদেশফের্তাদের জ্ঞান পল্লবগ্রাহী, এবং দেশের নাড়ীর সঙ্গে এদের যোগ নেই। মোল্লাদের অধিকাংশ অশিক্ষিত,—যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের সাতখুন মাফ করলেও প্রশ্ন থেকে যায়,—ইংরেজ রুশকে ঠেকিয়ে রাখাই

কি আফগানিস্থানের চরম মোক্ষ ? দেশের ধনদৌলত বাড়িয়ে শিক্ষাসভ্যতার জন্য যে প্রচেষ্টা, যে আন্দোলনের প্রয়োজন মৌলবী-সম্প্রদায় কি কোনো দিন তার অনুপ্রেরণা যোগাতে পারবেন ? মনে তো হয় না। তবে কি বাধা দেবেন ? বলা যায় না।

পৃথিবীর সব জাত বিশ্বাস করে যে, তার মত ভুবনবরেণ্য জাত আর দুটো নেই; গরীব জাতের তার উপর আরেকটা বিশ্বাস যে, তার দেশের মাটি খুঁড়লে সোনা রুপো তেল যা বেরবে তার জোরে সে বাকি দুনিয়া, ইস্তেক চন্দ্রসূর্য কিনে ফেলতে পারবে। নিরপেক্ষ বিচারে জোর করে কিছু বলা শক্ত কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি কিছু না বেরোয় তবে আফগানিস্থানের পক্ষে ধনী হয়ে শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তার করার অন্য কোনো সামর্থ্য নেই।

সত্যযুগে মহাপুরুষরা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, কলিযুগে গণৎকাররা করে। পাকা-পাকি ভবিষ্যদ্বাণী করার সাহস আমার নেই তবু অনুমান করি, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে শক্তিশালী হওয়া মাত্র আবার আফগানিস্থান-ভারতবর্ষে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে। কাবুল-কান্দাহারের বিদ্যার্থীরা আবার লাহোর দিল্লীতে পড়াশুনা করতে আসবে।

প্রমাণ ? প্রমাণ আর কি ? প্যারিস-বাসিন্দা ইংরিজী বলে না, ভিয়েনার লোক ফরাসী বলে না, কিন্তু বুডাপেস্টের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনো জর্মন বলেন, জ্ঞানান্বেষণে এখনো ভিয়েনা যান—ভিন্ন রাষ্ট্র নির্মিত হলেই তো আর ঐতিহ্য-সংস্কৃতির যোগসূত্র ছিন্ন করে ফেলা যায় না। কাবুলের মৌলবী-সম্প্রদায় এখনো উর্দু বলেন, ভারতবর্ষ বর্জন করে এঁদের উপায় নেই। ঝগড়া যদি করেন তবে সে তিনদিনের তরে।

উর্দু যে এদেশে একদিন কতটা ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ পেলুম হাতে-নাতে।

বাইশ

আগেই বলেছি, আমার বাসা ছিল কাবুল থেকে আড়াই মাইল দূরে—সেথান থেকে আরো মাইল দুই দূরে নূতন শহরের পত্তন হচ্ছিল। সেথানে যাবার চওড়া রাস্তা আমার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। অনেক পয়সা খরচ করে অতি যত্নে তৈরী রাস্তা। দু'দিকে সারি-বাঁধা সাইপ্রেস গাছ, স্বচ্ছ জলের নালা, পায়ে চলার আলাদা পথ, ঘোড়সোয়ারদের জন্যও পৃথক বন্দোবস্ত।

এ রাস্তা কাবুলীদের বুলভার। বিকেল হতে না হতেই মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, বাইসিকেল, ঘোড়া চড়ে বিস্তর লোক এ রাস্তা ধরে নূতন শহরে হাওয়া খেতে যায়। হেঁটে বেড়ানো কাবুলীরা পছন্দ করে না। প্রথম বিদেশী ডাক্তার যখন এক কাবুলী রোগীকে হজমের জন্য বেড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন তখন কাবুলী নাকি প্রশ্ন করেছিল যে, পায়ের পেশীকে হায়রান করে পেটের অন্ন হজম হবে কি করে ?

বিকেলবেলা কাবুল না গেলে আমি সাইপ্রেস সারির গা ঘেঁষে ঘেঁষে পায়চারি করতুম। এসব জায়গা সন্ধ্যার পর নিরাপদ নয় বলে রাস্তায় লোক চলাচল তখন প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত।

এক সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরছি তখন একখানা দামী মোটর ঠিক আমার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। স্টিয়ারিঙে এক বিরাট-বপু কাবুলী ভদ্রলোক, তাঁর পাশে মেমসায়েবের পোশাকে এক ভদ্রমহিলা—হ্যাটের সামনে ঝুলানো পাতলা পর্দার ভিতর দিয়ে যেটুকু দেখা গেল তার থেকে অনুমান করলুম, ভদ্রমহিলা সাধারণ সুন্দরী নন।

নমস্কার অভিবাদন কিছু না, ভদ্রলোক সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফার্সী বলতে পারেন ?'

আমি বললুম, 'অল্প স্বল্প।'

'দেশ কোথায় ?'

'হিন্দুস্থান।'

তখন ফার্সী ছেড়ে ভদ্রলোক ভুল উর্দুতে, কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রায়ই আপনাকে অবেলায় এখানে দেখতে পাই। আপনি বিদেশী বলে হয়ত জানেন না যে, এ জায়গায় সন্ধ্যার পর চলাফেরা করতে বিপদ আছে।'

আমি বললুম, 'আমার বাসা কাছেই।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি করে হয় ? এখানে তো অজ পাড়াগাঁ—চাষাভুষোরা থাকে।'

আমি বললুম, 'বাদশা এখানে কৃষিবিভাগ খুলেছেন—আমরা জনতিনেক বিদেশী একসঙ্গে এখানেই থাকি।'

আমার কথা ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ফার্সীতে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি হাঁ-না, কিছুই বলছিলেন না।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাবুল শহরে দোস্ত-আশনা নেই ? একা একা বেড়ানোতে দিল হায়রান হয় না ? আমার বিবি বলছিলেন, 'বাচ্চা গম্ মীখুরদ

—ছেলেটার মনে সুখ নেই।' তাইতে আপনার সঙ্গে আলাপ করলুম।' বুঝলুম, ভদ্রমহিলার সৌন্দর্য মাতৃত্বের সৌন্দর্য। নিচু হয়ে আদাবতসলিমাত জানালুম।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'টেনিস খেলতে পারেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তবে কাবুলে এলেই আমার সঙ্গে টেনিস খেলে যাবেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'অনেক ধন্যবাদ—কিন্তু আপনার কোর্ট কোথায়, আপনার পরিচয়ও তো পেলুম না।'

ভদ্রলোক প্রথম একটু অবাক হলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, 'আমি ? ওঃ, আমি ? আমি মুইন-উস্-সুলতানে। আমার টেনিস-কোর্ট ফরেন অফিসের কাছে। কাল আসবেন।' বলে আমাকে ভালো করে ধন্যবাদ দেবার ফুর্সৎ না দিয়েই মোটর হাঁকিয়ে চলে গেলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, মোটরের প্রায় বিশ গজ পিছনে দাঁড়িয়ে আমার ভৃত্য আবদুর রহমান অ্যারোপ্লেনের প্রপেলারের বেগে দু'হাত নেড়ে আমাকে কি বোঝাবার চেষ্টা করছে। মোটর চলে যেতেই এঞ্জিনের মত ছুটে এসে বলল, 'মুইন-উস্-সুলতানে, মুইন-উস্-সুলতানে!'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'লোকটি কে বটেন ?'

আবদুর রহমান উত্তেজনায় ফেটে চৌচির হয় আর কি। আমি যতই জিজ্ঞাসা করি মুইন-উস্-সুলতানে কে, সে ততই মন্ত্রোচ্চারণের মত শুধু বলে, মুইন-উস্-সুলতানে, মুইন-উস্-সুলতানে। শেষটায় নৈরাশ্য, অনুযোগ, ভর্ৎসনা মিশিয়ে বলল, 'চেনেন না, বরাদরে-আলা-হজরত, বাদশার ভাই,—বড় ভাই। আপনি করেছেন কি ? রাজবাড়ির সকলের হাতে চুমো খেতে হয়!'

আমি বললুম, 'রাজবাড়িতে লোক সবসুদ্ধ ক'জন না জেনে তো আর চুমো খেতে আরম্ভ করতে পারিনে। সকলের পোষাবার আগে আমার ঠোঁট ক্ষয়ে যাবে না তো ?'

আবদুর রহমান শুধু বলে, 'ইয়া আল্লা, ইয়া রসুল, করেছেন কি, করেছেন কি ?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তা উনি যদি রাজার বড় ভাই-ই হবেন তবে উনি রাজা হলেন না কেন ?'

আবদুর রহমান প্রথম মুখ বন্ধ করে তার উপর হাত রাখল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমি গরীব তার কি জানি; কিন্তু এসব কথা শুধোতে নেই।'

সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আবদুর রহমান যখন ঘরের এক কোণে বাদামের খোসা ছাড়াতে বসল তখন তার মুখে ঐ এক মুইন-উস্-সুলতানের কথা ছাড়া অন্য কিছু নেই। দু'তিনবার ধমক দিয়ে হার মানলুম। বুঝলুম, সরল আবদুর রহমান মনে করেছে, আফগানিস্থান যখন কাকামামাশালার দেশ, অর্থাৎ বড়লোকের নেকনজর পেলে সব কিছু হাঁসিল হয়ে যায় তখন আমি রাতারাতি উজীরনাজির কেউ-কেটা, কিছু-না-কিছু একটা, হয়ে যাবই যাব।

ততক্ষণে অভিধান খুলে দেখে নিয়েছি মুইন-উস্-সুলতানে সমাসের অর্থ 'যুব-রাজ'।

যুবরাজ রাজা হলেন না, হলেন ছোট ভাই। সমস্যাটার সমাধান করতে হয়।

তেইশ

মুইন-উস্-সুলতানে বা যুবরাজ রাজা না হয়ে ছোট ছেলে কেন রাজা হলেন সে-সমস্যার সমাধান করতে হলে খানিকটা পিছিয়ে এ-শতকের গোড়ায় পৌঁছতে হয়।

বাঙালী পাঠক এখানে একটু বিপদগ্রস্ত হবেন। আমি জানি, বাঙালী—তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন—আরবী ফার্সী মুসলমানী নাম মনে রাখতে বা বানান করতে অল্পবিস্তর কাতর হয়ে পড়েন। একথা জানি বলেই এতক্ষণ যতদূর সম্ভব কম নাম নিয়েই নাড়াচাড়া করেছি—বিশেষতঃ আনাতোল ফ্রাঁসের মত গুণী যখন বলেছেন, 'পাঠকের কাছ থেকে বড্ড বেশী মনোযোগ আশা করো না, আর যদি মনস্কামনা এই হয় যে, তোমার লেখা শত শত বৎসর পেরিয়ে পরবর্তী যুগে পৌঁছুক তা হলে হাল্কা হয়ে ভ্রমণ করো।' আমার সে-বাসনা নেই, কারণ ভাষা এবং শৈলী বাবদে আমার অক্ষমতা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন। কাজেই যখন ক্ষমতা নেই, বাসনাও নেই তখন পাঠকের নিকট ঈষৎ মনোযোগ প্রত্যাশা করতে পারি। মৌসুমী ফুলই মনোযোগ চায় বেশী; দু'দিনের অতিথিকে তোয়াজ করতে মহা কঞ্জুসও রাজী হয়।

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন আফগানিস্থানের কর্তা বা আমীর ছিলেন হবীব উল্লা। তাঁর ভাই নসর উল্লা মোল্লাদের এমনি খাস-পেয়ারা ছিলেন যে, বড় ছেলে মুইন-উস্-সুলতানে তাঁর মরার পর আমীর হবেন এ-ঘোষণা হবীব উল্লা বুকে হিম্মৎ বেঁধে করতে পারেননি। বরঞ্চ দুই ভায়ে এই নিষ্পত্তিই হয়েছিল যে

হবীব উল্লা মরার পর নসর উল্লা আমীর হবেন, আর তিনি মরে গেলে আমীর হবেন মুইন-উস্-সুলতানে। এই নিষ্পত্তি পাকা-পোক্ত করার মতলবে হবীব উল্লা
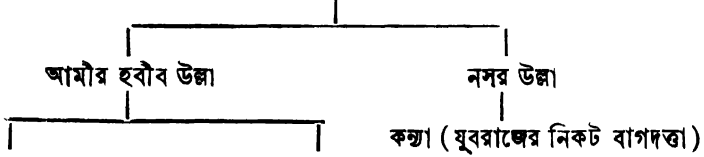
নসর উল্লা দুই ভাইয়ে মীমাংসা করলেন যে, মুইন-উস-সুলতানে নসর উল্লার মেয়েকে বিয়ে করবেন। হবীব উল্লা মনে মনে বিচার করলেন, আর যাই হোক, নসর উল্লা, জামাইকে খুন করে 'দামাদ-কুশ' (জামাতৃহন্তা) আখ্যায় কলঙ্কিত হতে চাইবেন না। ঐতিহাসিকদের স্মরণ থাকতে পারে যোধপুরের রাজা অজিত সিং যখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে জামাই দিল্লীর বাদশাহ ফরুক্খ-সিয়ারকে নিহত করেন তখন দিল্লীর ছেলে-বুড়োর 'দামাদ-কুশ', 'দামাদ-কুশ' চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষটায় তিনি দিল্লী ছাড়তে বাধ্য হন। রাস্তার ডেঁপো ছোঁড়ারা পর্যন্ত নির্ভয়ে অজিত সিং-এর পাল্কির দু'পাশে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলত আর সেপাই-বরকন্দাজের তম্বী-তম্বাকে বিলকুল পরোয়া না করে তারস্বরে একতানে 'দামাদ-কুশ', 'দামাদ-কুশ', বলে অজিত সিংহকে ক্ষেপিয়ে তুলত।

হবীব উল্লা, নসর উল্লা, মুইন-উস্-সুলতানে তিনজনই এই চুক্তিতে অল্প-বিস্তর সন্তুষ্ট হলেন। একদম নারাজ হলেন, মাতৃহীন মুইন-উস্-সুলতানের বিমাতা। ইনি আমান উল্লার মা, হবীব উল্লার দ্বিতীয়া মহিষী। আফগানিস্থানের লোক এঁকে রানী-মা বা উলিয়া হজরত নামে চিনত। এঁর দাপটে আমীর হবীব উল্লার মত খাণ্ডারও কুরবানির বকরি অর্থাৎ বলির পাঁঠার মত কাঁপতেন। একবার গোসা করে রানী-মা যখন নদীর ওপারে গিয়ে তাঁবু খাটান তখন হবীব উল্লা কোনো কৌশলে তাঁর কিনারা না লাগাতে পেরে শেষটায় এপারে বসে পাগলের মত সর্বাঙ্গে ধুলো-কাদা মেখে তাঁর সংগ্-দিল্ বা পাষাণ হৃদয় গলাতে সমর্থ হয়েছিলেন। রানী-মা স্থির করলেন, এই সংসারকে যখন ওমর খৈয়াম দাবাখেলার ছকের সঙ্গে তুলনা করেছেন তখন নসর উল্লা এবং মুইন-উস্-

স্থলতানের মত দুই জব্বর ঘুঁটিকে ঘায়েল করা আমান উল্লার মত নগণ্য :বড়ের পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে। তাঁর পক্ষেই বা রাজা হওয়া অসম্ভব হবে কেন?

এমন সময় কাবুলের সেরা খানদানী বংশের মুহম্মদ তর্জী সিরিয়া নির্বাসন থেকে দেশে ফিরলেন। সঙ্গে পরীর মত তিন কন্যা, কাওকাব, স্থরাইয়া আর বিবি খুর্দ। এঁরা দেশবিদেশ দেখেছেন, লেখাপড়া জানেন, রুজ-পাউডার ব্যবহারে ওকিবহাল; এঁদের উদয়ে কাবুল কুমারীদের চেহারা অত্যন্ত ম্লান, বেজৌলুশ, 'অমার্জিত' বা 'অনকলচরড্' (আজ্ জঙ্গল বর আমদেহ্ = যেন জঙ্গলী) মনে হতে লাগল।

হবীব উল্লা রাজধানীতে ছিলেন না। আমান উল্লার মা—যদিও আসলে দ্বিতীয়া মহিষী কিন্তু মুইন-উস-স্থলতানের মাতার মৃত্যুতে প্রধান মহিষী হয়েছেন —এক বিরাট ভোজের বন্দোবস্ত করলেন। অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনকে পই পই করে বুঝিয়ে দিলেন, যে করেই হোক মুইন-উস্-স্থলতানেকে তর্জীর বড় মেয়ে কাওকাবের দিকে আকৃষ্ট করাতেই হবে। বিপুল রাজপ্রাসাদের আনাচে কানাচে দু'-একটা কামরা বিশেষ করে খালি রাখা হল। সেখানে কেউ যেন হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত না হয়।

খানাপিনা চলল, গানবাজনায় রাজবাড়ি সরগরম। রানী-মা নিজে মুইন-উস্-স্থলতানেকে কাওকাবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আর কাওকাবকে ফিস ফিস করে কানে কানে বললেন, 'ইনিই যুবরাজ, আফগানিস্থানের তথ্‌ৎ একদিন এঁরই হবে।' কাওকাব বুদ্ধিমতী মেয়ে, ক'সের গমে ক'সের ময়দা হয় জানতেন, আর না জানলেই বা কি, শঙ্করাচার্য তরুণতরুণীর প্রধান বৃত্তি সম্বন্ধে যে মোক্ষম তত্ত্ব বলেছেন সেটা রাজপ্রাসাদেও খাটে।

প্ল্যানটা ঠিক উতরে গেল। বিশাল রাজপ্রাসাদে ঘুরতে ঘুরতে মুইন্-উস্-স্থলতানে কাওকাবের সঙ্গে পুরীর এক নিভৃত কক্ষে বিশ্রম্ভালাপে মশগুল হলেন। মুইন ভাবলেন, খুশ-এখতেয়ারে নিভৃত কক্ষে ঢুকেছেন (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে ফ্রীডম অব্ উইল), রানী-মা জানতেন, শিকার জালে পড়েছে (ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলে প্ল্যান্‌ড্ ডেসটিনি)।

প্ল্যানমাফিকই রানী-মা হঠাৎ যেন বেখেয়ালে সেই কামরায় ঢুকে পড়লেন। তরুণতরুণী একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়ালেন। রানী-মা সোহাগ মেখে অমিয়া ছেনে সতীনপোকে বললেন, 'বাচ্চা তোমার মা নেই, আমিই তোমার মা। তোমার সুখদুঃখের কথা আমাকে বলবে না তো কাকে বলবে?

তোমার বিয়ের ভার তো আমার কাঁধেই। কাওকাবকে যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তবে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? তর্জীর মেয়ের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন মেয়ে তো কাবুলে আর নেই। তোমার দিল কি বলে?'

দিল আর কি বলবে? মুইন তখন ফাটা বাঁশের মাঝখানে।

দিল যা বলে বলুক। মুখে কি বলেছিলেন সে সম্বন্ধে কাবুল চারণরা পঞ্চমুখ। কেউ বলেন, নীরবতা দিয়ে সম্মতি দেখিয়েছিলেন; কেউ বলেন, মৃদু আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ, জানতেন, নসর উল্লার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে; কেউ বলেন, মিনমিন করে সম্মতি জানিয়েছিলেন, কারণ ঠিক তার এক লহমা আগে ভালোমন্দ না ভেবে কাওকাবকে প্রেম-নিবেদন করে বসেছিলেন—হয়ত ভেবেছিলেন, প্রেম আর বিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শিরঃপীড়া—এখন এড়াবেন কি করে? কেউ বলেন, শুধু 'হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ' করেছিলেন, তার থেকে হস্ত-নীস্ত ('হাঁ-না',—যে কথা থেকে বাঙলা 'হেস্তনেস্ত' বেরিয়েছে) কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না; কেউ বলেন, তিনি রামগঙ্গা ভালো করে কিছু প্রকাশ করার আগেই রানী-মা কামরা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

অর্থাৎ কাবুল চারণদের পঞ্চমুখ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী বলে।

মোদ্দা কথা এই, সে অবস্থায় আমীর হোক, ফকীর হোক, ঘুঘু হোক, কবুতর হোক, আর পাঁচজন গুরুজনের সামনে পড়লে যা করে থাকে বা বলে থাকে মুইন-উস্-সুলতানে তাই করেছিলেন।

কিন্তু কি করে বলেছিলেন সে কথা জানার যত না দরকার, তার চেয়ে ঢের বেশী জানা দরকার রানী-মা মজলিসে ফিরে গিয়ে সে-বলা বা না-বলার কি অর্থ প্রকাশ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্‌সট্-বুক কি-বলে না-বলে সেটা অবান্তর, জীবনে কাজে লাগে বাজারের গাইড-বুক।

রানী-মা পর্দার আড়ালে থাকা সত্ত্বেও যখন তামাম আফগানিস্থান তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেত তখন মজলিসের হর্ষোল্লাস যে তাঁর গলার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল তাতে আর কি সন্দেহ? রানী-মা বললেন, 'আজ বড় আনন্দের দিন। আমার চোখের জ্যোতি (নূর-ই-চশ্‌ম্) ইনায়েত উল্লা খান, মুইন-উস্-সুলতানে তর্জীকন্যা কাওকাবকে বিয়ে করবেন বলে মনস্থির করেছেন। খানা-মজলিস দুটোর সময় ভাঙবার কথা ছিল, সে বন্দোবস্ত বাতিল। ফজরের নমাজ (সূর্যোদয়) পর্যন্ত আজকের উৎসব চলবে। আজ রাত্রেই আমি কন্যাপক্ষকে প্রস্তাব পাঠাচ্ছি।'

মজলিসের ঝাড়বাতি দ্বিগুণ আভায় জ্বলে উঠল। চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস,

হর্ষধ্বনি। দাসদাসী ছুটলো বিয়ের তত্ত্বের তত্ত্বতাবাস করতে। সব কিছু সেই দুপুর রাতে রাজবাড়িতেই পাওয়া গেল। আশ্চর্য হওয়ার সাহস কার?

তর্জী হাতে স্বর্গ পেলেন। কাওকাব হৃদয়ে স্বর্গ পেয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রানী-মা হবীব উল্লার কাছে 'সুসংবাদ' জানিয়ে দূত পাঠালেন। মা ও রাজমহিষীরূপে তিনি মুইন-উস্-সুলতানের হৃদয়ের গতি কোন্ দিকে জানতে পেরে তর্জী-কন্যা কাওকাবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে স্থির করেছেন; 'প্রগতিশীল' আফগানিস্থানের ভাবী রাজমহিষী সুশিক্ষিতা হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। কাবুলে এমন কুমারী নেই যিনি কাওকাবের কাছে দাঁড়াতে পারেন। প্রাথমিক মঙ্গলানুষ্ঠান খুদাতালার মেহেরবানীতে সুসম্পন্ন হয়েছে। মহারাজ অতিসত্বর রাজধানীতে ফিরে এসে 'আক্দ্-রসুমাতের' (আইনতঃ পূর্ণ বিবাহ) দিন ঠিক করে পৌরজনের হর্ষবর্ধন করুন।

হবীব উল্লা তো রেগে টং। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান হারালেন না। আর কেউ বুঝুক না-বুঝুক, তিনি বিলক্ষণ টের পেলেন যে, মূর্খ মুইন-উস্-সুলতানে কাও-কাবের প্রেমে পড়ে নসর উল্লার মেয়েকে হারায়নি, হারাতে বসেছে রাজসিংহাসন। কিন্তু হবীব উল্লা যদিও সাধারণত পঞ্চ ম'কার নিয়ে মত্ত থাকতেন তবুও তাঁর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, সমস্ত ষড়যন্ত্রের পিছনে রয়েছেন মহিষী। সৎমার এত প্রেম তো সহজে বিশ্বাস হয় না।

সতীন মা'র কথাগুলি
মধুরসের বাণী
তলা দিয়ে গুঁড়ি কাটেন
উপর থেকে পানি।

পানি-ঢালা দেখেই হবীব উল্লা বুঝতে পারলেন, গুঁড়িটি নিশ্চয়ই কাটা হয়েছে।

রাগ সামলে নিয়ে হবীব উল্লা অতি কমনীয় নমনীয় উত্তর দিলেন,—

'খুদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, মহিষী শুভবুদ্ধি-প্রণোদিতা হয়ে এই বিয়ে স্থির করেছেন। তর্জীকন্যা কাওকাব যে সব দিক দিয়ে মুইন-উস্-সুলতানের উপযুক্ত তাতে আর কি সন্দেহ? কিন্তু শুধু কাওকাব কেন, তর্জীর মেজো মেয়ে সুরাইয়াও তো সুশিক্ষিতা সুরূপা সুমার্জিতা। দ্বিতীয় পুত্র আমান উল্লাই বা খাস কাবুলী জংলী মেয়ে বিয়ে করবেন কেন? তাই তিনি মহিষীর মহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুরাইয়ার সঙ্গে আমান উল্লার বিয়ে স্থির করে এই চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে তর্জীর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠাচ্ছেন। সত্বর রাজধানীতে

ফিরে এসে তিনি স্বয়ং' ইত্যাদি।

হবীব উল্লা বুঝতে পেরেছিলেন, রানী-মার মতলব মুইন-উস্-সুলতানের স্কন্ধে কাওকাবকে চাপিয়ে দিয়ে, আপন ছেলে আমান উল্লার সঙ্গে নসর উল্লার মেয়ের বিয়ে দেবার। তাহলে নসর উল্লার মরার পর আমান উল্লার আমীর হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়। হবীব উল্লা সে পথ বন্ধ করার জন্য আমান উল্লার স্কন্ধে সুরাইয়াকে চাপিয়ে দিলেন। যে রানী-মা কাওকাবের বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি সুরাইয়াকে ঠেকিয়ে রাখবেন কোন লজ্জায়? বিশেষ করে যখন চিহ্‌ল্‌সতুন থেকে বাগ্-ই-বালা পর্যন্ত সুবে কাবুল জানে, সুরাইয়া কাওকাবের চেয়ে দেখতে শুনতে পড়াশোনায় অনেক ভালো।

রানী-মার মস্তকে বজ্রাঘাত। বড়ের কিস্তিতে রাজাকে মাত করতে গিয়ে তিনি যে প্রায় চাল-মাতের কাছাকাছি। হবীব উল্লাকে প্রাণভরে অভিসম্পাত দিলেন, 'নসর উল্লার মেয়েকে তুই পেলিনি, আমিও পেলুম না। তবু মন্দের ভালো; নসর উল্লার কাছে এখন মুইন-উস্-সুলতানে আর আমান উল্লা দু'জনই বরাবর। মুইন-উস্-সুলতানের পাশা এখন আর নসর-কন্যার সীসায় ভারী হবে না তো।—সেই মন্দের ভালো।'

দাবা খেলায় ইংরিজীতে যাকে বলে, 'ওয়েটিঙ মুভ্' রানী-মা সেই পন্থা অবলম্বন করলেন।

চব্বিশ

এর পরের অধ্যায় আরম্ভ হয় ভারতবর্ষের রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে নিয়ে।

১৯১৫ সালের মাঝামাঝি জর্মন পররাষ্ট্র বিভাগ রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের উপদেশ মত স্থির করলেন যে, কোনো গতিকে যদি আমীর হবীব উল্লাকে দিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করানো যায় তাহলে ইংরেজের এক ঠ্যাং খোঁড়া করার মতই হবে। ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতা পাবার লোভে বিদ্রোহ করুক আর নাই করুক, ইংরেজকে অন্তত একটা পুরো বাহিনী পাঞ্জাবে রাখতে হবে—তাহলে তুর্করা মধ্য-প্রাচ্যে ইংরেজকে কাবু করে আনতে পারবে। ফলে যদি সুয়েজ বন্ধ হয়ে যায় তা হলে ইংরেজের দু'পা-ই খোঁড়া হয়ে যাবে।

মহেন্দ্রপ্রতাপ অবশ্য আশা করেছিলেন যে, আর কিছু হোক না হোক ভারতবর্ষ যদি ফাঁকতালে স্বাধীনতা পেয়ে যায় তা হলেই যথেষ্ট।

কাইজার রাজাকে প্রচুর খাতির-যত্ন করে, স্বর্ণ-ঈগল মেডেল পরিয়ে একদল

জর্মন কূটনৈতিকের সঙ্গে আফগানিস্থান রওয়ানা করিয়ে দিলেন। পথে রাজা তুর্কীর সুলতানের কাছ থেকেও অনেক আদর-আপ্যায়ন পেলেন।

কিন্তু পূর্ব-ইরান ও পশ্চিম-আফগানিস্থানের রাজা ও জর্মনদলকে নানা বিপদ-আপদ, ফাঁড়া-গর্দিশ কাটিয়ে এগতে হল। ইংরেজ ও রুশ উভয়েই রাজার দৌত্যের খবর পেয়ে উত্তর দক্ষিণ দু'দিক থেকে হানা দেয়। অসম্ভব দুঃখকষ্ট সহ্য করে, বেশীর ভাগ জিনিসপত্র পথে ফেলে দিয়ে তাঁরা ১৯১৫ সালের শীতের শুরুতে কাবুল পৌঁছান।

আমীর হবীব উল্লা বাদশাহী কায়দায় রাজাকে অভ্যর্থনা করলেন—তামাম কাবুল শহর রাস্তার দু'পাশে ভিড় লাগিয়ে রাজাকে তাঁদের আনন্দ-অভিবাদন জানালো! বাবুর বাদশাহের কবরের কাছে রাজাকে হবীব উল্লার এক খাস প্রাসাদে রাখা হল।

কাবুলের লোক সহজে কাউকে অভিনন্দন করে না। রাজার জন্য তারা যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল তার প্রথম কারণ, কাবুলের জনসাধারণ ইংরেজের নষ্টামি ও হবীব উল্লার ইংরেজ-প্রীতিতে বিরক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল; নব্য-তুর্কী নব্য-মিশরের জাতীয়তাবাদের ক্বচিৎ-জাগরিত বিহঙ্গকাকলী কাবুলের গুলিস্তান-বোস্তানেকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। দ্বিতীয় কারণ, রাজা ভারতবর্ষের লোক, জর্মনীর শেষ মতলব কি সে সম্বন্ধে কাবুলীদের মনে নানা সন্দেহ থাকলেও ভারতবর্ষের নিঃস্বার্থপরতা সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। এ-অনুমান কাইজার বার্লিনে বসে করতে পেরেছিলেন বলেই ভারতীয় মহেন্দ্রকে জর্মন কূটনৈতিকদের মাঝখানে ইন্দ্রের আসনে বসিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

ইংরেজ অবশ্য হবীব উল্লাকে তম্বী করে হুকুম দিল, পত্রপাঠ যেন রাজা আর তার দলকে আফগানিস্থান থেকে বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু ধূর্ত হবীব উল্লা ইংরেজকে নানা রকম টালবাহানা দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখলেন। একথাও অবশ্য তাঁর অজানা ছিল না যে, ইংরেজের তখন দু'হাত ভর্তি, আফগানিস্থান আক্রমণ করবার মত সৈন্যবলও তার কোমরে নেই।

কিন্তু হবীব উল্লা রাজার প্রস্তাবে রাজী হলেন না। কেন হলেন না এবং না হয়ে ভালো করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমি অনেক লোকের মুখ থেকে অনেক কারণ, অনেক আলোচনা শুনেছি। সে-সব কারণের ক'টা খাঁটি, ক'টা ঝুটা বলা অসম্ভব কিন্তু এ-বিষয়ে দেখলুম কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, হবীব উল্লা তখন ভারত আক্রমণ করলে সমস্ত আফগানিস্থান তাতে সাড়া

দিত। অর্থাৎ আমীর জনমত উপেক্ষা করলেন ; জর্মনি, তুর্কী, ভারতবর্ষকেও নিরাশ করলেন।

জর্মনরা, এক বৎসর চেষ্টা করে দেশে ফিরে গেল কিন্তু রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ তখনকার মত আশা ছেড়ে দিলেও ভবিষ্যতের জন্য জমি আবাদ করতে কসুর করলেন না। রাজা জানতেন, হবীব উল্লার মৃত্যুর পর আমীর হবেন নসর উল্লা নয় মুইন-উস্‌-সুলতানে। কিন্তু দুটো টাকাই যে মেকি রাজা দু'চারবার বাজিয়ে বেশ বুঝে নিয়েছিলেন। আমান উল্লার কথা কেউ তখন হিসেবে নিত না কিন্তু রাজা যে তাকে বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার পরখ করে নিয়েছিলেন সে কথা কাবুলের সকলেই জানে। কিন্তু তাঁকে কি কানমন্ত্র দিয়েছিলেন সে কথা কেউ জানে না ; রাজাও মুখ ফুটে কিছু বলেন নি।

১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাজা কাবুল ছাড়েন। তারপর যুদ্ধ শেষ হল।

শেষ আশায় নিরাশ হয়ে কাবুলের প্রগতিপন্থীরা নির্জীব হয়ে পড়লেন। পর্দার আড়াল থেকে তখন এক অদৃশ্য হাত আফগানিস্থানের ঘুঁটি চালাতে লাগলো। সে হাত আমান উল্লার মাতা রানী-মা উলিয়া হজরতের।

বহু বৎসর ধরে রানী-মা প্রহর গুনছিলেন এই সুযোগের প্রত্যাশায়। তিনি জানতেন প্রগতিপন্থীরা হবীব উল্লা, নসর উল্লা, মুইন-উস্‌-সুলতানে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত আমান উল্লার কথা হিসেবেই আনবেন না। পর্দার আড়াল থেকেই রানী-মা প্রগতিপন্থী যুবকদের বুঝিয়ে দিলেন যে, হবীব উল্লা কাবুলের বুকের উপর জগদ্দল পাথর, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও যখন সে পাথরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি তখন তাঁরা বসে আছেন কিসের আশায় ? নসর উল্লা, মুইন-উস্‌-সুলতানে দু'জনই ভাবেন সিংহাসন তাঁদের হক্কের মাল—সে-মালের জন্য তাঁরা কোনো দাম দিতে নারাজ।

কিন্তু আমান উল্লা দাম দিতে তৈরী। সে দাম কি ? বুকের খুন দিয়ে তিনি ইংরেজের সঙ্গে লড়ে দেশকে স্বাধীন করতে প্রস্তুত।

কিন্তু আমান উল্লাকে আমীর করা যায় কি প্রকারে ? রানী-মা বোরকার ভিতর থেকে তারও নীলছাপ বের করলেন। আসছে শীতে হবীব উল্লা যখন নসর উল্লা আর মুইন-উস্‌-সুলতানেকে সঙ্গে নিয়ে জলালাবাদ যাবেন তখন আমান উল্লা কাবুলের গভর্নর হবেন। তখন যদি হবীব উল্লা জলালাবাদে মারা যান তবে কাবুলের অস্ত্রশালা আর কোষাধ্যক্ষের জিম্মাদার গভর্নর আমান উল্লা তার ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে পারবেন। রাজা হতে হলে এই দুটো জিনিসই যথেষ্ট।

কিন্তু মানুষ মরে ভগবানের ইচ্ছায়। নীলছাপের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে যে হবীব উল্লা ঠিক তখনই মরবেন তার কি স্থিরতা? অসহিষ্ণু রানী-মা বুঝিয়ে দিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছা মানুষের হাত দিয়েই সফল হয়—বিশেষত যদি তার হাতে তখন একটি নগণ্য পিস্তল মাত্র থাকে।

স্বামী হত্যা? এ্যাঁ? হ্যাঁ। কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা হচ্ছে না—যেখানে সমস্ত দেশের আশাভরসা, ভবিষ্যৎ মঙ্গল-অমঙ্গল ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সেখানে কে স্বামী, স্ত্রীই বা কে?

শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'কা তব কান্তা?' কিন্তু ঠিক তার পরেই 'সংসার অতীব বিচিত্র' কেন বলেছেন সে তত্ত্বটা এতদিন পর আমার কাছে খোলসা হল।

অর্বাচীনরা তবু শুধালো, 'কিন্তু আমীর হবীব উল্লার সৈন্যদল আর জলালাবাদ অঞ্চলের লোকজন নসর উল্লা বা মূইন-উস্-স্থলতানের পক্ষ নেবে না?'

রাগে দুঃখে রানী-মার নাকি কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়েছিল। উষ্মা চেপে শেষটায় বলেছিলেন, 'ওরে মূর্খের দল, জলালাবাদে যে-ই রাজা হোক না কেন, আমরা রটাব না যে, সিংহাসনের লোভে অসহিষ্ণু হয়ে সেই গুহ্যুই নিরীহ হবীব উল্লাকে খুন করেছে? মূর্খেরা এতক্ষণে বুঝল, এস্থলে 'রানীর কি মত?' নয়। এখানে 'রানীর মতই সকল মতের রানী'।

এসব আমার শোনা কথা—কতটা ঠিক কতটা ভুল হলপ করে বলতে পারব না; তবে এরকমেরই কিছু একটা যে হয়েছিল সে বিষয়ে কাবুল-চারণদের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কথামালার গল্প ভুল। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্য লোকও জুটল।

আপন অলসতাই হবীব উল্লার মৃত্যুর আরেক কারণ। জলালাবাদে একদিন সন্ধ্যাবেলা শিকার থেকে ফিরে আসতেই তাঁর এক গুপ্তচর নিবেদন করল যে, গোপনে হুজুরের সঙ্গে সে অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চায়। সে নাকি কি করে শেষ মুহূর্তে এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গিয়েছিল। 'কাল হবে, কাল হবে' বলে নাকি হবীব উল্লা প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে গেলেন। সকলের সামনে গুপ্তচর কিছু খুলে বলতে পারল না—আমীরও শুধু বললেন, 'কাল হবে, কাল হবে।'

সে কাল আর কখনো হয় নি। সে-রাত্রেই গুপ্তঘাতকের হাতে হবীব উল্লা প্রাণ দেন।

সকালবেলা জলালাবাদে যে কী তুমুল কাণ্ড হয়েছিল তার বর্ণনার আশা করা অন্যায়। কেউ শুধায়, 'আমীরকে মারল কে?' কেউ শুধায়, 'রাজা হবেন কে?' একদল বলল, 'শহীদ আমীরের ইচ্ছা ছিল নসর উল্লা রাজা হবেন,' আরেকদল বলল, 'মৃত আমীরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই; রাজা হবেন বড় ছেলে, যুবরাজ মুইন-উস্-সুলতানে ইনায়েত উল্লা। তখ্‌তের হক তাঁরই।'

বেশীর ভাগ গিয়েছিল ইনায়েত উল্লার কাছে। তিনি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছেন। লোকজন যতই জিজ্ঞেস করে রাজা হবেন কে? তিনি হয় উত্তর দেন না, না হয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেন, 'ব কাকায়েম বোরো' অর্থাৎ 'খুড়োর কাছে যাও, আমি কি জানি।' কেন সিংহাসনের লোভ করেননি বলা শক্ত; হয়ত পিতৃশোকে অত্যধিক কাতর হয়ে পড়েছিলেন, হয়ত পিতার ইচ্ছার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন, হয়ত আন্দাজ করেছিলেন যে, যারা তাঁর পিতাকে খুন করেছে তাদের লোকই শেষ পর্যন্ত তখ্‌ৎ দখল করবে। তিনি যদি সে-পথে কাঁটা হয়ে মাথা খাড়া করেন তবে সে-মাথা বেশীদিন ঘাড়ে থাকবে না। অত্যন্ত কাঁচা, কাঁচা-লঙ্কাও পাঁঠার বলি দেখে খুশী হয় না। জানে এবার তাকে পেষায় লগ্ন আসন্ন। নসর উল্লা আমীর হলেন।

এদিকে রানী-মা কাবুলে বসে তড়িৎ গতিতে কাবুল কান্দাহার জলালাবাদ হিরাতে খবর রটালেন, রাজ্যগৃধ্নু অসহিষ্ণু নসর উল্লা ভ্রাতা হবীব উল্লাকে খুন করেছেন। তাঁর আমীর হওয়ার এমনিতেই কোনো হক্ ছিল না—এখন তো আর কোনো কথাই উঠতে পারে না। হক্ ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র, যুবরাজ মুইন-উস্-সুলতানের। তিনি যখন স্বেচ্ছায়, খুশ-এখতেয়ারে নসর উল্লার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন অর্থাৎ সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করেছেন, তখন হক্ বর্তালো আমান উল্লার উপর।

অকাট্য যুক্তি। তবু কাবুল চীৎকার করলো, 'জিন্দাবাদ আমান উল্লা খান' —ক্ষীণকণ্ঠে।

সঙ্গে সঙ্গে রানী-মা আমান উল্লার তখ্‌ৎ লাভে খুশী হয়ে সেপাইদের বিস্তর বখশিশ দিলেন; নূতন বাদশা আমান উল্লা সেপাইদের তনখা অত্যন্ত কম বলে নিতান্ত 'কর্তব্য পালনার্থে' সে তনখা ডবল করে দিলেন। উভয় টাকাই রাজ-কোষ থেকে বেরলো। কাবুল হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'জিন্দাবাদ আমান উল্লা খান।'

ভলতেয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মন্ত্রোচ্চারণ করে একপাল ভেড়া মারা যায় কিনা। ভলতেয়ার বলেছিলেন, 'যায়, কিন্তু গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে সেঁকো

বিষ খাইয়ে দিলে আর কোনো সন্দেহই থাকবে না।'

আফগান সেপাইয়ের কাছে যুক্তিতর্ক মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায়—টাকাটাই সেঁকো।

আমান উল্লা কাবুল বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন। সজল নয়নে, বলদৃপ্ত কণ্ঠে পিতৃঘাতকের রক্তপাত করবেন বলে শপথ গ্রহণ করলেন, 'যে পাষণ্ড আমার জান্-দিলের পিতাকে হত্যা করেছে তার রক্ত না দেখা পর্যন্ত আমার কাছে জল পর্যন্ত শরাবের মত হারাম, তার মাংস টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত সব মাংস আমার কাছে শূকরের মাংসের মত হারাম।'

আমান উল্লার শত্রুপক্ষ বলে, আমান উল্লা থিয়েটারে ঢুকলে নাম করতে পারতেন; মিত্রপক্ষ বলে, সমস্ত ষড়যন্ত্রটা রানী-মা সর্দারদের সঙ্গে তৈরী করেছিলেন—আমান উল্লাকে বাইরে রেখে। হাজার হোক 'পিদর-কুশ' বা পিতৃহন্তার হস্ত চুম্বন করতে অনেক লোকই ঘৃণা বোধ করতে পারে। বিশেষত রানী-মা যখন একাই একলক্ষ তখন তরুণ আমান উল্লাকে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে নামিয়ে লাভ কি? আফগানিস্থানে স্ত্রীলোকের আমীর হওয়ার রেওয়াজ থাকলে তাঁকে হয়ত সারাজীবনই যবনিকা-অন্তরালে থাকতে হত।

আমান উল্লার সৈন্যদল জলালাবাদ পৌঁছল। নসর উল্লা, ইনায়েত উল্লা দু'জনই বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেন। নসর উল্লা মোল্লাদের কুতুব-মিনার স্বরূপ ছিলেন; সে মিনার থেকে যাজক সম্প্রদায়ের গম্ভীর নিনাদ বহির্গত হয়ে কেন যে সেপাই-সান্ত্রী জড়ো করতে পারল না সেও এক সমস্যা।

কাবুল ফেরার পথে যুবরাজ নাকি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেঁদে ফেলেছিলেন। জলালাবাদের যেসব সেপাই তাঁকে আমীরের তখ্‌তে বসাবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিল তারা ততক্ষণে আমান উল্লার দলে যোগ দিয়ে কাবুল যাচ্ছে। কান্না দেখে তারা নাকি মুইন-উস্-সুলতানের কাছে এসে বারবার বিদ্রূপ করে বলেছিল, 'বলো না এখন, 'ব কাকায়েম বোরো—খুড়োর কাছে যাও, তিনি সব জানেন।' যাও এখন খুড়োর কাছে? এখন দেখি, কাবুল পৌঁছলে খুড়ো তোমাকে বাঁচান কি করে!'

কাবুলের আর্ক দুর্গে দু'জনকেই বন্দী করে রাখা হ'ল। কিছুদিন পর নসর উল্লা 'কলেরায়' মারা যান। কফি খেয়ে নাকি তাঁর কলেরা হয়েছিল। কফিতে অন্য কিছু মেশানো ছিল কিনা সে বিষয়ে দেখলুম অধিকাংশ কাবুল-চারণের স্মৃতিশক্তি বড়ই ক্ষীণ।

এর পর মুইন-উস্-সুলতানের মনের অবস্থা কি হয়েছিল ভাবতে গেলে আমার

মত নিরীহ বাঙালীর মাথা ঘুরে যায়। কল্পনা সেখানে পৌঁছয় না, মৃত্যুভয়ের তুলনাও নাকি নেই।

এখানে পৌঁছে সমস্ত দুনিয়ার উচিত আমান উল্লাকে বারবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা। প্রাচ্যের ইতিহাসে যা কখনো হয়নি আমান উল্লা তাই করলেন। মাতার হাত থেকে যেটুকু ক্ষমতা তিনি ততদিনে অধিকার করতে পেরেছিলেন তারই জোরে, বিচক্ষণ কূটনৈতিকদের শত উপদেশ গ্রাহ্য না করে তিনি বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মুক্তি দিলেন।

এ যে কত বড় সাহসের পরিচয় তা শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন যাঁরা মোগল-পাঠানের ইতিহাস পড়েছেন। এত বড় দরাজ-দিল আর হিম্মৎ-জিগরের নিশান আফগানিস্থানের ইতিহাসে আর নেই।

পঁচিশ

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কানমন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে আমান উল্লা আরো ভালো রকমেই বুঝতে পারলেন যে, চোরের যদি তিন দিন হয় তবে সাধুর মাত্র এক দিন। সেই এক দিনের হক্কের জোরে তিনি লড়াই জিতেছেন—এখন আবার দুশমনের পালা। আমান উল্লা তার জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

জমাখরচের খাতা খুলে দেখলেন, জমায় লেখা, আমান উল্লা খান দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছেন, তিনি আর 'আমীর' আমান উল্লা নন—তিনি 'গাজী' 'বাদশাহ' আমান উল্লা খান।

খরচে লেখা, নসর উল্লার মোল্লার দল যদিও আসর থেকে সরে গিয়েছে তবু তাদের বিশ্বাস নেই। আমান উল্লা ফরাসী জানতেন—'রেকুলের পুর মিয়ো সোতের,' অর্থাৎ 'ভালো করে লাফ দেওয়ার জন্য পিছিয়ে যাওয়া' প্রবাদটা তাঁর অজানা ছিল না।

কিন্তু আমান উল্লা মনে মনে স্থির করলেন, মোল্লারা সরকারী রাস্তার কোন্ খানে খানাখন্দ বানিয়ে রাখবে সে ভয় অহরহ বুকের ভিতর পুষে রাখলে দেশ-সংস্কারের মোটর টপ্ গিয়ারে চালানো অসম্ভব। অথচ পুরা স্পীডে মোটর না চালিয়ে উপায় নেই—সাধুর মাত্র এক দিন।

কাবুলে পৌঁছে যে দিকে তাকাই সেখানেই দেখি হরেকরকম সরকারি উর্দীপরা স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরারা ঘোরাঘুরি করছে। খবর নিয়ে শুনি,

কোনোটা উর্দী ফরাসী স্কুলের, কোনোটা জর্মন, কোনোটা ইংরিজী আর কোনোটা মিলিটারী স্কুলের। শুধু তাই নয়, গাঁয়ের পাঠশালা পাশ করে যারা শহরে এসেছে তাদের জন্য ফ্রি বোর্ডিং, লজিং, জামাকাপড়, কেতাবপত্র, ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট-বক্স, ডিক্‌সনরি, ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্য খচ্চরের ভাড়া, এক কথায় 'অল ফাউণ্ড'।

ভারতবর্ষের হয়ে আমি বললুম, 'নাথিং লস্ট'।

প্যারিসফের্তা সইফুল আলম বুঝিয়ে বললেন, 'আপনি ভেবেছেন 'অল ফাউণ্ড' হলে বিদ্যেও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে জুটে যায়। মোটেই না। হস্টেল থেকে ছেলেরা প্রায়ই পালায়।'

আমি বললুম, 'ধরে আনার বন্দোবস্ত নেই ?'

সইফুল আলম বললেন, 'গাঁয়ের ছেলেরা শক্ত হাড়ে তৈরী। পালিয়ে বাড়ি না গিয়ে যেখানে সেখানে দিন কাটাতে পারে। তারও দাওয়াই আমান উল্লা বের করেছেন। হস্টেল থেকে পালানো মাত্রই আমরা সরকারকে খবর দিই। সরকারের তরফ থেকে তখন দু'জন সেপাই ছোকরার গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে আসর জমিয়ে বসে, তিন বেলা খায় দায় এবং যদিও হুকুম নেই তবু সকলের জানা কথা যে, কোর্মা-কালিয়া না পেলে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ছেলের বাপকে তিন বেলা মার লাগায়। বাপ তখন ছেলেকে খুঁজতে বেরোয়। সে এসে হস্টেলে হাজিরা দেবে, হেডমাস্টারের চিঠি গাঁয়ে পৌছবে যে আসামী ধরা দিয়েছে তখন সেপাইরা বাপের ভালো দুম্বাটি কেটে বিদায়-ভোজ খেয়ে তাকে হুঁশিয়ার না করে শহরে ফিরবে। পরিস্থিতিটার পুনরাবৃত্তিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।'

আমি বললুম, 'কিন্তু পড়াশোনায় যদি কেউ নিতান্তই গর্দভ হয় তবে ?'

'পর পর তিনবার যদি ফেল মারে তবে হেডমাস্টার বিবেচনা করে দেখবেন তাকে ডিসমিস করা যায় কি না। বুদ্ধিশুদ্ধি আছে অথচ পড়াশোনায় ঢিলেমি করছে জানলে তার তখনো ছুটি নেই।'

এর পর কোন্ দেশের রাজা আর কি করতে পারেন ?

মিলিটারি স্কুলের ভার তুর্কদের হাতে। তুর্কী জেনারেলদের ঐতিহ্য বার্লিনের পৎস্‌দাম সমরবিদ্যায়তনের সঙ্গে জড়ানো; তাই শুনলুম স্কুলটি জর্মন কায়দায় গড়া। সেখানে কি রকম উন্নতি হচ্ছে তার খবর কেউ দিতে পারলেন না। শুধু অধ্যাপক বেনওয়া বললেন, 'ইস্কুলটা তুলে দিলে আফগানিস্থানের কিছু ক্ষতি হবে না।'

মেয়েদের শিক্ষার জন্য আমান উল্লা আর তাঁর বেগম বিবি সুরাইয়া উঠে পড়ে লেগেছেন। বোরকা পরে এক কাবুল শহরেই প্রায় দু'হাজার মেয়ে ইস্কুলে যায়,

উঁচু পাঁচিলঘেরা আঙিনায় বাস্কেট-বল, ভলি-বল খেলে। সইফুল আলম বললেন, 'লিখতে পড়তে, আঁক কষতে শেখে, সেই যথেষ্ট। আর তাও যদি না শেখে আমার অন্তত কোনো আপত্তি নেই। হারেমের বন্ধ হাওয়ার বাইরে এসে লাফালাফি করছে এই কি যথেষ্ট নয়?'

আমি সর্বান্তঃকরণে সায় দিলুম। সইফুল আলম কানে কানে বললেন, 'কিন্তু একজন লোক একদম সায় দিচ্ছেন না। রানী-মা।'

শুনে একটু ঘাবড়ে গেলুম। দুই শত্রু নিপাত করে, তৃতীয় শত্রুকে ঠাণ্ডা রেখে যিনি আমান উল্লাকে বাদশা বানাতে পেরেছেন তাঁর রায়ের একটা মূল্য আছে বই কি? তার মতে নাকি এত শিক্ষার খোরাক আফগানিস্থান হজম করতে পারবে না। এই নিয়ে নাকি মাতাপুত্রে মনোমালিন্যও হয়েছে—মাতা অভিমানভরে পুত্রকে উপদেশ দেওয়া বন্ধ করেছেন। বধূ সুরাইয়াও নাকি শাশুড়ীকে অবজ্ঞা করেন।

কিন্তু কাবুল শহর তখন আমান উল্লার চাবুক খেয়ে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে—'দেরেশি' পরে। 'দেরেশি' কথাটা ইংরিজী 'ড্রেস' থেকে এসেছে—অর্থাৎ হ্যাট, কোট, টাই, পাতলুন। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, সরকারী কর্মচারী হলেই তাকে দেরেশি পরতে হয় তা সে বিশ টাকার কেরানীই হোক, আর দশ টাকার সিপাই-ই হোক। শুধু তাই নয়, দেরেশি পরা না থাকলে কাবুল নাগরিক সরকারী বাগানে পর্যন্ত ঢুকতে পায় না। একদিকে সরকারী চাপ, অন্যদিকে বাইরের চাকচিক্যের প্রতি অনুন্নত জাতির মোহ, মাঝখানে সিনেমার উস্কানি, তিনে মিলে কাবুল দেরেশি-পাগল হয়ে উঠেছে।

ইস্তেক আবদুর রহমানের মনে ছোঁয়াচ লেগেছে। আমি বাড়িতে শিলওয়ার পরে বসে থাকলে সে খুঁতখুঁত করে; আটপৌরে সুট পরে বেরতে গেলে নীলকৃষ্ণ দেরেশি পরার উপদেশ দেয়।

মেয়েরাও তাল রেখে চলেছেন। আমীর হবীব উল্লা হারেমের মেয়েদের ফ্রক ব্লাউজ পরাতেন। আমান উল্লার আমলে দেখি ভদ্রমহিলা মাত্রেই উঁচু হিলের জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক, আস্বচ্ছ সিল্কের মোজা, লম্বাহাতার আঁটসাঁট ব্লাউজ, দস্তানা আর হ্যাট পরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। হ্যাটের সামনে একখানা অতি পাতলা নেট ঝুলছে বলে চেহারাখানা পষ্টাপষ্টি দেখা যায় না। যে মহিলার যত সাহস তাঁর নেটের বুনুনি তত ঢিলে।

Figure কথাটার ফরাসী উচ্চারণ ফিগুর, অর্থ—মুখের চেহারা। ফরাসী অধ্যাপক বেনওয়া বলতেন, 'কাবুলী মেয়েদের ফিগার বোঝা যায় বটে, কিন্তু

ফিগুর দেখবার উপায় নেই।'

কিন্তু দেশের ধনদৌলত না বাড়িয়ে তো নিত্য নিত্য নূতন স্কুল-কলেজ খোলা যায় না, দেরেশি দেখানো যায় না, ফিগার ফলানো যায় না। ধনদৌলত বাড়াতে হলে আজকের দিনে কলকারখানা বানিয়ে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার করতে হয়। তার জন্য প্রচুর পুঁজির দরকার। আফগানিস্থানের গাঁটে সে কড়ি নেই—বিদেশীদের হাতে দেশের শিল্পবাণিজ্য ছেড়ে দিতেও বাদশা নারাজ। আমান উল্লার পিতামহ দোর্দণ্ডপ্রতাপ আবদুর রহমান বলতেন, 'আফগানিস্থান সেদিনই রেলগাড়ি চালাবে যেদিন সে নিজের হাতে রেলগাড়ি তৈরী করতে পারবে।' পিতা হবীব উল্লা সে আইন ঠিক ঠিক মেনে চলেননি—তবে কাবুলের বিজলী বাতির জন্য যে কলকব্জা কিনেছিলেন সেটা কাবুলী টাকায়। আমান উল্লা কি করবেন ঠিক মনস্থির করতে পারছিলেন না—ন্যাশন্যাল লোন তোলার উপদেশ কেউ কেউ তাঁকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাহলে সবাইকে সুদ দিতে হয় এবং সুদ দেওয়া-নেওয়া ইসলামে বারণ।

হয়ত আমান উল্লা ভেবেছিলেন যে, দেশের গুরুভারের খানিকটে নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে দেশের আর পাঁচজনের কাঁধে যদি ভাগবাঁটোয়ারা করে দেওয়া যায় তাহলে প্রগতির পথে চলার সুবিধে হবে। আমান উল্লা বললেন, পার্লিমেণ্ট তৈরী করো।

সে পার্লিমেণ্টের স্বরূপ দেখতে পেলুম পাগমান গিয়ে।

কাবুল থেকে পাগমান কুড়িমাইল রাস্তা। বাস চলাচল আছে। সমস্ত শহরটা গড়ে তোলা হয়েছে পাহাড়ের থাকে থাকে। দূর থেকে মনে হয় যেন একটা শাঁখ কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার ভাঁজে ভাঁজে ছোট বাঙলো; অনেকটা ইতালিয়ান ভিলার মত। সমস্ত পাগমান শহর জুড়ে আপেল নাসপাতির গাছ বাঙলোগুলোকে ঘিরে রেখেছে আর চূড়ার বরফগলা ঝরণা রাস্তার এক পাশের নালা দিয়ে থাকে থাকে নেমে এসেছে। পিচ ঢালা পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে উঠছি আর দেখছি দুদিকে ঘন সবুজের নিবিড় স্তব্ধ সুষুপ্তি। কোনো দিকে কোনো প্রকার জীবনযাত্রার চঞ্চলতা নেই, কঠিন পাথরের খাড়া দেয়াল নেই, ঘিন-ঘিনে হলদে রঙের বাড়িঘরদোর নেই। কিছুতেই মনে হয় না যে, নীরস কর্কশ আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে চলেছি, থেকে থেকে ভুল লাগে আর চোখ চেয়ে থাকে সামনের মোড় ফিরতেই নেবুর ঝুড়ি-কাঁধে খাসিয়া মেয়েগুলোকে দেখবে বলে।

বাদশা আমীর-ওমরাহ নিয়ে গ্রীষ্মকালটা এখানে কাটান। এক সপ্তাহের

জন্য তামাম আফগানিস্থান এখানে জড়ো হয় 'জশন' বা স্বাধীনতা দিবসের আমোদ আহ্লাদ করার জন্য। দল বেঁধে আপন আপন তাঁবু সঙ্গে নিয়ে এসে তারা রাস্তার দু'দিকে যেখানে সেখানে সেগুলো খাটায়। সমস্ত দিন কাটায় চাঁদমারি, মঙ্গোল নাচ, পল্টনের কুচকাওয়াজ দেখে, না হয় চায়ের দোকানে আড্ডা জমিয়ে; রাত্রে তাঁবুতে তাঁবুতে শুরু হয় গানের মজলিস। "আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই; জোয়ান হইব গোড়া হতে তবে এ জীবন দোহরাই"—ধরনের ওস্তাদী গানের রেওয়াজ প্রায় নেই, হরেকরকম "ফতুজানকে" অনেকরকম সাধ্য-সাধনা করে ডাকাডাকি করা হচ্ছে এ-সব গানের আসল ঝোঁক। মাঝে মাঝে একজন অতিরিক্ত উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে দু'চার চক্কর নাচ ভী দেখিয়ে দেয়। আর সবাই গানের ফাঁকে ফাঁকে 'সাবাস সাবাস' বলে নাচনেওয়ালাকে উৎসাহ দেয়।

এ-রকম মজলিসে বেশীক্ষণ বসা কঠিন। বন্ধ ঘরে যদি সবাই সিগারেট ফোঁকে তবে নিজেকেও সিগারেট ধরাতে হয়—না হলে চোখ জ্বালা করে, গলা খুসখুস করতে থাকে। এ-সব মজলিসে আপনিও যদি মনের ভিতর কোনো "ফতুজান" বা কদম্ববনবিহারিণীর ছবি এঁকে গলা মিলিয়ে—না মিললেও আপত্তি নেই—চিৎকার করে গান না জোড়েন তবে দেখবেন ক্রমেই কানে তালা লেগে আসছে, শেষটায় ফাটার উপক্রম। রাগবি খেলার সঙ্গে এ-সব গানের অনেক দিক দিয়ে মিল আছে—তাই এর রসভোগ করতে হয় বেশ একটু তফাতে আল-গোছে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু আমার বার বার মনে হ'ল পাগমান হৈ-হল্লার জায়গা নয়। নির্ঝরের ঝরঝর, পত্র-পল্লবের মৃদু মর্মর, অচেনা পাখির একটানা কূজন, পচা পাইনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, সবশুদ্ধ মিলে গিয়ে এখানে বেলা দ্বিপ্রহরেও মানুষের চোখে তন্দ্রা আসে। ভর গ্রীষ্মকাল, গাছের তলায় বসলে তবু শীত শীত করে—কোটের কলারটা তুলে দিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় পেয়ালা, প্রিয়া, কবিতার বই কিছুরই প্রয়োজন নেই, একখানা র‍্যাপার পেলে ওমটা ঠিক জমত।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। চোখ মেলে দেখি এক অপরূপ মূর্তি। কাঁচাপাকা লম্বা দাড়িওয়ালা, ঘামে-ভেজা, আজন্ম অস্নাত অধৌত, পীত দন্তকৌমুদী বিকশিত এক আফগান সামনে দাঁড়িয়ে। এরূপ আফগান অনেক দেখেছি, কিন্তু এর পরনে ধারালো ক্রীজওয়ালা সদ্য নূতন কালো পাতলুন, কালো ওয়েস্টকোট, স্টার্চ করা শক্ত শার্ট, কোণ-ভাঙা স্টিফ কলার, কালো টাই, দু'বোতামওয়ালা নব্যতম কাটের মর্নিং-কোট আর একমাথা বাবরি চুলের উপর দেড়ফুট উঁচু চকচকে সিল্কের

অপেরা-হ্যাট ! সব কিছু আনকোরা ঝা-চকচকে নূতন ; দেখে মনে হল যেন এই মাত্র দর্জির কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে বের করে গাছতলায় দাঁড়িয়ে পরা হয়েছে। যা তা 'দেরেশি' নয়, ষোল আনা মর্নিং-স্যুট। প্যারেডের দিনে লাট-বেলাট এই রকম স্যুট পরে সেলুট নেন।

বেল্টের অভাবে পাজামার নোংরা নেওয়ার দিয়ে পাতলুন বাঁধা, কালো ওয়েস্টকোট আর পাতলুনের সঙ্গমস্থল থেকে একমুঠো ধবধবে সাদা শার্ট বেরিয়ে এসেছে, টাইটাও ওয়েস্টকোটের উপরে ঝুলছে।

বাঁ হাতে পাগড়ির কাপড় দিয়ে বানানো বোঁচকা, ডান হাতে ফিতেয় বাঁধা একজোড়া নূতন কালো বুট। তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি পায়ে জুতো মোজা নেই !

আমাকে পশতু ভাষায় অভিবাদন করে বোঁচকাটা কাঁধে ফেলে, লম্বা হাতে বুট জোড়া দোলাতে দোলাতে ওরাঙওটাঙের মত বড় রাস্তার দিকে রওয়ানা হল।

আমি তো ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা পেলুম না যে, এ রকমের আফগান এ-ধরনের স্যুট পেলেই বা কোথায়, আর এর প্রয়োজনই বা তার কি। কিন্তু ঐ এক মূর্তি নয়। বন থেকে বেরবার আগে হুবহু এক দ্বিতীয় মূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে দেখি এক মুচির সামনে উবু হয়ে বসে গল্প জুড়েছে আর মুচি তার বুটের তলায় লোহা ঠুকে ঠুকে আল্পনা এঁকে দিচ্ছে।

পরের দিন আমান উল্লার বক্তৃতা। সভায় যাবার পথে এ-রকম আরো ডজনখানেক মূর্তির সঙ্গে দেখা হল। সেখানে গিয়ে দেখি সভার সবচেয়ে ভালো জায়গায়, প্ল্যাটফর্মের মুখোমুখি প্রায় শ'দেড়েক লোক এ-রকম মর্নিং-স্যুটের ইউনিফর্ম পরে বসে আছে। এরাই প্রথম আফগান পার্লিমেন্টের সদস্য।

যে তাজিক, হাজারা, মঙ্গোল, পাঠান আপন আপন জাতীয় পোষাক পরে এতকাল স্বচ্ছন্দে ঘরে-বাইরে ঘোরাফেরা করেছে, বিদেশীর মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আজ তারা বিকট বিজাতীয় বেশভূষা ধারণ করে সভাস্থলে কাঠের মত বসে আছে। শুনেছি অনভ্যাসের ফোঁটা চড়চড় করে, কিন্তু এদের তো শুধু কপালে ফোঁটা দেওয়া হয়নি, সর্বাঙ্গে যেন কৃষ্ণচন্দন লেপে দেওয়া হয়েছে !

আমান উল্লা দেশের ভূতভবিষ্যৎবর্তমান সম্বন্ধে অনেক খাঁটী কথা বললেন। কাবুলের লোক হাততালি দিল। সদস্যদের তালিম দেওয়া হয়েছিল কিনা জানিনে, তারা এলোপাতাড়ি হাততালি দিয়ে লজ্জা পেয়ে এদিক ওদিক তাকায় ; ফরেন অফিসের কর্তারা আরো বেশী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করেন। বিদেশী

রাজদূতেরা অপলক দৃষ্টিতে আমান উল্লার দিকে তাকিয়ে—সেদিন বুঝতে পারলুম রাজদূত হতে হলে কতদূর আত্মসংযম, কত জোর চিত্তজয়ের প্রয়োজন।

জানি, স্যুট ভালো করে পরতে পারা না-পারার উপর কিছুই নির্ভর করে না কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কি প্রয়োজন ছিল লেফাফাদুরস্ত হওয়ার লোভে দেড়শ' জন গাঁওবুড়াকে লাঞ্ছিত করে নিজে বিড়ম্বিত হওয়ার?

আমান উল্লার বক্তৃতা এরা কতদূর বুঝতে পেরেছিল জানিনে—ভাষা এক হলেই তো আর ভাবের বাজারের বেচাকেনা সহজ সরল হয়ে ওঠে না। শুনেছি, পুরানো বোতলও নাকি নয়া মদ সইতে পারে না।

ছাব্বিশ

গ্রীষ্মকালটা কাটল ক্ষেত-খামারের কাজ দেখে দেখে। আমাদের দেশে সে সুবিধে নেই; ঠাঠা রোদ্দুর, ঝমাঝম বৃষ্টি, ভলভলে কাদা আর লিকলিকে জোঁকের সঙ্গে একটা রফারফি না করে আমাদের দেশের ক্ষেত-খামারের পয়লা দিকটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করার উপায় নেই। এদেশের চাষবাসের বেশীর ভাগ শুকনো-শুকনিতে। শীতের গোড়ার দিকে বেশ ভালো করে একদফা হাল চালিয়ে দেয়; তারপর সমস্ত শীতকাল ধরে চাষীর আশা যেন বেশ ভালো রকম বরফ পড়ে। অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে বার কয়েক ক্ষেতের উপর বরফ জমে আর গলে; জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে অনেক নিচে ঢোকে আর সমস্ত ক্ষেতটাকে বেশ নরম করে দেয়। বসন্তের শুরুতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়, কিন্তু মাঠঘাট ডুবে যায় না। আধা-ভেজা আধা-শুকনোতে তখন ক্ষেতের কাজ চলে—নালার ধারে গাছতলায় একটুখানি শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে বেশ আরাম করে বসে ক্ষেতের কাজ দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না। তারপর গ্রীষ্মকালে চতুর্দিকে পাহাড়ের উপরকার জমা-বরফ গলে কাবুল উপত্যকায় নেমে এসে খাল-নালা ভরে দেয়। চাষীরা তখন নালায় বাঁধ দিয়ে দু'পাশের ক্ষেতকে নাইয়ে দেয়। ধান ক্ষেতের মত আল বেঁধে বেবাক জমি টৈটম্বুর করে দিতে হয় না।

কোন্ চাষীর কখন নালায় বাঁধ দেবার অধিকার সে সম্বন্ধে বেশ কড়াকড়ি আইন আছে। শুধু তাই নয়, নালার উজান ভাঁটির গাঁয়ে গাঁয়ে জলের ভাগ-বাঁটোয়ারার কি বন্দোবস্ত তারও পাকাপাকি শর্ত সরকারের দফতরে লেখা থাকে। মাঝে মাঝে মারামারি মাথা-ফাটাফাটি হয়, কিন্তু কাবুল উপত্যকার চাষারা দেখলুম বাঙালী চাষার মতই নিরীহ—মারামারির চেয়ে গালাগালিই বেশী পছন্দ

করে। তার কারণ বোধহয় এই যে, কাবুল উপত্যকা বাংলা দেশের জমির চেয়েও উর্বরা। তার উপর তাদের আরেকটা মস্ত সুবিধা এই যে, তারা শুধু বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না। শীতকালে যদি যথেষ্ট পরিমাণে বরফ পড়ে তাদের ক্ষেত ভরে যায়, অথবা যদি পাহাড়ের বরফ প্রচুর পরিমাণে গলে নেমে আসে, তাহলে তারা আর বৃষ্টির তোয়াক্কা করে না। কাবুলের লোক তাই বলে, 'কাবুল বেজর্ শওদ লাকিন বে-বর্ফ্ন্ বাশদ'—কাবুল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়।

আমার বাড়ির সামনে দিয়ে প্রায় দশ হাত চওড়া একটি নালা বয়ে যায়। তার দু'দিকে দু'সারি উঁচু চিনার গাছ, তারই নিচে দিয়ে পায়ে চলার পথ। আমি সেই পথ দিয়ে নালা উজিয়ে উজিয়ে অনেক দূরে গিয়ে একটা পঞ্চবটির মত পাঁচচিনারের মাঝখানে বরসাতি পেতে আরাম করে বসতুম। একটু উজানে নালায় বাঁধ দিয়ে আরেক চাষা তার ক্ষেত নাওয়াচ্ছে। আমি যে ক্ষেতের পাশে বসে আছি তার চাষা আমার সঙ্গে নানারকম সুখদুঃখের কথা কইছে। এ দু'জনের কান মসজিদের দিকে—কখন আসরের (অপরাহ্ণ) নমাজের আজান পড়বে। তখন আমার চাষার পালা। আজান পড়া মাত্রই সে উপরের বাঁধের পাথর-কাদা সরিয়ে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে কুলকুল করে নীচের বাঁধের জল ভর্তি হতে শুরু করে; চাষা তার বাঁধ আগের থেকেই তৈরী করে রেখেছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে সে তখন বাঁধের তদারক করে বেড়ায়, কাঠের শাবল দিয়ে মাঝে মাঝে কাদা তুলে সেটাকে আরো শক্ত করে দেয়, ক্ষেতের ঢেলা মাটি এদিকে ওদিকে সরিয়ে দিয়ে বানের জলের পথ করে দেয়। শিলওয়ারটা হাঁটুর উপরে তুলে কোমরে গুঁজে নিয়েছে, জামাটা খুলে গাছতলায় পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে, আর পাগড়ির লেজ দিয়ে মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছছে। আমি ততক্ষণে তার হুঁকোটার তদারক করছি। সে মাঝে মাঝে এসে দু'একটা দম দেয় আর পাগড়ির লেজ দিয়ে হাওয়া খায়। আমাদের চাষার গামছা আর কাবুলী চাষার পাগড়ি দুই-ই একবস্তু। হেন কর্ম নেই যা গামছা আর পাগড়ি দিয়ে করা যায় না—ইস্তেক মাছ ধরা পর্যন্ত। যদিও আমাদের নালায় সব সময়ই দেখেছি অতি নগণ্য পোনা মাছ।

বেশ বেলা থাকতে মেয়েরা কলসী মাথায় 'জলকে' আসত। গোড়ার দিকে আমাকে দেখে তারা মুখের উপর ওড়না টেনে দিত, আমাদের দেশের চাষীর বউ যে রকম 'ভদ্দর নোককে' দেখলে 'নজ্জা' পায়। তবে এদের 'নজ্জা' একটু কম। ডানহাত দিয়ে বুকের উপর ওড়না টেনে বাঁহাত দিয়ে হাঁটুর উপরে পাজামা তুলে

এরা প্রথম দর্শনে আরবী ঘোড়ার মত ছুট দেয়নি আর অল্প কয়েকদিনের ভিতরই তারা আমার সামনে স্বচ্ছন্দে আমার চাষা বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল।

কিন্তু চাষা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বেশীদিন টিকলো না। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মুইন-উস্-সুলতানে। চাষাই বলল, সে প্রথমটায় তার চোখকে বিশ্বাস করেনি যখন দেখতে পেল তারি আগা (ভদ্রলোক) বন্ধু মুইন-উস-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি (টেনিস) খেলছেন। আমি তাকে অনেক করে বোঝালুম যে, তাতে কিছুমাত্র এসে যায় না, সেও সায় দিল, কিন্তু কাজের বেলা দেখলুম সে আর আমাকে তামাক সাজতে দেয় না, আগের মত প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না, 'তো'র বদলে হঠাৎ 'শুমা' বলতে আরম্ভ করেছে আর সম্মানার্থে বহুবচন যদি বা সর্বনামে ঠিক রাখে তবু ক্রিয়াতে একবচন ব্যবহার করে নিজের ভুলে নিজেই লজ্জা পায়। ভাষা শুধরাতে গিয়ে গল্পের খেই হারিয়ে ফেলে, আর কিছুতেই ভুলতে পারে না যে, আমি মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে তোপবাজি খেলি। আমাদের তেলতেলে বন্ধুত্ব কেমন যেন করকরে হয়ে গেল।

কিন্তু লেনদেন বন্ধ হয়নি, যতদিন গাঁয়ে ছিলুম প্রায়ই মুরগীটা আণ্ডাটা দিয়ে যেত। দাম নিতে চাইত না, কেবল আবদুর রহমানের থাবার ভয়ে যা নিতান্ত না নিলে চলে না তাই নিতে স্বীকার করত।

হেমন্তের শেষের দিকে ফসলকাটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন চাষা কাঠুরে হয়ে গেল। আমাকে আগের থেকেই বলে রেখেছিল—একদিন দেখি পাঁচ গাধা-বোঝাই শীতের জ্বালানি কাঠ নিয়ে উপস্থিত। আবদুর রহমানের মত খুঁতখুঁতে লোকও উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করল যে, এ রকম পয়লা নম্বরের নিম-তর্ নিম-খুশ্‌ক্ (আধা-ভেজা) কাঠ কাবুল বাজারের কোথাও পাওয়া যায় না। আবদুর রহমান আমাকে বুঝিয়ে বলল যে, সম্পূর্ণ শুকনো হলে কাঠ তাড়াতাড়ি জ্বলে গিয়ে ঘর বড্ড বেশী গরম করে তোলে, তাতে আবার খর্চাও হয় বেশী। আর যদি সম্পূর্ণ ভেজা হয় তাহলে গরমের চেয়ে ধুঁয়োই বেরোয় বেশী, যদিও খর্চা তাতে কম।

এবার দাম দেবার বেলায় প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। আমি তাকে কাবুলের বাজার দর দিতে গেলে সে শুধু বলে যে, কাবুলের বাজারে সে অত দাম পায় না। অনেক তর্কাতর্কির পর বুঝলুম যে, বাজারের দরের বেশ খানিকটা পুলিশ ও তাদের ইয়ার-বক্সীকে দিয়ে দিতে হয়। শেষটায় গোলমাল শুনে মাদাম জিরার এসে মিটমাট করে দিয়ে গেলেন।

আমাদের দিলখোলা বন্ধুত্ব প্রায় লোপ পাবার মত অবস্থা হল যেদিন সে শুনতে পেল আমি 'সৈয়দ'। তারপর দেখা হলেই সে তার মাথার পাগড়ি ঠিক করে বসায় আর আমার হাতে চুমো খেতে চায়। আমি যতই বাধা দিই, সে ততই কাতর নয়নে তাকায়, আর পাগড়ি বাঁধে আর খোলে।

তামাক-সাজার সত্যযুগের কথা ভেবে নিশ্বাস ফেললুম।

ডিমোক্রেসি বড় ঠুনকো জিনিস; কখন যে কার অভিসম্পাতে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। তারপর আর কিছুতেই জোড়া লাগে না।

সাতাশ

হেমন্তের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতন থেকে মৌলানা জিয়াউদ্দীন এসে কাবুলে পৌঁছলেন। বগদানফ, বেনওয়া, মৌলানা আমাতে মিলে তখন 'চারইয়ারী' জমে উঠল।

জিয়াউদ্দীন অমৃতসরের লোক। ১৯২১ সালের খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে কলেজ ছাড়েন। ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হন এবং পরে ভালো বাঙলা শিখেছিলেন। বেশ গান গাইতে পারতেন আর রবীন্দ্রনাথের অনেক গান পাঞ্জাবীতে অনুবাদ করে মূল সুরে গেয়ে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যসভায় আসর জমাতেন। এখানে এসে সে সব গান খুব কাজে লেগে গেল, কাবুলের পাঞ্জাবী সমাজ তাঁকে লুফে নিল। মৌলানা ভালো ফার্সী জানতেন বলে কাবুলীরাও তাঁকে খুব সম্মান করত।

কিন্তু 'চারইয়ারি' সভাতে ভাঙন ধরল। বগদানফের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতন চলে গেলেন। বেনওয়া সায়েব তখন বড্ড মনমরা হয়ে গেলেন। কাবুলে তিনি কখনো খুব আরাম বোধ করেন নি। এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সনকে বাদ দিলে বেনওয়া ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খাঁটি সমজদার। শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে ভেবে ভদ্রলোক প্রায়ই উদাস হয়ে যেতেন আর খামকা কাবুলের নিন্দা করতে আরম্ভ করতেন।

বেনওয়া সায়েবই আমাকে একদিন রাশান এম্বেসিতে নিয়ে গেলেন।

প্রথম দর্শনেই ডাভারিশ দেমিদফকে আমার বড় ভালো লাগলো। রোগা চেহারা, সাধারণ বাঙালীর মতন উঁচু, সোনালী চুল, চোখের লোম পর্যন্ত সোনালী, শীর্ণ মুখ আর দুটি উজ্জ্বল তীক্ষ্ন নীল চোখ। বেনওয়া যখন আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনি মুখ খোলার আগেই যেন চোখ দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা

করে নিচ্ছিলেন। সাধারণ কন্টিনেন্টালের চেয়ে একটু বেশী ঝুঁকে তিনি হ্যাণ্ডশেক করলেন, আর হাতের চাপ দেওয়ার মাঝ দিয়ে অতি সহজ অভ্যর্থনার সহৃদয়তা প্রকাশ করলেন।

তাঁর স্ত্রীরও রেশমী চুল, তবে তিনি বেশ মোটাসোটা আর হাসিখুশী মুখ। কোথাও কোনো অলঙ্কার পরেননি, লিপস্টিক রুজ তো নয়ই। হাত দুখানা দেখে মনে হল ঘরের কাজকর্মও বেশ খানিকটা করেন। সাধারণ মেয়েদের কপালের চেয়ে অনেক চওড়া কপাল, মাথার মাঝখানে সিঁথি আর বাঙালী মেয়েদের মত অযত্নে বাঁধা এলোখোঁপা।

কর্তা কথা বললেন ইংরিজীতে, গিন্নী ফরাসীতে।

অভিজ্ঞান শেষ হতে না হতেই তাভারিশা দেমিদভা বললেন, 'চা, অন্য পানীয়, কি খাবেন বলুন।'

ইতিমধ্যে দেমিদফ পাপিরসি (রাশান সিগারেট) বাড়িয়ে দিয়ে দেশলাই ধরিয়ে তৈরী।

আমি বাঙালী, বেনওয়া সায়েব শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে আধা বাঙালী হয়ে গিয়েছেন আর রাশানরা যে চা খাওয়াতে বাঙালীকেও হার মানায় সে তো জানা কথা।

তবে খাওয়ার কায়দাটা আলাদা। টেবিলের মাঝখানে সামোভার; তার জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। এদিকে টি-পটে সকাল বেলা মুঠো পাঁচেক চা আর গরম জল দিয়ে একটা ঘন মিশকালো লিকার তৈরী করা হয়েছে—সেটা অবশ্য ততক্ষণে জুড়িয়ে হিম হয়ে গিয়েছে। টি-পট হাতে করে প্রত্যেকের পেয়ালা নিয়ে মাদাম শুধান, 'কতটা দেব বলুন।' পোয়াটাক নিলেই যথেষ্ট; সামোভারের চাবি খুলে টগ্‌বগে গরম জল তাতে মিশিয়ে নিলে দু'য়ে মিলে তখন বাঙালী চায়ের রঙ ধরে। কায়দাটা মন্দ নয়, একই লিকার দিয়ে কখনো কড়া, কখনো ফিকে যা খুশী খাওয়া যায়। দুধের রেওয়াজ নেই, দুধ গরম করার হাঙ্গামাও নেই। সকাল বেলাকার তৈরী লিকারে সমস্ত দিন চলে।

সামোভারটি দেখে মুগ্ধ হলুম। রূপোর তৈরী। দু'দিকের হ্যাণ্ডেল, উপরের মুকুট, জল খোলার চাবি, দাঁড়াবার পা সব কিছুতেই পাকা হাতের সুন্দর, সুদক্ষ, সূক্ষ্ম কাজ করা।

তারিফ করে বললুম, 'আপনাদের রূপোর তাজমহলটি ভারি চমৎকার।'

দেমিদফের মুখের উপর মিষ্টি লাজুক হাসি খেলে গেল—ছোট ছেলেদের প্রশংসা করলে যে রকম হয়। মাদাম উচ্ছ্বসিত হয়ে বেনওয়া সায়েবকে বললেন,

'আপনার ভারতীয় বন্ধু ভালো কমপ্লিমেন্ট দিতে জানেন।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাজমহল ছাড়া ভারতীয় আর কোনো ইমারতের সঙ্গে তুলনা দিলে কিন্তু চলত না মসিয়ো; আমি ঐ একটির নাম জানি, ছবি দেখেছি।'

তখন দেমিদফ বললেন, 'সামোভারটি তুলা শহরে তৈরী।'

আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললুম, 'কোথায় যেন চেখফ না গর্কির লেখাতে একটা রাশান প্রবাদ পড়েছি, 'তুলাতে সামোভার নিয়ে যাওয়ার মত।' আমরা বাঙলাতে বলি, 'তেলা মাথায় তেল ঢালা'।'

'কেরিইং কোল টু নিউ কাস্‌ল,' 'বরেলি মে বাঁস লে জানা' ইত্যাদি সব ক'টাই আলোচিত হল। আমায় ফরাসী প্রবাদটিও মনে পড়ছিল, 'প্যারিসে আপন স্ত্রী নিয়ে যাওয়া' কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করে সেটা চেপে রাখলুম। হাফিজও যখন বলেছেন, 'আমি কাজী নই মোল্লাও নই, আমি কোন দুঃখে 'তওবা' (অনুতাপ) করতে যাব,' আমি ভাবলুম, 'আমি ফরাসী নই, আমার কি দায় রসাল প্রবাদটা দাখিল করবার।'

দেমিদফ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবর্ষের লোক রাশান কথাসাহিত্য পড়ে কি না।'

আমি বললুম, 'গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো মত দেওয়া কঠিন কিন্তু বাঙলা দেশ সম্বন্ধে বলতে পারি সেখানে এককালে ফরাসী সাহিত্য যে আসন নিয়েছিল সেটা কয়েক বৎসর হল রুশকে ছেড়ে দিয়েছে। বাঙলা দেশের অনেক গুণী বলেন, চেখফ মপাসাঁর চেয়ে অনেক উঁচু দরের স্রষ্টা।'

বাংলা দেশ কেন সমস্ত ভারতবর্ষই যে ক্রমে ক্রমে রুশ সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে সে সম্বন্ধে বেনওয়া সায়েব তখন অনেক আলোচনা করলেন। ভারতবাসীর সঙ্গে রুশের কোন্ জায়গায় মনের মিল, অনুভূতির ঐক্য, বাতাবরণের সাদৃশ্য, সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বেনওয়া অনেকক্ষণ ধরে আপন পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সুন্দর ভাষায় মজলিসী কায়দায় পরিবেষণ করলেন। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে যে প্রচুর রাশান নভেল, ছোট গল্পের বই মজুদ আছে সে কথাও বলতে ভুললেন না।

দেমিদফ বললেন, 'রাশানরা প্রাচ্য না পাশ্চাত্যের লোক তার স্থিরবিচার এখনো হয়নি। সামান্য একটা উদাহরণ নিন না। খাঁটি পশ্চিমের লোক শার্ট পাতলুনের নিচে গুঁজে দেয়, খাঁটি প্রাচ্যের লোক, তা সে আফগানই হোক আর ভারতীয়ই হোক, কুর্তাটা ঝুলিয়ে দেয় পাজামার উপরে। রাশানরা এ দু'দলের মাঝখানে—শার্ট পরলে সেটা পাতলুনের নিচে গোঁজে, রাশান কুর্তা পরলে সেটা

পাতলুনের উপর ঝুলিয়ে দেয়—সে কুর্তাও আবার প্রাচ্য কায়দায় তৈরী, তাতে অনেক রঙ অনেক নক্সা।'

দেমিদফের মত অত শান্ত ও ধীর কথা বলতে আমি কম লোককেই শুনেছি। ইংরিজী যে খুব বেশী জানতেন তা নয় তবু যেটুকু জানতেন তার ব্যবহার করতেন বেশ ভেবেচিন্তে, সযত্নে শব্দ বাছাই করে করে।

রাশান সাহিত্যে আমার শখ দেখে তিনি টলস্টয়, গর্কি ও চেখফ ইয়াসনা পলিয়ানাতে যে সব আলাপ আলোচনা করেছিলেন তার অনেক কিছু বর্ণনা করে বললেন, 'জারের আমলে তার সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি—কারণ টলস্টয় আপন মতামত প্রকাশ করার সময় জারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যেতেন। জারের পতনের পর নতুন সরকার এতদিন নানা জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল —এখন আস্তে আস্তে কিছু কিছু ছাপা হচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে নানা রহস্যের সমাধান হচ্ছে।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা, আমি তো শুনেছি আপনারা আপনাদের প্রাক-বলশেভিক সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত নন।'

মাদামের মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু উত্তেজনার সঙ্গে বললেন, 'নিশ্চয় ইংরেজের প্রোপাগাণ্ডা।'

আমি আমার ভুল খবরের জন্য হন্তদন্ত হয়ে মাপ চেয়ে বললুম, 'আমরা রাশান জানিনে, আমরা চেখফ পড়ি ইংরিজীতে, লাল রুশের নিন্দাও পড়ি ইংরিজীতে।'

দেমিদফ চুপ করে ছিলেন। ভাব দেখে বুঝলুম তিনি ইংরেজ কি করে না-করে, কি বলে না-বলে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আপন বক্তব্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে যে অসত্য আপনার থেকে বিলোপ পাবে সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর মূল বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে বারে বারে প্রকাশ পাচ্ছিল।

আমরা এসেছিলুম চারটের সময়; তখন বাজে প্রায় সাতটা। এর মাঝে যে কত পাপিরসি পুড়ল, কত চা চলল গল্পের তোড়ে আমি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিনি। এক কাপ শেষ হতেই মাদাম সেটা তুলে নিয়ে এঁটো চা একটা বড় পাত্রে ঢেলে ফেলেন, লিকার ঢেলে গরম জল মিশিয়ে চিনি দিয়ে আমার অজানাতেই আরেক কাপ সামনে রেখে দেন। জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেন না কতটা লিকারের প্রয়োজন, দু'-একবার দেখেই আমার পরিমাণটা শিখে নিয়েছেন। আমি কখনো ধন্যবাদ দিয়েছি, কখনো টলস্টয় গর্কির তর্কের ভিতরে ডুবে যাওয়ায় লক্ষ্য করিনি বলে পরে অনুতাপ প্রকাশ করেছি।

কথার ফাঁকে মাদাম বললেন, 'আপনারা এখানেই খেয়ে যান।' আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'আরেক দিন হবে।' বেনওয়া সায়েব তো ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আজ উঠি, বড্ড বেশীক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি।'

আমি একটু বোকা বনে গেলুম। পরে বুঝতে পারলুম বেনওয়া সায়েব খাওয়ার নেমন্তন্নটা অন্য অর্থে ধরে নিয়ে লজ্জা পেয়েছেন। মাদামও দেখি আস্তে আস্তে বেনওয়ার মনের গতি ধরতে পেরেছেন। তখন লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে বললেন, 'না মসিয়ো, আমি সে অর্থে বলিনি; আমি সত্যিই আপনাদের গালগল্পে ভারী খুশী হয়ে ভাবলুম তু'মুঠো খাবার জন্য কেন আপনাদের আড্ডাটা ভঙ্গ হয়।'

দেমিদফ চুপ করে ছিলেন। ভালো করে কুয়াশাটা কাটাবার জন্য বললেন, 'পশ্চিম ইয়োরোপীয় এটিকেটে এ-রকম খেতে বলার অর্থ হয়ত 'তোমরা এবার ওঠো, আমরা খেতে বসব।' আমার স্ত্রী সে ইঙ্গিত করেননি। জানেন তো খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমরা এখনো আমাদের কুর্তা পাতলুনের উপরে পরে থাকি—অর্থাৎ আমরা প্রাচ্যদেশীয়।'

সকলেই আরাম বোধ করলুম। কিন্তু সে যাত্রা ডিনার হ'ল না। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেমিদফ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি রাশান শেখেন না কেন?'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি শেখাবেন?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়। With pleasure!'

বেনওয়া বললেন, 'No, not with pleasure' বলে আমার দিকে চোখ ঠার দিলেন।

মাদাম বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

বেনওয়া বললেন, 'এক ফরাসী লণ্ডনের হোটেলে ঢুকে বলল, 'Waiter, bring me a cotlette, please!' ওয়েটার বলল, 'With pleasure, Sir.' ফরাসী ভয় পেয়ে বলল, 'No, no, not with pleasure, with potatoes, please!'

বেনওয়া বিদগ্ধ ফরাসী। একটুখানি হাল্কা রসিকতা দিয়ে শেষ পাতলা মেঘটুকু কেটে দিয়ে টুক করে বেরিয়ে এলেন।

মাদামও কিছু কম না। শেষ কথা শুনতে পেলুম 'But I shall give you cotlettes with both pleasure and potatoes'.

রাস্তায় বেরিয়ে বেনওয়াকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'এ দুটি যথার্থ খাঁটি লোক।'

আটাশ

হেমন্তের কাবুল 'মধ্যযুগীয় সম্প্রসারণে ফুলে ওঠে,' ইংরিজীতে যাকে বলে 'মিড্‌ল্ এজ্ স্প্রেড্।' অর্থাৎ ভুঁড়িটা মোটা হয়, চাল-চলন ভারিক্কীভরা।

যবগমের দানা ফুলে উঠল, আপেল ফেটে পড়ার উপক্রম, গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত গ্রীষ্ম-ভর রোদ বাতাস বৃষ্টি খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছে, হাওয়া বইলে ডাইনে বাঁয়ে নাচন তোলে না, ঠায় দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কাঁপে, না হয় থপ করে ডাল ছেড়ে গাছতলায় শুয়ে পড়ে। প্রথম নবান্ন হয়ে গিয়েছে, চাষীরাও খেয়েদেয়ে মোটা হয়েছে। শীতকাতুরেরা দুটো একটা ফালতো জামা পরে ফেঁপেছে, গাধাগুলো ঘাস খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে উঠেছে, খড়-চাপানো গাড়ির পেট ফেটে গিয়ে এদিক ওদিক কুটোর নাড়ী ছড়িয়ে পড়ছে।

আর সফল হয়ে ফেঁপে ওঠার আসল গরমি দেখা যায় সকাল বেলার শিশিরে। বেহায়া বড়লোকের মত কাবুল উপত্যকা কেবলি হীরের আংটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়,—ঝলমলানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

কিন্তু এ সব জেল্লাই কাবুল নদীর রক্তশোষণ করে। সাপের খোলসের মত সে নদী এখন শুকিয়ে গিয়েছে, বাতাস বইলে বুক চিরে বালু ওড়ে। মার্কস্ তো আর ভুল বলেননি, 'শোষণ করেই সবাই ফাঁপে।'

যে পাগমান পাহাড়ের বরফের প্রসাদে কাবুল নদীর জৌলুশ সে তার নীল চূড়োগুলো থেকে এক একটা করে সব ক'টা বরফের সাদা টুপি খসিয়ে ফেলেছে। আকাশ যেন মাটির তুলনায় বড্ড বেশী বুড়িয়ে গেল—নীল চোখে ঘোলাটে ছানি পড়েছে।

পাকা, পচা ফলের গন্ধে মাথা ধরে; আফগানিস্থানের সরাইয়ের চতুর্দিক বন্ধ বলে দুর্গন্ধ যে রকম বেরতে পারে না, কাবুল উপত্যকা'র চারিদিকে পাহাড় বলে তেমনি পাকা ফল ফসলের গন্ধ সহজে নিষ্কৃতি পায় না। বাড়ির সামনে যে ঘূর্ণিবায়ু খড়কুটো পাতা নিয়ে বাইরে যাবে বলে রওয়ানা দেয় সেও দেখি খানিকক্ষণ পরে ঘুরে ফিরে কোনোদিকে রাস্তা না পেয়ে সেই মাঠে ফিরে এসে সবসুদ্ধ নিয়ে থপ করে বসে পড়ে।

তারপর একদিন সন্ধ্যের সময় এল ঝড়! প্রথম ধাক্কায় চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলুম, মেলে দেখি শেলির 'ওয়েস্ট্ উইণ্ড' কীটসের 'অটামকে' ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে,—সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ'। খড়কুটো, জমে-ওঠা পাতা, ফেলে-

দেয়া কুলো সবাই চলল দেশ ছেড়ে মুহাজরিন হয়ে। কেউ চলে সার্কাসের সঙের মত ডিগবাজি খেয়ে, কেউ হনুমানের মত লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে দিয়ে আর বাদবাকি যেন ধনপতির দল—প্রলেতারিয়ার আক্রমণের ভয়ে একে ওকে জড়িয়ে ধরে।

আধ ঘণ্টার ভিতর সব গাছ বিলকুল সাফ।

সে কী বীভৎস দৃশ্য!

আমাদের দেশে বন্যার জল কেটে যাওয়ার পর কখনো কখনো দেখেছি কোনো গাছের শিকড় পচে যাওয়ায় তার পাতা ঝরে পড়েছে—সমস্ত গাছ ধবল-কুষ্ঠ রোগীর মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

এখানে সব গাছ তেমনি দাঁড়িয়ে, নেঙ্গা সঙ্গীন আকাশের দিকে উঁচিয়ে।

দু'-একদিন অন্তর অন্তর দেখতে পাই গোর দিতে মড়া নিয়ে যাচ্ছে। আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলুম কোথাও মড়ক লেগেছে কি না।

আবদুর রহমান বলল, 'না হুজুর, পাতা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োরাও ঝরে পরে। এই সময়েই তারা মরে বেশী।'

খবর নিয়ে দেখলুম, শুধু আবদুর রহমান নয় সব কাবুলীরই এই বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে আবদুর রহমানের সঙ্গে আমার রীতিমত হার্দিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। তার জন্য দায়ী অবশ্য আবদুর রহমানই।

আমাকে খাইয়ে দাইয়ে সে রোজ রাত্রেই কোনো একটা কাজ নিয়ে আমার পড়ার ঘরের এক কোণে আসন পেতে বসে,—কখনো বাদাম আখরোটের খোসা ছাড়ায়, কখনো চাল ডাল বাছে, কখনো কাঁকুড়ের আচার বানায় আর নিতান্ত কিছু না থাকলে সব ক'জোড়া জুতো নিয়ে রঙ লাগাতে বসে।

আবদুর রহমানের জুতো বুরুশ করার কায়দা মামুলী সায়াজ নয়, অতি উচ্চাঙ্গের আর্ট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার অর্ধেক মেহন্নতে মোনা লিসার ছবি আঁকা যায়।

প্রথম খবরের কাগজ মেলে তার মাঝখানে জুতো জোড়াটি রেখে অনেকক্ষণ ধরে দেখবে। তারপর দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে যদি কোথাও শুকনো কাদা লেগে থাকে তাই ছাড়াবে। তারপর লাগাবে এঞ্জিনের পিস্টনের গতিতে বুরুশ। তারপর মেথিলেটেড স্পিরিটে নেকড়া ভিজিয়ে বেছে বেছে যে সব জায়গায় পুরানো রঙ জমে গিয়েছে সেগুলো অতি সন্তর্পণে ওঠাবে। তারপর কাপড় ধোয়ার সাবানের উপর ভেজা নেকড়া চালিয়ে তাই দিয়ে জুতোর উপর থেকে আগের দিনের রঙ সরাবে। তারপর নির্বিকার চিত্তে আধঘণ্টাটাক বসে থাকবে জুতো

শুকোবার প্রতীক্ষায়—'ওয়াশের' আর্টিস্টরা যে রকম ছবি শুকোবার জন্য সবুর করে থাকেন। তারপর তার রঙ লাগানো দেখে মনে হবে প্যারিস-সুন্দরীও বুঝি এত যত্নে লিপস্টিক লাগান না—তখন আবদুর রহমানের ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট, প্রশ্ন শুধোলে সাড়া পাবেন না। তারপর বাঁ হাত জুতোর ভিতর ঢুকিয়ে ডান হাতে বুরুশ নিয়ে কানের কাছে তুলে ধরে মাথা নিচু করে যখন ফের বুরুশ চালাবে তখন মনে হবে বেহালার ডাকসাইটে কলাবৎ সমে পৌঁছবার পূর্বে যেন দ'য়ে মজে গিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছেন। তখন কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না, 'সাবাস' বললেও ওস্তাদ তেড়ে আসবেন।

সর্বশেষে মোলায়েম সিল্ক দিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে সর্বাঙ্গ বুলিয়ে দেবে, মনে হবে দীর্ঘ অদর্শনের পরে প্রেমিক যেন প্রিয়ার চোখে মুখে কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথম দিন আমি আপন অজানাতে বলে ফেলেছিলুম 'সাবাস'।

একটি আট ন' বছরের মেয়েকে তারই সামনে আমরা একদিন কয়েকজন মিলে অনেকক্ষণ ধরে তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছিলুম—সে চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। যখন সকলের বলা কওয়া শেষ হল তখন সে শুধু আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তবু তো আজ তেল মাখিনি।'

আবদুর রহমানের মুখে ঠিক সেই ভাব।

গোড়ার দিকে প্রায়ই ভেবেছি ওকে বলি যে সে ঘরে বসে থাকলে আমার অস্বস্তি বোধ হয়, কিন্তু প্রতিবারেই তার স্বচ্ছন্দ সরল ব্যবহার দেখে আটকে গিয়েছি। শেষটায় স্থির করলুম, ফার্সীতে যখন বলেছে এই দুনিয়া মাত্র কয়েকদিনের মুসাফিরী ছাড়া আর কিছুই নয় তখন আমার ঘরে আর সরাইয়ের মধ্যে তফাত কোথায়? এবং আফগান সরাই যখন সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতায় প্যারিসকেও হার মানায় তখন কমরেড আবদুর রহমানকে এঘর থেকে ঠেকিয়ে রাখি কোন্ হক্কের জোরে? বিশেষতঃ সে যখন আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বাদামের খোসা ছাড়াতে পারে, তবে আমিই বা তার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রাশান ব্যাকরণ মুখস্থ করতে পারব না কেন?

আবদুর রহমান ফরিয়াদ করে বলল, আমি যে মুইন-উস্-সুলতানের সঙ্গে টেনিস খেলা কমিয়ে দিয়ে রাশান রাজদূতাবাসে খেলতে আরম্ভ করেছি সেটা ভালো কথা নয়।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, মুইন-উস্-সুলতানের কোর্টে টেনিসের বল যে রকম শক্ত, এক মুইন-উস্-সুলতানেকে বাদ দিলে আর সকলের হৃদয়ও সে

রকম শক্ত—রাশান রাজদূতাবাসের বল যে রকম নরম, হৃদয়ও সে রকম নরম।

আবদুর রহমান ফিসফিস করে বলল, 'আপনি জানেন না হুজুর, ওরা সব 'বেদীন, বেমজহব'।' অর্থাৎ ওদের সব কিছু 'ন দেবায়, ন ধর্মায়'।

আমি ধমক দিয়ে বললুম, 'তোমাকে ওসব বাজে কথা কে বলেছে?'

সে বলল, 'সবাই জানে, হুজুর; ওদেশে মেয়েদের পর্যন্ত হায়া-শরম নেই, বিয়ে-শাদী পর্যন্ত উঠে গিয়েছে।'

আমি বললুম, 'তাই যদি হবে তবে বাদশা আমান উল্লা তাদের এদেশে ডেকে এনেছেন কেন?' ভাবলুম এই যুক্তিটাই তার মনে দাগ কাটবে সব চেয়ে বেশী।

আবদুর রহমান বলল, 'বাদশা আমান উল্লা তো—।' বলে থেমে গিয়ে চুপ করে রইল।

পরদিন টেনিস খেলার দু'সেটের ফাঁকে দেমিদফকে জানালুম, প্রলেতারিয়া আবদুর রহমান ইউ. এস. এস. আর. সম্বন্ধে কি মতামত পোষণ করে। দেমিদফ বললেন, 'আফগানিস্থান সম্বন্ধে আমরা বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নই। তবে তুর্কীস্থান অঞ্চলে আমাদের একটু আস্তে আস্তে এগোতে হচ্ছে বলে আমাদের চিন্তাপদ্ধতি কর্মধারা একটু অতিরিক্ত ঘোলাটে হয়ে আফগানিস্থানে পৌঁচচ্ছে। আমরা উপর থেকে তুর্কীস্থানের কাঁধে জোর করে নানা রকম সংস্কার চাপাতে চাইনে; আমরা চাই তুর্কীস্থান যেন নিজের থেকে আপন মঙ্গলের পথ বেছে নিয়ে বাকি রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।'

দেমিদফের স্ত্রী বললেন, 'বুখারার আমীর আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ শোষক-সম্প্রদায় বলশেভিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যহারা হয়ে পালিয়ে এসে এখানে বাসা বেঁধেছে। তারা যে নানা রকম প্রোপাগাণ্ডা চালাতে কসুর করছে না, তা তো জানেনই।'

আমি কম্যুনিজমের কিছুই জানিনে, কিন্তু এঁদের কথা বলার ধরন, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞের প্রতি সহিষ্ণুতা, আপন আদর্শে দৃঢ়-বিশ্বাস আমাকে সত্যই মুগ্ধ করল।

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ করল রাজদূতাবাসের ভিতর এঁদের সামাজিক জীবন। অন্যান্য রাজদূতাবাসে বড়কর্তা, মেজকর্তা ও ভদ্রেতরজনে তফাত যেন গৌরীশঙ্কর, তুমকা পাহাড় আর উইয়ের ঢিপিতে। এখানে যে কোনো তফাত নেই, সে কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়, কিন্তু সে পার্থক্য কখনো রূঢ় কর্কশরূপে আমার চোখে ধরা দেয়নি।

কত অপরাহ্ণ, কত সন্ধ্যা কাটিয়েছি দেমিদফের বসবার ঘরে। তখন এম্বেসির

কত লোক এখানে এসেছেন, পাপিরসি টেনেছেন, গল্প-গুজব করেছেন। তাঁদের কেউ সেক্রেটারি, কেউ ডাক্তার, কেউ কেরানী, কেউ আফগান এয়ার ফোর্সের পাইলট—দেমিদফ স্বয়ং রাজদূতাবাসের কোষাধ্যক্ষ। সকলেই সমান খাতির-যত্ন পেয়েছেন; জিজ্ঞেস না করে জানবার কোনো উপায় ছিল না যে, কে সেক্রেটারি আর কে কেরানী।

খোদ অ্যামবেসডর অর্থাৎ রুশ রাষ্ট্রপতির নিজস্ব প্রতিভূ তাভারিশ স্ট্রেঙ পর্যন্ত সেখানে আসতেন। প্রথম দর্শনে তো আমি বগদানফ সায়েবের তালিম মত খুব নিচু হয়ে ঝুঁকে শেকহ্যাণ্ড করে বললুম, 'I am honoured to meet Your Excellency!' কিন্তু আমার চোস্ত ভদ্রতায় একসেলেন্সি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমাকে জোরে হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতখানা তলোয়ারের মত এমনি ধারা চালালেন যে, আমার সমস্ত 'ভদ্রস্থতা' যেন দু'টুকরো হয়ে কার্পেটে লুটিয়ে পড়ল।

মাদাম দেমিদফ বললেন, 'ইনি রুশ সাহিত্যের দরদী।'

কোনো ইংরেজ বড়কর্তা হলে বলতেন, 'রিয়েলি? হাউ ইণ্টারেস্টিঙ!' তারপর আবহাওয়ার কথাবার্তা পাড়তেন।

স্ট্রেঙ বললেন, 'তাই নাকি, তা হলে বসুন আমার পাশে, আপনার সঙ্গে সাহিত্যালোচনা হবে।' আর সকলে তখন আপন আপন গল্পে ফিরে গিয়েছেন। স্ট্রেঙ প্রথমেই অসঙ্কোচে গোটাকয়েক চোখা চোখা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমার বিদ্যের চৌহদ্দি জরিপ করে নিলেন, তারপর পুশকিনের গীতিকাব্য-রস আমাকে মূল থেকে আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলেন। যে অংশ বেছে নিলেন সে-ও ভারী মরমিয়া। ওনিয়েগিন সংসারে নানা দুঃখ, নানা আঘাত পেয়ে তাঁর প্রথমা প্রিয়ার কাছে ফিরে এসে প্রেম নিবেদন করছেন; উত্তরে প্রিয়া প্রথম যৌবনের নষ্ট দিবসের কথা ভেবে বলছেন, 'ওনিয়েগিন, হে আমার বন্ধু, আমি তখন তরুণী ছিলুম, হয়ত সুন্দরীও ছিলুম—'

আমাদের দেশের রাধা যে রকম একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'দেখা হইল না রে শ্যাম, আমার এই নতুন বয়সের কালে'।

আমি তন্ময় হয়ে শুনলুম। আবৃত্তি শেষ হলে ভাবলুম, বরঞ্চ একদিন শুনতে পাব স্বয়ং চার্চিল হেদোর পারে লঙ্কা-ঠাসা চীনেবাদাম খেয়ে সশব্দে ডাইনে-বাঁয়ে নাক ঝাড়ছেন, কিন্তু মহামান্য বৃটিশ রাজদূত প্রথমদর্শনে অভ্যাগতকে কীটসের 'ইসাবেলা' শোনাচ্ছেন, এ যেন 'বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভাসি যায়, দেখিলেও না করো প্রত্যয়'।

ব্রিটিশ রাজদূতকে হামেশাই দেখেছি স্ট্রাইপ্ট ট্রাউজার আর স্প্যাট-পরা। ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে যেন স্বয়ং পঞ্চম জর্জের মামাতো ভাই। নিতান্ত দৈবদুর্বিপাকে এক দুশমনের পুরীতে বড় অনিচ্ছায় কাল কাটাচ্ছেন। 'কীটস্ কে, অথবা কারা?—পিছনে যখন বহুবচনের 'এস্' রয়েছে? পাসপোর্ট চায় নাকি? বলে দাও, ওসব হবে-টবে না।'

এমন কি, ফরাসী রাজদূতকেও কখনো বগদানফের ঘরে আসতে দেখিনি। বেনওয়া তাঁর কথা উঠলেই বলতেন, 'কার কথা বলছেন? মিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ লিগেশন ইন মাবুল—'

'মাবুল' অর্থ অভিধানে লেখে, Loony, off his nut!

স্ট্রেঙ বললেন, 'তিনি রাজদূতাবাসের সাহিত্যসভাতে চেখফ সম্বন্ধে একখানা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। শুনে তো আমার চোখের তারা ছিটকে পড়ার উপক্রম। আরেকটা লিগেশনের কথা জানি, সেখানে চড়ুই পাখি শিকার'সম্বন্ধে প্রবন্ধ চললেও চলতে পারে, কিন্তু চেখফ, বাই গ্যাড্, স্যার!'

আমি বললুম, 'রাশান শেখা হলে আপনার প্রবন্ধটি অনুবাদ করার বাসনা রাখি।'

স্ট্রেঙ বললেন, 'বিলক্ষণ! আপনাকে একটা কপি পাঠিয়ে দেব। কোনো স্বত্ব সংরক্ষিত নয়।'

আমরা যতক্ষণ কথা বলছিলুম আর পাঁচজন তখন বড়কর্তার মুখের কথা লুফে নেবার জন্য চতুর্দিকে ঝুলে থাকেননি। ছোট্ট ছোট্ট দল পাকিয়ে সবাই আপন আপন গল্প নিয়ে মশগুল ছিলেন। আর সকলে কি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, ঠিক ঠিক বলতে পারিনে, তবে একটা কথা নিশ্চয় জানি যে, তাঁরা ড্রইংরুমে বসে চাকরের মাইনে, ধোপার গাফিলি আর মাখনের অভাব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চালাতে পারেন না!

নিতান্ত ছোট জাত! আর শুধু কি তাই; এমনি বজ্জাত যে, সে কথাটা ঢাকবার পর্যন্ত চেষ্টা করে না!

সাধে কি আর ইংরেজের সঙ্গে এদের মুখ-দেখা পর্যন্ত বন্ধ!

ইংরেজ তখন মস্কো-বাগে দুরবীন লাগিয়ে স্তালিন আর ত্রৎস্কি দলের মোষের লড়াই দেখছে, আর দিন গুনছে ইউ. এস. এস. আর.-এর তেরটা বাজবে কখন।

এ সব হচ্ছে ১৯২৭ সালের কথা।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

চাচা কাহিনী

প্রথম খণ্ড

স্বয়ংবরা

বার্লিনের বড় রাস্তা কুরফুর্স্টেন্‌-ডাম্‌ যেখানে উলাণ্ড-স্ট্রাসের সঙ্গে মিশেছে সেখান থেকে উলাণ্ড-স্ট্রাসে উজিয়ে দু-তিনখানা বাড়ি ছাড়ার পরই "Hindusthan Haus" অর্থাৎ "Hindusthan House" অর্থাৎ "ভারতীয় ভবন"। আসলে রেস্তোরাঁ, দা-ঠাকুরের হোটেল বললেই ঠিক হয়। জর্মনি শূয়ারের দেশ, অর্থাৎ জর্মনির প্রধান খাদ্য শূকর মাংস, হিন্দুস্থান হাউসে সে-মাংসের প্রবেশ নিষেধ। সেই যে তার প্রধান গুণ তা নয়, তার আসল গুণ, সেখানে ভাত ডাল মাছ তরকারি মিষ্টি খেতে পাওয়া যায় আর যেদিন ঢাকার ফণি গুপ্ত বা চাটগাঁর আব্দুল্লা মিয়া রসুইয়ের ভার নিতেন সেদিন আমাদের পোয়াবারো কিন্তু উলাণ্ড-স্ট্রাসেতে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। জর্মনিতে লাল লঙ্কার রেওয়াজ নেই ('পাপ্রিকা' নামক যে লাল আবীর লঙ্কার পদ পেতে চায় তার স্বাদ আবীরেরই মত), কাজেই হিন্দুস্থান হৌসে লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে তার চতুর্দিকে সিকি মাইল জুড়ে হাঁচি-কাশি ঘণ্টা খানেক ধরে চলত। পাড়াপড়শীরা নাকি দু-চারবার পুলিশে খবর দিয়েছিল কিন্তু জর্মন পুলিশ তদারক-তদন্ত করতে হলে খবর দিয়ে আসত বলে আমরা সেদিনকার মত লঙ্কার হাঁড়িটা 'ডয়েটশে বাঙ্কে' জমা দিয়ে আসতুম। শুনেছি শেষটায় নাকি প্রতিবেশীদের কেউ কেউ লঙ্কা-ফোঁড়ন চড়লে গ্যাস-মাস্ক্‌ পরত। জর্মনি বৈজ্ঞানিকদের দেশ।

ঢুকেই রেস্তোরাঁ। গোটা আষ্টেক ছোট ছোট টেবিল। এক একটা টেবিলে চারজন লোক খেতে পারে। একপাশে লম্বা কাউণ্টার, তার পিছনে হয় ফণি নয় আব্দুল্লা লটরুচটর্‌ করত, অর্থাৎ অচেনা খদ্দের ঢুকলে তার সামনে ব্যস্ত-সমস্ততার ভান করত। কাউণ্টারের পাশ দিয়ে ঢুকে পিছনে রান্নাঘর। রেস্তোরাঁর যে দিকে কাউণ্টার তার আড়াআড়ি ঘরের অন্য কোণে কয়েকখানা আরাম কেদারা আর চৌকি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। এ কুণ্ডলীর চক্রবর্তী চাচা, উজীর-নাজীর গুটি ছয় বাঙালী।

অবাঙালীরা আমাদের আড্ডায় সাধারণতঃ যোগ দিত না। তার জন্য দায়ী চাচা। তিনি কথা বলতেন বাঙলায়, আর অবাঙালী থাকলে জর্মনে। এবং সে এমনি তুখোড় জর্মন যে তার রস উপভোগ করবার মত ক্ষমতা খুব কম ভারতীয়েরই ছিল। ফলে অবাঙালীরা দুদিনের ভিতরই ছিটকে পড়ত। বাঙালীরা জানত যে তারা খসে পড়লেই চাচা ফের বাঙলায় ফিরে আসবেন; তাই তারা

তাঁর কট্‌মটে জর্মন তুদণ্ডের মত বরদাস্ত করে নিত।

জব্বলপুরের ঔপনিবেশিক বাঙালী শ্রীধর মুখুয্যে তাই নিয়ে একদিন ফরিয়াদ করে বলেছিল, 'বাঙালী বড্ড বেশী প্রাদেশিক। আর পাঁচজন ভারতবাসীর সঙ্গে মিলে মিশে তারা ভারতীয় নেশন গড়ে তুলতে চায় না।'

চাচা বলেছিলেন, 'প্রাদেশিক নয়, বাঙালী বড্ড বেশী নেশনাল। বাঙলাদেশ প্রদেশ নয়, বাঙলা-দেশ দেশ। ভারতবর্ষের আর সব প্রদেশ সত্যকার প্রদেশ। তাদের এক একজনের আয়তন, লোকসংখ্যা, সংস্কৃতি এত কম যে পাঁচটা প্রদেশের সঙ্গে জড়াজড়ি করে তারা যদি 'ইণ্ডিয়ান নেশন, ইণ্ডিয়ান নেশন' বলে চেল্লাচেল্লি না করে তবে দুনিয়ার সামনে তারা মুখ দেখাতে পারে না। এই বার্লিন শহরেই দেখ; আমরা জন চল্লিশ ভারতীয় এখানে আছি। তার অর্ধেকের বেশী বাঙালী। মারাঠি, গুজরাতি কটা এক হাতের এক আঙুল, জোর দু আঙুলে গোনা যায়। ত্রিশটা লোক যদি বিদেশের কোনো জায়গায় বসবাস করে তবে অন্ততঃ তার পাঁচটা এক জায়গায় জড় হয়ে আড্ডা দেবে না? মারাঠি, গুজরাতিরা আড্ডা দেবার জন্য লোক পাবে কোথায়?'

আড্ডার পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিন সরকার বলল, 'লোক বেশী হ'লেও তারা আর যা করে করুক আড্ডা দিতে পারত না। আড্ডা জমাবার বুনিয়াদ হচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপ, কাছারি-বাড়ি, টঙ্গি-ঘর, বৈঠকখানা—এককথায় জমিদারী প্রথা।'

চাচা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাই বুঝি তুই কলেজ পালিয়ে আড্ডা মারিস? তোদের জমিদারীর সদর-খাজনা কত রে?'

সরকার বলল, 'কানাকড়িও না। জমিদারী গেছে, আড্ডাটি বাঁচিয়ে রেখেছি। আমার ঠাকুরদাকে এক সায়েব আদালতে জিজ্ঞেস করেছিল তাঁর ব্যবসা কি? বুড়ো বলেছিলো "সেলিং"।'

মুখুয্যে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

'তার মানে, তিনি জমিদারী বিক্রি করে করে জীবনটা কাটিয়েছেন। তাই বাবাকে কোনো সদর-খাজনা দিতে হয় নি।'

হিন্দুস্থান হৌসে মদ বিক্রি হত না। কিন্তু বিয়ার বারণ ছিল না। সূর্য রায় বেশীর ভাগ সময়ই বিয়ারে গলা ডুবিয়ে চোখ বন্ধ করে নাক দিয়ে ধুঁয়ো ছাড়তেন। চাচার পরেই জ্ঞানগম্যিতে তাঁর প্রাধান্য আড্ডায় ছিল বেশী। চাচার জর্মনজ্ঞান ছিল পাণ্ডিত্যের জ্ঞান, আর রায়ের জ্ঞান ছিল বহুমুখী। বার্লিনের মত শহরের বুকের উপর বসে তিনি কাগজে জর্মন কলাম লিখে পয়সা কামাতেন: ফোনে কথা শুনে শব্দতাত্ত্বিক হের মেনজেরাট্‌ পর্যন্ত ধরতে পারেনি যে জর্মন

রায়ের মাতৃভাষা নয়।

চোখবন্ধ রেখেই বললেন, 'হক কথা কয়েছ সরকার। সবই বিক্রি, সব বেচে ফেলতে হয়। থাই তো দু ফোঁটা বিয়ার কিন্তু বিক্রি করে দিতে হয়েছে বেবাক লিভারখানা।'

আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া ছিল গোলাম মৌলা। রায়ের 'প্রতেজে' বা 'দেশের ছেলে'। সে সব সময় ভয়ে ভয়ে মরত পাছে রায় বিয়ারে বানচাল হয়ে যান। চুপে চুপে বলল, 'মামা, বাড়ি চলুন।'

রায় চোখ মেললেন। একদম সাদা। বললেন, 'তুই বুঝি ভয় পেয়েছিস আমি মাতাল হয়ে গিয়েছি। ইশ্ বিন্ ইন্ মাইনেম্ নরমালেন্‌ৎসুস্টান্ট, ডাস্ হাইস্ট, আইন বিস্‌শেন্ ব্লাউ। আমি আমার সাধারণ (নর্মাল) অবস্থায় আছি, অর্থাৎ ঈষৎ নীল।' তার মানে মনে একটু রঙ লেগেছে, এবং ঐ রঙ লাগানো অবস্থাই ছিল তাঁর নর্মাল অবস্থা। মদ্যসংক্রান্ত বিষয় রায় কখনো বাংলায় বলতেন না। তাঁর মতে বাংলায় তার কোনো পরিভাষা নেই। 'পান্তা ভাতে কাঁচা লঙ্কা চটকে এক সানক গিলে এলুম' যেমন জর্মনে বলা যায় না, তেমনি মদ্যসংক্রান্ত ব্লাও (নীল), বেসফেন্ (টে-টম্বুর), ফল্ (সম্পূর্ণ), বেট্রুঙ্কেন (ডুবে-মরা) কথার বাংলা করলেও বাংলা হয় না।

চাচা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার এবনরমাল অবস্থাটা দেখবার বাসনা আমার মাঝে মাঝে হয়।'

রায় আঁৎকে উঠে বললেন, 'ষাট্, ষাট্। আমি মরব, আপনিও মরবেন। গেল সাত বছরে একদিন এক ঘণ্টার তরে বিয়ার না খেয়ে আমি এবনরমাল অবস্থায় ছিলুম। গিয়েছিলুম ফেরবেল্লিনার প্লাৎসের মসজিদে—ঈদের পরবে।* মদ খেয়ে মসজিদে যাওয়ার সাহস ওমর খাইয়ামেরও ছিল না, আমি তো নস্যি।' বলে ওস্তাদরা যে রকম মিয়া (তানসেন) কী তোড়ী গাইবার সময় কানে হাত ছোঁয়ান সেইরকম কান মলা খেয়ে নিলেন। বললেন,

'ফল? ফেরার পথে মিস জমিতফকে বিয়ের কথা দিয়ে ফেলেছি। এবনরমাল—'

কিন্তু তারপর রায় কি বলেছিলেন, সে কথা শোনে কে? রায়ের পক্ষে খুন করা অসম্ভব নয়, অবস্থাভেদে গাঁটও হয়ত তিনি কাটতে পারেন কিন্তু তিনি যে একদিন বিয়ের ফাঁদে পা দেবেন এত বড় অসম্ভব অবস্থার কল্পনা আমরা কোনো

---

* ফেরবেল্লিনার প্লাৎসের মসজিদে ঈদ-পর্ব উপলক্ষে বার্লিনের আরব, ইরানী, ভারতীয় সব মুসলমান জড় হয়। অমুসলমানের মধ্যে প্রধানতঃ যায় বাঙালী হিন্দু।

দিন করতে পারি নি। স্বয়ং হিণ্ডেনবুর্গ যদি তখন গোঁফ কামিয়ে আমাদের আড্ডায় এসে উপস্থিত হতেন তাহলেও আমরা এতদূর আশ্চর্য হতুম না।

রায় তখন লড়াইয়ে-জেতা বীরের গর্জনে হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন,

'দেখতে চান আমার এবনরমাল অবস্থা আরো দু-চারবার? সরকারী লাইব্রেরী পোড়ানো, আইনস্টাইনকে খুন, কিছুই বাদ যাবে না। তবু যদি—'

চাচা বললেন, 'বড় ভাবিয়ে তুললে হে রায় সাহেব।'

আমরা তখন সবাই কলরব করে রায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কেউ বলছে, 'এমন সুন্দরী সহজে জোটে না', কেউ বলছে, 'ম্যাথম্যাটিক্স্ যা জানে', কেউ বা বলে, 'কী মিষ্টি স্বভাব।'

সরকার বলল, 'ওহে গোলাম মৌলা, রাধা কেষ্টর কে হয় জানো?'

চাচা বললেন, 'বড় ভাবিয়ে তুললে হে রায় সাহেব।'

দু' দুবার চাচা যে কেন 'ভাবিত' হলেন আমরা ঠিক ধরতে পারলুম না। রায় যে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তা নিয়ে আশ্চর্য হওয়া যেতে পারে কিন্তু তাতে দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হওয়ার কি আছে?

চাচার সবচেয়ে ন্যাওটা ভক্ত গোঁসাই বলল, 'আপনি তো বিয়ে করেন নি, কখনো এন্‌গেজ্‌ডও হন নি। তাই আপনার ভয়, ভাবনা—'

চাচা বললেন, 'আমার ফাঁসি হয় নি সত্যি, কিন্তু তাই বলে আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াইনি তুই কি করে জানলি?'

ঠেলাঠেলির ভিতর বাসের হ্যাণ্ডেল ধরতে পেলে মানুষ যে রকম ঝুলে পড়ে, রায় ঠিক তেমনি চাচার জবানবন্দির হ্যাণ্ডেল পেয়ে বললেন, 'উকিলের নাম বলুন চাচা, যে আপনায় বাঁচালে।'

রায়ের বিয়ের খবর শুনে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলুম কিন্তু স্তম্ভিত হই নি। কারণ রায় স্ত্রীজাতিকে অতি সন্তর্পণে দূরে ঠেলে রাখতেন, তাই শেষ পর্যন্ত ধরা দিলেন। কিন্তু চাচা এ সব বাবদে স্ত্রীপুরুষে কোনো তফাৎ রাখতেন না। বার্লিনের মেয়ে মহলে তিনি ছিলেন বেসরকারী পাদ্রী। বরঞ্চ পাদ্রীদের সম্বন্ধে ফষ্টিনষ্টির কাহিনী মাঝে মাঝে শোনা যায় কিন্তু চাচার হৃদয় জয় করতে যাবে কে? সে-হৃদয় তিনি বহু পূর্বেই আত্মজনের মাঝে ভাগ বাঁটোয়ারা করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। অতো হিস্সেদারের সম্পত্তি নিলামে উঠলেও তো কেউ কেনে না। আমরা সবাই করুণ নয়নে চাচার দিকে তাকালুম, তিনি যেন কাহিনীটা চেপে না যান।

চাচা বললেন, 'ওরকম ধারা তাকাচ্ছিস কেন? তোরা কাউকে চিনবি নে।

১৯১৯-এর কথা। আমি তখন সবে বার্লিনে এসেছি। বয়স আঠারো পেরয় নি; মাকুন্দ বলে বিনা ব্লেডে গোঁফ কামাতুম—ল্যাণ্ডলেডি যাতে ঘর গোছাবার সময় ক্ষেউরির জিনিসপত্র না দেখে ভাবে আমি নিতান্ত চ্যাংড়া। তার থেকেই বুঝতে পারছিস আমি কতটা অজ পাড়াগেঁয়ে, আনাড়ি ছিলুম। এক গাদা ভারতীয়ও ছিল না যে আমাকে সলা-পরামর্শ দিয়ে ওয়াকিফহাল করে তুলবে। যে দু-চারজন ছিলেন তাঁরা তখন আপন আপন ধান্দায় মশগুল—জর্মনির তখন বড় দুর্দিন।

ভাগ্যিস দু-চারটে গুঁত্তাগাঁত্তা খাওয়ার পরই হিম্মৎ সিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

সাইনবোর্ডে গেট্রেঙ্কে (পানীয়) শব্দ দেখে আমি বিয়ারখানায় ঢুকে দুধ চেয়ে বসেছি। কি করে জানবো বল পানীয়গুলো রূঢ়ার্থে বিয়ার ব্রাণ্ডি বোঝায়। ওয়েট্রেসগুলো পাঁজরে হাত দিয়ে দু ভাঁজ হয়ে এমনি খিল্ খিল্ করে হাসছিল যে শব্দ শুনে হিম্মৎ সিং রাস্তা থেকে তাড়িখানার ভিতরে তাকালেন। আমার চেহারা দেখে তাঁর দয়ার উদয় হয়েছিল—তোদের মত পাষণ্ডগুলোরও হ'ত। গটগট করে ঘরে ঢুকলেন। আমার পাশে বসে ওয়েট্রেসকে বললেন, 'এক লিটার বিয়ার, বিটে (প্লীজ)!'

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিহার নহী পিতে?'

আমি মাথা নাড়িয়ে বললুম, 'না।'

'ওয়াইন?'

ফের মাথা নাড়ালুম।

'কিসি কিস্‌মকী শরাব?'

আমি বললুম যে আমি দুধের অর্ডার দিয়েছি।

দাড়ি-গোঁপের ভিতর যেন সামান্য একটু হাসির আভাস দেখতে পেলুম। বললেন, 'অব সমঝা।' তারপর আমাকে বসে থাকতে আদেশ দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন এক গেলাস দুধ হাতে নিয়ে। সমস্ত বিয়ার-খানার লোক যে অবাক হয়ে তার কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করেছে সেদিকে কণামাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তারপর, সেই যে বসলেন গেঁট হয়ে, আর আরম্ভ করলেন জালা জালা বিয়ার-পান। সে-পান দেখলে গোলাম মৌলা আর কক্‌খনো রায়ের পানকে ভয় করবে না।

শিখের বাচ্চা, রক্তে তার তিন পুরুষ ধরে আগুন-মার্কা ধেনো, আর মোলায়েমের মধ্যে নির্জলা হুইস্কি; বিয়ার তাঁর কি করতে পারে?

লিটার আষ্টেক খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পয়সা দিয়ে বেরোবার সময়ও কোনো দিকে একবারের তরে তাকালেন না। আমি কিন্তু বুঝলুম, বিয়ার-খানার হাসি ততক্ষণে শুকিয়ে গিয়েছে। সবাই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে হিম্মৎ সিংয়ের দিকে তাকাচ্ছে, আর ফিস্‌ফিস্ প্রশংসাধ্বনি বেরুচ্ছে।

বাইরে এসে শুধু বললেন, 'অব ইনলোগোঁকো পতা চল্ গিয়া কি হিন্দুস্থানী শরাব ভী পি সক্তা।'

তারপর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে একখানা চেয়ারে বসালেন। নিজে খাটে শুলেন। কান পেতে আমার দুঃখ-বেদনার কাহিনী শুনলেন। তারপর বাড়ির কর্ত্রী ফ্রাউ (মিসেস) রুবেন্‌সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মহিলাটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বিধবা। খানদানী ঘরের মেয়ে এবং হিম্মৎ সিংয়ের সঙ্গে যে ভাবে কথা কইলেন তার থেকে বুঝলুম যে হিম্মৎ সিং সে-বাড়িতে রাজ-পুত্রের খাতির-যত্ন পাচ্ছেন।

তারপর এক মাসের ভিতর তিনি বার্লিন শহরের কত সব হোমরাচোমরা পরিবারের সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিলেন এতদিন পর সে-সব পরিবারের বেশীর ভাগের নামও আমার মনে নেই। কূটনৈতিক সমাজ, খানদানী গোষ্ঠী, অধ্যাপক মণ্ডলী, ফৌজী আড্ডা সর্বত্রই হিম্মৎ সিংয়ের অবাধ গতায়াত ছিল। হিম্মৎ সিং এককালে ভারতীয় ফৌজের বড়দরের অফিসার ছিলেন। ১৯১৪-১৮-এর যুদ্ধে বন্দী হয়ে জর্মনিতে থাকার সময় তিনি জর্মনদের যুদ্ধপরামর্শদাতা ছিলেন। এবং সেই সূত্রে বার্লিনের সকল সমাজের দ্বার তাঁর জন্য খুলে যায়। হিম্মৎ সিং আমাকে কখনো তাঁর জীবনী সবিস্তারে বলেন নি, কাজেই জর্মনরা কেন যে ১৯১৭-১৮ সালে তাঁকে মস্কো যেতে দিয়েছিল ঠিক জানিনে। সেখান থেকে কেন যে আবার ১৯১৯ সালে বার্লিন ফিরে এলেন তাও জানিনে। তবে তাঁকে বহুবার রুশ-পলাতক হোমরাচোমরাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে দেখেছি। সে-সব রুশদের কাছ থেকে একথাও শুনেছি যে হিম্মৎ সিং মস্কোতে যে খাতির যত্ন পেয়েছিলেন তার সঙ্গে তাঁর বার্লিনের প্রতিপত্তিরও তুলনা হয় না। কম্যুনিস্ট বড়কর্তাদের সঙ্গে মতের মিল না হওয়াতে তিনি নাকি মস্কো ত্যাগ করেন। আশ্চর্য নয়, কারণ হিম্মৎ সিংয়ের মত জেদী আর একরোখা লোক আমি আমার জীবনে দুটি দেখি নি।

আর আমায় লাই যা দিয়েছিলেন। ভালোমন্দ কিছুমাত্র বিবেচনা না করে আমাকে যেখানে খুশী সেখানে নিয়ে যেতেন, আমি বেজার হয়ে বসে রইলে রাই-স্টাক ভাড়া করে নাচের বন্দোবস্ত করবার তালে লেগে যেতেন। আমার সর্দি

হলে বার্লিন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে ডেকে পাঠাতেন, শরীর ভালো থাকলে নিজের হাতে কাবাব রুটি বানিয়ে খাওয়াতেন।

তিন মাস ধরে কেউ কখনো সুখ-স্বপ্ন দেখেছে? ফ্রয়েড নাকি বলেন, স্বপ্নের পরমায়ু মাত্র দু-তিন মিনিট। এ তত্ত্বটা জেনেও মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারলুম না, যে-দিন হিম্মৎ সিং হঠাৎ কিছু না বলে কয়ে নিরুদ্দেশ হলেন। ফ্রাউ রুবেন্‌সও কিছুই জানেন না, বললেন, যে-স্যুট পরে বেরিয়েছিলেন তাই নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কয়েকদিন পরে মার্সলেস থেকে চিঠি, তাঁর জিনিসপত্র ভিখিরি-আতুরকে বিলিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে।

বহু বৎসর পরে জানতে পেরেছিলুম, আন্‌হাল্‌টার স্টেশনে তাঁর এক প্রাচীন রাজনৈতিক দুশমনকে হঠাৎ আবিষ্কার করতে পেয়ে তাকে ধরবার জন্য পিছু নিয়ে তিনি একবস্ত্রে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন।

হিম্মৎ সিংয়ের সঙ্গে আর কখনো দেখা হয় নি। তাঁর কাছ থেকে কোনো দিন কোনো চিঠিও পাই নি।

তারপর আরো তিন মাস কেটে গিয়েছে। বার্লিনে যে সমাজে আমাকে চড়িয়ে দিয়ে হিম্মৎ সিং মই নিয়ে চলে গিয়েছিলেন সেখান থেকে আমি লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে জখমও হলুম।

এমন সময় ফ্রাউ রুবেন্‌স একদিন টেলিফোন করে অনুরোধ জানালেন আমি যেন তাঁর সঙ্গে ক্যোনিক কাফেতে বেলা পাঁচটায় দেখা করি। বিশেষ প্রয়োজন। হিম্মৎ সিং চলে যাওয়ার পর ফ্রাউ রুবেন্‌সের সঙ্গে আমার মাত্র একদিন দেখা হয়েছিল। টেলিফোনে মাঝে মাঝে হিম্মৎ সিংয়ের খবর নিয়েছি—যদিও জানতুম তাতে কোনো ফল হবে না—কিন্তু ও-বাড়িতে যাবার মত মনের জোর আমার ছিল না। গোঁসাইয়ের মত লুকিয়ে লুকিয়ে বার্লিনে শরৎ চাটুয্যের উপন্যাস পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতুম না বটে, কিন্তু বাঙালী তো বটি।

পাঁচটার সময় কাফে ক্যোনিকে গিয়ে দেখি কাফের গভীরতম আর নির্জনতম কোণে ফ্রাউ রুবেন্‌স বসে, আর তাঁর পাশে—একঝলক যা দেখতে পেলুম—এক বিপজ্জনক সুন্দরী।

ফ্রাউ রুবেন্‌স পরিচয় দিয়ে নাম বললেন, "ফ্রলাইন ভেরা গিব্রিয়াডফ"।

লেডি-কিলার অর্থাৎ নটবর পুলিন সরকার জিজ্ঞেস করল, 'বিপজ্জনক সুন্দরী বলতে কি বোঝাতে চাইলেন আমার ঠিক অনুমান হল না। বার্লিনের আর পাঁচজনের জন্য বিপজ্জনক না আপনার নিজের ধর্মরক্ষায় বিপজ্জনক?'

চাচা বললেন, 'আমার এবং আর পাঁচজনের জন্য বিপজ্জনক। তোর কথা বলতে পারিনে। তুই তো বার্লিনের সব বিপদ, সব ভয় জয় করতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিস।'

শ্রীধর মুখুয্যে আবৃত্তি করল,

"মাইন হের্ৎস্ ইস্ট বি আইন বীনেন হাউস
ডী মেডেলস সিণ্ট ডী বীনেন—

হৃদয় আমার মধুচক্রের সম
মেয়েগুলো যেন মৌমাছিদের মত
কত আসে যায় কে রাখে হিসাব বল
ঠেকাতে, তাড়াতে মন মোর নয় রত।"

রায় বললেন, 'কী মুশকিল! এরা যে আবার কবিত্ব আরম্ভ করল।'

চাচা বললেন, 'ফ্রাউ রুবেন্‌স ফ্রলাইন ভেরার পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বিশেষ করে জোর দিয়ে বললেন যে হিম্মৎ সিং যখন মস্কোতে ছিলেন তখন বসবাস করেছিলেন গিব্রিয়াডফদের সঙ্গে। আমি তখন ভেরার দিকে তাকাতে তিনিও ভালো করে তাকালেন।

ছ'মাস ধরে প্রতিদিন যে লোকটির কথা উঠতে বসতে মনে পড়েছে তিনি এঁদের বাড়িতে ছিলেন, এই মেয়েটির চোখে তার ছায়া কত শত বার পড়েছে, আমি আমার অজানাতে তাঁর চোখে যেন হিম্মৎ সিংয়ের ছবি দেখতে পাবার আশা করে ভালো করে তাকালুম।

হিম্মৎ সিংয়ের ছবি দেখতে পাই নি, কিন্তু ভেরার চোখ থেকে বুঝতে পারলুম হিম্মৎ সিং আমার জীবনের কতখানি জায়গা দখল করে বসে আছেন সে-কথা ভেরাও জানেন। তাঁর চোখে আমার জন্য সহানুভূতি টলটল করছিল।

ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'আপনি হিম্মৎ সিংকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।'

এর উত্তর দেবার আমি প্রয়োজন বোধ করলুম না।

ফ্রাউ রুবেন্‌স তখন বললেন, 'আপনাকে একটি বিশেষ অনুরোধ করার জন্য আমরা দু'জন আজ আপনাকে ডেকেছি। হিম্মৎ সিং আজ বার্লিনে নেই—যেখানেই হোন্ ভগবান তাঁকে কুশলে রাখুন—আমি ধরে নিচ্ছি তিনি যেন এখন আমাদের মাঝখানেই বসে আছেন। তাই আপনাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করছি, আজ যদি হিম্মৎ সিংয়ের কোনো প্রিয় কাজ করতে আপনাকে অনুরোধ করি আপনি সেটা করবার চেষ্টা করবেন কি?'

আমি বললুম, 'আপনার মনে কি সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আছে?'

ফ্রাউ রুবেন্‌স তখন বললেন, 'আমার মনে নেই। ফ্রলাইন ভেরার জন্য শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম।' ভেরা মাথা নাড়িয়ে বোঝালেন, তাঁরও কোনো প্রয়োজন ছিল না। ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'ভেরা অত্যন্ত বিপদে পড়ে মস্কো থেকে বার্লিন পালিয়ে এসেছেন। রাজনৈতিক দলাদলিতে ধরা পড়ে তাঁর বাপ মা, দু'ভাই সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছেন। এক ভাই তখন অডেসায় ছিলেন। তিনি কোনো গতিকে প্যারিসে পৌঁচেছেন। ভেরা যদি তাঁর ভাইয়ের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন তবে তাঁর বিপদের শেষ হয়। কিন্তু তাঁর কাছে রাশান পাসপোর্ট তো নেইই, অন্য কোনো পাসপোর্টও তিনি যোগাড় করতে পারেন নি। জর্মন পাসপোর্ট পেলেও কোনো বিশেষ লাভ নেই ; কারণ জর্মনদের ফ্রান্সে ঢুকতে দিচ্ছে না। তবে সেটা যোগাড় করতে পারলে তিনি অন্ততঃ কিছুদিন বার্লিনে থাকতে পারতেন। এখন অবস্থা এই যে বার্লিন পুলিশ খবর পেলে ভেরাকে জেলে পুরবে। রাশাতেও ফেরৎ পাঠাতে পারে।'

আমরা সবাই একসঙ্গে আঁৎকে উঠলুম !

চাচা বললেন, 'এতদিন পরও ঘটনাটা শুনে তোরা আঁৎকে উঠছিস। আমি শুনেছিলুম ফ্রলাইন ভেরার সামনাসামনি। আমার অবস্থাটা ভেবে দেখ।'

ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'এখন কি করা যায় বলুন ?'

হিম্মৎ সিংয়ের কথা মনে পড়ল। আমাদের কাছে যে বাধা হিমালয়ের মত উঁচু হয়ে দেখা দিয়েছে, তিনি তার উপর দিয়ে স্কেটিং করে চলে যেতেন। পাস-পোর্ট যোগাড় করার চেয়ে দেশলাই কেনা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল—শিখধর্মের 'সিগরেট নিষেধ' তিনি মানতেন।

ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'ভেরার জন্য পাসপোর্ট যোগাড় করা তাঁর পক্ষেও কঠিন, হয়ত অসম্ভব হত। কিন্তু একথাও জানি যে শেষ পর্যন্ত তিনি একটা পথ বের করতেনই করতেন।'

এ বিষয়ে আমার মনেও কোনো সন্দেহ ছিল না।

ফ্রাউ রুবেন্‌স অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করতে আপনার কোনো আপত্তি আছে কি ?'

ধর্মত বলছি, আমি ভাবলুম, ফ্রাউ রুবেন্‌স রসিকতা করছেন। সব দেশেরই আপন আপন বিদঘুটে রসিকতা থাকে, তাই এক এক ভাষার রসিকতা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। হয়ত জর্মন রসিকতাটির ঠিক রস ধরতে পারি নি ভেবে ক্যাবলার মত আমি তখন একটুখানি 'হে হে' করেছিলুম।

ফ্রাউ রুবেন্‌স আমার কাষ্ঠরসময় 'হে হে'-তে বিচলিত না হয়ে বললেন,

'নিতান্ত দলিলসংক্রান্ত বিয়ে। আপনি যদি ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করেন তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় অর্থাৎ ব্রিটিশ ন্যাশানালিটি পেয়ে যাবেন এবং অনায়াসে প্যারিস যেতে পারবেন। মাস তিনেক পর আপনি ভেরার বিরুদ্ধে ডেজারশনের (পতিবর্জনের) মোকদ্দমা এনে ডিভোর্স (তালাক) পেয়ে যাবেন।' তারপর একটু কেশে বললেন, 'আপনাকে স্বামীর কোনো কর্তব্যই সমাধান করতে হবে না।' একটুখানি থেমে বললেন, 'খাওয়ানো পরানো, কিছুই না।'

লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে গিয়েছিল, না ভয়ে আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, না আশ্চর্য হয়ে আমার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল আজ এতদিন বাদে বলতে পারব না। এমন কি ক্যাবলাকান্তের মত 'হে হে' করাও তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

রায়ের বিয়ার ফুরিয়ে গিয়েছে বলে কথা বলার ফুর্সৎ পেলেন, বললেন, 'বিলক্ষণ! আমারও সেই অবস্থা হয়েছে।'

চাচা বললেন, 'ছাই হয়েছে, হাতী হয়েছে। আমার বিপদের সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না। সব কথা পয়লা শুনে নাও, তারপর যা খুশি বলো।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফ্রাউ রুবেন্স যা বললেন তার থেকে বুঝতে পারলুম যে তিনি ভাত ঠাণ্ডা হতে দেন না, তার উপরই গরম ঘি ছাড়েন। বললেন, 'আমার দৃঢ় প্রত্যয়, হিম্মৎ সিংকে এ পথটা দেখিয়ে দিতে হত না। তিনি দু'মিনিটের ভিতর সব কিছু ফিক্স্ উণ্ড ফের্তিস (পাকা পোক্ত) করে দিতেন।'

চাচা বললেন, 'ইয়োরোপে cold blooded খুন হয়, ভারতবর্ষে কোল্ড-ব্লাডেড্ বিয়ে হয়। এবং দুটোই ভেবে-চিন্তে, প্ল্যান মাফিক, প্রিমেডিটেটেড্ কিন্তু এখানে আমাকে অনুরোধ করা হচ্ছিল কোল্ড-ব্লাডেড্ বিয়ে করতে কিন্তু না ভেবে-চিন্তে, অর্থাৎ রোমান্টিক কায়দায়। প্রথম দর্শনে প্রেম হয় শুনেছি, কিন্তু প্রথম দর্শনেই বিয়ে, এরকমধারা ব্যাপার আমি ইয়োরোপে দেখিও নি, শুনিও নি। অবশ্য আমার এ সব তাবৎ ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু বলির পাঁঠা আমি হতে যাব কেন?

অপরূপ সুন্দরী; দেখে চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছিল অস্বীকার করব না কিন্তু বিয়ে—!'

ফ্রাউ রুবেন্স গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?'

আমি চুপ।

তখন ফ্রাউ রুবেন্‌স এমন একখানা অস্ত্র ছাড়লেন যাতে আমার আর কোনো পথ খোলা রইল না। বললেন, 'আপনি কি সত্যি হিম্মৎ সিংকে ভালোবাসতেন?'

চাচা বললেন, 'অন্য যে-কোনো অবস্থায় হলে আমি ফ্রাউ রুবেন্‌সকে একটা ঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা করতুম কিন্তু তখন কোনো উত্তরই দিতে পারলুম না। তোরা জানিস আমি স্নেহ-প্রেম-দয়ামায়াকে বুদ্ধিবৃত্তি-আত্মজয়ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী দাম দি। কাজেই ফ্রাউ রুবেন্‌সের আঘাতটা আমার কতখানি বেজেছিল তার খানিকটে অনুমান তোরা করতে পারবি। কোনো চোখা উত্তর যে দিই নি তার কারণ, ততখানি চোখা জর্মন আমি তখন জানতুম না।

ঘড়েল মাস্টারগুলো জানে যে ছাত্র যখন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, তখন তাকে ভালো করে নির্যাতন করার উপায় হচ্ছে চুপ করে উত্তরের প্রতীক্ষা করা। ফ্রাউ রুবেন্‌স সেটা চরমে পৌঁছিয়ে দিয়ে পরে বললেন, 'আপনি তা হলে হিম্মৎ সিংয়ের ঋণ শোধ করতে চান না?'

রায়ের বিয়ার এসে গিয়েছে। চুমুক দিয়ে বললেন, 'চাচা মাপ করুন। আপনার কেস্ অনেক বেশী মারাত্মক।'

চাচা রায়ের কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'সেই বে-ইজ্জতিরও যখন আমি কোনো উত্তর দিলুম না তখন ফ্রলাইন গিব্রিয়াডফ হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কুণ্ডুলী-পাকানো গোখরো সাপকে আমি এরকমধারা হঠাৎ খাড়া হতে দেখেছি। গিব্রিয়াডফের মুখ লাল, কালো চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে, সে আগুনের আঁচ ব্লণ্ড চুলে লেগে চুলও যেন লাল হয়ে গিয়েছে।'

ফ্রাউ রুবেন্‌স তাঁকে বললেন, 'আপনি শান্ত হোন। বারন ফন্ ফাল্কেনডর্ফ যখন আপনাকে বিয়ে করার জন্য পায়ের তলায় বসেন, তখন এর প্রত্যাখ্যানে অপমান বোধ করছেন কেন?'

ভেরা বসে পড়লেন।

আমি তখন দিগ্বিদিকশূন্য। অতিকষ্টে বললুম, 'আমাকে দুদিন সময় দিন।'

ফ্রাউ রুবেন্‌স কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ভেরা বাধা দিয়ে বললেন, 'সেই ভালো।' দু'জনাই উঠে দাঁড়ালেন; ফ্রাউ রুবেন্‌স বললেন, 'পরশু দিন পাঁচটায় তাহলে এখানে আবার দেখা হবে।'

হ্যাণ্ডশেক না করেই দু'জনা বেরিয়ে গেলেন। ফ্রাউ রুবেন্‌স কাঁচা রেল লাইনের উপর বিরাট এঞ্জিনের মত হেলেদুলে গেলেন, আর ভেরার চেয়ার ছেড়ে ওঠা আর চলে যাওয়ার ধরন দেখে মনে হল যেন টব ছেড়ে রজনীগন্ধাটি হঠাৎ

দু'খানা পা বের করে ঘরের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। সর্বাঙ্গে হিল্লোল, কিন্তু মাথাটি স্থির, নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মতো। যেন রাজপুত মেয়ে কলসী-মাথায় চলে গেল। ক্যোনিক কাফের আন্তর্জাতিক খদ্দের-গোষ্ঠী সে-চলন মুগ্ধ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখল।'

লেডি-কিলার সরকার বলল, 'মাইরি চাচা, আপনার সৌন্দর্যবোধ আর কবিত্বশক্তি দুইই আছে। অমনতরো বিপাকের মধ্যিখানে আপনি সবকিছু লক্ষ্য করলেন।'

চাচা বললেন, 'কবিত্বশক্তি না ষাঁড়ের গোবর। আমি লক্ষ্য করেছিলুম জ্বরের ঘোরে মানুষ যে রকম শেতলপাটির ফুলের পেটার্ন মুখস্থ করে সেই রকম।'

তারপরে দুদিন আমার কি করে কেটেছিল সে-কথা আর বুঝিয়ে বলতে পারব না। এক রকম হাবা হয় দেখেছিস, মুখে যা দেওয়া গেল তাই পড়ে পড়ে চিবোয় আর চিবোয়,—বলে দিলেও গিলতে পারে না। আমি ঠিক তেমনি দুদিন ধরে একটি কথার দুটো দিক মনে মনে কত লক্ষবার যে চিবিয়েছিলুম বলতে পারব না। হিম্মৎ সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার একমাত্র পন্থা যদি ফ্রলাইন ভেরাকে বিয়ে করাই হয় তবে আমি সে কর্তব্য এড়াই কি করে—আর চেনা নেই, পরিচয় নেই, একটা মেয়েকে হুশ্‌ করে বিয়ে করিই বা কি প্রকারে? সমস্যাটা চিবুচ্ছি আর চিবুচ্ছি, গিলে ফেলে ভালো মন্দ যাই হোক, একটা সমাধান যে করব সে ক্ষমতা যেন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলুম।

মুরুব্বি নেই, বন্ধু নেই, সলা-পরামর্শ করিই বা কার সঙ্গে। হিম্মৎ সিং যাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মাবার কথা নয়, নিজের থেকেও কোনো বন্ধু জোটাতে পারি নি কারণ আমার জর্মন তখনো গল্প জমাবার মত মিশ্রির দানা বাঁধে নি। যাই কোথায়, করি কি?

য়ুনিভার্সিটির কাছে একটা দুধের দোকানে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি—আমার মেয়াদের তখন আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা বাকি—এমন সময় জুতোর শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি সামনে ফ্রলাইন ক্লারা ফন্‌ ব্রাখেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ-শাস্ত্রের ছাত্রী, বার্লিনের মেয়েদের হকি টিমের কাপ্তান। ছ'ফুটের মত লম্বা; হঠাৎ রাস্তায় দেখলে মনে হত মাইকেল এঞ্জেলোর মার্বেল মূর্তি স্কার্ট-ব্লাউজ পরে বেড়াতে বেরিয়েছে। আমার সঙ্গে সামান্য আলাপ ছিল।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে আপনার?'

মাথা নাড়িয়ে জানালুম কিচ্ছু হয় নি।

ধমক দিয়ে বললেন, 'আলবৎ হয়েছে। খুলে বলুন।'

বয়সে আমার চেয়ে ছয় বছরের বড় হয় কি না হয়; কথার রকম দেখে মনে হয় যেন জ্যাঠাইমা। বললুম, 'বলছি, কিছুই হয় নি।'

ফন্ ব্রাখেল আমার পাশে বসলেন। আমার কোটের আস্তিনে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বলুনই না কি হয়েছে।'

তখন চেখফের একটা গল্প মনে পড়ল। এক বুড়ো গাড়োয়ান তার ছেলে মরে যাওয়ার দুঃখের কাহিনী কাউকে বলতে না পেয়ে শেষটায় নিজের ঘোড়াকে বলেছিল। ঘোড়ার সঙ্গে ফন্ ব্রাখেলের অন্তত একটা মিল ছিল। হকিতে তাঁর ছুট যেমন তেমন ঘোড়ার চেয়ে কম ছিল না। আমি তখন মরিয়া। ভাবলুম, দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়ি।

সমস্ত কাহিনী শুনে ফন্ ব্রাগেল পাঁচটি মিনিট ধরে ঠাঠা করে হাসলেন। হাসির ফাঁকে ফাঁকে কখনো বলেন, 'ডু লীবার হের গট্' (হে মা কালী), কখনো বলেন, 'বী ক্যোস্‌ট্‌লিষ্' (কি মজার ব্যাপার), কখনো বলেন, 'লাখেন ডি গ্যোটার' (দেবতারা শুনলে হাসবেন)।

আমি বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। ফন্ ব্রাখেল আমার কাঁধে দিলেন এক গুঁত্তা। ঝপ্ করে ফের বসে পড়লুম। বললেন, 'ডু ক্লাইনের ইডিয়ট্ (হাবাগঙ্গারাম), এখ্‌খুনি তোমার ফোন করে বলে দেওয়া উচিত, তোমার দ্বারা ওসব হবে-টবে না।'

আমি বললুম, 'হিম্মৎ সিং থাকলে যা করতেন, আমার তাই করা উচিত।'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'ঈসপের গল্প পড়নি। ব্যাঙ ফুলে ফুলে হাতী হবার চেষ্টা করেছিল। হিম্মৎ সিংয়ের পক্ষে যা সরল তোমার পক্ষে তা অসম্ভব। তাঁকে আমি বেশ ভালো করেই চিনি—হকি খেলায় তিনি আমাদের তালিম দিতেন। তাঁর দাড়ি গোঁফ নিয়ে তিনি পঁচিশখানা বিয়ে করতে পারতেন, দুটো হারেম পুষতে পারতেন। পারো তুমি?'

আমি বললুম, 'গিব্রিয়াডফ বড় বিপদে পড়েছেন। আমার তো কর্তব্যজ্ঞান আছে।'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'যে মেয়ে মস্কো থেকে পালিয়ে বার্লিন আসতে পারে, তার পক্ষে বার্লিন থেকে প্যারিস যাওয়া ছেলে-খেলা। রুশ সীমান্তের পুলিশের হাতে থাকে মেশিনগান, জর্মন সীমান্তের পুলিশের হাতে রবরের ডাণ্ডা।'

আমি যতই যুক্তিতর্ক উত্থাপন করি তিনি ততই হাসেন আর এমন চোখা চোখা উত্তর দেন যে আমার তাতে রাগ চড়ে যায়। শেষটায় বললুম, 'আপনি পুরুষ হলে বুঝতে পারতেন, যুক্তিতর্কের উপরেও পুরুষের কর্তব্যজ্ঞান নামক ধর্মবুদ্ধি থাকে।'

ফন্ ব্রাখেল গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যে পুরুষ তাতে আর কি সন্দেহ। সোজা বলে ফেল না কেন সুন্দরী দেখে সেই পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছে।'

আমি আর ধৈর্যধারণ করতে পারলুম না। বেরবার সময় শুনতে পেলুম, ফন্ ব্রাখেল বলছেন, 'বিয়ের কেক্ শ্যাম্পেন অর্ডার দিয়ো না কিন্তু। বিয়ে হবে না।'

একেই তো আমার দুর্ভাবনার কূলকিনারা ছিল না, তার উপর ফন্ ব্রাখেলের ব্যঙ্গ। মনটা একেবারে তেতো হয়ে গেল। শরৎ চাটুয্যের নায়করাই শুধু যত্র-তত্র 'দিদি' পেয়ে যায়, আমার কপালে ঢুঢু।

সোজা বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লুম। অন্ধকারে শিস দিয়ে মানুষ যেরকম ভূতের ভয় কাটায় আমি তেমনি হিম্মৎ সিংয়ের প্রিয় দোহাটি আবৃত্তি করতে লাগলুম ;—

"এহসান নাখুদাকা উঠায় মেরী বলা
কিস্তি খুদা পর ছোড় দুঁ লঙ্গরকো তোড় দুঁ।"

'মাঝি আমায় সব বিপদ-আপদ থেকে বাঁচাবে এই আমার ভরসা? নৌকো খুদার নামে ভাসালুম, নোঙ্গর ভেঙে ফেলে দিয়েছি।'

পরদিন পাঁচটার সময় কাফে ক্যোনিকে গিয়ে বসলুম। জানা ছিল, ফাঁসীর পূর্বে খুনীকে সাহস দেবার জন্য মদ খাইয়ে দেওয়া হয়। হিম্মৎ সিং আমাকে কখনো মদ খেতে দেন নি। ভাবলুম তাঁর ফাঁসীতে যখন চড়ছি তখন খেতে আর আপত্তি কি?'

গোলাম মৌলা অবাক হয়ে শুধাল, 'মদ খেলেন?'

চাচা বললেন, 'কেনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাওয়া হয় নি।'

সোয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা, ছ'টা বাজল। ফ্রাউ রুবেন্স, ফ্রলাইন গিত্রিয়াডফ কারো দেখা নেই। এর অর্থ কি? জর্মনরা তো কখনো এরকম লেট্ হয় না। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। যাই হয়ে থাকুক না কেন, আমি পালাই।

বাড়ি ফিরে ভয়ে ভয়ে ল্যাণ্ডলেডিকে জিজ্ঞেস করলুম, ফ্রাউ রুবেন্স ফোন করেছিলেন কি না? না। আমার উচিত তখন ফোন করা, অনুসন্ধান করা, কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি তো; কিন্তু চেপে গেলুম। নোঙ্গর যখন ভেঙে ফেলে দিয়েছি তখন আমি হালই বা ধরতে যাব কেন?

সাতদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিলুম। রাত্রে শুতে যাবার সময় একবার ল্যাণ্ডলেডিকে চিঁচিঁ করে জিজ্ঞেস করতুম, কোনো ফোন ছিল কি

না? ল্যাণ্ডলেডি নিশ্চয় ভেবেছিল আমি কারো প্রেমে পড়েছি। প্রেমের দ্বিতীয় অঙ্কে নাকি মানুষ এরকম করে থাকে।

কোনো ফোনও না।

করে করে তিন মাস কেটে গেল; আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কাজকর্মে মন দিলুম।

নটে গাছটি মুড়িয়ে দিয়ে চাচা চেয়ারে হেলান দিলেন।

ভোজের শেষে সন্দেশ-মিষ্টি না দিলে বরযাত্রীদের যে রকম হন্যে হয়ে ওঠার কথা আমরা ঠিক সেইরকম একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম। মুখুয্যে বলল, 'কিন্তু ওনারা সব এলেন না কেন, তার তো কোনো হদীস পাওয়া গেল না।'

সরকার বলল, 'আপনার শেষ রক্ষা হল বটে, কিন্তু গল্পটির শেষ রক্ষা হল না।'

রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, 'নোঙ্গর-ভাঙা নৌকোতে আমাকে ফেলে আপনি কেটে পড়লেন চাচা? আমার উদ্ধারের উপায় বলুন।'

চাচা বললেন, 'মাস তিনেক পরে দস্তানা কিনতে গিয়েছি 'তীৎসে'। জর্মনদের হাতের তুলনায় আমাদের হাত ছোট বলে লেডিজ ডিপার্টমেণ্টে আমাদের দস্তানা কিনতে হয়। সেখানে ফন্ ব্রাখেলের সঙ্গে দেখা। কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে পুরুষ-পুঙ্গব, এখানে কেন? নিজের জন্য দস্তানা কিনছ না বউয়ের জন্য? কিন্তু বউ কোথায়?' আমি উম্মাভরে গটগট করে চলে যাচ্ছিলুম,—ফন্ ব্রাখেল আমার হাতটি চেপে ধরলেন—'বুলি'র সময় হকিস্টিক যে রকম চেপে ধরেন।

সেই কাফে ক্যোনিকেই নিয়ে বসালেন।

বললেন, 'আমি সে দিন পাঁচটার সময় কাফের উপরের গ্যালারিতে বসে তোমাকে লক্ষ্য করছিলুম।'

আমি তো অবাক।

বললেন, 'ওরা কেউ এল না বলে তোমার সঙ্গে কথা না বলে চলে গেলুম। কিন্তু তারা এল না কেন জান? তবে শোনো। তোমার মত মূর্খকে বাঁচানো আমার কর্তব্য মনে করে আমি তাদের সঙ্গে লড়েছিলুম। হিম্মৎ সিং আমার বন্ধু, আমার পিতারও বন্ধু। তাঁর প্রতি এবং তাঁর 'প্রতেজে', তোমার প্রতি আমারও কর্তব্য আছে।

'তোমার কাছ থেকে সব কথা শুনে আমি সোজা চলে যাই ফ্রাউ রুবেন্‌সের ওখানে। তাঁকে রাজী করাই আমাকে গিব্রিয়াডফের ওখানে নিয়ে যাবার জন্য। সময় অল্প ছিল বলে, এবং ইচ্ছে করেই ফোন করে যাই নি। গিয়ে দেখি সেখানে

একপাল ষাঁড়ের সঙ্গে সুন্দরী শ্যাম্পেন খাচ্ছেন, হৈহল্লা চলছে। ফাউ রুবেন্সের চক্ষুস্থির। তিনি গিব্রিয়াডফ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্য ধারণা করেছিলেন—ইংরেজিতে যাকে বলে ডেমজেল্ ইন্ ডিস্ট্রেস্ (বিপন্না)। সে কথা থাক্—আমি দু'জনকে সামনে বসিয়ে পষ্টাপষ্টি বললুম যে তোমাতে আমাতে প্রেম, বিয়ে স্থির—আমি অন্য কোনো মেয়ের নোন্সেন্স সহ্য করব না।'

আমি বললুম, 'একি পাগলামি! আপনি এসব মিথ্যে কথা বলতে গেলেন কেন?'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'চুপ করে শোনো। আমি বাজে বকা পছন্দ করিনে। এ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। গিব্রিয়াডফ কিন্তু কামড় ছাড়ে না—আমি তখন ভয় দেখিয়ে বললুম যে, আমি পুলিশে খবর দেব তার পাসপোর্ট নেই, আর পাসপোর্ট যোগাড়ের জন্য তোমাকে মেকি বিয়ে করছে। আমি অবশ্য সমস্তক্ষণ ভান করছিলুম যে আমি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি—তোমার মত অজমূর্খের। প্রেমে হাবুডুবু, শুনলে মুরগীগুলো পর্যন্ত হেসে উঠবে!—আর তোমাকে বিয়ে করার জন্য এম'ন হন্যে হয়ে আছি যে, পুলিশ লেলানো, খুনখারাবী সব কিছুই করতে প্রস্তুত।

'গিব্রিয়াডফ হার মানলেন। ফ্রাউ রুবেন্স ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। গিব্রিয়াডফ যে তাঁকে কতদূর বোকা বানিয়েছে বুঝতে পেরে বড় লজ্জা পেলেন। বাড়ি ফেরার পথে গিব্রিয়াডফ তাঁর সঙ্গে কি করে বন্ধুত্ব জমিয়েছিল সে-ব্যাপার আগাগোড়া খুলে বললেন। তখন আরো অনুসন্ধান করে জানলুম, মস্কোতে এ গিব্রিয়াডফের বাড়িতে হিম্মৎ সিং কখনো বসবাস করেন নি—এরা ওঁদের দূর সম্পর্কে আত্মীয় মাত্র।'

চাচা বললেন, 'ফন্ ব্রাখেল উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমার তাড়া আছে, হকি ম্যাচে চললুম।' '

আমি বললুম, 'কিন্তু একটা কথার উত্তর দিন। গিব্রিয়াডফ বিয়ের জন্য আমাকেই বাছলেন কেন? বারন ফন্ ফাক্লেনডর্ফের মত বর তো ছিল।'

ফন্ ব্রাখেল বললেন, 'লীবার ইডিয়ট (প্রিয় মূর্খ), গিব্রিয়াডফ তো বর খুঁজছিল না, খুঁজছিল শিখণ্ডী। ফাক্লেনডর্ফ বা অন্য কাউকে বিয়ে করলে সে-স্বামী তার হক্ক্ চাইত না? তা হলে পঁচিশটে ষাঁড়ের সঙ্গে দিবারাত্তির শ্যাম্পেন চলত কি করে? ফাক্লেনডর্ফ প্রাশান মোষ। নীটশের উপদেশে বিশ্বাস করে—স্ত্রীলোকের কাছে যেতে হলে চাবুকটি নিয়ে যেতে ভুলো না—হল? বুঝলে হে নরর্ষভ?'

চাচা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'জীবনে এরকম বোকা বনিনি, অপমানিত

বোধ করিনি। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা গিলে ফেলা ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না।'

গোলাম মৌলা বলল, 'একটা বাজতে তিন মিনিট। শেষ ট্রেন একটা দশে।'

আমরা হন্তদন্ত হয়ে ছুট দিলুম সাভিন্নিপ্লাৎস স্টেশনের দিকে। রায় চেঁচিয়ে বললেন, 'চাচা, ফন্ ব্রাখেলের ঠিকানা কি?'

চাচাও তখন তার গলাবন্ধ কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে ছুট দিয়েছেন। বললেন, 'সে-বিয়ারে ছাই। তোমার ফির্য়াসে শ্রীমতী জমিতফের সঙ্গে ফন্ ব্রাখেলের গলাগলি। তাই তো বলেছিলুম, বড় ভাবিয়ে তুলেছ।'

কর্ণেল

কুরফুর্স্টেন্-ডাম্ বার্লিন শহরের বুকের উপরকার যজ্ঞোপবীত বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। ওরকম নৈকষ্য-কুলীন রাস্তা বার্লিনে কেন, ইয়োরোপেই কম পাওয়া যায়। চাচার মেহেরবানীতে 'হিন্দুস্থান হৌস' যখন গুলজার তখন কিন্তু বার্লিনের বড় দুরবস্থা; ১৯১৪-১৮-এর শ্মশান ফেরতা বার্লিন ১৯২৯-এও পৈতে উল্টো কাঁধে পরছে, এবং তাই গরীব ভারতীয়দের পক্ষেও সম্ভবপর হয়েছিল কুরফুর্স্টেন্-ডামের গা ঘেঁষে উলাণ্ডস্ট্রাসের উপর আপন রেস্তোরাঁ 'হিন্দুস্থান হৌস' পত্তন করার।

বহু জর্মন অজর্মন 'হিন্দুস্থান হৌসে' আসত। জর্মনরা আসত নূতনত্বের সন্ধানে —কলকাতার লোক যে রকম 'চাইনীজ' বা 'আমজদিয়ায়' খেতে যায়। ভারতীয়েরা নিয়ে আসত জর্মন, অজর্মন বান্ধবীদের—মাছ-ভাত বা ডাল-রুটির স্বাদ বাৎলাবার জন্য, আর বুলগেরিয়ান, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ানরা আসত জর্মনদের সঙ্গে নিয়ে, তাদের কাছে সপ্রমাণ করার জন্য যে তাদের আপন আপন দেশের রান্না ভারতীয় রান্নার চেয়ে ভালো। কিন্তু ভারতীয় রান্না এমনি উচ্চশ্রেণীর সত্তা যে তার সঙ্গে শুধু ভগবানের তুলনা করা যেতে পারে। ভগবানের অস্তিত্ব যে রকম প্রমাণ করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, ভারতীয় রান্নাও জর্মনদের কাছে ঠিক তেমনিতর প্রমাণ বা বাতিল কিছুই করা যায় না। কারণ ভারতীয় রান্নার বর্ণনাতে আছে :—

তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
অপূর্ব ব্যঞ্জন, মরি, রান্ধিয়া সুমতি
প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে।

এবং সে গ্রাত্তারী রান্না কেন, মামুলী রান্নায় সামান্যতম মশলা দিলেও জর্মনরা সে-খাদ্য গলাধঃকরণ করতে পারে না। আর মশলা না দিলে আমাদের ঝোল হয়ে যায় আইরিশ স্টু, ডাল হয় লেন্টিল স্যুপ, তরকারি হয় বয়েল্ড ভেজ, মাছভাজা হয় ফ্রাইড্ ফিশ্। আমাদের চতুর্বর্ণ তখন শুধু বর্ণ নয়, রস-গন্ধ-স্বাদ সব কিছু হারিয়ে একই বিস্বাদের আসনে বসেন বলে চণ্ডালের মত হয়ে যান। কাজেই আমাদের রান্না জর্মনদের কাছে এখনো ভগবানেরই ন্যায় সিদ্ধাসিদ্ধ কিছু নন। দাবাখেলায় এই অবস্থাকেই বলে চালমাত।

তবে হাঁ, আমাদের ছানার সন্দেশ ছিল কান্টের কাটেগরিশে ইম্পেরাটিফের মত অলঙ্ঘ্য ধর্ম। তার সামনে জর্মন অজর্মন সকলেই মাথা নিচু করতেন। ছানা-তত্ত্বে অবাঙালীর অবদান অনায়াসে অবহেলা করা যেতে পারে।

'হিন্দুস্থান হৌসে'র সবচেয়ে বড় আড়কাঠি ছিলেন চাচা। হিণ্ডেনবুর্গের গোঁপের পরেই বার্লিনের সবচেয়ে পরিচিত বস্তু ছিল চাচার বেশ—তার সঙ্গে 'ভূষা' শব্দ জুড়লে চাচার প্রতি অন্যায় করা হবে। সে বেশ ছিল সম্পূর্ণ বাহুল্য বর্জিত। কারখানার চোঙার মত গোলগাল পাতলুন, গলা-বন্ধ হাঁটু-জোকা কোট আর ভারী-ভারী এক জোড়া মিলিটারি বুট। লোকে সন্দেহ করত, তাঁর কোটের তলায় কামিজ-কুর্তা নাকি নেই। তবে এ-কথা ঠিক কোট, পাতলুন, বুট ছাড়া অন্য কোনো তৃতীয় আবরণ বা আভরণ তাঁর শ্যামাঙ্গে কেউ কখনো বিরাজ করতে দেখে নি। বার্লিনের মত পাথর-ফাটা শীতেও তিনি কখনো হ্যাট, টুপি, ওভারকোট বা দস্তানা পরেন নি। খুব সম্ভব শীতের প্রকোপেই তাঁর মাথার ঘন বাবরী চুল পাতলা হয়ে আসছিল কিন্তু চাচা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

সেই অপরূপ পাতলুন, গণ্ডারের চামড়ার মত পুরু গলাবন্ধ কোট, আর একমাথা বাবরী নিয়ে চাচা হঠাৎ থমকে দাঁড়াতেন কুরফুর্স্টের্ন্-ডামের ফুটপাতে। পেছনের দিকে মাথা ঠেলে, উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন উড়ন্ত মেঘের পানে। কেন, কে জানে? হয়ত বিদেশের অচেনা-অজানা দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাটের মাঝখানে একমাত্র আকাশ আর মেঘই তাঁকে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। দেশ ছেড়েছেন বহুকাল হল, কবে ফিরবেন জিজ্ঞাসা করলে হাঁ, না, কিছু কবুল না করে কলকাতার উড়িষ্যাবাসীদের মত শুধু বলতেন 'ললাটঙ্ক লিখন'।

বার্লিনের লোক শহরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে মেঘের দিকে তাকিয়ে কাব্যি করে না। দু'মিনিট যেতে না যেতেই চাচার চতুর্দিকে ভিড় জমে যেত। তাঁর অদ্ভুত বেশ, বাবরী চুল, ঘনশ্যাম দেহরুচি আর বেপরোয়া ভাব লক্ষ্য না করে থাকবার যো ছিল না।

ফিসফিস শুনেই চাচার ঘুম ভাঙত। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে 'বাও' করে একটু মৃদু হাসির মেহেরবানী দেখাতেন। ভিড় তখন ফাঁক হয়ে রাস্তা করে দিত। চাচা আবার 'বাও' করে 'হিন্দুস্থান হৌস' রওয়ানা দিতেন। কেউ 'গুটেন মর্গেন' (সুপ্রভাত) ধরনের কিছু বললে বা পরিচয় করবার চেষ্টা দেখালে চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতর হাত চালিয়ে তাঁর একখানা ভিজিটিং কার্ড বের করে এগিয়ে ধরে ফের 'বাও' করতেন—যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী নবাব কাউকে ডুয়েলে আহ্বান করছেন। সে-কার্ডে চাচার ঠিকানা থাকত 'হিন্দুস্থান হৌসে'র। জর্মনরা চালাক ; বুঝত, চাচা রাস্তায় মাঝখানে নীরব কাব্য করেন বলে কথা বলতে চান না। কাজেই তারা চাচার আড্ডায় এসে উপস্থিত হত।

মেঘ দেখবার জন্য অন্য জায়গা এবং অন্য কায়দা থাকতে পারে কিন্তু 'হিন্দুস্থান হৌসে'র রান্নার খুশবাই ছড়াবার জন্য এর চেয়ে ভালো গ্যোবেল্‌স্ আর কি হতে পারে ?

শ্রীধর মুখুয্যে বলছিল, 'সংস্কৃতের নূতন ছোকরা প্রফেসর এসেছে য়ুনিভার্সিটিতে। পড়াচ্ছে গীতা। আজ সকালে প্রথম অধ্যায় পড়াবার সময় বলল, 'কুলক্ষয়-ফুলক্ষয় সব আবোল-তাবোল কথা। বর্ণসঙ্কর না হলে কোনো জাতের উন্নতি হয় না।' তার থেকে আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে গীতার প্রথম অধ্যায়টা গুপ্তযুগে লেখা। বর্ণসঙ্করের জুজু নাকি বৌদ্ধ যুগের পূর্বে ছিল না।'

চাচা বললেন, 'কি করে বর্ণসঙ্কর হয়, আর তার ফল কি, সেটা প্রথম অধ্যায়ে বেশ ধাপে ধাপে বাৎলানো হয়েছে না রে ? বল তো, ধাপগুলো কি ?'

শ্রীধর খাবি খাচ্ছে দেখে আড্ডার পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ পুলিন সরকার বলল, 'কুলক্ষয় থেকে কুলধর্মনষ্ট, কুলধর্মনষ্ট থেকে অধর্ম, অধর্ম থেকে স্ত্রীলোকদের ভিতর নষ্টামি, নষ্টামি থেকে বর্ণসঙ্কর হলে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ—'

মুখুয্যে বাধা দিয়ে বলল, 'হাঁ, হাঁ, প্রফেসর বলছিল, "পিণ্ডির পরোয়া করে কোন সুস্থবুদ্ধির লোক" ?'

বিয়ারের ভিতর থেকে সুর্য্যি রায়ের গলা বুদ্বুদের মত বেরলো, 'ছোকরা প্রফেসর ঠিক বলেছে। বর্ণসঙ্কর ভালো জিনিস। মুখুয্যে বামুনের ছেলে, এদিকে গীতার পয়লা পাঠ মুখস্থ নেই ; সরকার কায়েতের ছেলে, পুরো চেনটা বাৎলে দিলে। মুখুয্যের উচিত সরকারের মেয়েকে বিয়ে করে কুলধর্ম বাঁচানো।'

চাচা বললেন, 'ঠিক বলেছ, রায়। তাহলে তুমি এক কাজ কর। তোমার

বিয়ারে একটু জল মিশিয়ে ওটাকে বর্ণসঙ্কর করে ফেলো।'

রায় রীতিমত শক্ট্ হয়ে বললেন, 'পানশাস্ত্রে এর চেয়ে বড় নাস্তিকতা আর কিছুই হতে পারে না। বিয়ারে জল!'

চাচা মুখুয্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোদের নয়া প্রফেসরটা নিশ্চয়ই ইহুদি। ওরা যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করে আপন জাতটাকে খাঁটি রাখবার জন্য, ঠিক তেমনি আর পাঁচজনকে উপদেশ দেয় বর্ণসঙ্কর ডেকে আনবার জন্য। ওদিকে খাঁটি জর্মন এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না একদম, কিন্তু কাজের বেলায় না খেয়ে মরবে তবু বর্ণসঙ্কর হতে দেবে না।'

সরকার জিজ্ঞেস করল, 'এদেশেও নিরম্বু-উপবাস আছে নাকি?'

চাচা বললেন, 'আলবাৎ, শোন। আমি এ-বিষয়ে ওকীব-হাল।

পয়লা বিশ্বযুদ্ধের পর হেথায় অবস্থা হয়েছিল 'জর্মনির সর্বনাশ, বিদেশীর পৌষ মাস।' ইনফ্লেশনের গ্যাসে ভর্তি জর্মন কারেন্সির বেলুন তখন বেহেশ্‌তে গিয়ে পৌঁচেছে—বেহেশ্‌তটা অবশ্যি বিদেশীদের জন্য, জর্মনরা কেউ পাঁচহাজার, কেউ দশহাজারে বেলুন থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ দিচ্ছে। আত্মহত্যার খবর তখন আর কোনো কাগজ ছাপাত না, নারী-হৃদয় ইকনমিক্সের কমডিটি, এক 'বার্' চকলেট দিয়ে একসার ব্লণ্ড কেনা যেত, পাঁচটাকায় 'ফার' কোট, পাঁচশ' টাকায় কুর্‌ফুর্স্টেন্-ডামে বাড়ি, একটাকায় গ্যোটের কম্‌প্লীট ওয়ার্কস।'

আড্ডার সবাই সেই সর্বনাশী পৌষ মাসের কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

চাচা বললেন, 'সেই ঝড়ে তখনো যে সব বাড়ি দড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল তাদের প্রত্যেকের ভিতরে ছিল বিদেশী পেয়িং-গেস্ট। যে-সব জর্মন-পরিবারে বিদেশীরা পেয়িং-গেস্ট হয়ে বসবাস করছিল তাদের প্রায় সকলেই খেয়ে পরে জান বাঁচাতে পেরেছিল, কারণ যত নির্লজ্জ, কঞ্জুস, সুবিধাবাদী, পৌষ-মাসীই হও না কেন তামাম মাসের ঘড়ভাড়া, খাইখর্চার জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশটি টাকা তো দিতে হয়। বিদেশী টাকার তখন এমনি গরমী যে সেই পঞ্চাশ টাকায় তোমাকে নিয়ে একটা পরিবারের কায়ক্লেশে দিনগুজরান হয়ে যেত।'

গোঁসাই গুন গুন করে গান ধরলেন, 'দেখা হইল না রে শ্যাম, তোমার সেই নতুন বয়সের কালে।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু একটা দেশের দুর্দিনে এক সের ধান দিয়ে পাঁচ সের চাল নিতে আমার বাধত। তাই যখন আমার বুড়ো ল্যাণ্ডলেডি একদিন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল তখন আমাকে লুফে নেবার জন্য পাড়ায় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এমন সময় আমার বাড়িতে একদিন এসে হাজির ফ্রলাইন্ ক্লারা ফন্ ব্রাখেল।'

আড্ডা এক গলায় শুধাল, 'হকি-টিমের কাপ্তান ?'

চাচা বললেন, 'আমার জান-বাঁচানে-ওয়ালী।' বললেন, 'ক্লাইনার ইডিয়ট (হাবাগঙ্গারাম), তুমি যদি অন্যত্র কোথাও না গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠো তা হলে আমি বড় খুশী হই। প্রাশান ওবেস্টে'র (কর্নেলের) বাড়ি, একটু সাবধানে চলতে হবে। এককালে খুব বড় লোক ছিলেন, এখন 'উন্‌জর টেগ্‌লিশেস্‌ ব্রট্‌ গিব্‌উন্‌স্‌ হয়টে' (Give us this day our daily bread)। অথচ এমন দম্ভী যে পেয়িং-গেস্টের কথা তোলাতে আমাকে কোর্ট মার্শাল করতে চায়! শেষটায় যখন বললুম যে তুমি প্রাশান কারো কাছ থেকে উচ্চাঙ্গের জর্মন শেখার জন্য সুদূর ভারতবর্ষ থেকে বার্লিন এসেছ তখন ভদ্রলোক মোলায়েম হল। এখন বুঝতে পারছ, কেন তোমাকে সাবধানে পা ফেলতে বললুম। তুমি ভাবটা দেখাবে যেন তাঁর বাড়িতে উঠতে পেরে কৃতার্থম্মন্য হয়েছ; তুমি যে কোনো উপকার করছ সেটা যেন ধরতে না পারেন। তার বউ সম্বন্ধে কোনো দুর্ভাবনা ক'রো না, তিনি সব বোঝেন, জানেন।' '

চাচা বললেন, 'প্রাশান অফিসারদের আমি চিরকাল এড়িয়ে গিয়েছি। দূর থেকে ব্যাটাদের ধোপদুরস্ত ইস্ত্রি-করা স্টিফ ইউনিফর্ম আর স্টিফ ভাবসাব দেখে আমার সব সময় মনে হয়েছে এরা যেন হাসপাতালের এপ্রন-পরা সার্জেনদের দল। সার্জেনরা কাটে নির্বিকার চিত্তে রোগীর পেট, এরা কাটে পরমানন্দে ফ্রান্সের গলা।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু ফন্‌ ব্রাখেলের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তার দৌলতে আমি অনেক কিছুই করতে প্রস্তুত ছিলুম। এবং মনে মনে ভাবলুম বেশীর ভাগ ভারতীয়ই বসবাস করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে, দেখাই যাক না খানদানীরা থাকে কি কায়দায়।

ফন্‌ ব্রাখেল আমাকে নিয়ে যান নি। খবর দিয়ে আমি একাই একদিন সুটকেস নিয়ে কর্নেল ডুটেন্‌হফারের বাড়ি পৌঁছলুম।

ট্যাক্সিওলা যে বাড়ির সামনে দাঁড়াল তার চেহারা আগের দেখা থাকলে ফন্‌ ব্রাখেলের প্রস্তাবে আমি রাজী হতুম কি না সন্দেহ। বাড়ি তো নয় সে এক রাজপ্রাসাদ। এ বাড়িতে তো অন্ততঃ শ'খানেক লোকের থাকার কথা কিন্তু তাকিয়ে দেখি দোতলার মাত্র দু'তিনখানা ঘরের জানালা খোলা, বাদবাকি যেন সিল মেরে আঁটা। সামনে প্রকাণ্ড লন্‌। পেরিয়ে গিয়ে দরজার ঘণ্টা বাজালুম। মিনিট তিনেক পরে যখন ভাবছি আবার ঘণ্টা বাজাবো কি না তখন দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল।

গহরজান যখন পানের পিক গিলতেন তখন নাকি গলার চামড়ার ভিতর দিয়ে তার লাল রঙ দেখা যেত। যে-রমণীকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম তাঁর চামড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুখচ্ছবি দেখে মনে হল তিনি যেন সকাল বেলাকার শিশির দিয়ে গড়া। জর্মনিতে পান পাওয়া যায় না, কিন্তু আমার মনে হল ইনি পান খেলে নিশ্চয়ই পিকের রঙ এঁর গলার চামড়ায় ছোপ লাগাবে। চুল যেন রেশমের সুতো, ঠোঁট দু'খানি যেন প্রজাপতির পাখা, ভুরু যেন উড়ে-যাওয়া পাখী, সবসুদ্ধ মিলিয়ে মনে সন্দেহ হয় ইনি দাঁড়িয়ে আছেন না হাওয়ায় ভাসছেন। প্রথম দিনেই যে এ-সব কিছু লক্ষ্য করেছিলুম তা নয়; কিন্তু আজ যখন পিছন পানে তাকাই তখন তাঁর ঐ চেহারাই মনে পড়ে।

ইংরিজিতে বোধহয় একেই বলে ডায়াফনাস্; 'আস্বচ্ছ' বললে ঠিক মানে ধরা পড়ে না।

কতক্ষণ ধরে হাবার মত তাকিয়েছিলুম জানিনে, হঠাৎ শুনলুম 'গুটেন মর্গেন' (সুপ্রভাত), আপনার আগমন শুভ হোক্। আমি ফ্রাউ (মিসেস) ডুটেন্‌হফার।'

ভাগ্যিস ভারী মালপত্র ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির হাতে আগেই সমঝে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল তা না হলে মাল নিয়ে আমি বিপদে পড়তুম। এ রকম অবস্থায় চাকর দাসী কেউ না কেউ আসে কিন্তু কেউ যখন এল না তখন বুঝতে পারলুম ডুটেন্‌হফারদের দুরবস্থা কতটা চরমে পৌঁচেছে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডজন খানেক হল পেরলুম—কোথাও একরত্তি ফর্নিচার নেই, দোর জানালায় পর্দা পর্যন্ত নেই। দেয়ালের সারি সারি হুক দেখে বুঝলুম, এককালে নিশ্চয় বিস্তর ছবি ঝোলানো ছিল, মেঝের অবস্থা দেখে বুঝলুম এ-মেঝের উপর কখনো কোনো জুতোর চাট পড়ে নি—জন্মের প্রথম দিন থেকে এর সর্বাঙ্গ গালচেতে ঢাকা ছিল। কঙ্কাল থেকে পূর্ণাবয়ব মানুষের যতখানি ধারণা করা যায় দেয়ালের হুকের সার, ছাতের শেকলের গোছা, দরজা-জানালার গায়ে-লাগানো পরদা-ঝোলানোর ডাণ্ডা থেকে আমি নাচের ঘর, মজলিসখানা, বাজি-ঘরের ততখানি আন্দাজ করলুম।

শূন্য শ্মশান ভয়ঙ্কর, কিন্তু কঙ্কালের ব্যঞ্জনা বীভৎস।

এ-বাড়িতে থাকব কি করে? চুলোয় যাক প্রাশান জর্মন শেখা।

আন্দাজে বুঝলুম যে আমার জন্য যে-ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা বাড়ির প্রায় ঠিক মাঝখানে। ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার আমাকে সে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

বজরার মত খাট, কিন্তু ঘরখানাও বিলের মত। নৌকোয় চড়া অভ্যাস না হওয়া পর্যন্ত বিলের মাঝখানে নৌকোয় ঘুমুতে যে-রকম অসহায় অসহায়, ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে সে-খাটে শুয়ে আমারো সেই অবস্থা হয়েছিল।

দুপুরে খাবার ঘরে গিয়ে দেখি বেন্‌কুয়েট টেবিলে তিনজনের জায়গা। টেবিলের এক মাথায় কর্তা, অন্য মাথায় গিন্নী, মাঝখানে আমি। একে অন্যকে কোনো জিনিস হাত বাড়িয়ে দেবার উপায় নেই বলে তিনজনের সামনেই আপন আপন নিমক-দান। মাস্টার্ড, সস মাথায় থাকুন, গোলমরিচেরও সন্ধান নেই। বুঝলুম পাঁড় প্রাশানের বাড়ি বটে; আড়ম্বরহীনতায় এদের রান্নার সামনে আমাদের বালবিধবার হবিষ্যান্নও লজ্জায় ঘোমটা টানে। কিন্তু ওসব কথা থাক, এ রকম ধারা মশলার বিরুদ্ধে জেহাদ আমি অন্য জায়গায়ও দেখেছি।

ভেবেছিলুম বাড়ির কর্তাকে দেখতে পাব শূয়ারের মত হোঁৎকা, টমাটোর মত লাল, অসুরের মত চেহারা, দুশমনের মত এই-মারি-কি-তেই-মারি অর্থাৎ সবসুদ্ধ জড়িয়ে মড়িয়ে প্রাশান বিভীষিকা, কিন্তু যা দেখলুম তার সঙ্গে তুলনা হয় তেমন কিছু ইয়োরোপে নেই।

এ যেন নর্মদা-পারের সন্ন্যাসী বিলিতি কাপড় পরে পদ্মাসনে না বসে চেয়ারে বসেছেন। দেহের উত্তমার্ধ কিন্তু যোগাসনে—শিরদাঁড়া খাড়া, চেয়ারে হেলান দেন নি।

শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, শুষ্কমুখ, আর সেই শুকনো মুখ আরো পাংশু করে দিয়েছে দু'খানি বেগুনি ঠোঁট। কপাল থেকে নাক নেমে এসেছে সোজা, চশমার ব্রিজের জায়গায় এতটুকু খাঁজ খায় নি আর গালের হাড় বেরিয়ে এসে চোখের কোটর দুটোকে করে দিয়েছে গভীর গুহার মত। কিন্তু কী চোখ! আমার মনে হল উঁচু পাহাড় থেকে তাকিয়ে দেখছি নীচে, চতুর্দিকে পাথরে ঘেরা, নীল সরোবর। কী গভীর, কী তরল। সে-চোখে যেন এতটুকু লুকোনো জিনিস নেই। যত বড় অবিশ্বাস্য কথাই এ লোকটা বলুক না কেন, এর চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা অবিশ্বাস করার জো নেই।

খেতে খেতে সমস্তক্ষণ আড়-নয়নে সেই ধ্যানমগ্ন চোখের দিকে, সেই বিষণ্ণ ঠোঁটের দিকে আর চিন্তাপীড়িত ললাটের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখছি। তখন চোখে পড়ল তাঁর খাবার ধরন। চোয়াল নড়ছে না, ঠোঁট নড়ছে না, খাবার গেলার সময় গলায় সামান্যতম কম্পনের চিহ্ন নেই।

পরনে প্রাশান অফিসারদের য়ুনিফর্ম তো নয়ই, মাথার চুলও কদম-ছাঁট নয়। ব্যাক্‌ব্রাশ করা চক্‌চকে প্ল্যাটিনামরঙ চুল।

কিন্তু সবচেয়ে রহস্যময় মনে হল এঁর বয়স। চল্লিশ, পঞ্চাশ, সত্তর হতেও বাধা নেই। বয়সের আন্দাজ করতে গিয়েই বুঝলুম নর্মদা পারের সন্ন্যাসীর সঙ্গে এঁর আসল মিল কোনখানে।

এত অল্প খেয়ে মানুষ বাঁচে কি করে, তাও আবার শীতের দেশে? স্যুপ খেলেন না, পুডিং খেলেন না, খাবার মধ্যে খেলেন এক টুকরো মাংস—শ্যামবাজারের মামূলী মটন-কট্‌লেটের সাইজ—দুটো সেদ্ধ আলু, তিনখানা বাঁধা-কপির পাতা আর এক স্লাইস রুটি। সঙ্গে ওয়াইন, বিয়ার, জল পর্যন্ত না।

আহারে যত না বিরাগ তার চেয়েও তাঁর বেশী বিরাগ দেখলুম বাক্যালাপে। নূতন বাড়িতে উঠলে প্রথম লাঞ্চের সময় যে-সব গতানুগতিক সম্বর্ধনা, হাসিঠাট্টা, গ্যাস সম্বন্ধে সতর্কতা, সিঁড়ির পিচ্ছিলতা সম্বন্ধে খবরদারি সে-সব তো কিছুই হল না—আমি আশাও করিনি—আবহাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভদ্রতা-দুরস্ত কৌতুহল, এ সব কোনো মন্তব্য বা প্রশ্নের দিক দিয়ে হের ওবের্স্ট (কর্নেল মহাশয়) গেলেন না। আমিও চুপ করে ছিলুম, কারণ আমি বয়সে সক্কলের ছোট।

খাওয়ার শেষের দিকে যখন আমি প্রায় মনস্থির করে ফেলেছি যে, ডুটেন্‌-হফারদের জিভে হয় ফোস্কা নয় বাত, তখন হের ওবের্স্ট হঠাৎ পরিষ্কার ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেক্সপীয়ারের কোন্ নাট্য আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে?'

আমার পড়া ছিল কুল্লে একখানাই। নির্ভয়ে বললুম, 'হ্যামলেট।'

'গ্যোটে পড়েছেন?'

আমি বললুম, 'অতি অল্প।'

'একসঙ্গে গ্যোটে পড়ব?'

আমি আনন্দের সঙ্গে, অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে সম্মতি জানালুম। মনে মনে বললুম, 'দেখাই যাক্ না প্রাশান রাজপুত কি রকম কালিদাস পড়ায়। হের ওবের্স্টের চেহারাটি যদিও ভাবুকের মত, তবু কুলোপানা চক্কর হলেই তো আর দাঁতে কালবিষ থাকে না।

ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার বললেন, 'ভদ্রলোক জর্মন বলতে পারেন।'

'তাই নাকি?' বলে সেই যে ইংরিজি বলা বন্ধ করলেন তারপর আমি আর কখনো তাঁকে ইংরিজি বলতে শুনি নি।

লাঞ্চ শেষ হতেই হের ওবের্স্ট উঠে দাঁড়ালেন। জুতোর হিলে হিলে ক্লিক্ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম স্ত্রীকে, তারপর আমাকে 'বাও' করে আপন ঘরের দিকে চলে গেলেন। বাপের বয়সী লোক, বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ এরকম 'বাও'

করে বসবে কি করে জানব বলো। আমি হন্তদন্ত হয়ে উঠে বার বার 'বাও' করে তার খেসারতি দেবার চেষ্টা করলুম কিন্তু মনে মনে মাদামের সামনে বড় লজ্জা পেলুম। পাছে তিনিও আবার কোনো একটা নূতন এটিকেট চালান সেই ভয়ে —যদিও আমার কোনো তাড়া ছিল না—আমি দু'মিনিট যেতে না যেতেই উঠে দাঁড়ালুম, মাদামকে কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে 'বাও' করে নিজের ঘরের দিকে রওয়ানা হলুম—হিলে হিলে ক্লিকটা আর করলুম না, জুতোর হিল্ রবরের ছিল বলে।

চারটের সময় কাফ খেতে এসে দেখি হের ওবের্স্ট নেই। মাদাম বললেন, তিনি অপরাহ্ণে আর কিছু খান না। মনে মনে বললুম, বাব্বা, ইনি পওহারী বাবার কাছে পৌঁছে যাবার তালে আছেন।

ডিনারে ওবের্স্ট খেলেন তিনখানা সেনউইজ্ আর এক কাপ চা—তাও আর পাঁচজন জর্মনের মত—'বিনদুধে'।

চাচা থামলেন। তারপর গুনগুন করে অনুষ্টুপ ধরলেন,

'এবমুক্তো হৃষিকেশ গুড়াকেশেন ভারত।'

তারপর বললেন, 'আমি গুড়াকেশ নই, নিদ্রা আমি জয় করি নি, নিদ্রাই আমাকে জয় করেছেন, অর্থাৎ আমি ইন্‌সমনিয়ায় কাতর। কাজেই সংযমী না হয়েও 'যা নিশা সর্বভূতানাং' তার বেশীর ভাগ আমি জেগে কাটাই। রাত তিনটের সময় শুতে যাবার আগে জানালার কাছে গিয়ে দেখি কর্তার পড়ার ঘরে তখনো আলো জলছে।

দেরিতে উঠি। ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে দেখি কর্তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। লজ্জা পেলুম, কিন্তু সেটা পুষিয়ে নিলুম লোহার নালে নালে এমনি বম্‌শেল্ ক্লিক্ করে যে, মাদাম আঁৎকে উঠলেন। মনে মনে বললুম, 'হিন্দুস্থানীকী তমিজ ভী দেখ লীজীয়ে।'

ওবের্স্টকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কি অনিদ্রায় ভোগেন?' বললেন, 'না তো।' আমি কেন প্রশ্নটা শুধালুম সে সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল না দেখিয়ে শুধু স্মরণ করিয়ে দিলেন যে দশটায় গ্যোটে-পাঠ।

পূর্ণ এক বৎসর তিনি আমায় গ্যোটে পড়িয়েছিলেন, দুটি শর্ত প্রথম দিনই আমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে। তিনি কোনো পারিতোষিক নেবেন না, আর আমার পড়া তৈরী হোক আর না হোক, ক্লাস কামাই দিতে পারব না।

মিলিটারি কায়দায় লেখাপড়া শেখা কাকে বলে জানো? বুঝিয়ে বলছি। আমরা দেশকালপাত্রে বিশ্বাস করি; গুরুর যদি শরীর অসুস্থ থাকে, ছাত্রের যদি পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়, পালা-পরবে যদি কোথাও যেতে হয়, পাঠ্যপুস্তকের যদি

অনটন হয়, শিক্ষক অথবা ছাত্রের যদি পড়া তৈরী না থাকে, গুর্বীর যদি ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন সংক্রান্ত কোনো বিশেষ প্রয়োজন হয়—এবং তখনকার গম-বরাদ্দের (রেশনিঙের) দিনে তার নিত্য নিত্য প্রয়োজন হত—তাহলে অনধ্যায়। কিন্তু প্রাশান মিলিটারি-মার্গ অঘটনঘটনপটিয়সী দৈবদুর্বিপাকে বিশ্বাস করে না; আমি বুকে কফ নিয়ে এক ঘণ্টা কেশেছি, ক্লাস কামাই যায় নি, হিণ্ডেনবুর্গ হের ওবের্স্টকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, ক্লাস কামাই যায় নি। একটি বৎসর একটানা গ্যোটে, আবার গ্যোটে এবং পুনরপি গ্যোটে। তার অর্ধেক পরিশ্রমে পাণিনি কণ্ঠস্থ হয়, সিকি মেহন্নতে ফিরদৌসীকে ঘায়েল করা যায়।

অথচ পড়ানোর কায়দাটা ন' সিকে ভটচাযি। গ্যোটের খেই ধরে বাইমার, বাইমার থেকে ট্যুরিঙেন্, ট্যুরিঙেন্ থেকে পূর্ণ জর্মনির ইতিহাস; গ্যোটের সঙ্গে বেটোফোনের দেখা হয়েছিল কার্লসবাডে—সেই খেই ধরে বেটোফোনের সঙ্গীত, বাগনারে তার পরিণতি, আমেরিকায় তার বিনাশ; গ্যোটে শেষ বয়সে সরকারি গেহাইমরাট্ খেতাব পেয়েছিলেন, সেই খেই ধরে জর্মনির তাবৎ খেতাব, তাবৎ মিলিটারি মেডেল, গণতন্ত্রে খেতাব তুলে দেওয়াটা ভালো না মন্দ সে সব বিচার, এক কথায় জর্মন দৃষ্টিবিন্দু থেকে তামাম ইয়োরোপের সংস্কৃতি-সভ্যতার সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস। পূর্ণ এক বৎসর ধরে গ্যোটের গোষ্পদে ইয়োরোপের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে-ওঠা ইতিহাস-ঐতিহ্য বিম্বিত হল।

আর এ সব কিছু ছাড়িয়ে যেত তাঁর আবৃত্তি করার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। সে ইন্দ্রজালের মোহ বোধহয় আমার এখনো কাটে নি; আমি এখনো বিশ্বাস করি, মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায়—যে-শ্রদ্ধা, যে-অনুভূতি, যে-সংজ্ঞা নিয়ে ডুটেন্‌হফার গ্যোটে আবৃত্তি করতেন—তাহলে ঈপ্সিত ফললাভ হবেই হবে।

পূর্ণ এক বৎসর রোজ দু'ঘণ্টা করে এই গুণীর সাহচর্য পেলুম কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর নিজের জীবন অথবা তাঁর পরিবার সম্বন্ধে তিনি কখনো একটি কথাও বলেন নি। কেন তিনি মিলিটারি ছাড়লেন, লুডেনডর্ফের আহ্বানে জর্মনিতে নূতন দল গড়াতে কেন তিনি সাড়া দিলেন না (কাগজে এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা হত), পেন্সন্ কেন তিনি ত্যাগ করলেন, না করে পারিবারিক তৈলাঙ্কন তৈজসপত্র বাঁচানো কি অধিকতর কাম্য হত না,—এ-সব কথা বাদ দাও, একদিনের তরে ঠাট্টাচ্ছলেও তাঁকে বলতে শুনি নি প্রথম যৌবনে তিনি সোয়া দু'বার না আড়াই-বার প্রেমে পড়েছিলেন অথবা ছাত্রাবস্থায় মাতাল হয়ে ল্যাম্প-পোস্টকে জড়িয়ে ধরে 'ভাই, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি' বলে কান্নাকাটি করেছিলেন কি না।

পূর্ণ এক বৎসর ধরে এই লোকটির সাহচর্য পেয়েছি, তাঁর সংযম দেখে মুগ্ধ

হয়েছি—মদ না, সিগরেট না, কফি না ; বার্লিনের মেরুমুক্ত হিমে মুক্ত-বাতায়ন নিরিন্ধন গৃহে ত্রি-যামা-যামিনী বিদ্যাচর্চা, আত্মসম্মান রক্ষার্থে পিতৃপিতামহসঞ্চিত আশৈশব শ্রদ্ধাবিজড়িত প্রিয়বস্তু অকাতরে বিসর্জন, আহারে বিরাগ, ভাষণে অরুচি, দন্তহীন, দৈন্যে নীলকণ্ঠ, গুড়াকেশ—সব কিছু নিয়ে এঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে এমনি অভিভূত করে ফেলেছিল যে আমি নিজের অজানায় তাঁকে অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছিলুম। ডুটেন্‌হফারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আমি যে দস্তানা, ওভারকোট, টাই কলার ছাড়লুম, আজো তা গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করি নে। কিন্তু কিসে আর কিসে তুলনা করছি !'

চাচা বললেন, 'শুধু একটা জিনিসে হের ওবেস্টের চিত্তগতি আমি ধরতে পেরেছিলুম। আমাদের আলাপের দ্বিতীয় দিনে জিনিয়স সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জাতিভেদের কথা ওঠে। আমি মুসলমান, তার উপর ছেলেবেলায় দু' হাত তফাতে দাঁড়িয়ে বামুন পণ্ডিতকে স্লেট দেখিয়েছি, কৈশোরে হিন্দুহস্টেলে বেড়াতে গিয়ে ঢুকতে পাই নি, জাতিভেদ সম্বন্ধে আমার অত্যধিক উৎফুল্ল হওয়ার কথা নয়। তার-ই প্রকাশ দিতে হের ওবেস্ট জাতিভেদের ইতিহাস, তার বিশ্লেষণ, বর্তমান পরিস্থিতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ সম্বন্ধে এমনি তথ্য এবং তত্ত্বে ঠাসা কতকগুলো কথা বললেন যে আমার উষ্মার চোদ্দ আনা তখনি উবে গেল। দেখলুম, শুধু যে তিনি মনুসংহিতার জর্মন অনুবাদ ভালো করে পড়েছেন তা নয়, গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্রের তাবৎ আচার অনুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেছেন—অবশ্য সংস্কৃতে নয়, হিলেব্রাণ্টের জর্মন অনুবাদে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি, বৈজ্ঞানিক পরশ পাথর দিয়ে বিচার করলে তার কতটা গ্রহণীয় কতটা বর্জনীয়, বিজ্ঞান যেখানে নীরব সেখানে কিংকর্তব্য এসব তো বললেনই, এবং যে সব সমস্যায় তিনি স্বয়ং কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে-সবগুলোও বিশেষ উৎসাহে আমার সামনে উপস্থিত করলেন।

অথচ কি বিনয়ের সঙ্গে দিনের পর দিন এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন —প্রাশান কৌলীন্য যেন দম্ভপ্রসূত না হয়। প্রাশান কৌলীন্য জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবী করে না, তার দাবী শুধু এইটুকু যে তার বিশেষত্ব আছে, সে-বিশেষত্ব-টুকুও যদি পৃথিবী স্বীকার না করে তাতেও আপত্তি নেই কিন্তু অন্ততপক্ষে পার্থক্যটুকু যেন স্বীকার করে নেয়। হের ওবেস্ট তাতেই সন্তুষ্ট। তিনি সেইটুকুই বাঁচিয়ে রাখতে চান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, সে-পার্থক্যের জন্য 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' রয়েছে।

এবং সেই পার্থক্যটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দেখতে হবে রক্তসংমিশ্রণ যেন না হয়।

নীটশের সুপারম্যান ?

না, না। শুধু বড় হওয়ার জন্য বড় হওয়া নয়, শুধু 'সুপার' হওয়ার জন্য 'সুপার' হওয়া নয়। প্রাশান আদর্শ হবে ত্যাগের ভিতর দিয়ে, আত্মজয়ের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক হওয়ার।

এবং যদি দরকার হয়, তার জন্য সংগ্রাম পর্যন্ত করা। সেবা করার জন্য যদি দরকার হয় তবে যে-সব অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ তার অন্তরায় হয় তাদের বিনাশ করা।

আমার কাছে বড় আশ্চর্য ঠেকল। সেবার জন্য সংগ্রাম, বাঁচবার জন্য বিনাশ ?

হের ওবেস্ট বলতেন, 'শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কেন যুদ্ধ করতে বলেছিলেন ? সেইটে বার বার পড়তে হয়, বুঝতে হয়। ভুললে চলবে না, জীবনের সমস্ত চিন্তাধারা কর্মপদ্ধতি লোকসেবায় যেন নিয়োজিত হয়।'

আমি প্রথম দিনের আলোচনার পরই বুঝতে পেরেছিলুম হের ওবেস্টের সঙ্গে তর্ক করা আমার ক্ষমতার বহু, বহু উর্ধ্বে কিন্তু এই 'সেবার জন্য সংগ্রাম' বাক্যটা আমার কাছে বড়ই আত্মঘাতী, পরস্পরবিরোধী বলে মনে হল। রক্তসংমিশ্রণ ঠেকাবার জন্য প্রাণ বসর্জন, এও যেন আমার কাছে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি মনে হল। আমার কোন্ কোন্ জায়গায় বাধছে হের ওবেস্টের কাছে সেগুলোও অজানা ছিল না।

লক্ষ্য করলুম, এঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্পভাষণে। কিন্তু স্বল্প হলে কি হয়, শব্দের বাছাই, কল্পনার ব্যঞ্জনা, যুক্তির ধাপ এমনি নিরেট ঠাসবুনুনিতে বক্তব্যগুলোকে ভরে রাখত যে সেখানে সূচ্যগ্র ঢোকাবার মত ক্ষমতা আমার ছিল না। এবং আরো লক্ষ্য করলুম যে একমাত্র রক্তসংমিশ্রণের ব্যাপারেই তিনি যেন ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

বিষয়টি যে তাঁর জীবনের কত বিরাট অংশ দখল করে বসে আছে সেটা বুঝতে পারলুম একদিন রাত প্রায় দুটোর সময় যখন তিনি আমার ঘরে এসে বললেন, 'এত রাতে এলুম, কিছু মনে করবেন না ; আমাদের আলোচনার সময় একটি কথা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সেটি হচ্ছে, 'সুখদুঃখ, জয়পরাজয়, লাভক্ষতি যিনি সমদৃষ্টিতে দেখতে পারেন, একমাত্র তাঁরই অধিকার সেবার ভার গ্রহণ করার, সেবার জন্য সংগ্রাম করার।'

কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে হিল্-ক্লিকের সঙ্গে 'বাও' করে বেরিয়ে গেলেন।

এত রাত্রে এসে এইটুকু বলার এমন কি ভয়ঙ্কর প্রয়োজন ছিল ?

হের ওবেস্টের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি, বাড়ির লনে পাইচারি করেছি, পৎস্‌দাম পেরিয়ে ছোট ছোট গ্রামে গিয়ে চাষাদের বাড়িতে খেয়েছি, পুরানো বইয়ের দোকানে প্রাচীন মাসিক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি, অধিকাংশ সময় তিনি চুপ, আমিও চুপ। তাঁকে কথা বলাতে হলে প্রাশান ঐতিহ্যের প্রস্তাবনা করাই ছিল প্রশস্ততম পন্থা। একদিন শুধালুম, 'ফ্রান্সের সঙ্গে আপনাদের বনে না কেন?'

হের ওবেস্ট বললেন, 'না বনাই ভালো। এ রকম ধ্বংসমুখ দেশ পৃথিবীতে আর দুটো নেই। প্যারিসের উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল বিলাস দেখেছেন? কোন্ সুস্থ জাতির পক্ষে এরকম নির্লজ্জ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সম্ভব?'

আমি বললুম, 'বার্লিনেও 'কাবারে' আছে।'

হের ওবেস্ট বললেন, 'বার্লিন জর্মনি নয়, প্রাশার প্রতীক নয়, কিন্তু প্যারিস ফ্রান্স এবং ফ্রান্স প্যারিস।'

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলুম। হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগল। যে-সমস্যা মানুষের মনকে অহরহ আন্দোলিত করে শেষ পর্যন্ত সে-সমস্যা নিজের জীবনে, নিজের পরিবারের জীবনে কতটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তাই নিয়ে মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় একদিন না একদিন আলোচনা করে। হের ওবেস্টকে কখনো আলোচনার সে দিকটা মাড়াতে দেখি নি।

ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারকে আমি অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গল্প-কাহিনী বলতুম। হের ওবেস্টের তুলনায় যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হত কম, তবু তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছিল বেশী। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হের ওবেস্টের সঙ্গে নানা আলোচনা হয়, কিন্তু আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, না জেনে হয়ত আমি এমন বিষয়ের কথা পাড়ব যাতে তাঁর আঘাত লাগতে পারে। আমার বিশ্বাস তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন—তাই এ-প্রশ্ন শুধালুম।'

ফ্রাউ ওবেস্ট অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখের ভাব থেকে মনে হল তিনি মনে মনে 'বলি কি বলি না' করছেন। শেষটায় ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমাদের পরিবারের কথা কখনো পাড়বেন না। আমাদের ষোল বছরের ছেলেটি ফ্রান্সের লড়াইয়ে গেছে, আমাদের মেয়ে—'

কথার মাঝখানে ফ্রাউ ডুটেন্‌হফার হঠাৎ দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলেন। এই বেকুব গোমূর্খামির জন্য আমি মনে মনে নিজেকে খুব জুতো-পেটা করলুম। অতটা বুদ্ধি কিন্তু তখনো ছিল যে এ সব অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে বিপদ বাড়িয়ে তোলা হয় মাত্র। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। প্রাশানরা হয়ত তখনো ছিল্ ক্লিক করে।

বড় ছেলে মরে যাওয়াতে বয়স্ক চাষাকে একদম ভেঙে পড়তে দেখেছি। তার তখন দুঃখ সে মরে গেলে তার খেত-খামার দেখবে কে। সভ্যতা কুলটুরের পয়লা কাতারের শহরে তারি পুনরাবৃত্তি দেখলুম ডুটেন্‌হফার পরিবারে। এত ঐতিহ্য, এত সাধনা, এত ভবিষ্যতের স্বপ্ন সব এসে শেষ হবে এই ডুটেন্‌হফারে?

তাই কি এত কৃচ্ছ্রসাধন, রক্তসংমিশ্রণের বিরুদ্ধে এত তীব্র হুঙ্কার? যে বর্ষায় সফল বৃষ্টি হয় না সেই বর্ষাতেই কি দামিনীর ধমক, বিদ্যুতের চমক বেশী?

তাই হের ওবেস্টের পড়াশুনোরও শেষ নেই। সভ্য অসভ্য বর্বর বিদগ্ধ দুনিয়ার তাবৎ জাতির নৃতত্ত্ব, সমাজগঠন, ধর্মনীতি পড়েই যাচ্ছেন, পড়েই যাচ্ছেন। শীতের রাতে আগুন না জ্বালিয়ে ঘরের ভিতর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাইচারি, বসন্তে বেখেয়ালে বৃষ্টিতে জবজবে হয়ে বাড়ি ফেরা, গ্রীষ্মের সুদীর্ঘ দিবস বিদেশী মুসলমানকে প্রাশান ধর্মের মূল তত্ত্বে ওকীবহাল করার অন্তহীন প্রয়াস, হেমন্তের পাতা-ঝরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে না জানি কোন্ নিষ্ফল বৃক্ষের কথা ভেবে ভেবে চিত্তের লুকানো কোণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ।

কিন্তু আমার সামনে তিনি কখনো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন নি। এসব আমার নিছক কল্পনাই হবে।

এক বৎসর ঘুরে এল। আমি ততদিনে পুরো পাকা প্রাশান হয়ে গিয়েছি। চেয়ারে হেলান না দিয়ে বসি, সুপে গোলমরিচের গন্ধ পেলে ঝাড়া পনরো মিনিট হাঁচি, একটানা বারো ঘণ্টা কাজ করতে পারি, তিন দিন না ঘুমুলেও চলে—যদিও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আমার নিদ্রাকৃচ্ছ্রতা তখন অনেকটা সেরে গিয়েছে—কাঠের পুতুলের মত খট খট করে হাঁটা রপ্ত হয়ে গিয়েছে, আর আমার জর্মন উচ্চারণ শুনে কে বলবে আমি ভাত-খেকো, নেটিব, কালা-আদমী। সঙ্গে সঙ্গে এ-বিশ্বাসও খানিকটে হল যে হের ওবেস্টের হৃদয় বলে যদি কোনো রক্তমাংসে গড়া বস্তু থাকে তবে তার খানিকটে আমি জয় করতে পেরেছি।

এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে আমার জীবনের প্রাশান-পর্বকে তার কুরুক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দিল।

কলেজ থেকে ফিরেছি। দোরের গোড়ায় দেখি একটি যুবতী পেরেম-বুলেটরের হ্যাণ্ডেলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছে। চেহারাটি ভারী সুন্দর, হুবহু হের ওবেস্টের মত। তিনিও সামনে দাঁড়িয়ে। মুখে কথা নেই। আমিও দাঁড়ালুম, প্রাশান এটিকেট যদিও সে-অবস্থায় কাউকে সেখানে দাঁড়াতে কড়া বারণ করে। তবুও যদি কেউ দাঁড়ায় তবে সেই প্রাশান এটিকেটেরই অলঙ্ঘ্য আদেশ, হের ওবেস্ট তাকে মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে

দেবেন। তিনি এটিকেট লঙ্ঘন করলেন,—সেই প্রথম আর সেই শেষ।

আমি তখন আর প্রাশান না। আমার মুখোস খসে পড়েছে। আমি ফের কালা-আদমী হয়ে গিয়েছি। আমি নড়ব না।

মেয়েটি কি বললেন বুঝতে পারলুম না।

হের ওবের্স্ট বললেন, 'তোমাকে আমি একবার বলেছি, আমার সঙ্গে যোগ-সূত্র স্থাপনা করার চেষ্টা করবে না। তাই আর বার, শেষবারের মত বলছি, তুমি যদি আবার এরকম চেষ্টা করো, তবে আমাকে বাধ্য হয়ে তোমার সন্ধানের বাইরে যেতে হবে।'

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। ছুটে গেলুম ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারের কাছে। বললুম, 'আপনার মেয়ে দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে। আপনার স্বামী তাঁকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

তিনি পাথরের মতো বসে রইলেন। আমি তাঁকে হাত ধরে তুলে সদর দরজার দিকে চললুম। করিডরে শুনি দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, দেখি, হের ওবের্স্ট ফিরে আসছেন। আমি তখন ফ্রাউ ডুটেন্‌হফারের হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটলুম মেয়েটির সন্ধানে। তাঁকে পেলুম বাড়ির সামনের রাস্তায়। তখনো কাঁদছেন। তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলুম, তাঁর ঠিকানা টুকে নিয়ে এলুম।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে দেখি টেবিলের উপর আমার নামে একখানা চিঠি। ঋজু, শক্ত, প্রাশান হাতে হের ওবের্স্টের লেখা। আমার বুক কেঁপে উঠল। খুলে পড়লুম ;—

'আপনার কর্তব্যবুদ্ধি আপনাকে যে-আদেশ দিয়েছিল আপনি তাই পালন করেছেন। আমি তাতে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু এর পর আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো যোগসূত্র থাকতে পারে না।

আপনার বাড়ি পেতে কোনো কষ্ট হবে না জেনেই বৃথা সময় নষ্ট না করে আপনাকে আমার বক্তব্য জানালুম।'

হের ওবের্স্টকে ততদিনে এতটা চিনতে পেরেছিলুম যে, তাঁর হৃদয় থাক আর নাই থাক, তাঁর প্রতিজ্ঞার নড়চড় হয় না। পরদিন সকাল বেলা ডুটেন্‌হফারদের বাড়ি ছাড়লুম। হের ওবের্স্টের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করি নি। ফ্রাউ কপালে চুমো খেয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

আড্ডা এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। কে যেন জিজ্ঞেস করল—সকলের হয়ে—'কিন্তু মেয়েটির দোষ কি ছিল?'

চাচা বললেন, 'হের ওবের্স্টের গোর দিতে যাই তার প্রায় বৎসর খানেক

পরে। সেখানে শুনলুম, তাঁর মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে বিয়ে করেছিলেন, এবং তিনি জাতে ফরাসী।'

মুখুয্যের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোর অধ্যাপক কি বলছিল রে? বর্ণসঙ্কর-ফঙ্কর আবোল-তাবোল কথা? বর্ণসঙ্করের প্রতি দরদ দেখিয়েছিলুম বলে হের ওবের্স্ট তাঁর জীবনের শেষ সঙ্গীকে অকাতরে অপাঙক্তেয় করলেন।

এবং নিজে? অর্ধ-অনশনে তাঁর মৃত্যু হয়। আমাকে না তাড়ালে হয়ত তিনি আরো বহুদিন বাঁচতেন। তিনি আর কোনো পেয়িং গেস্ট নিতে রাজী হন নি। একে নিরম্বু উপবাসে মৃত্যু বলা চলে না সত্যি, কিন্তু এরো একটি পদবী থাকা উচিত। কি বলো গোঁসাই?'

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা বলল, 'শেষ ট্রেন মিস করেছি।'

চাচা বললেন, 'চ, প্রাশান কায়দায় পাঁচ মাইল ডবলমার্চ করা দেখিয়ে দি।'

মা-জননী

যুদ্ধের পূর্বে লণ্ডনে অগুনতি ভারতীয় নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি করত। তাদের জন্য হোটেল, বোর্ডিং হৌস তো ছিলই, ডাল-রুটি, মাছ-ভাত খাওয়ার জন্য রেস্তোরাঁও ছিল প্রয়োজনের চেয়ে অধিক।

বাদবাকি সমস্ত কন্টিনেণ্টে ছিল মাত্র দুটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। প্যারিসের রু্য দ্য সমোরারের 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও বার্লিনের 'হিন্দুস্থান হৌস'।

লণ্ডন ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে উদাসীন কিন্তু বার্লিন ভারতীয়দের খাতির করত। তাই অর্থাভাব সত্ত্বেও 'হিন্দুস্থান হৌস' কায়ক্লেশে যুদ্ধ লাগা পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে 'হিন্দুস্থান হৌস' নাৎসি আন্দোলনের চেয়েও প্রাচীন কারণ ১৯২৯-এ হৌসের যখন পত্তন হয় তখনো হিটলার বার্লিনে কল্কে পান নি।

সেই 'হিন্দুস্থান হৌসে'র এক কোণে বাঙালীদের একটা আড্ডা বসত। সে-আড্ডার ভাষাবিদ্ সুর্য্যি রায়, লেডি-কিলার পুলিন সরকার, বেটোফেনজ্ঞ মদন-মোহন গোস্বামী বার্লিন সমাজের অশোক-স্তম্ভ কুতুব মিনার হয়ে বিরাজ করতেন। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা। 'হিন্দুস্থান হৌসে'র ভিতরে বাহিরে তাঁর প্রতিপত্তি কতটা তা নিয়ে আমরা কখনো আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করি নি কারণ চাচা ছিলেন বয়সে সকলের চেয়ে বড়, দানে খয়রাতে হাতিম-তাই আর সলা-পরামর্শে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

এঁদের সকলকেই লুফে নেবার জন্ম বার্লিনের বিস্তর ড্রইং-রুম খোলা থাকা সত্ত্বেও এঁরা স্থবিধে পেলেই 'হিন্দুস্থান হৌসে' এসে আড্ডা জমাতেন। এ-স্বভাবটাকে বাঙালীর দোষ এবং গুণ দুইই বলা যেতে পারে।

আড্ডা জমেছে। সুষ্যি রায় চুক্‌চুক্ করে বিয়ার খাচ্ছেন। লেডি-কিলার পুলিন সরকার চেস্টনাট্ ব্রাউন আর ব্রুনেট্ চুলের তফাৎটা ঠিক কোন্ জায়গায় তাই নিয়ে একখানা থিসিস ছাড়ছে, চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে চোখ বন্ধ করে আপন ভাবনা ভেবে যাচ্ছেন এমন সময় আড্ডার সবচেয়ে চ্যাংড়া সদস্য, রায়ের 'প্রতেজে' বা 'দেশের ছেলে', গ্রাম-সম্পর্কে ভাগ্নে গোলাম মৌলা এসে তার মামার পাশে বসল। তার চোখে মুখে অদ্ভুত বিহ্বলতা—লাস্ট ট্রেন মিস্ করলে কয়েক মিনিটের তরে মানুষ যে-ভাব নিয়ে বোকার মত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকটা সেই রকম।

রায় শুধালেন, 'কি রে, কি হয়েছে? প্রেমে পড়েছিস?'

গোলাম মৌলা বড্ড লাজুক ছেলে। বয়স সতর হয় কি না হয়, বাপ কট্টর খেলাফতি, ছেলেকে কি দেশে কি বিলেতে ইংরেজের আওতায় আসতে দেবেন না বলে সেই অল্প বয়সেই বার্লিন পাঠিয়েছেন। 'সুষ্যিমামা' না থাকলে সে বহুকাল আগেই বার্লিন ছেড়ে পালাত। কথা কয় কম, আর বড়দের ফাইফরমাস করে দেয় অনুরোধ বা আদেশ করার আগেই।

বলল, 'আমার ল্যাণ্ডলেডি আর তার মেয়েতে কি ঝগড়াটাই না লেগেছে যদি দেখতেন। মা নাচে যাচ্ছে, কিছুতেই মেয়েকে নিয়ে যাবে না। মেয়ে বলছে যাবেই।'

রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মায়ের বয়স কত রে?'

'চল্লিশ হয় নি বোধ হয়।'

'মেয়ের?'

'আঠারো হবে।'

রায় বললেন, 'তাই বল। এতে তোর এত বেকুব বনার কি আছে রে? মা মেয়ে যদি এক সঙ্গে নাচে যায় তবে মায়ের বয়স ভাঁড়াতে অসুবিধা হবে না?'

মৌলা বলল, 'কি ঘেন্না! মেয়েটাও দেমাক করে বলছিল, সে থাকলে নাকি মায়ের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। আমি ভাবলুম, রাগের মাথায় বলছে, কিন্তু কী ঘেন্না, মায়ে মেয়ে এই নিয়ে লড়াই! মৌলার বিহ্বলতা কেটে গিয়েছে আর তার জায়গায় দেখা দিয়েছে তেতো-তেতো ভাব।

আড্ডা তর্কাতর্কির বিষয় পেয়ে যেন রথের নারকোলের উপর লাফিয়ে পড়ল।

একদল বলে বাচ্চার জন্য মায়ের ভালোবাসা অনুন্নত সমাজেই পাওয়া যায় বেশী, অন্য দল বলে ভারতের একান্ন পরিবার সভ্যতার পরাকাষ্ঠা আর একান্ন পরিবার খাড়া আছে মা-জননীদের দয়ামায়ার উপর। লেডি-কিলার সরকারকে জর্মনরা বলত 'Schuerzenjaeger' অর্থাৎ 'এপ্রন-শিকারী', কাজেই সে যে মা মেয়ে সকলের পক্ষ নিয়ে লড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি, আর গোঁসাই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের মা যশোদার কাছে মা-মেরির মাদন্নারূপ নিতান্ত পানসে।

রায় তর্কে যোগ দেন নি। কথা কাটাকাটি কমলে পরে বললেন, 'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? হবে হবে, কলকাতা বোম্বাই সর্বত্রই আস্তে আস্তে মায়ে মেয়ে রেষারেষি আরম্ভ হবে।'

তখন চাচা চোখ মেললেন। বললেন, 'সে কি হে রায় সায়েব? তুমিও একথা বললে? তার চেয়ে কথাটা পাল্টে দিয়ে বলো না কেন, জর্মনিতেও এক-দিন আর এ-লড়াই থাকবে না। এখনকার অবস্থা তো আর স্বাভাবিক নয়। বেশীর ভাগ ল্যাণ্ডলেডিই বিধবা, আর যাদের বয়স ষোলর উপরে তারাই বা বর জোটাবে কোত্থেকে? আরো বহুদিন ধরে চলবে কুরুক্ষেত্রের শত বিধবার রোদন। ১৪—১৮টা কুরুক্ষেত্রের চেয়ে কম কোন্ হিসেবে?'

গোঁসাই বললেন, 'কিন্তু—'

চাচা বললেন, 'তবে শোনো।'

কর্নেল ডুটেন্‌হফারের বাড়ি ছাড়ার বৎসর খানেক পরে হঠাৎ আমাকে টাকা-পয়সা বাবদে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। তখনকার দিনে বার্লিনে পয়সা কামানো আজকের চেয়েও অনেক বেশী শক্ত ছিল। মনে মনে যখন ভাবছি ধন্নাটা কোন্ চাকরি নিয়ে শুরু করব, অর্থাৎ ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিট্যুটে অনুবাদকের, খবরের কাগজে কলামনিস্টের, না ইংরিজি ভাষার প্রাইভেট ট্যুটরের এমন সময়ে ফ্রলাইন ক্লারা ফন্ ব্রাখেলের সঙ্গে দেখা। আমি একটা অত্যন্ত নচ্ছার রেস্তোরাঁ থেকে বেরুচ্ছি, তিনি তাঁর মের্সেডেজ্ হাঁকিয়ে যাচ্ছেন। গাড়িতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্লাইনার ইডিয়ট, কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছ নাকি, এরকম প্রলেতারিয়া রেস্তোরাঁয় নবাব-পুত্তুর কি ভেবে?'

তোমরা জানো, আমাকে 'ক্লাইনার ইডিয়ট' অর্থাৎ 'হাবাগঙ্গারাম' বলার অধিকার ক্লারার আছে।'

আড্ডা ঘাড় নাড়িয়ে যা জানাতে চাইল তার অনুবাদ এককথায়,—'বিলক্ষণ।'

চাচা বললেন, 'ততদিনে আমার জর্মন শেখা হয়ে গিয়েছে। উত্তর দিলুম ডাকসাঁইটে কবিতায়,

'কাইনেন্ ট্রোপ্‌ফ্‌যেন্ ইন্ বেষার্ মের্,
উন্‌ট্ ডাস্ বয়টেল্ শ্লাপ্ উন্‌ট্ লের্ ॥

গেলাসেতে নেই এক ফোঁটা মাল আর।
ট্যাক ফাঁকা মাঠ, বেবাক পরিষ্কার ॥'

ক্লারা বললেন, 'পয়সা যদি কামাতে চাও তবে তার বন্দোবস্ত আমি করে দিতে পারি। আমার পরিচিত এক 'হঠাৎ-নবাবের' ছেলের যক্ষ্মা হয়েছে। একজন সঙ্গীর দরকার। খাওয়া-থাকা তো পাবেই, মাইনেও দেবে ভালো। ওরা থাকে রাইন-ল্যাণ্ডে। বার্লিনের তুলনায় গরমে সাহারা।'

আমি রাজী হলুম। দু'দিন বাদ টেলিফোনে চাকরি হয়ে গেল। হানোফার হয়ে কলন পৌঁছলুম।

মৌলা শুধাল, 'যেথান থেকে 'ও দ্য কলন' আসে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দাম এখানে যা, কলনেও তা। তারপর কলনে গাড়ি বদল করে বন্, বন্ থেকে গোডেসবের্গ্। রাইন নদীর পারে। স্টেশনের চেহারাটা দেখেই জানটা তর্ হয়ে গেল। ভারী ঘরোয়া ঘরোয়া ভাব। ছোট্ট শহরখানির সঙ্গে জড়িয়ে মড়িয়ে এক হয়ে আছে। গাছপালায় ভর্তি—বার্লিনের তুলনায় সোঁদর বন।'

'হঠাৎ-নবাবই' বটে। না হলে জর্মনির আপন খাসা মের্ৎসেডেজ থাকতে রোল্‌স্ কিনবে কেন? ড্রাইভার ব্যাটাও উর্দি পরেছে মানওয়ারি জাহাজের এ্যাডমিরালের।

কিন্তু কর্তা-গিন্নীকে দেখে বড় ভালো লাগল। 'হঠাৎ-নবাব' হোক আর যাই হোক আমাকে এগিয়ে নেবার জন্য দেখি দেউড়ির কাছে লনে বসে আছেন। খাতির যত্নটা যা করলেন, আমি যেন কাইজারের বড় ব্যাটা। দু'জনাই ইয়া লাশ—কর্তা বিয়ার খেয়ে খেয়ে, গিন্নী হুইপট্ ক্রীম গিলে গিলে। কর্তার মাথায় বিপর্যয় টাক আর গিন্নীর পা দু'খানা ফাইলেরিয়ায় ফুলে গিয়ে আগাগোড়া কোল-বালিশের মত একাকার। দু'জনেই কথায় কথায় মুচকি হাসেন—ছোট্ট মুখ দু'খানা তখন চতুর্দিকে গাদা গাদা মাংসের সঙ্গে যেন হাতাহাতি করে কোনো

গতিকে আত্মপ্রকাশ করে, এবং সে এতই কম যে তার ভিতর দিয়ে দাঁতের দর্শন মেলে না।

জিরিয়ে জুরিয়ে নেওয়ার পর আমি বললুম, 'এইবার চলুন, আপনাদের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাক।' তখন কর্তা গিন্নীকে ঠেলেন, গিন্নী কর্তাকে। বুঝতে পারলুম ছেলের অসুখে তাঁরা এতই বিহ্বল হয়ে গিয়েছেন যে সামান্যতম কর্তব্যের সামনে দু'জনেই ঘাবড়ে যান—পাছে কোনো ভুল হয়ে যায়, পাছে তাতে করে ছেলের রোগ বেড়ে যায়।

যদি জানা না থাকত যে যক্ষ্মায় ভুগছে তাহলে আমি কার্লকে ওলিম্পিকের জন্য তৈরী হতে উপদেশ দিতুম। কী সুন্দর সুগঠিত দেহ—যেন গ্রীক ভাস্কর শাস্ত্র মিলিয়ে মেপেজুপে প্রত্যেকটি অঙ্গ নির্মাণ করেছেন, কোনো জায়গায় এতটুকু খুঁত ধরা পড়ে না আর সানবাথ নিয়ে নিয়ে গায়ের রঙটি আমাদের দেশের হেমন্তের পাকাধানের রঙ ধরেছে, চোখ দুটি আমাদেরি শরতের আকাশের মত গভীর আসমানি।

ঘরে আরেকটি প্রাণী উপস্থিত ছিল, নিতান্ত সাদামাটা চেহারা, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী—রোগীর নার্স। গিন্নী আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদেরি শহর স্টুটগার্টের মেয়ে, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কার্লের সেবার ভাবনা আমাদের এতটুকুও ভাবতে হয় না। আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

একে নিয়েই আমার অভিজ্ঞতা।'

লেডি-কিলার সরকার বলল, 'কিন্তু বললেন যে নিতান্ত সাদামাটা।'

রায় বললেন, 'চোপ।'

চাচা কোনো কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'অভিজ্ঞতাটা এমনি মর্মন্তুদ যে সেটা আমি চটপট বলে ফেলি। এ জিনিস ফেনিয়ে বলার নয়।

মেয়েটির নাম সিবিলা। প্রথম দর্শনে নার্সদের কায়দামাফিক গম্ভীর সরকারি চেহারা নিয়ে টেম্পারেচারের চার্টের দিকে এমনি ভাবে তাকিয়েছিল যেন চার্টখানা হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে যাবার চেষ্টা করলে সে সেটাকে খপ করে ধরে ফেলবে। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই টের পেলুম, সে কার্লকে যত না নিখুঁত সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তার চেয়ে ঢের বেশী প্রাণরস যোগাচ্ছে হাসিখুশী, গালগল্প দিয়ে। সাদামাটা চেহারা—কিন্তু সেটা যতক্ষণ সে অন্যের প্রতি উদাসীন ততক্ষণই—একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে চোখমুখ যেন নাচতে থাকে, ড্যাবডেবে পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যে-রকম ধারা হয়। কারো কথা শোনার সময়ও এমন ভাবে তাকায়, মনে হয় যেন চোখ দিয়ে কথা গিলছে। তার উপর গানের

ফোয়ারা তার ছিল অন্তহীন ;—গ্যোটে, হাইনে, ম্যোরিকে, রুকের্টের কথা, বেটোফেন, ব্রামস, শুমান, মেণ্ডেলজোনের সুর দিয়ে গড়া যে-সব গান সে কখনো কার্লের জন্য চেঁচিয়ে, কখনো আপন মনে গুনগুনিয়ে গেয়েছে তার অর্ধেক ভাণ্ডারও আমি অন্য কোনো এমেচারের গলায় শুনিনি।

কিন্তু কয়েক দিনের ভিতরেই লক্ষ্য করলুম, কথা বলার মাঝখানে সিবিলা আচমকা কেমন ধারা আনমনা হয়ে যায়, খানার টেবিলে হঠাৎ ছুরি কাঁটা রেখে দিয়ে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, আর প্রায়ই দেখি অবসর সময়ে রাইনের পারে একা একা বসে ভাবছে। দু-একবার নিতান্ত পাশ ঘেঁষে চলে গিয়েছি—সিবিলা কিন্তু দেখতে পায়নি। ভাবলুম নিশ্চয় প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কখন, আর কার সঙ্গে ?

এমন সময় একদিন গিন্নী আমায় খাঁটি খবরটা দিলেন। ভদ্রমহিলা নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হয়েই আমাকে সব কিছু বললেন, কারণ তাঁর স্বামী কার্লের অসুখের ব্যাপারে এমনি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে গিন্নী খবরটা তাঁর কাছে ভাঙতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

সিবিলা অন্তঃসত্ত্বা এবং অবিবাহিতা! পাঁচ মাস। আর বেশীদিন চলবে না। পাড়ায় কেলেঙ্কারি রটে যাবে।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয় নি। আমি গিন্নীকে বললুম, 'সিবিলা চলে গেলেই পারে।'

গিন্নী বললেন, 'যাবে কোথায়, খাবে কি ? এ-অবস্থায় চাকরি তো অসম্ভব, মাঝখান থেকে নার্সের সার্টিফিকেটটি যাবে।'

আমি বললুম, 'তা হলে কর্তাকে না জানিয়ে উপায় নেই।'

গিন্নীর আন্দাজ ভুল ; কর্তা খবরটা শুনে দু'হাত দিয়ে মাথার চুল ছেঁড়েন নি, রেগেমেগে চেল্লাচেল্লিও করেন নি। প্রথম ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন, "সিবিলার সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা না বলে উপায় নেই। কিন্তু আমি মনিব, সে কর্মচারী এবং ব্যাপারটা সঙ্গিন। আপনার মত কেউ যদি মধ্যস্থ থাকে তবে বড় উপকার হয়। অথচ জিনিসটা আপনার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হবে বলে আপনাকে অনুরোধ করতে সাহস পাচ্ছি না।'

আমি রাজী হলুম।

সিবিলা টেবিলের উপর মাথা রেখে অঝোরে কাঁদল। কর্তা-গিন্নী দু'জনই খাঁটি লোক, সিবিলাকে এ বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার করা যায় তার উপায় অনুসন্ধান করলেন অনেক কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হল না। তার কারণটাও আমি

বুঝতে পারলুম। এদিকে বিচক্ষণ সংসারী লোক পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা মাথায় কাবুতে আনার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে গ্যোটে-হাইনের স্নেহ-প্রেমের কবিতায় ভরা, অনুভূতির ভাপে ঠাসা জালে-পড়া সবৎসা সচকিতা হরিণী। ইনি বলছেন 'পা ছুড়ে ছুঁড়ে জাল ছেঁড়ো' ; ও বলছে 'ছোঁড়াছুঁড়ি করলে বাচ্চা হয়ত জখম হবে।' —ইনি জিজ্ঞেস করছেন, 'বাচ্চার বাপ কে ?' ও মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বোঝাচ্ছে, 'তাতে কোনো লাভ নেই, সে বিবাহিত ও অত্যন্ত গরীব।'

বুঝলুম, সিবিলার মনস্থির, সে মা হবেই।

কেঁদে কেঁদে টেবিলের একটা দিক ভিজিয়ে ফেলেছে।'

চাচা স্পর্শকাতর বাঙালী কাজেই তাঁর গলায় বেদনার আভাস পেয়ে আড্ডার কেউই আশ্চর্য হল না।

চাচা বললেন, 'দেশে আমার বোন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বাড়ি ফিরেছে। মা খুশী, বাবা খুশী। দু'দিন আগে নির্মম ভাবে যে-বোনের চুল ছিঁড়েছি তার জন্যে তখন কাঁচা পেয়ারার সন্ধানে সারা দুপুর পাড়া চষি। তার শরীরের বিশেষ যত্ন নেওয়ার কথা উঠলে সে মিষ্টি হাসে—কি রকম লজ্জা, খুশী আর গর্বে মেশানো। ছোট বোনরা কাঁথা সেলাই করে, আর বাবার বন্ধু বুড়ো কবরেজ মশায় দু'বেলা গলা খাঁকারি দিয়ে বাড়িতে ঢোকেন।

আর এ-মেয়েও তো মা হবে।

থাক সে-সব কথা। শেষটায় স্থির হল যে কিছুই স্থির করবার উপায় নেই। উপস্থিত সিবিলা কাজ করে যাক, যখন নিতান্তই অচল হয়ে পড়বে তখন তাকে নার্সিঙ-হোমে পাঠানো হবে। আমি পরে কর্তাকে বললুম, 'কিন্তু বাচ্চাটার কি গতি হবে সে কথাটা তো কিছু ভাবলেন না।' কর্তা বললেন, 'এখন ভেবে কোনো লাভ নেই। বিপদআপদ কাটুক, তখন বাচ্চার প্রতি সিবিলার কি মনোভাব সেইটে দেখে ব্যবস্থা করা যাবে।'

প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিবিলা কাজ করেছিল। কিন্তু শেষের দিকে তার গান-গাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার বোন এমনিতে গান গাইত না। সে শেষের দিকে গুন্ গুন্ করতে আরম্ভ করেছিল!

বাচ্চা হল। আহা, যেন একমুঠো জুঁই ফুল।

কিন্তু তখন আরম্ভ হল আসল বিপদ। বাচ্চাকে অনাথ আশ্রমে দিতে সিবিলা কিছুতেই রাজী হয় না। বলে, কোনো পরিবারে যেন সে আশ্রয় পায়। কিন্তু এরকম পরিবার পাওয়া যায় কোথায়? অনুসন্ধান করলে যে পাওয়া একেবারে অসম্ভব তা নয় কিন্তু জর্মনির সে দুর্দিনে, ইনফ্লেশনের গরমিতে মানুষের

বাৎসল্যরস শুকিয়ে গিয়েছে—আর তার চেয়েও বড় কথা, অতটা সময় আমাদের হাতে কই!

রোজ হয় ফোন, নয় চিঠি। নার্সিঙ-হোম্ বলে, সিবিলাকে নিয়ে যাও। এখানে বেড্ দখল করে সে শুধু আসন্ন-প্রসবাদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

এদিকে কর্তা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, পয়সা দিয়ে এজেন্সির লোককে লাগানো, আপন বন্ধুবান্ধবদের কাছে অনুসন্ধান কিছুই বাদ দেন নি। আমাকে পর্যন্ত দু'তিনবার কলন, ড্যুসেলডর্ফ হয়ে আসতে হল। নার্সিঙ-হোমের তাড়া খেয়ে কর্তার ভুঁড়ি গিয়ে আষ্টেক কমে গেল। কী মুশকিল!

সব কিছু জানতে পেয়ে তখন সিবিলাই এক আজব প্যাঁচ খেলে আমাদের দম ফেলার ফুর্সৎ করে দিল। নার্স তো বটে, এমনি এক বিদঘুটে ব্যামোর খাসা ভান করলে যে পাঠশালার মিটমিটে শয়তান আর হলিউডের ভ্যাম্পে মিললেও ফল এর চেয়ে ভালো ওতরাতো না। ক্নুট হামসুন বলেছেন, 'প্রেমে পড়লে বোকা বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে, বুদ্ধিমান বোকা হয়ে যায়'। সিবিলার মত ভিতরে বাইরে সাদামাটা মেয়ে বাচ্চার মঙ্গলের জন্য ফন্দিবাজ হয়ে উঠলো।

এমন সময় কর্তা—কারবারে যাকে বলে ভালো 'পার্টি'র খবর পেলেন। অগাধ পয়সা, সমাজে উঁচু, শিক্ষিত পরিবার কিন্তু আমাদের এজেন্ট বলল 'পার্টি'—অর্থাৎ ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী—কড়া শর্ত দিয়েছেন যে সিবিলা এবং আমাদের অন্য কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পাবে না, এবং কথা দিতে হবে যে জানবার চেষ্টা করবে না, যে কারা সিবিলার বাচ্চাকে গ্রহণ করলেন। এ শর্ত কিছু নূতন নয়, কারণ কল্পনা করা কিছু অসঙ্গত নয় যে সিবিলা যদি একদিন হঠাৎ তার বাচ্চাকে ফেরত চেয়ে বসে তখন নানা বিপত্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর কিছু না হোক বাচ্চাটা যদি জানতে পেরে যায় তার আসল মা কে তাহলেই তো উৎকট সঙ্কট।

কর্তার মত ব্যবসায়ের পাঁজে পোড়-খাওয়া ঝামাও এ-প্রস্তাব নিয়ে নার্সিঙ-হোমে যান নি। সব কিছু চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন। দু'দিন পরে উত্তর এল, সিবিলা রাজী।

মনস্থির করতে সিবিলার দু'দিন লেগেছিল। সে আটচল্লিশ ঘণ্টা তার কি করে কেটেছিল, জানি না। বাড়িতে আমরা তিনজন নিঃশব্দে লাঞ্চ-ডিনার খেয়েছি, একে অন্যে চোখাচোখি হলেই একসঙ্গে সিবিলার দ্বিতীয় প্রসব বেদনার কথা ভেবেছি। আইন মানুষকে এক পাপের জন্য সাজা দেয় একবার, সমাজ কতবার, কত বৎসর ধরে দেয় তার সন্ধান কোনো কেতাবে লেখা নেই, কোনো

বৃহস্পতিও জানেন না।

ট্রাঙ্ক কলে ট্রাঙ্ক কলে সব বন্দোবস্ত পাকাপাকি করা হল। কর্তা সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবেন। 'পার্টি'র ওয়েট নার্স (ধাই) বাচ্চার জন্য ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করবে। সিবিলা স্টুটগার্টের ট্রেন ধরলে পর কর্তা বাচ্চাটিকে সেই ধাইয়ের হাতে সঁপে দেবেন। 'পার্টি' কড়াক্কড় জানিয়েছেন, সিবিলা যেন ওয়েট নার্সকেও না দেখতে পায়।

যে দিন সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবার কথা সে-দিন দুপুর বেলা কার্লের গলা দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠল। ছ'মাস ধরে টেম্পারেচর, স্প্যুটাম কাবুতে এসে গিয়েছিল, এ-পি বন্ধ ছিল, তারপর হঠাৎ সাদা দাঁতের উপর কাঁচা রক্তের নিষ্ঠুর ঝিলিমিলি। আমরা তিনজনাই সামনে ছিলাম। কর্তারই কি একটা রসিকতায় হাসতে গিয়ে ব্যাপারটা ঘটল। ছেলের মন ভালো রাখবার জন্য ভদ্রলোক অনেক ভেবেচিন্তে রসিকতাখানা তৈরী করেছিলেন। অবস্থাটা বোঝো। আমি তাঁকে হাত ধরে নিজের ঘরে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করতে ছুটলুম।

আমাকে কর্তা গিন্নী এতদিন ধরে যে-আদর আপ্যায়ন করেছেন তার বদলে যদি সে-সন্ধ্যায় আমি কর্তার বদলে সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে না যেতুম তাহলে নিছক নিমক-হারামি হত। হার্ট নিয়ে কর্তা আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন। আমি নার্সিঙ-হোম যাচ্ছি শুনে আমার হাতে সিবিলার ছ'মাসের জমানো মাইনে দিলেন। গিন্নী নিজের থেকে আরো কিছু, আর আপন হাতে বোনা বাচ্চার জন্য একজোড়া মোজা দিলেন।

গোডেসবের্গ ছোট শহর। কিন্তু নার্সিঙ-হোম থেকে স্টেশন যেতে হলে দুটি বড় রাস্তার উপর দিয়ে যেতে হয়। আমি স্টিয়ারিঙে, সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে পিছনে। ইচ্ছে করেই ড্রাইভারকে সঙ্গে নিই নি, এবং ট্রেনটাও বাছা হয়েছে রাত্রের, যাতে করে খামকা বেশী জানাজানি না হয়। তার মাইনে তাকে দিয়েছি; মোজার মোড়ক যখন সে খুলল তখন আমি সে দিকে তাকাই নি।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি—ঝাঁকুনিতে কাঁচা বাচ্চার অনিষ্ট হয় কি না হয় তা তো জানিনে। থেকে থেকে সিবিলা আমার কাঁধের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি ঠিক জানেন যাঁদের বাড়িতে আমার বুবি যাচ্ছে তাঁরা ভালো লোক?' আমি আমার সাধ্যমত তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি আর ভাবছি কর্তা এলেই ভালো হত। তিনি সমস্ত জিনিসটা নিশ্চয়ই আরো গুছিয়ে করতে পারতেন।

সিবিলা একই প্রশ্ন বারে বারে শুধায়, তাঁরা লোক ভালো তো? আমি ভাবছি যদি শুধায় তাঁরা ভালো আমি কি করে জানলুম তা হলেই তো গেছি। আমার কেন কর্তারও তো সে-সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। কিন্তু যখন সিবিলা সে প্রশ্ন একবারও শুধালো না তখন বুঝতে পারলুম, তার কাছে অজানার অন্ধকার আধা-আলোর দ্বন্দ্বের চেয়ে অনেক বেশী কাম্য হয়ে উঠেছে। জেরা করলে যদি ধরা পড়ে যায়—যদি ধরা পড়ে যায় যে আমার উত্তরে রয়েছে শুধু ফাঁকি? তখন? তখন সে মুখ ফেরাবে কোন্ দিকে, কোথায় তার সান্ত্বনা?

সিবিলা বলল, 'গাড়ি থামান একটু দয়া করে। ঐ তো খেলনার দোকান। আমার বুবির তো কোনো খেলনা নেই।' তাই তো, কর্তা, আমি দু'জনেই এদিকে একদম খেয়াল করি নি। কিন্তু এক মাসের শিশু কি খেলনা বোঝে?

এক গাদা খেলনা নিয়ে সিবিলা গাড়িতে ঢুকল।

দশ পা যেতে না যেতেই সিবিলা বলল, 'ঐ তো জামা কাপড়ের দোকান। বুবির তো ভালো জামা নেই। গাড়ি থামান।' থামালুম। এবার বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে সে দোকানে ঢুকলো, জিনিস বয়ে আনতে অসুবিধে হতে পারে ভেবে আমিও সঙ্গে গেলুম।

দোকানি যেটা দেখায় সেটাই কেনে। কোনো বাছবিচার না, দাম জিজ্ঞেস করা না। দোকানি পর্যন্ত কেনার বহর দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'বুবির এখন বাড়ন্ত বয়স, জামাগুলো দু'দিনেই ছোট হয়ে যাবে না?'

বলে করলুম পাপ। সিবিলা বলল, 'ঠিক তো,' আর কিনতে আরম্ভ করল সব সাইজের জামা, পাতলুন, মোজা, টুপি। আমি হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষটায় বললুম, 'ফ্রলাইন সিবিলা, ট্রেনের বেশী দেরি নেই।' সিবিলা বলল, 'চলুন।'

আরো দশ পা। সিবিলা হুকুম করল, 'থামান।'

এবারে কি কিনল ভগবানই জানেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দোকানপাট একটা একটা করে বন্ধ হতে আরম্ভ করেছে। সিবিলা বলে, 'থামান,' সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গাড়ি থেকে নেবে পড়ে আর ছুটে গিয়ে দোকানিকে দরজা বন্ধ করতে বারণ করে। যে-দোকান দেখে বন্ধ হচ্ছে, ছুটে যায় সে-দোকানেরই দিকে। ছুটোছুটিতে চুল এলোথেলো হয়ে গিয়েছে, পাগলিনীর মত এদিক ওদিক তাকায়—সে একাই লড়বে সব দোকানির সঙ্গে। কেন? একদিনের তরে তারা দোকানগুলো দু'মিনিট বেশী খোলা রাখতে

পারে না? আমি বার বার অনুনয় করছি, 'ফ্রলাইন সিবিলা, বিট্টে বিট্টে, প্লীজ, প্লীজ, জায়েন জী ফেরনুনফ্টিষ্, এ কি করেছেন? গাড়ি ধরব কি করে?' সিবিলা কোনো কথায় কান দেয় না। আমার মাথায় কুবুদ্ধি চাপল, ভাবলুম একটু জোরজার করি। বললুম, 'এত সব জিনিসের কি প্রয়োজন?'

চকিতের জন্য সিবিলা বাঘিনীর ন্যায় রুখে দাঁড়াল। হুঙ্কার দিয়ে 'কী?' বলেই থেমে গেল। তারপর হঠাৎ ঝরঝর করে চোখের জল বেরিয়ে এল।'

চাচা বললেন, 'আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। খোদার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করলুম সিবিলার পরীক্ষা সহজ করে দেবার জন্য।'

তারপর আমি আর বাধা দিই নি। যায় যাক্ দুনিয়ার বেবাক ট্রেন মিস্ হয়ে। বিশ্বসংসার যদি তার জন্য আটকা পড়ে যায় তবে পড়ুক। আমি বাধা দেব না।

বোধ হয় টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। সিবিলা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কাছে আমার আর কোনো পাওনা আছে?' আমি বললুম, 'না, কিন্তু আপনার যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি দিতে পারি।' বলল, 'পাঁচটা মার্ক দিন, একখানা আ-বে-ৎসের বই কিনব।'

এক মাসের শিশু বই পড়বে।

গাড়ির পিছনটা জিনিসে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে আমার পাশে বসল। তার হাতের বেলুন উড়ে এসে আমার স্টিয়ারিঙে বাধা দিচ্ছে। সিবিলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

স্টেশনে যখন পৌঁছলুম তখন গাড়ি আসতে কয়েক মিনিট বাকি। গোডেস-বের্গ ছোট স্টেশন, ডাকগাড়ি দু'মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। আমি বাচ্চাটাকে নেবার জন্য হাত বাড়ালুম, কোনো কথা না বলে। সিবিলা বলল, 'প্ল্যাটফর্মে চলুন, গাড়ি ছাড়লে পর—'। আমি কোনো কথা না বলে এগিয়ে চললুম।

পোর্টারই দেখিয়ে দিল কোন্ জায়গায় দাঁড়ালে সেকেণ্ড ক্লাস ঠিক সামনে পড়বে। আমি সিবিলাকে আরো পঞ্চাশটি মার্ক দিলুম।

সিবিলা সিগনেলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের অন্ধকারের মাঝখানে তার দৃষ্টি ডুবে গিয়েছে। তার কোলে বুবি। ভগবানের জুঁই একরাতেই শুকিয়ে যায়, সিবিলার জুঁই যেন অক্ষয় জীবনের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘুমুচ্ছে।

সিবিলা আমার হাতে বাচ্চাকে তুলে দিল। এক মুহূর্তের তরে সব কিছু ভুলে গিয়ে বলল, 'আপনি তো বেশ বাচ্চা কোলে নিতে জানেন; আমাদের পুরুষরা তো পারে না।'

আমি আরাম বোধ করলুম। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পোর্টার সিবিলার সুটকেশ তুলে দিয়েছে।

হঠাৎ সিবিলা সেই পাথরের প্ল্যাটফর্মে হাঁটু গেড়ে আমার দু' হাঁটু জড়িয়ে হাহা করে কেঁদে উঠল। সে কান্নায় জল নেই, বাষ্প নেই। বিকৃত কণ্ঠে বলল—

'আমায় কথা দিন, ঈশ্বরের শপথ, কথা দিন আপনি বুবির খবর নেবেন সে ভালো আছে কি না। মা মেরির শপথ,—না, না, মা মেরির না—আপনার মায়ের শপথ, কথা দিন।'

আমি আমার মায়ের নামে শপথ করলুম। 'পার্টি' যা বলে বলুক, যা করে করুক।

পোর্টার হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। সিবিলাকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিল।

গাড়ির গায়ে চলার পূর্বের কাঁপন লেগেছে। এমন সময় আমার আর সিবিলার কাম্‌রার মাঝখান দিয়ে একটি মহিলা ধীরে সুস্থে ছোট্ট একটি ছেলের হাত ধরে ধরে চলে গেলেন। সিবিলা দোরে দাঁড়িয়েছিল, তাদের লক্ষ্য করল কি না বলতে পারি নে, হঠাৎ দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল।

আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

আমি বাধা দিলুম না।'

তীর্থহীনা

ভারতবর্ষের লোক এককালে লেখাপড়া শেখবার জন্য যেত কাশী তক্ষশিলা। মুসলমান আমলেও কাশী-মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি, ছাত্রের অভাবও হয় নি। তবে সঙ্গে সঙ্গে আরবী-ফারসী শিক্ষারও দুটি কেন্দ্র দেওবন্দ আর রামপুরে গড়ে উঠল। ইংরেজ আমলে সব ক'টাই নাকচ হয়ে গিয়ে শিক্ষা-দীক্ষার মক্কা-মদিনা হয়ে দাঁড়াল অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ। ভটচায-মৌলবী কোন্ দুঃখে কাশী-দেওবন্দ উপেক্ষা করে ছেলে—এমন কি মেয়েদেরও—বিলেত পাঠাতে আরম্ভ করলেন তার আলোচনা করে আজ আর লাভ নেই।

কিন্তু ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করল। 'অসহযোগী' ছাত্রদের কেউ কেউ বিলেতে না গিয়ে গেল বার্লিন। এদের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে শেষটায় ১৯২৯-এ এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যার উপর ভর করে একটা রেস্তোরাঁ চালান সম্ভবপর হয়ে উঠল। তাই বার্লিনে

'হিন্দুস্থান হৌসে'র পত্তন।

সেদিন 'হিন্দুস্থান হৌসে'র আড্ডা ভালো করে জমছিল না। কোত্থেকে এক পাদ্রীসায়েব এসে হাজির। খোদায় মালুম কে তাকে বলেছে, এখানে একগাদা হিদেন ঝামেলা লাগায়। প্রভু খ্রীষ্টের সুসমাচার শুনতে না শুনতেই এরা ঝাঁকে ঝাঁকে প্রভুর স্মরণ নেবে ও স্তবে বার্লিনিস্থানে পাদ্রীসায়েবের জয়জয়কার পড়ে যাবে। অবশ্যি তাঁর ভুল ভাঙতে খুব বেশী সময় লাগে নি। গোঁসাই সঙ্গীতরসজ্ঞ, আর এ-দুনিয়ার তাবৎ সঙ্গীতই গড়ে উঠেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। কাজেই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তিনি ধর্মবাবদে খানিকটা ওকিবহাল। বললেন, 'সায়েব, খ্রীষ্টধর্ম যে উত্তম ধর্ম তাতে আর কি সন্দেহ কিন্তু আমাদের কাছে তো শুধু এই ধর্মটাই ভোট চাইছে না, হিন্দু মুসলমান আরো দুটো ডাঙর কেণ্ডিডেট রয়েছে যে। গীতা পড়েছ?'

তখন দেখা গেল পাদ্রী কুরান পড়ে নি, গীতার নাম শোনে নি, আর ত্রিপিটক উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনবার হোঁচট খেল।

ঘণ্টাখানেক তর্কাতর্কি চলেছিল। ততক্ষণে ওয়েট্রেস পাশের একটা বড় টেবিলে আড্ডার ডাল-ভাত-চচ্চড়ি সাজিয়ে ফেলেছে। চাচা পাদ্রীকে দাওয়াত করলেন হিদেন্-খানা চেখে দেখতে। সায়েব বিজাতীয় আহারের দিকে একটি-বার নজর বুলিয়েই অনেক ধন্যবাদ দিয়ে কেটে পড়ল।

চাচা বললেন, 'দেখলি, অচেনা রান্না পরখ করে দেখবার কৌতুহল যার নেই সে যাবে অজানা ধর্মের সন্ধানে! গোঁসাই, তুমি বৃথাই শক্তিব্যয় করছিলে।'

সুষ্যি রায় মাস্টার্ড পেতলে নিয়ে কাসুন্দীর মত করে লুচির সঙ্গে খেতে খেতে বললেন, 'ব্যাটা গ্যোটেও পড়ে নি নিশ্চয়। গ্যোটে বলেছেন, 'যে বিদেশ যায় নি সে কখন স্বদেশের স্বরূপ চিনতে পায় নি। ধর্মের বেলাও তাই।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু অনেক কঠিন। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম, কিন্তু বিদেশে যাওয়ার জন্য স্থূল ট্রেন রয়েছে, স্থূলতর জাহাজ রয়েছে, আর টমাস কুক্‌রা তো আছেই। বিদেশে নিয়ে যাবার জন্য ওরাই সবচেয়ে বড় আড়কাঠি অর্থাৎ মিশনরি। আর এতই পাক্কা মিশনরি যে ওরা সক্কলের পকেটে হাত বুলিয়ে দু' পয়সা কামায়ও বটে। কিন্তু ধর্মের মিশনরিদের হ'ল সব চেয়ে বড় দেউলে প্রতিষ্ঠান।'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার বলল, 'কিন্তু কি দরকার বাওয়া এসব বখেড়ার? বার্লিন শহরটা তো ধর্ম বাদ দিয়েও দিব্যি চলছে।'

চাচা বললেন, 'বাদ দিতে চাইলেই তো আর বাদ দেওয়া যায় না। শোন।

আমি যখন রাইনল্যাণ্ডের গোডেস্‌বের্গ শহরে ছিলুম তখন ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে আমার অল্প অল্প পরিচয় হতে আরম্ভ হ'ল। না হয়ে উপায়ও নেই। বার্লিনের হৈ-হল্লোড় গির্জেগুলোকে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছে আর রাইনল্যাণ্ডের গির্জার সঙ্গীত তামাম দেশটাকে বন্যায় ভাসিয়ে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দু'য়েকটি তান—'

এ তো তাও নয়। এখানে সমস্ত দেশব্যাপী সঙ্গীতবন্যা আর তার মাঝখানে আমি ক্যাথলিক নই বলে শাখামৃগের মত একটা গাছের ডগায় আঁকড়ে ধরে বসে প্রাণ বাঁচাব এ ব্যবস্থা আমার কিছুতেই মনঃপূত হল না,—তার চাইতে বাউলের উপদেশই ভালো, 'যে জন ডুবলো সখী, তার কি আছে বাকি গো?'

সমস্ত সপ্তাহের অফুরন্ত কাজ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা, বার্লিনের লোক খানিকটে ঠাণ্ডা করে সারা রবির সকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। কিন্তু রাইনের জীবন বিলম্বিত একতালে। তাই রবির সকাল রাইনের দ্রষ্টব্য বস্তু।

কাচ্চা-বাচ্চারা চলেছে রঙ-বেরঙের জামা কাপড় পরে, কতকগুলো করছে কিচির-মিচির, কতকগুলো বা মা-বাপের কথামত গির্জার গাম্ভীর্য জোর করে মুখে মাখবার চেষ্টা করছে, মেয়েরা যেতে যেতে দোকানের শার্সীতে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে হ্যাটটা আধ ইঞ্চি এ-দিক ও-দিক করে নিচ্ছে, গ্রামভারী গাঁও-বুড়োরা রবিবারের নেভিব্লু স্যুট পরে চলেছেন গিন্নীদের সঙ্গে ধীরে মন্থরে, আর যে সব অথর্ব বুড়ো-বুড়ী সপ্তাহের ছ'দিন ঘরে বসে কাটান তাঁরা পর্যন্ত চলেছেন লাঠিতে ভর করে নাতি-নাত্নীদের সঙ্গে, অথবা হুইল-চেয়ারে বসে ছেলে-ভাইপোর মোলায়েম ঠেলা খেয়ে খেয়ে—বাচ্চারা যেরকম-ধারা পেরেম্বুলেটরে করে হাওয়া খেতে বেরোয়। জোয়ানদের ভিতর গির্জায় যায় অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু যারা যায় তাদের মুখে ফুটে উঠেছে প্রশান্ত ভাব—এরা গির্জার কাছ থেকে এখনো অনেক কিছু আশা করে, ধর্ম এখনো তাদের কাছে লোকাচার হয়ে যায় নি।

দোকান-পাট বন্ধ। রাস্তার কারবারি ভিড় নেই। শহর গ্রাম শান্ত, নিস্তব্ধ। তাই শোনা যাচ্ছে গির্জার ঘণ্টা—জনপদ, হাটবাট, তরুলতা, ঘরবাড়ি সবই যেন গির্জার চুড়ো থেকে ঢেলে-দেওয়া শান্তির বারিতে অভিষিক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

চাচা থামলেন। বোধ করি বার্লিনের কলরবের মাঝখানে রাইনের সে ছবির বর্ণনা তাঁর নিজের কাছেই অদ্ভুত শোনাল। খানিকটে ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু এহ বাহ্য। ক্যাথলিক ধর্ম ক্রিশ্চানের দৈনন্দিন জীবনে কতটুকু ঠাঁই পেয়েছে

জানিনে, কিন্তু গির্জার ভিতরে তার যে রূপ সে না দেখলে, না শুনলে বর্ণনা দিয়ে সে-জিনিস বোঝাবার উপায় নেই।

মানুষ তার হৃদয়, তার চিন্তাশক্তি, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার শোকনৈরাশ্য দিয়ে বিরাট ব্রহ্মকে আপন করে নিয়ে কত রূপে দেখেছে তার কি সীমা-সংখ্যা আছে? ইহুদিরা দেখেছে য়েহোভাকে তাঁর রুদ্ররূপে, পারসিক দেখেছে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বের প্রতীকরূপে, ইরানি সুফী তাঁকে দেখেছে প্রিয়ারূপে, মরমিয়া বৈষ্ণব তাঁকে দেখেছে কখনও কৃষ্ণরূপে কখনও রাধারূপে আর ক্যাথলিক তাঁকে দেখেছে মা-মেরির জননীরূপে।

তাই মা-মেরির দেবী-মূর্তি লক্ষ লক্ষ নরনারীর চোখের জল দিয়ে গড়া। আর্ত পিপাসার্ত বেদনাতুর হিয়া যখন পৃথিবীর কোনোখানে আর কোনো সান্ত্বনার সন্ধান পায় না, তখন তার শেষ ভরসা মা-মেরির শুভ্র কোল। যে মা-মেরি আপন দেহজাত সন্তান কণ্টকমুকুটশির যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় পলে পলে মরতে দেখলেন তাঁর চোখের সামনে, তিনি কি এই হতভাগ্য কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়বেদনা বুঝতে পারবেন না? নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তিনি আজ বসে আছেন দিব্য সিংহাসনে—তাঁর অদেয় কিছুই নেই, মানুষের অশ্রুবারি সপ্তসিন্ধু হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে হানা দিলেও তিনি সে-সপ্তসিন্ধু মুহূর্তের ভিতরেই করাঙ্গুলি নির্দেশে শুকিয়ে দিতে পারেন। তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ক্যাথলিক গির্জায় গির্জায়,

'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী। তুমি প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছ। রমণী জাতির মধ্যে তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার দেহজাত সন্তান যীশু। মহিমাময়ী মা-মেরি, এই পাপীতাপীদের তুমি দয়া কর, আর দয়া কর যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।'

কত হাজার বার শুনেছি আমি এই প্রার্থনা। এই 'আভে-মারিয়া' উপাসনা-মন্ত্র খ্রীষ্টবৈরী ইহুদী সম্প্রদায়ের মেণ্ডেল্‌সোনকে পর্যন্ত যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তারই ফলে মেণ্ডেল্‌সোন সুর দিয়েছেন মেরিমন্ত্রকে। ক্যাথলিকরা সেই সুরে মেরিমন্ত্র গেয়ে বিশ্বজননীকে আবাহন করে অষ্টকুলাচলশিরে, সপ্তসমুদ্রের পারে পারে।

কত লক্ষবার শুনেছি আমি এই প্রার্থনা। পুরুষের সবলকণ্ঠে, বৃদ্ধার অর্ধস্ফুট অনুনয়ে, শিশুর সরল উপাসনায় মিলে গিয়ে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় সে মন্ত্র তখন আর শুধু ক্যাথলিকদের নিজস্ব প্রার্থনা নয়, সে প্রার্থনায় সাড়া দেয় সর্ব আস্তিক, সর্ব নাস্তিক।

হঠাৎ মন্ত্রোচ্চারণ ছাপিয়ে সমস্ত গির্জা ভরে ওঠে যন্ত্রধ্বনিতে। বিরাট অর্গান

সুরের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে গির্জার শেষ কোণ, ভিজিয়ে দিয়েছে পাপীর শুষ্কতম হৃদয়। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে উপরের দিকে সে-গম্ভীর যন্ত্ররব, আর তার সঙ্গে গেয়ে ওঠে সমস্ত গির্জা সম্মিলিত কণ্ঠে,

'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী।'

সেই উর্ধ্বদিকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত সঙ্গীতের প্রতীক উর্ধ্বশির ক্যাথলিক গির্জা। মানুষের যে-প্রার্থনা যে-বন্দনা অহরহ মা-মেরির শুভ্রকোলের সন্ধানে উর্ধ্বপানে ধায় তারই প্রতীক হয়ে গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে উর্ধ্বদিকে। লক্ষ লক্ষ গির্জার লক্ষ লক্ষ শিখর মা-মেরির দিব্যসিংহাসনের পার্থিব স্তম্ভ।'

চাচা চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবলেন। তার পর চোখ মেলে গোঁসাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গোঁসাই, রবিঠাকুরের সেই গানটা গাও তো,

'বরিষ ধরার মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
উর্ধ্বমুখে নরনারী'।'

গোঁসাই গুন্‌গুন্ করে গান গাইলেন। গাওয়া শেষ হলে চাচা বললেন, "গির্জার ক্যাথলিক ধর্মসঙ্গীত তোমরাও শুনেছ কিন্তু তার করুণ দিকটা কখন লক্ষ্য করেছ কি না জানিনে।

একদিন যখন আমি এই 'আভে মারিয়া' সঙ্গীতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চিলের মত উপরের দিকে উঠে যাচ্ছি—বাহ্যজ্ঞান প্রায় নেই—তখন হঠাৎ শুনি আমার পাশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। চেয়ে দেখি একটি মেয়ে চোখের জলে প্রেয়ার-বুক্ রাখার হাইবেঞ্চ আর তার পায়ের কাছে খানিকটে জায়গা ভিজিয়ে দিয়েছে। অর্গান আর পাঁচশ' গলার তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েটি আপন কান্না কেঁদে নিচ্ছে।

পূব-বাঙ্গলার ভাটিয়ালি গানে আছে রাধা ভেজাকাঠ জ্বালিয়ে ধুঁয়ো বানিয়ে কৃষ্ণ-বিরহের কান্না কাঁদতেন। শাশুড়ী ননদী জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ধুঁয়ো চোখে ঢুকেছে বলে চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। শুনেছি বাঙ্গালী মেয়েও নাকি নির্জনে কাঁদবার ঠাঁই না পেলে স্নানের ঘরে কল ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গে হাউ হাউ করে কাঁদে।

গির্জায় মেয়েটির কান্না দেখে আমি জীবনে প্রথম বুঝতে পারলুম, রাধার কান্না, বাঙ্গালী মেয়ের কান্না কত নিরন্ধ্র অসহায়তা থেকে ফেটে বেরোয়।

তখন বুঝতে পারলুম, গির্জা থেকে বেরবার সময় যে অনেক সময় দেখেছি এখানে ওখানে জলের পোঁচ সে ছাতার জল নয়, মেঝে ধোওয়ার জলও নয়, সে জল চোখের জল।

কুরান শরীফে আছে কুমারী মরীয়ম (মেরি) যখন গর্ভযন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন তখন লোকচক্ষুর অগোচরে গিয়ে খেজুর গাছ জড়িয়ে ধরে তিনি লজ্জায় দুঃখে আর্তনাদ করেছিলেন, 'ইয়া লায়তানি, মিত্তু কবলা হাজা—হায়, এর আগে আমি মরে গেলুম না কেন? মানুষের চোখের থেকে মন থেকে তাহলে আমি নিস্তার পেতুম।'

লোকচক্ষুর অগোচরে যাবারও যাদের স্থান নেই তাদের জন্য ভিজে কাঠের ধুঁয়ো আর স্নানের ঘরের কল খুলে দেওয়া।

তাই সর্ব অসহায় সর্ব বিপন্না নরনারীর চোখের জল মুক্তার হার হয়ে দুলছে মা-মেরির গলায়, তারই নাম 'আভে মারিয়া' মন্ত্র—'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী'।'

গোঁসাই ভাল কীর্তন গাইতে পারেন; সহজেই কাতর হয়ে পড়েন। বললেন, 'চাচা, আর না।'

চাচা বললেন, 'মেয়েটিকে চিনতে পারলুম। কার্লকে এক্‌স্‌রে করাতে গিয়ে ডাক্তারের ওয়েটিং-রুমে মেয়েটির মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রমহিলা মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন একই উদ্দেশ্যে। এরও যক্ষ্মা। তবে কি নিরাময় হবার জন্য কাঁদছিল? কে জানে?'

চাচা বললেন, 'তারপর এক মাস হয়ে গিয়েছে, এমন সময় নাস্তিক উইলির সঙ্গে রাস্তায় দেখা। আমার গির্জা যাওয়া নিয়ে সে হামেশাই হাসি-মস্করা করত, কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মের মূল তত্ত্ব তার অজানা ছিল না। উইলি 'মুক্তপুরুষ' কিন্তু আর পাঁচজনের জন্য যে ধর্মের প্রয়োজন সে কথা সে মানত। আমায় জিজ্ঞেস করল আমি য়ুডাস টাডেয়াসের তীর্থে যাবার সময় তার মাসীমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব কি না? আমি শুধালুম য়ুডাস টাডেয়াস তীর্থ সাপ না ব্যাঙ তার কোনো খবরই যখন আমার জানা নেই তখন সে তীর্থে আমার যাবার কোনো কথাই ওঠে না। শুনে উইলি যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'সে কি হে, টাডেয়াস তীর্থের নাম শোনো নি আর ক্যাথলিকদের সঙ্গে তোমার দহরম-মহরম।'

তারপর উইলি আমায় সালঙ্কারে বুঝিয়ে দিল, রাইন-নদীর ওপারে হাইস্টার-বাখার রোট। সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে টাডেয়াস তীর্থ। সে তীর্থের দেবতা বল, পীর বল, বড়কর্তা হচ্ছেন সেণ্ট য়ুডাস টাডেয়াস। বড় জাগ্রত পীর। ভক্তিভরে ডাকলে পরীক্ষা তো নিশ্চিত পাস হবে, যথেষ্ট ভক্তি থাকলে জলপানিও পেতে পার। আর যদি মেয়েছেলে ঠাকুরকে ডাকে তবে সে নির্ঘাত বর পাবে—

আশী বছরের বুড়ীর পক্ষে বাইশ বছরের বর পাওয়াও নাকি ঠাকুরের কৃপায় সসিজ্-বিয়ার (অর্থাৎ ডালভাত)।

বুঝলুম ঠাকুর খাসা বন্দোবস্ত করেছেন। নদীর এ-পারের বন্ন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোকরারা যাবে তাঁর কাছে পরীক্ষা পাসের লোভে, মেয়েরা যাবে বরের লোভে —দু'দলে তীর্থে দেখা হবে। তার পর কন্দর্প ঠাকুর তো রয়েছেনই টাডেয়াস্ ঠাকুরের সহকর্মী হয়ে স্বর্গের একসিকিউটিভ কমিটিতে। অর্থাৎ এ তীর্থে যে মেয়ে পশ্চাৎপদ নয় তার কপালে সপ্তপদী আছেই আছে।

উইলি পইপই করে বুঝিয়ে দিল, তীর্থ না করে ক্যাথলিক ধর্মের মূলতত্ত্বে কেউ কখনো প্রবেশ করতে পারেনি—উইলির নিজস্ব ভাষায় বলতে গেলে, ক্যাথলিক ধর্ম যে কতটা কুসংস্কারে নিমজ্জিত তা তীর্থে না গিয়ে বোঝা যায় না। যীশুর ক্রস নিয়ে মাতামাতি, পোপকে বাবাঠাকুর বলে কলুর বলদের মত ঠুলি পরে তাঁর চতুর্দিকে ঘোরা তীর্থযাত্রার কুসংস্কারের কাছে নস্যি।

তাহলে তো যেতে হয়।

পাড়ার পাদ্রীসায়েবকে যখন আমার সুমতির খবর দিলুম তখন তিনি কিছু-মাত্র আশ্চর্য হলেন না। মনে হল, আমার যখন ধর্মে এত অচলা ভক্তি তখন যে আমি জব্বর পরবটাতে গরহাজির থাকব না তা তিনি আগের থেকেই ধরে নিয়ে-ছিলেন।

গোডেসবের্গ থেকে আমরা জন তিরিশেক দল বেঁধে পাদ্রীসায়েবের নেতৃত্বে ট্রাম ধরে বন্ন্ পৌঁছলুম। বেরবার সময় কার্লের মা আমার হাতে তুলে দিলেন প্রেয়ার-বুক্ বা উপাসনা-পুস্তিকা আর এক গাছা রোজারি বা জপ-মালা। বন্ন্ পৌঁছে দেখি সেখানেই তীর্থের ঝামেলা লেগে গিয়েছে। এক গোডেসবের্গেরই বিস্তর চেনা-অচেনা লোককে দেখতে পেলুম। এক আশী বছরের বুড়ীকে দেখে আমি ভয়ে আঁতকে উঠলুম—আমার বয়স তখন বাইশ। হয়ত উইলি ভুল বলে নি। পালাই পালাই করছি এমন সময় পাদ্রীসায়েব আমাকে জোর করে বসিয়ে দিলেন সেই যক্ষ্মারোগিণী আর তার মায়ের কাছে। মেয়েটির সঙ্গে আলাপও হল—ভুল বললুম, পরিচয় হল, কারণ সামান্যতম সৌজন্যের মৃদুহাস্য বা অভ্যর্থনা পর্যন্ত সে করল না।

উইলির মাসী ইতিমধ্যে না-পাত্তা। খবর নিয়ে শুনলুম, পীরের দর্গায় জ্বালাবার জন্য মোমবাতি কিনতে গিয়েছেন। সে কি কথা? বিলিতী পীরের খাসা ইলিকটিরি রয়েছে, মোমবাতির কি প্রয়োজন? আমাদের না হয় সাপের দেশ, বিজলি-বাতিও নেই—পিদিম মশাল না হ'লে পীরের অসুবিধা হয়। উইলি

ঠিকই বলেছে, ধর্ম মাত্রই মোমবাতির আধা-আলোয় কুসংস্কারে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পছন্দ করে, বিজলির কড়া আলোতে আত্মপ্রকাশ করতে চায় না।

মাসীর আবার কড়া নজর। মোমবাতি কেনার ঠেলাঠেলিতেও আমার উপর চোখ রেখেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, গ্রেটের সঙ্গে কি করে পরিচয় হল। তার পর মাসী যা বললেন তার থেকে গ্রেটের কান্নার অর্থ পরিষ্কার হল। গোসাঁইয়ের পদাবলীতে খণ্ডিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, বিপ্রলব্ধা নামের নানা নায়িকার পরিচয় আছে, এ বেচারী তার একটাতেও পড়ে না। এ মেয়ে বালবিধবার চেয়েও হত-ভাগিনী, এর বল্লভ হঠাৎ এক দিন উধাও হয়ে যায়। পরে খবর পাওয়া গেল পয়সার লোভে অন্যত্র বিয়ে করার জন্য গ্রেটেকে সে বর্জন করেছে। বালবিধবার অন্তত এটুকু সান্ত্বনা থাকে, তার প্রেম অবমানিত হয়নি।

মাসী বললেন, 'কিন্তু আশ্চর্য, পুরো দু'বৎসর আমরা কেউ বুঝতে পারিনি গ্রেটের প্রাণে কতটা বেজেছে। মেয়েটা চিরকালই হাসি-তামাশা করে সময় কাটাত—দু'বছর তাতে কোনো হেরফের হ'ল না। তারপর হ'ল যক্ষ্মা। তখন বোঝা গেল, যে-আপেলের ভিতরে পোকা সে আপেলটারই বাইরের রঙের বাহার বেশী।'

চাচা বললেন, 'আমি বাঙাল দেশের লোক। যা-তা নদী আমার চোখে চটক লাগাতে পারে না। তবু স্বীকার করি, রাইন নদী কিছু ফেলনা নয়। দু'দিকে পাহাড়, আর মাঝখান দিয়ে রাইন সুন্দরী নেচে নেচে চলে যাবার সময় দু'পাড়ে যেন দু'খানা সবুজ শাড়ি শুকোবার জন্য বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। সে শাড়ি দু'-খানা আবার খাঁটি বেনারসী। হেথায় লাল ফুলের কেয়ারী হোথায় নীল সরো-বরের ঝলমলানি, যেন পাকা হাতের জরির কাজ।

আর সেই শাড়ির উপর দিয়ে আমাদের ট্রাম যেন দুষ্টু ছেলেটার মত কারো মানা না শুনে ছুটে চলেছে। মেঘলা দিনের আলোছায়া সবুজ শাড়িতে সাদা-কালোর আল্পনা এঁকে দিচ্ছে আর তার ভিতর চাঁপা রঙের ট্রামের আসা-যাওয়া —সমস্ত ব্যাপারটা যেন বাস্তব বলে মনে হয় না; মনে হয় হঠাৎ কখন রাইন সুন্দরীর ধমকে দুষ্টু ছেলেগুলো পালাবে, আর সুন্দরী তাঁর শাড়িখানা গুটিয়ে নিয়ে সবুজের লীলাখেলা ঘুচিয়ে দেবেন।

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ হলুম মোকামে পৌঁছে, ট্রাম থেকে নেমে সেখানে রাইনের দিকে তাকিয়ে। দেখি রাইনের বুকের উপর ফুটে উঠেছে দুটি ছোট ছোট পল্লব-ঘন দ্বীপ। তার পেলব সৌন্দর্য আমায় মনে যে তুলনাটি এনে দিল, নিতান্ত বেরসিকের মনেও সেই তুলনাটাই আসত। তাই সেটা আর বলছি না—সর্বজন-

গ্রাহ্য তুলনা রসিয়ে বলতে পারেন যিনি যথার্থ গুণী—শিপ্রাবল্লভ কালিদাস এ রকম একজোড়া দ্বীপ দেখতে পেলে মেঘদূতকে আর অলকায় পাঠাতেন না, এইখানেই শেষবর্ষণ করতে উপদেশ দিতেন।'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সূর্য্যি রায়ের ধমক খেয়ে চুপ করে গেল।

চাচা বললেন, 'হাইস্টারবাথার রোট থেকে টাডেয়াস্ তীর্থ আধ মাইল দূরে। এই পথটুকু নির্মাণ করা হয়েছে জেরুজালেমের 'ভিয়া ডলোরেসা' বা 'বেদনা-পথের' অনুকরণে। খ্রীষ্টের প্রাণদণ্ডের আদেশ জেরুজালেমের যে-ঘরে হয় সেথান থেকে তাঁর কাঁধে ভারি ক্রস চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাঁকে ক্রসের সঙ্গে পেরেক পুঁতে মারা হয়। এ পথটুকুর নাম 'ভিয়া ডলোরেসা'। ক্যাথলিক মাত্রেরই আশা, জীবনে যেন অন্তত একবার সে ঐ পথ বেয়ে ক্রুসভূমিতে উপস্থিত হতে পারে—যেখানে প্রভু যীশু সর্বযুগের বিশ্বমানবের সর্বপাপ স্কন্ধে নিয়ে কণ্টক-মুকুটশিরে আপন রক্তমোক্ষণ নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

কিন্তু জেরুজালেম যাওয়ার সৌভাগ্য বেশী ক্যাথলিকের হবে না বলেই তার অনুকরণে ক্যাথলিক জগতের সর্বত্র 'বেদনা-পথ' বানানো হয়। জেরুজালেমে এ পথের যেখানে শুরু তাকে বলা হয় প্রথম স্টেশন (পুণ্যভূমি) আর ক্রুসভূমিতে চতুর্দশ স্টেশন। এখানে তারই অনুকরণে চৌদ্দটি স্টেশনের প্রথমটি হাইস্টার-বাথার রোটের কাছে আর শেষটি টাডেয়াস্ তীর্থের গির্জার ভিতরে।'

চাচা বললেন, 'হাইস্টারবাথার রোটে সেদিন রাইনল্যাণ্ডের বহু দূরের জায়গা থেকে বিস্তর লোক এসে জড় হয়েছে, এখান থেকে পায়ে হেঁটে টাডেয়াস্ তীর্থে যাবে বলে। ছোট রেস্তোরাঁখানাতে বসবার জায়গা নেই দেখে আমি গাছ-তলায় বসে পড়েছি—গ্রেটে আর তার মা কোনো গতিকে দুটো চেয়ার পেয়ে বেঁচে গেছেন। হঠাৎ দেখি আমাদের পাদ্রীসায়েব গোডেসবের্গের যাত্রীদলের তদারক করতে করতে আমার কাছে এসে হাজির। ভদ্রলোক একটু নার্ভাস টাইপের—অর্থাৎ সমস্তক্ষণ হন্তদন্ত, কিছু একটা উনিশ-বিশ হলেই কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে যায়।

ধপ করে আমার পাশে বসে পড়লেন। আমি খানিকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করলুম, 'এই দুর্বল শরীর নিয়ে গ্রেটের তীর্থযাত্রায় বেরনো কি ঠিক হল?'

পাদ্রীসায়েবের মাথায় ঘাম দেখা দিল। রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, 'জানেন মা-মেরি; গ্রেটের মায়ের শেষ আশা যদি টাডেয়াসের দয়া হয় আর তার বর জোটে। ঐ তো একমাত্র পন্থা পুরোনো প্রেম ভোলবার। তা না হলে ও

মেয়ে তো বাঁচবে না।' পাদ্রীসায়েব চোখ বন্ধ করে মা-মেরির স্মরণে উপাসনা করলেন, 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী'!

জিরিয়েজুরিয়ে আমরাও শেষটায় রওয়ানা দিলুম তীর্থের দিকে। লম্বা লাইন—সক্কলের হাতে উপাসনাপুস্তিকা আর জপমালা। পাদ্রীসায়েব চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী' আর যাত্রীদল বারবার ঘুরে ফিরে সেই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে সর্বশেষে ভক্তিভরে বলে,

'এই পাপীতাপীদের দয়া কর, আর দয়া কর যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিক ঘনিয়ে আসবে।'

তারপর আমরা এক একটা করে সেই সব স্টেশন (পুণ্যভূমি) পেরতে লাগলুম। কোনটাতে পাদ্রীসায়েব চেঁচিয়ে বলেন, 'হে প্রভু, এখানে এসে ক্রসের ভার সইতে না পেরে তুমি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলে,' আর সমস্ত তীর্থযাত্রী করুণ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'হে প্রভু, তোমার লুটিয়ে পড়াতেই আমাদের পরিত্রাণ হল।' কোনো পুণ্যভূমির সামনে পাদ্রীসায়েব বলেন, 'এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হল তোমার জননী মা-মেরির। দূর থেকে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছেন তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ। এবার তিনি তোমার কাছে আসতে পেরেছেন কিন্তু কথা কইবার অনুমতি পাননি। তোমার দিকে তিনি তাকালেন—সে তাকানোতে কী পুঞ্জীভূত বেদনা কী নিদারুণ আতুরতা!' যাত্রীদল এককণ্ঠে বলে উঠল, 'মৃত্যুর চেয়েও ভালবাসা অসীম শক্তির আধার—স্টার্ক্ বী ডের টোট্ ইস্ট্ ডী লীবে।' কোনো পুণ্যভূমিতে পাদ্রীসায়েব বলেন, 'এখানে তাপসী ভেরোনিকা তাঁকে বস্ত্রখণ্ড এগিয়ে দিলেন, যীশু মুখ মুছলেন, আর কাপড়ে তাঁর মুখের ছবি ফুটে উঠল।' যাত্রীদল বলে, 'আমাদের হৃদয়ের উপর, হে প্রভু, তুমি সেই রকম ছবি এঁকে দাও।'

যাত্রীদল ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে আর প্রতি পুণ্যভূমির সামনে সবাই হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করে। পাদ্রীসায়েব পুণ্যভূমির স্মরণে চিৎকার করে তার বর্ণনা পড়েন, যাত্রীদল নম্রকণ্ঠে সেই ঘটনাকে প্রতীক করে প্রাণের ভিতর তার গভীর অর্থ ভরে নেবার চেষ্টা করে।

বনের ভিতর ঢুকলাম। দু'দিকে উঁচু পাইন গাছ ঠায় দাঁড়িয়ে। আমরা যেন মহাভাগ্যবান নাগরিকদল চলেছি রাজরাজেন্দ্র দর্শনে, আর এরা হতভাগ্যের দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পল্লব দুলিয়ে কপালে করাঘাত করছে, না এরা চামরব্যজন করে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে? প্রার্থনার মৃদু গুঞ্জরণ মিশে গিয়েছে পাইন পল্লবের মর্মরের সঙ্গে আর জমে-ওঠা শুকনো পাইন পাতার গন্ধ মিশে গিয়েছে

যাত্রীদলের হাতের ধূপাধারের গন্ধের সঙ্গে।

খ্রীষ্ট আর মা-মেরির বেদনাকে কেন্দ্র করে এই যাত্রীদল, বিশ্বসংসারের তাবৎ ক্যাথলিক আপন দুঃখ-কষ্টের সান্ত্বনা খোঁজে, দুর্বলতার আশ্রয় খোঁজে, আপন নির্ভরের সন্ধান করে। রাধার বিরহবেদনায় বৈষ্ণব সাধু ভগবানকে না-পাওয়ার হাহাকার শুনতে পায়; সুফী সাধকের কান্নার গানও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে প্রিয়াবিরহের বেদনাকে কেন্দ্র করে।'

চাচা বললেন, 'গ্রেটের দিকে আমি মাত্র একবার তাকিয়েছিলুম অতি কষ্টে, সাহস সঞ্চয় করে। দেখি, সে চোখ বন্ধ করে মন্ত্রমুগ্ধের মত চলেছে, তার মা তার হাত ধরে তাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তার দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে।'

চাচা বললেন, 'আমার ভক্তি কম। তাই বোধ হয় আড়নয়নে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছিলুম দুপুর বেলাকার সাদা মেঘ অপরাহ্ণের শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন কালো কালো ওভার-কোট পরতে আরম্ভ করেছে। দশম কি একাদশ পুণ্য-ভূমির সামনে হঠাৎ জোর হাওয়া বইতে আরম্ভ করল আর সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি—জর্মনে যাকে বলে 'বল্কেনব্রুখ' অর্থাৎ মেঘ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। ছাতা-বরসাতী অল্প লোকেই সঙ্গে এনেছিল—এবার প্রাণ যায় আর কি? ভাগ্যিস সেখান থেকেই তীর্থযাত্রীদের জন্য যে-সব রেস্তোরাঁ তার প্রথমটা অতি কাছে পড়েছিল। তবু রেস্তোরাঁতে গিয়ে যখন ঢুকলুম তখন আমাদের অধিকাংশই জবুথবু। পাদ্রীসায়েব গ্রেটেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন দু'খানা বরসাতী দিয়ে। তার মা ছাতা ধরেছিলেন আর পাদ্রীসায়েব গ্রেটেকে বুকের ভিতরে যেন গুঁজে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন। পাদ্রীদের শরীর তাগড়া—যীশুখ্রীষ্টের এত বড় গির্জা যখন তাঁদের কাঁধের উপর থেকে পড়ে ভেঙে যায়নি তখন গ্রেটে তো তার কাছে চরকাকাটা বুড়ীর সুতো।

'রথ দেখা আর কলা-বেচা' না কচু। তাতে হয় ধর্ম আর অর্থ। কিন্তু যদি বলা হত 'রথ দেখা আর প্রিয়ার কণ্ঠালিঙ্গন' তাহলে হয় ধর্ম আর কাম, আর তাতেই আছে আসল মোক্ষ। রেস্তোরাঁয় ঢুকে তত্ত্বটা মালুম হল।

রেস্তোরাঁ এতই বিশাল যে সেটাকে নৃত্যশালা বলাই উচিত। দেখি শ'-খানেক ছোঁড়াছুঁড়ি, বুড়োবুড়ী ধেই ধেই করে নাচছে, বিয়ারের ফোয়ারা বইছে আর শ্যাম্পেনে শ্যাম্পেনে ছয়লাপ। আর সবাই তখন এমনই মৌজে যে আমাদের দল ভিজে কাকের মত ঢুকতেই চিৎকার করে সবাই অভিনন্দন জানাল। ধাক্কা-ধাক্কি ঠাসাঠাসি করে আমাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া হল, গায়ে পড়ে আমাদের জন্য পানীয় কেনা হল, আহা, আমরা যেন সব লঙ লস্‌ট ব্রাদার্স—

বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরিয়ে-পাওয়া ভাই।

এতে চটবার কি আছে, বল? ধর্মকর্ম করতে গেলেই যে মুখ গুমশো করে সব কিছু করতে হবে সে কথা লেখে ধর্মবিধির কোন্ ধারায়? এমন কি আদালতেও দেখোনি যেখানে খুনের মোকদ্দমা হচ্ছে সেখানেও জজ-ব্যারিস্টাররা ঠাট্টামস্করা করেন।

গ্রেটের মা, গ্রেটে, পাদ্রীসায়েব আর আমি একখানা টেবিল পেয়ে গেলুম জানালার কাছে। বাইরে তখন বৃষ্টি আর ঝড়, আর জানালার খড়খড়ানি থেকে বুঝতে পারছি ঝড় বেড়েই যাচ্ছে, বিদ্যুতের আলোতে দেখলুম রাস্তা জনমানবহীন, এক হাঁটু জল জমে গিয়েছে।

তাতে কার কি এসে যায়। গান ফূর্তি তো চলছে। 'ট্রিঙ্ক, ট্রিঙ্ক, ট্রিঙ্ক ব্র্যাডারলাইন—পিয়ো, পিয়ো বঁধুয়া, পিয়ো আরবার' শতকণ্ঠে গান উঠছে, পিয়ো পিয়ো বঁধুয়া। এরা সব গান গাইতে পারে ভালো,—গির্জেয় এদের ধর্মসঙ্গীত গাওয়ার অভ্যাস আছে। যে শিবলিঙ পূজোর জন্য দেবতা হন তাঁকে দিয়ে মশারির পেরেক ঠুকলে তিনি কি আর গোসা করে বাড়িঘরদোর পুড়িয়ে দেন? রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, আমাদেরই বাগানের ফুল 'কেহ দেয় দেবতারে, কেহ প্রিয়জনে।' দু'জনকে দিতেও তিনি আপত্তি করতেন না নিশ্চয়ই।

পাদ্রীসায়েব আমাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যেতে লাগলেন। আমাদের তিনমাসের পরিচয়ের মধ্যে একদিন একবারের তরেও তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল দেখাননি। আজ এই শরাব-খানায় হঠাৎ যে কেন তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা বেড়ে গেল বুঝতে পারলুম। দরদী মানুষ; গ্রেটের মন ভোলাবার জন্য সব কিছু করতেই রাজী আছেন। আমিও কলকাতাতে যে হাতী-ট্যাক্সি পাওয়া যায় এবং তার ভাড়া দিতে হয় হাতীকে কলা খাইয়ে, সে-কথা বলতে ভুললুম না। বোধ করি গ্রেটেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার সম্মান রাখার জন্য দু'একবার হেসেছিল। একবার আমায় জিজ্ঞেসও করল আমি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কি কি পড়েছি? আমি অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলুম সে কিছু পড়েছে কিনা। ততক্ষণে তার মন আবার অন্য কোন দিকে চলে গিয়েছে। দু'বার জিজ্ঞেস করার পর শুধু বলল 'হুঁ'। বুঝলুম হতভাগিনী শান্তির সন্ধানে অনেক দুয়ারেই মাথা কুটেছে।

সেখানেই ডিনার খাওয়া হল। এ জলঝড়ে তীর্থ মাথায় থাকুন, বাড়ি ফেরার কথাই কেউ তুললো না। শেষ ট্রাম ছাড়ে দশটায়। রাত তখন এগারোটা।

হঠাৎ গ্রেটে পাদ্রীসায়েবকে শুধাল, 'ক'টা বেজেছে?'

পাদ্রীসায়েব একেই নার্ভাস লোক তার উপর এই জলঝড়ে তাঁর সব কিছু ঘুলিয়ে গিয়েছিল। দশ মিনিট পর পর জানালা দিয়ে দেখছিলেন বৃষ্টি কমবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা—আমি প্রতিবারেই ভেবেছি তীর্থযাত্রীর শেষরক্ষা করার জন্য সায়েবের এই ছটফটানি।

গ্রেটের প্রশ্ন শুনে তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে দরজা খুলে সেই ঝড়ের মাঝখানে বেরিয়ে পড়লেন। আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের আলোকে দেখলুম, বাতাসের ঠেলায় পাইন গাছগুলো কাত হয়ে এ ওর গায়ে মাথা কুটছে, আর পাদ্রীসায়েব কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে কোনো অজানার সন্ধানে চলেছেন।

আমি ফের টেবিলে এসে বসলুম। মা মেয়ে দু'জনই চুপ। আমার মুখ দিয়েও কোনো কথা বেরুচ্ছিল না।

এ ভাবে কতক্ষণ কাটল জানিনে। ঘণ্টা খানেক হতে পারে—অল্পবিস্তর এদিক ওদিক। পাদ্রীসায়েব ফিরে এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ের একটি লোম পর্যন্ত শুকনো নয়। বললেন, 'জলঝড়ের জন্য কাউকে খুঁজে পেলুম না, গির্জে বন্ধ করে সবাই চলে গিয়েছে। আর এ জলে তুমি যেতেই বা কি করে?'

পাদ্রীসায়েব আরো কি যেন বলছিলেন, টাডেয়াসকে সব জায়গা থেকেই স্মরণ করা যায়, তিনি অন্তর্যামী এরকম ধারা কিছু, কিন্তু তাঁর কথার মাঝখানে হঠাৎ গ্রেটে উঠে দাঁড়াল। জলঝড়ের ভিতর দিয়েও শব্দ এল গির্জার বারোটার ঘণ্টা। গ্রেটে শুনতে পেয়েছে, মন দিয়ে শুনেছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, তোমাকে তখনই বলেছিলুম, আমি আসব না। তবু তুমি আমায় জোর করে নিয়ে এলে। ঐ শুনলে বারোটা বাজার ঘণ্টা? পরব শেষ হল। যুডাস টাডেয়াস্ আমাকে তাঁর তীর্থে যেতে দিলেন না। তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমি জানতুম, আমি জানতুম, এ রকমই হবে। এখন আমি কোথায় যাবো গো, মাগো, হে মা-মেরি—'

গ্রেটের গলা থেকে ঘড়ঘড় করে কি রকম একটা অদ্ভুত শব্দ বেরল। পাদ্রী-সায়েব জড়িয়ে না ধরলে সে পড়ে যেত।'

চাচা থামলে পর অনেকক্ষণ ধরে কেউ কিছু বলল না। শেষটায় বয়সে সকলের ছোট গোলাম মৌলা জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটার আর কোনো খবর নেন নি?'

চাচা বললেন, 'না, তবে মাস দুই পরে আরেকদিন গির্জায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি গ্রেটের মা। পরনে কালো পোশাক।'

বেল-তলাতে দু-দু'বার

বার্লিন শহরে 'হিন্দুস্থান হৌসের' আড্ডা সেদিন জমিজমি করে জমছিল না। নাৎসিদের প্রতাপ দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। আড্ডার তাতে কোনো আপত্তি নেই, বরঞ্চ খুশী হবারই কথা। নাৎসিরা যদি একদিন ইংরেজের পিঠে দু'চার ঘা লাগাতে পারে তাতে অন্তত এ-আড্ডায় কেউ বেজার হবে না। বেদনাটা সেখানে নয়, বেদনাটা হচ্ছে দু'একটা মূর্খ নাৎসি নিয়ে। ফর্সা ভারতীয়কে তারা মাঝে মাঝে ইহুদি ভেবে কড়া কথা বলে, আর এক নাক-বাঁকা নীল-চোখো কাশ্মীরীকে তারা নাকি দু'একটা ঘুষিঘাষাও মেরেছে।

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা এ-সব বাবদে নাৎসিদের চেয়েও অসহিষ্ণু। বলল, 'আমরা যে পরাধীন সে-কথা সবাই জানে। তবে কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া ? এক ব্যাটা নাৎসি সেদিন আমার সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে চটেমটে বলল, 'তোমরা তো পরাধীন, তোমরা এসব নিয়ে ফপরদালালি কর কেন ?' নাৎসিদের তর্ক করার কায়দা অদ্ভুত।'

পুলিন সরকার বলল, 'তা তুই বললি না কেন, পরাধীন বলেই তো বাওয়া, ভারতবর্ষে কলকব্জা বেচে আর ইনসিওরেন্স কোম্পানী খুলে দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছো। ভারতবর্ষের লোক তো আর হটেন্‌টট্ নয় যে, স্বরাজ পেলেও কল-কব্জা বানাতে পারবে না ? জানিস, সুইটজারল্যাণ্ডে এখন জাপানী ঘড়ি বিক্‌কিরি হয়।'

বিয়ারের ভিতর থেকে সুষ্যি রায় বললেন,

' 'নাই তাই খাচ্ছো,
থাকলে কোথা পেতে ?'
কহেন কবি কালিদাস
পথে যেতে যেতে।'

কাটা-ন্যাজের ঘাতে যে মাছিগুলো পেট ভরে খেয়ে নিচ্ছিল তারাও তাই নিয়ে গরুটাকে কটু-কাটব্য করেনি। নাৎসিদের বুদ্ধি ঐ রকমেরই। যে হাত খাবার দিচ্ছে সেইটেকেই কামড়ায়। নাৎসিদের তুলনায় ইংরেজ সম্বন্ধীরা ঘুঘু—ভারতবর্ষের পরাধীনতাটার সঙ্গে ব্যবহার করে যেন বাড়ির ছোট বউ। মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেয় বটে কিন্তু তিনি যে আছেন সে-কথাটা কথাবার্তায় চাল-চলনে আকসারই অস্বীকার ক'রে যায়।'

চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন। তাঁর ন্যাওটা ভক্ত গোসাঁই জিজ্ঞেস করল, 'চাচা যে রা কাড়ছেন না?'

চাচা চোখ না খুলেই বললেন, 'আমি ওসবেতে নেই। আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে।'

সবাই অবাক। গোসাঁই জিজ্ঞেস করল, 'সে কি কথা? নাৎসিরা তো দাবড়াতে আরম্ভ করেছে মাত্র সেদিন। এর মাঝে কিছু একটা হলে তো আমরা খবর পেতুম।'

কথাটা সত্য। চাচার গলাবন্ধ কোট, শ্যামবর্ণ চেহারা, আর রবিঠাকুরী বাবরী বার্লিন শহরের হাই-কোর্ট। যে দেখেনি তার বাড়ি পদ্মার হে-পারে। চাচার উপর চোটপাট হলে একটা আন্তর্জাতিক না হোক আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

চাচা বললেন, 'তোরা তো দেখছিস নাৎসিদের দ্বিজত্ব। তাদের পয়লা জনম হয়েছিল মিউনিকে। আমি তখন—'

জব্বলপুরের শ্রীধর মুখুয্যে অভিমানভরে বলল, 'চাচা, আপনি কি আমাদের এতই বাঙাল ঠাওরালেন যে আমরা পুচ্‌শের (Putsch) খবরটা পর্যন্ত জানিনে?'

চাচা বললেন, 'এহ বাহ্য, আমি তারও আগেকার কথা বলছি। এই ভুশুণ্ডি স্থিয্যি রায় আর আমি তখন মিউনিকে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতুম। মিউনিক বললে ঠিক কথা বলা হ'ল না। আমরা থাকতুম মিউনিক থেকে মাইল পনরো দূরে, ছোট্ট একটা গ্রামে—ডেলি প্যাসেঞ্জরি করলে সব দেশেই পয়সা বাঁচে। আমি থাকতুম এক মুদির বাড়িতে। নিচের তলায় দোকান, উপরে তিন ছেলে, এক মেয়ে, আর আমাকে নিয়ে মুদির সংসার।

মুদির সংসারটির দুটি মহৎ গুণ ছিল—কাচ্চা বাচ্চা বাপ মা সকলেরই ঠাট্টা-মস্করার রসবোধ ছিল প্রচুর আর ওস্তাদী সঙ্গীতের নামে তারা অজ্ঞান। বড় ছেলে অস্কার বাজাত বেয়ালা, মেয়ে করতাল-ঢোল, বাপ পিয়ানো আর মেজো ছেলে হুবের্ট চেল্লো। কাজকর্ম সেরে দু'দণ্ড ফুরসৎ পেলেই কনসার্ট—কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঠাট্টা-মস্করা।

কিন্তু এদের মধ্যে আসল গুণী ছিল অস্কার। তবে তার গুণের সন্ধান পেতে আমার বেশ কিছুদিন লেগে গিয়েছিল—কারণ অস্কারকে পাওয়া যেত দুই অবস্থায়। হয় টং মাতাল, নয় মাথায় ভিজে পট্টি বাঁধা। তখন সে প্রধানতঃ আমাকে লক্ষ্য করেই বলত,

'ডু ইণ্ডার, ওরে ভারতবাসী কালা শয়তান, তোরা যে মদ খাস্‌নে সেইটেই তোদের একমাত্র গুণ। তোর সঙ্গে থেকে থেকে আর কাল রাত্রির বাইশ গেলাসের পর—'

মেয়ে মারিয়া আমাকে বলল, 'বাইশ না বিয়াল্লিশ জানল কি করে? পনরোর পর তো ও আর হিসেব রাখতে পারে না।'

মা বলল, 'তাই হবে। কাল রাত্রে চারটের সময় অস্কার বাড়ি ফিরে তো হড় হড় করে সব বিয়ার গলাতে আঙুল দিয়ে বের করে নিচ্ছিল। বোধ হয় সন্দেহ হয়েছিল মদওয়ালা যে বাইশ গ্লাসের দাম নিল তাতে কোনো ফাঁকি নেই তো! বমি করছিল বোধ হয় মেপে দেখবার জন্য।'

অস্কার বলল, 'ওসব কথায় কান দিয়ো না হে ইণ্ডার (ভারতীয়)। দরকারও আর নেই। আমি এই সর্বজনসমক্ষে মা-মেরির দিব্যি কেটে বললুম, আর কক্‌খনো মদ স্পর্শ করব না। মদ মানুষকে পরের দিন কি রকম বেকাবু করে ফেলে এই ভিজে পট্টিই তার লেবেল। বাপ রে বাপ, মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে।'

ভিজে পট্টিতেও আর কুলোল না। অস্কার কল খুলে মাথাটি নিচে ধরল।

সেখান থেকেই জলের শব্দ ডুবিয়ে অস্কার হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমাকে বিয়ারে ফাঁকি দিয়ে পয়সা মারবে কে শুনি? হুঁঃ। বক্সিং-এর পয়লা প্রাইজের কথা কি মদওয়ালা ভুলে গিয়েছে? তার হোটেলের বাগানেই তো, বাবা, ফাইনালটা হলো। ব্যাটার নাকটা এমনিতেই থ্যাবড়া, আমার বাঁ'হাতের একখানা সরেস আণ্ডার-কাট খেলে সে-নাক মিউনিক-বার্লিন সদর রাস্তার মত ফেলেট্ হয়ে যাবে না?'

কথাটা ঠিক। বিয়ারওয়ালা বরঞ্চ ইনকামটেক্স অফিসারকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতে পারে—'আভেমারিয়া' মন্ত্র কমিয়ে সমিয়ে ভগবানকে ফাঁকি প্রতি রবিবারে গির্জেঘরে সে দেয়ই, না হলে সময় মত দোকান খুলবে কি করে?—কিন্তু বিয়ার নিয়ে অস্কারের সঙ্গে মস্করা ফস করে কেউ করতে যাবে না।

ঢক ঢক করে এক গেলাস নেবুর সরবৎ খেয়ে অস্কার বলল, 'মাথার ভিতর যেন এ্যারোপ্লানের প্রপেলার চলছে, চোখের সামনে দেখছি গোলাপী হাতী সারে সারে চলছে, জিবখানা যেন তালুর সঙ্গে ইস্ক্রু মারা হয়ে গিয়েছে, কানে শুনছি মা যেন বাবাকে ঠ্যাঙাচ্ছে।'

মুদি বলল, 'ভাল হোক মন্দ হোক, আমার তো একটা আছে, তুই তো তাও

জোটাতে পারলি নে।'

অস্কার কান না দিয়ে বলল, 'কিন্তু আর বিয়ার না। মা-মেরি সাক্ষী, পীর রেমিগিয়ুস সাক্ষী, কালা শয়তান ইওার সাক্ষী, আর বিয়ার না।'

অস্কারকে সকাল বেলা যে কোনো মদ্য নিবারণী সভার বড়কর্তা বানিয়ে দেওয়া যায়। সন্ধ্যের সময় বিয়ারের জন্য সে আলকাপোনের ডাকাতদলের সর্দারী করতে প্রস্তুত। আমি পকেট-ডায়েরি খুলে পড়ে বললুম, 'অস্কার, এই নিয়ে তুমি সাতাশী বার মদ ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করেছ।'

অস্কার বলল, 'যাঃ! তুই সাতাশী পর্যন্ত গুনতেই পারিসনে। ভারতবর্ষে অশিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা সাতাশী। তুই তো তাদেরি একজন। ওখানে পাঠশালা থেকে তাডিয়ে দিয়েছে বলেই তো এদেশে এসেছিস। তুই সাতাশীতে ঘুলিয়ে ফেলেছিস।'

মুদির মা বলল, 'অস্কার চাকরি পেয়েছে আঠারো বছর বয়সে। সেই থেকে প্রতি রাত্রেই বিয়ার, ফি সকাল মদ ছাড়ার শপথ। এখন তার বয়স বাইশ। সাতাশীবার ভুল বলা হল।'

অস্কার বলল, 'ঐ যাঃ! বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম আজ আমাদের কারখানায় সালতামামী পরব—বিয়ার পার্টি। চাকরির কথায় মনে পড়ল। কিন্তু না, না, না, আর বিয়ার না। দেখো, ইওার, আজ যদি পার্টির কোনো ব্যাটা আসে তবে তুমি ভারতীয় কায়দায় তাকে নরবলি দেবে।' '

চাচা বললেন, 'আমি আজও বুঝতে পারিনে অস্কার এই পট্টিবাধা মাথা নিয়ে কি করে প্রেসিশন মেশিনারির কাজ করত। মদ খেলে তো লোকের হাত কাঁপে, চোখের সামনে গোলাপী হাতী দেখে। অস্কার এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগ তা হলে দেখতই বা কি করে আর বানাতোই বা কি কৌশলে? এত সূক্ষ্ম কাজ করতে পারত বলে তাকে মাত্র দু'ঘণ্টা কারখানায় খাটতে হত। মাইনেও পেত কয়েক তাড়া নোট। তাই দিয়ে খেত বিয়ার আর করত দান খয়রাত। দ্বিতীয়টা হরবকত। মৌজে থাকলে তো কথাই নেই, পট্টিবাঁধা অবস্থায় ও মোটর সাইকেল থেকে নেবে বুড়ী দেশলাইওয়ালীর কাছ থেকে একটা দেশলাই কিনে এক ডজনের পয়সা দিত।

অস্কার ছিল পাঁড় নাৎসি। আমাকে বলত, 'এ সব ভিখিরি আতুরকে কেন যে সরকার গুলি করে মারে না একথাটা এখনো আমি বুঝে উঠতে পারিনে। সমস্ত দেশের কপালে আছে তো কুল্লে তিন মুঠো গম। তারই অর্ধেক খেয়ে ফেললে এ বুড়ী, ও কানী, সে খোঁড়া। সোমথ জোয়ানরা থাকে

কি, দেশ গড়বে কি দিয়ে? প্লেজকে যখন নেকড়ে তাড়া করে তখন দুটো দুব্‌লা বাচ্চা ফেলে দিয়ে বাঁচাতে হয় তিনটে তাগড়াকে। সব কটাকে বাঁচাতে গেলে একটাকেও বাঁচানো যায় না। কথাটা এত সোজা যে কেউ স্বীকার করবে না, পাছে লোকে ভাবে লোকটা যখন এত সোজা কথা কয় তখন সে নিশ্চয়ই হাবা।'

আমি বললুম, 'তিনটেকে বাঁচাতে গিয়ে দুটোকে নেকড়ের মুখে দিয়ে যদি অমানুষ হতে হয় তবে নাই বাঁচল একটাও।'

অস্কার যেন ভয়ঙ্কর বেদনা পেয়েছে সে রকম মুখ করে বললে, 'বললি? তুইও বললি? তুই না এসেছিস এদেশে পড়াশোনা করতে। এদেশের পণ্ডিতদের জুড়ি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই বলেই তুই এখানে এসেছিস। এ পণ্ডিতের জাতটা মরে যাক্ এই বুঝি তোর ইচ্ছে? বল দিকিনি বুকে হাত দিয়ে, এই জর্মন জাতটা মরে গেলে পৃথিবীটা চালাবে কে? পণ্ডিত, কবি, বীর এ জাতে যেমন জন্মেছে—'

আমি বললুম, 'থাক্ থাক্। তোমার ওসব লেকচার আমি ঢেরঢের শুনেছি।'

অস্কার মোটর সাইকেল থামিয়ে বলল, 'যা বলেছিস। তোকে এসব শুনিয়ে কোনো লাভ নেই। তুই মুসলমান, তোরা কখনো ধর্ম বদলাসনে, যা আছে তাই নিয়ে আঁকড়ে পড়ে থাকিস। চ, একটা বিয়ার খাবি?'

আমি পিনিয়ন থেকে নেমে বললুম, 'গুড বাই। আর দেখো তুমি সোজা বাড়ি যেয়ো। আমি লোকাল ধরব।'

অস্কার বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। তোমাকে তো আর নিত্যি নিত্যি আমি লিফ্‌ট্ দিতে পারিনে। কারখানায় পরীরা সব ভয়ঙ্কর চটে গিয়েছে আমার উপর, কাউকে লিফ্‌ট্ দিইনে বলে। প্রেমট্রেম সব বন্ধ।'

আমি রাগ করে বললুম, 'এ কথাটা এত দিন বলো নি কেন? আমি তোমাকে পই পই করে বারণ করিনি আমায় কখন ক্লাস শেষ হয় না হয় তার ঠিক নেই, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে না।'

অস্কার বলল, 'তোমার জন্য আমি আর অপেক্ষা করলুম কবে? সামনের শরাবখানায় ঢুকি এক গেলাস বিয়ারের তরে। জানালা দিয়ে যদি দেখা যায় তুমি বেরিয়ে আসছ তাহলে কি তোমার দিকে তাকানোটাও বারণ? বেড়ালটাও তো কাইজারের দিকে তাকায়, তাই বলে কি কাইজার তার গর্দান নেন নাকি?'

চাচা বললেন, 'অস্কারের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আর ঐ ছিল তার অদ্ভুত

পরোপকার করার পদ্ধতি। 'ভিখিরিটাকে তিনটে মার্ক দিলে কেন?' অস্কার বলবে, 'ব্যাটা বেহেড মাতাল, তিন মার্কে টং নেশা করে গাড়ি চাপা হয়ে মরবে এই আশায়।' 'আমাকে নিত্যি নিত্যি লিফ্‌ট্‌ দেবার জন্য তুমি অপেক্ষা করো কেন?' 'সে কি কথা? আমি তো বিয়ার খেতে শরাবখানায় ঢুকেছিলুম!' 'নাৎসি পার্টিতে টাকা ঢালছো কেন?' 'তাই দিয়ে বন্দুক পিস্তল কিনে বিদ্রোহ করবে, তারপর ফাঁসিতে ঝুলবে বলে।' আমি একদিন বলেছিলুম, 'মিশনারিরা যে আফ্রিকায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে যায় সেটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।' অস্কার বলল, 'তাহলে দুর্ভিক্ষের সময় বেচারী নিগ্রোরা খাবে কি? মিশনারির মাংস উপাদেয় খাদ্য!'

চাচা বললেন, 'কিন্তু এসব হাইজাম্প লঙ্‌জাম্প শুধু মুখে মুখে। অস্কার নাৎসি আন্দোলনের বেশ বড় ধরনের কর্তা আর নাৎসিদের নিজে যতই রসিকতা করুক না কেন, আর কেউ কিছু বললে তাকে মার মার করে তাড়া লাগাত। আমার সঙ্গে এক বৎসর ধরে যে এত বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল সেইটি পর্যন্ত সে একদিন অকাতরে বিসর্জন দিল ঐ নাৎসিদের সম্বন্ধে আমি আমার রায় জাহির করেছিলুম বলে।

রান্নাঘরে সকাল বেলা সবাই জমায়েত। সেদিন ছিল রবিবার—সপ্তাহে ঐ একটি মাত্র দিন আমরা সবাই রান্নাঘরে বসে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতুম, আর ছ'দিন যে যার সুবিধে মত।

মেয়ে মারিয়া পাঁচজনের উপকারার্থে চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। অস্কার মাথায় ভিজে পট্টি বাঁধছিল আর আপন মনে মাথা নেড়ে নেড়ে নিজকে বোঝাচ্ছিল, বিয়ার খাওয়া বড় খারাপ। মারিয়া হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ খবরটা মন দিয়ে শুনুন, হের ডক্টর। 'পাটেনকির্ষেনে হৈ হৈ রৈ রৈ, নাৎসি গুণ্ডা কর্তৃক ইহুদিনী আক্রান্ত। প্রকাশ, ইহুদিনী রাস্তায় নাৎসি পতাকা দেখে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আপন বিরক্তি প্রকাশ করেছিল। নাৎসিরা তখন তাকে ধরে নিয়ে এসে পতাকার সামনে মাথা নিচু করতে আদেশ করে। সে তখনো নারাজী প্রকাশ করাতে নাৎসিরা তাকে মার লাগায়। পুলিস এসে পড়ায় নাৎসিরা পালিয়ে যায়। তদন্ত চলছে।' '

চাচা বললেন, 'আমি বিরক্তি প্রকাশ করে বললুম, নাৎসি গুণ্ডারা কি করে না-করে আমার তাতে কি?'

অস্কার আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, 'জাতির পতাকার সম্মান যারা বাঁচাতে চায় তারা গুণ্ডা?'

আমি কিছু বলার আগেই বুড়ো বাপ বলল, 'ওটা জাতির পতাকা হল কি করে? ওটা তো নাৎসি পার্টির পতাকা।'

আমি বললুম, 'ঠিক,—এবং জাতীয় পতাকাকে কেউ অবহেলা করলে তাকে সাজা দেবার জন্য পুলিস রয়েছে, আইন আদালত রয়েছে। বিশেষ করে একটা মেয়েকে ধরে যখন পাঁচটা ষাঁড়ে মিলে ঠ্যাঙ্গায় তখন সেটা গুণ্ডামি না হলে গুণ্ডামি আর কাকে বলে?'

অস্কার আমার দিকে ঘুরে হঠাৎ 'আপনি' বলে সম্বোধন করে বলল, 'আপনি তা হলে ইহুদিদের পক্ষে?'

আমি বললুম, 'অস্কার, অত সিরিয়স হচ্ছ কেন? আমি ইহুদিদের পক্ষে না বিপক্ষে সে প্রশ্ন তো অবান্তর।'

অস্কার বলল, 'প্রশ্নটা মোটেই অবান্তর নয়। ইহুদিরা যতদিন এদেশে থাকবে ততদিনই বর্ণসঙ্করের সম্ভাবনা থাকবে। জর্মনির নর্ডিক জাতের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।'

চাচা বললেন, 'এর পর আমার আর কোনো কথা না বললেও চলত। কিন্তু মানুষ তো আর সব সময় শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে ওঠা-বসা করে না, আর হয় তো অস্কার আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যে আমার মনে হয়েছিল, কোনো একটা যুৎসই উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। আমি বললুম, 'ভারতবর্ষেও তো আর্য জাতি রয়েছে এবং তারা জর্মনদের চেয়ে ঢের বেশী খানদানী এবং কুলীন। আর্যদের প্রাচীনতম সৃষ্টি চতুর্বেদ ভারতবর্ষেই বেঁচে আছে। গ্রীস রোমে যা আছে তার বয়স বেদের হাঁটুর বয়সেরও কম। জর্মনির ফ্রান্সের তো কথাই ওঠে না—পরশু দিনের সব চ্যাংড়ার পাল। কিন্তু তার চেয়েও বড় তত্ত্বকথা হচ্ছে এই, ভারতবর্ষের যা কিছু প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে তোমরা আমরা সবাই গর্ব করি সেটা গড়ে উঠেছে আর্য অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণ অর্থাৎ বর্ণসঙ্করের ফলে। আমাদের দেশে বর্ণসঙ্কর সবচেয়ে কম হয়েছে কাশ্মীরে—আর ভারতীয় সভ্যতায় কাশ্মীরীদের দান ট্যাঁকে গুঁজে রাখা যায়। এবং আমার বিশ্বাস যে সব গুণী জর্মনিকে বড় করে তুলেছেন তাঁদের অনেকেই খাঁটি আর্য নন।'

আমাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে অস্কার হুঙ্কার তুলে বলল, 'আপনি বলতে চান, আমাদের সুপারম্যানরা সব বাস্টার্ড?' '

চাচা বললেন, 'আমি তো অবাক। কিন্তু ততক্ষণে আমার সৎবুদ্ধির উদয় হয়েছে। কিছু না বলে চুপ করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলুম।'

চাচা কফিতে চুমুক দিলেন। সেই অবসরে গোলাম মৌলা বলল, 'আমার

সঙ্গেও ঠিক এইরকম ধারাই তর্ক হয়েছিল কিন্তু আমি তো ভারতীয় সভ্যতার অতশত জানিনে তাই ওরকম টায় টায় তুলনা দিয়ে তর্ক করতে পারিনি। কিন্তু নাৎসিরা রাগ দেখায় একই ধরনের।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি প্রয়োজন ছিল তর্ক করার? বিশেষ করে যখন জানি, যত বড় সত্য কথাই হোক মানুষ আপন কৌলীন্য বজায় রাখার জন্য সেটাকেও বিসর্জন দেয়। তার উপর অস্কার জানেই বা কি, বোঝেই বা কি? মানুষটা ভালো, তর্ক করে আনাড়ির মত, আর আগেও তো বলেছি তার হাইজাম্প, লঙ্‌জাম্প তো শুধু মুখেই।'

আমি আর অস্কার বাড়ির সকলের পয়লা ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরতুম। পর দিন খেতে বসে দেখি অস্কার নেই। র‍্যাকে তার বরসাতি আর হ্যাটও নেই। বুঝলুম আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। মনে কি রকম খটকা লাগল। দু'দিনের ভিতরই কিন্তু ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল—অস্কার আমাকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শুনলুম মুদি আর তার মা আমার পক্ষ নিয়ে অস্কারকে ধমক দিয়েছেন। অস্কার কোনো উত্তর দেয়নি কিন্তু আমি রান্নাঘরে থাকলে সেখানে আসে না।

মহা বিপদগ্রস্ত হলুম। বাড়ির বড় ছেলে আমার সঙ্গে মন কষাকষি করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, আর-সবাই সে সম্বন্ধে সচেতন, অষ্টপ্রহর অস্বস্তিভাব, বুড়োবুড়ী আমার দিকে সব সময় কি রকম যেন মাপ-চাই ভাবে তাকান—মরুক গে, কি হবে এখানে থেকে।

বুড়োবুড়ী তো কেঁদেই ফেললেন। মারিয়া আমার কাছে ইংরিজী পড়ত। সে দেখি জিনিসপত্র প্যাক করছে; বলল, 'চললুম কিছুদিনের জন্য মাসীর বাড়ি।' দুসরা ছেলে হুবের্ট কথা কইত কম। আমাকে ম্যুনিকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় বলল, 'আশ্চর্য, অস্কারের মত সহৃদয় লোক নাৎসিদের পাল্লায় পড়ে কি রকম অদ্ভুত হয়ে গেল দেখলেন?' আমি আর কি বলব।'

চাচা বললেন, 'তারপর ছ'মাস কেটে গিয়েছে। বান্ধব বর্জন সব সময়ই পীড়াদায়ক—সে বর্জন ইচ্ছায় করো আর অনিচ্ছায়ই ঘটুক। তার উপর বড় শহরে মানুষ যে রকম নিঃসঙ্গ অনুভব করে তার সঙ্গে গ্রামের নির্জনতার তুলনা হয় না। গ্রামের নিত্যিকার ডালভাত অরুচি এনে দেয় সত্যি, তবু সেটা শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর পাঁচজনের শেরি-শ্যাম্পেন খাওয়া দেখার চেয়ে অনেক ভালো। দিনের ভিতর তাই অন্ততঃ পঞ্চাশবার 'দুত্তোর ছাই' বলতুম আর বুড়োবুড়ীর কাছে ফিরে যাওয়া যায় কি না ভাবতুম। কিন্তু জানো তো, বড় শহরে স্থান যোগাড় করা যেমন কঠিন, সেখান থেকে বেরুনো তার চেয়েও কঠিন।

করে করে প্রায় এক বৎসর কেটে গিয়েছে। একদিন বাসায় ফিরে দেখি বুড়োবুড়ী আর মারিয়া আমার বসার ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কি ব্যাপার? ব্র্যোনডর্ফের সাম্বৎসরিক মেলা। আমাদের যেমন ঈদ দুর্গোৎসবের সময় আত্মীয়স্বজন দেশের বাড়িতে জড়ো হয় এদের বাৎসরিক মেলার সময়ও ঐ রেওয়াজ। বুড়োবুড়ী, মারিয়া তাই আমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন।

আমার মনের ভিতর কি খেলে গেল সেইটে যেন বুঝতে পেরেই মারিয়া বলল, 'অস্কারের সঙ্গে এ ক'দিন আপনার দেখা হবার সম্ভাবনা নেই বললেও চলে। ছুটি নিয়ে এ ক'দিন সে অষ্টপ্রহর বিয়ার খায়। আপনাকে দেখলে ও চিনতে পারবে না।'

বুড়ী বললেন, 'অস্কারকে একটা সুযোগ দিন আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার। মেলার সময় তাই তো আত্মীয়স্বজন জড়ো হয়।'

মেলার পরব সব দেশে একই রকম। তিন মিনিট নাগরদোলায় চক্কর খেয়ে নিলে, ঝপ্ করে দুটো পানের খিলি মুখে পুরলে (দেশভেদে চকলেট), দুটো সস্তা পুতুল কিনলে, গণৎকারের সামনে হাত পাতলে, না হয় ইয়ারদের সঙ্গে গোট পাকিয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসলে (দেশভেদে ফষ্টিনষ্টি করলে)। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে যে ঘন ঘন পট পরিবর্তন সম্ভব হয় না সেইটে মেলার সময় সুদে আসলে তুলে নেওয়া। যে মেলা যত বেশী মনের ভোল ফেরাবার পাঁচমেশালী দিতে পারে সে-মেলার জৌলুশ তত বেশী। তাই বুঝতে পারছ, বড় শহরে কেন মেলা জমে না। যেখানে মানুষ বারো মাস মুখোস পরে থাকে সেখানে বহুরূপী কল্কে পাবে কেন?

তবে দেশের মেলার সঙ্গে এদেশের মেলার একটা বড় তফাত রয়েছে। রাত ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেলা যখন ঝিমিয়ে আসে তখন দেশে শুরু হয়, যাত্রা-গান কিম্বা কবির লড়াই। এদেশে শুরু হয় মদ আর নাচ। ছোটখাটো গ্রামে তো প্রায় অলঙ্ঘ্য রেওয়াজ প্রত্যেক মদের আড্ডায় অন্ততঃ একবার ঢুকে এক গেলাস বিয়ার খাওয়ার। কারো দোকান কট্ করা চলবে না, তা ততক্ষণে তুমি টং হয়ে গিয়ে থাকো আর নাই থাকো।

আমরা যেরকম উচ্ছৃঙ্খলতায় সুখ পাই, জর্মনরা তেমনি আইন মেনে সুখ পায়। মুদি মুদিবউ তাই আমাকে নিয়ে এই নিয়ম প্রতিপালন করে করে শেষ-টায় ঢুকলেন তাঁদেরই বাড়ির পাশের গ্রামের সব চেয়ে বড় শরাবখানায়। রাত তখন এগারোটা হবে। ডান্স হলের যা সাইজ তাতে দু'পাঁচখানা চণ্ডীমণ্ডপ সেখানে অনায়াসে লুকোচুরি খেলতে পারে। আশপাশের দশখানা গ্রামের

ছোঁড়াছুঁড়ি বুড়োবুড়ী ধেই ধেই করে নাচছে, আর শ্যাম্পেন-ওয়াইন যা বইছে তাতে সমস্ত গ্রামখানাকে সম্বৎসর মজিয়ে রেখে আচার বানানো যায়। দেশলাই ঠুকতে ভয় হয় পাছে হাওয়ার এলকহলে আগুন ধরে যায়, সিগার সিগারেটের ধুঁয়ো দেখে মনে হয়, দেশের গোয়ালঘরের মশা তাড়ানো হচ্ছে।

বুড়োবুড়ী পাড়ার মুরুব্বী। কাজেই তাঁদের জন্য টেবিল রিজার্ভ করা ছিল।

বুড়োবুড়ী আইন মেনে এক চক্কর নেচে নিলেন। বয়স হয়েছে, অল্পেই হাঁপিয়ে পড়েন। তবু পায়ের চিকন কাজ থেকে অনায়াসে বুঝতে পারলুম, এঁদের যৌবনে এঁরা আজকের দিনের ছোঁড়াছুঁড়ির চেয়ে ঢের ভালো নেচেছেন। আর মারিয়ার তো পো' বারো। সুন্দরী মেয়ে। তাকে নিয়ে যে লোফালুফি লেগে যাবে, সে-কথা নাচের মজলিসে না এসেই বলা যায়।

ঘণ্টাখানেক কেটে গিয়েছে। মজলিস গুলজার। সবাই মৌজে। তখনো লোকজন আসছে—এত লোকের যে কোথায় জায়গা হচ্ছে খোদায় মালুম, আল্লাই জানেন। এমন সময় একজোড়া কপোত-কপোতী আমাদেরই টেবিলের পাশে এসে জায়গার সন্ধানে চারদিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু তখন আর সত্যি একখানা চেয়ারও খালি নেই। বুড়োবুড়ী তাদের ডেকে বললেন, 'আমরা বাড়ি যাচ্ছি। আপনারা আমাদের জায়গায় বসতে পারেন।' আমি উঠে দাঁড়ালুম। বুড়ী বললেন, 'সে কি কথা? আপনি থাকবেন। না হলে মারিয়াকে বাড়ি নিয়ে আসবে কে?' আমার বাড়ি যাবার ইচ্ছে করছিল, কিন্তু এরপর তো আর আপত্তি জানানো যায় না। জর্মনি মধ্যযুগের প্রায় সব বর্বরতা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে কিন্তু শক্তসমর্থ মেয়েরও রাত্রে রাস্তায় একা বেরতে নেই এ বর্বরতাটা কেন ছাড়তে পারে না বুঝে ওঠা ভার।

কপোত-কপোতী চেয়ার দুটো পেয়ে বেঁচে গেল। কপোতীটি দেখতে ভালোই, মারিয়ার সঙ্গে বেশ যেন খাপ খেয়ে গেল। আমি তাদের মধ্যিখানে বসেছিলুম—আহা, যেন দুটি গোলাপের মাঝখানে কাঁটাটি।'

চাচার কথায় বাধা দিয়ে গোসাঁই বললেন, 'চাচা, আত্মনিন্দা করবেন না। বরঞ্চ বলুন, দুটো কাঁটার মাঝখানে গোলাপটি। আর কিছু না হোক সেই অজ-পাড়াগাঁয়ে ইণ্ডার হিসেবে নিশ্চয়ই আপনাকে মাইডিয়ার-মাইডিয়ার দেখাচ্ছিল।'

চাচা বললেন, 'ঠিক ধরেছিস। ঐ বিদেশী চেহারার যে চটক থাকে তাই নিয়ে বাধল ফ্যাসাদ।

নাচের মজলিসে, বিশেষ করে একই টেবিলে তো আর ব্যাকরণসম্মত

পদ্ধতিতে ইনট্রডাকশন্ করে দেবার রেওয়াজ নেই। কপোতীটি বিনা আড়ম্বরে শুধালো, 'আপনি কোন্ দেশের লোক?' উত্তর দিলুম। তারপর এটা, ওটা, সেটা এমন কি ফষ্টিটা-নষ্টিটা, অবশ্যি সন্তর্পণে, যেন ফুলদানির ফুলের ভিতর দিয়ে—থ্রু ফ্লাওয়ার্স।

ওদিকে দেখি কপোতটি এ জিনিসটা আদপেই পছন্দ করছে না।

আমি ভাবলুম, কাজ কি হ্যাঙ্গামা বাড়িয়ে। দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দিলুম না, যেন শুনতে পাইনি। কিন্তু মারিয়াটা ঘড়েল মেয়ে। ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে আর নষ্টামির ভূত চেপেছে তার ঘাড়ে, হয়ত শ্যাম্পেনও তার জন্য খানিকটা দায়ী। সে আরম্ভ করল মেয়েটাকে উসকাতে। বলল, 'জানেন, ইনি আমার দাদা হন।'

মেয়েটি বললে, 'তা কি করে হয়। ওঁর রঙ বাদামী, চুল কালো, উনি তো ইণ্ডার।'

মারিয়া গম্ভীর মুখে বলল, 'ঐ তো! উনি যখন জন্মান মা-বাবা তখন কলকাতার জর্মন কনসুলেটে কর্ম করতেন। কলকাতার লোক বাঙলা ভাষায় কথা কয়। দাদাকে জিজ্ঞেস করুন উনি বাঙলা জানেন কি না।'

মেয়েটি হেসে কুটি কুটি। বললে, 'হ্যাঁ, ওঁর জর্মন বলাতে কেমন যেন একটু বিদেশী গোলাপের খুশবাই রয়েছে।' মেরেছে! বিদেশী ওঁচা এ্যাকসেন্ট হয়ে দাঁড়ালো, 'গোলাপী খুশবাই'!'

চাচা বললেন, 'আমি মারিয়াকে দিলুম ধমক। দিয়ে করলুম ভুল। বোঝা উচিত ছিল মারিয়ার স্কন্ধে তখন শ্যাম্পেনের ভূত ড্যাং ড্যাং করে নাচছে। শ্যাম্পেনকে ঝাঁকুনি দিলে তার বজ্ বজ্ বাড়ে বই কমে না। মারিয়া মরমিয়া স্বরে কপোতীর কাছে মাথা নিয়ে গিয়ে বলল, 'আর উনি এ্যাসা খাসা নাচতে পারেন। আমাদেরই ওয়ালট্স্ নাচ—আর তার উপর থাকে ভারতীয় জরির কাজ। আইন, ৎস্বয়াই, ড্রাই—আইন, ৎস্বয়াই, ড্রাই,—তার সঙ্গে ধা, ধিন, না; ধা, তিন, না; ভাডরা? না?' '

চাচা বললেন, 'পাঁচপীরের কসম, আমার বাপ-ঠাকুর্দা চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনো নাচেনি। মুখে গরম আলু পড়াতে হয়তো নেচেছে কিন্তু সে তো ওয়ালট্স্ নয়। মেয়েটাও বেহায়ার একশেষ। মারিয়াকে বলল, 'তা উনি যে নাচতে পারবেন তাতে আর বিচিত্র কি? কি রকম যেন সাপের মত শরীর।' বলে চোখ দিয়ে যেন আমার গায়ে এক দফা হাত বুলিয়ে নিল।'

চাচা বললেন, 'ও: ! এখনো ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। ওদিকে ছেলেটাও চটে উঠেছে। আর চটবে নাই বা কেন ? বান্ধবীকে নিয়ে এসেছে নাচের মজলিসে ফুর্তি করতে। সে যদি আরেকটা মদ্দার সঙ্গে জমে যায় তবে কার না রাগ হয় ? কপোত দেখি বাজপাখীর মূর্তি ধরতে আরম্ভ করছে। তখন তাকিয়ে দেখি তার কোটে লাগানো রয়েছে নাৎসি পার্টির মেম্বারশিপের নিশান। ভারী অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলুম।

মারিয়া তখন তার-সপ্তকের পঞ্চমে। শেষ বাণ হানলো, 'একটু নাচুন না, হের ডক্টর !'

আমাদের দেশে যেমন বাচ্চা মেয়ের নাম 'পেঁচির মা', 'ঘেঁচির মা' হয়, আপন বাচ্চা জন্মাবার বহু পূর্বে, ম্যুনিক অঞ্চলে তেমনি ডক্টরেট প্রসব করার পূর্বেই পোয়াতী অবস্থাতেই আত্মীয়স্বজন ডাকতে আরম্ভ করে, 'হের ডক্টর'। আমার তখনো ডক্টরেট পাওয়ার ঢের বাকি কিন্তু আত্মজনের নেকনজরে আমি য়ুনি-ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হার্ড-বয়ল্ড্ হের ডক্টর হয়ে গিয়েছিলুম। মারিয়ার অবশ্য এই বেমোকায় 'হের ডক্টর' বলার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটিকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া যে অজ পাড়াগাঁয়ের মেলাতে বসে থাকলেই মানুষ কিছু কামার চামার হতে বাধ্য নয়—আমি রীতিমত খানদানী মনিষ্যি, 'হের ডক্টর' ! বাঙলা কথা।

মেয়েটি তখন কাতর হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে বলল, 'হে—র—ড—ক্—ট্—র !' '

চাচা বললেন, 'আমি মনে মনে বললুম, 'দুত্তোর তোর হের ডক্টর, আর দুত্তোর তোর এই মারিয়াটা।' মুখে বললুম, 'মারিয়া, আমি এখখুনি আসছি।' বলে, দিলুম চম্পট।'

চাচা বললেন, 'তোরা তো ম্যুনিকে যাসনি কাজেই জানিসনে মানুষ সেখানে কি পরিমাণ বিয়ার খায়। তাই সবাইকে যেতে হয় ঘনঘন বিশেষ স্থলে। আমি এসব জিনিস খাইনে, কিন্তু তাই নিয়ে তো মারিয়া আর তর্কাতকি জুড়তে পারে না।'

চাচা বললেন, 'বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কষে ঠাণ্ডা বাতাস বুকের ভিতর নিয়ে সিগার-সিগরেটের ধুঁয়ো যতটা পারি ঝেঁটিয়ে বের করলুম। মারিয়াটা যে এত মিটমিটে শয়তান কি করে জানব বল। কিন্তু মারিয়ার কথায় মনে পড়ল, ওকে ফেলে তো বাড়ি যাওয়া যাবে না। বুড়োবুড়ী তা হলে সত্যই ক্ষুণ্ণিত হবেন। ভাববেন, এই সামান্য দায়টুকু আমি এড়িয়ে গেলুম। কিন্তু

ততক্ষণে একটা দাওয়াই বের করে ফেলেছি। শরাবখানার ঠিক মুখোমুখি ছিল আরেকটি ছোটাসে ছোটা বিয়ার ঘর। সেখানে কফিও পাওয়া যায়। অধিকাংশ খদ্দের ওখানে ঢুকে 'বারে' দাঁড়িয়েই ঝপ করে একটা বিয়ার খেয়ে চলে যায়, আর যারা নিতান্ত নিরামিষ তারা বসে বসে কফিতে চুমুক দেয়। স্থির করলুম, সেখানে বসে কফি খাব, আর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নজর রাখব। যদি মারিয়া বেরয় তবে তক্ষুণি তাকে ক্যাঁক করে ধরে বাড়ি নিয়ে যাব। যদি না বেরয় তবে ঘণ্টাখানেক বাদে মারিয়ার তত্ত্বতাবাশ করব। শ্যেনও ততক্ষণে ফের কবুতর হয়ে যাবে আশা করাটা অন্যায় নয়।'

চাচা শিউরে উঠে বললেন, 'বাপস্! কি মারাত্মক ভুলই না করেছিলুম সেই বিয়ার-খানায় ঢুকে। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে দেখি সেই কপোতী শরাবখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর ঢুকল সেই বিয়ারখানাতে। আমার তখন আর লুকোবার বা পালাবার পথ নেই। আমাকে দেখে মেয়েটির মুখে বিদ্যুৎ-চমকানো-গোছ হাসির ঝিলিক মেরে উঠল। ঝুপ করে পাশের চেয়ারে বসে বলল, 'একটু দেরি হলো। কিছু মনে করোনি তো!' বলে দিল আমার হাতে হাত, পায়রার বাচ্চা যে রকম মায়ের বুকে মুখ গোঁজে।

বলে কি! ছন্ন না মাথা খারাপ। আপন মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝলুম, এরকম ধারা চলে এসে অন্য জায়গায় বসাটা হচ্ছে এদেশের প্রচলিত সঙ্কেত। অর্থটা 'সপত্ন' (অর্থাৎ পুং-সতীন) ব্যাটাকে এড়িয়ে চলে এস বাইরে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।' তাই সে এসেছে।

মেয়েটা আমার হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'কিন্তু, ভাই, তুমি কায়দাটা জানো ভালো। টেবিলে তো ভাবখানা দেখালে আমাকে যেন কেয়ারই করো না।' বলে আমার গালে দিল একটি মিষ্টি ঠোনা।'

চাচা বললেন, 'আমি তখন মরমর। ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, 'আপনি ভুল করেছেন। আমায় মাপ করুন।' মেয়েটা তখন একটু যেন বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমার এই প্রাচ্যদেশীয় টানা-ঠ্যালা, টানা-ঠ্যালা কায়দা থামাও। আমার সময় নেই। হয়ত এতক্ষণে আমার বন্ধুর সন্দেহ হয়েছে আর হঠাৎ এখানে এসে পড়বে। তাহলে আর রক্ষে নেই। তোমার ফোন নম্বর কত বলো। আমি পরে কন্ট্রাক্ট করবো। তখন তোমার সব রকম খেলার জন্য আমি তৈরী হয়ে থাকব।'

বাঁচালে। নম্বরটা দিলেই যদি মেয়েটা চলে যায় তাহলে আমিও নিষ্কৃতি

পাই। পরের কথা পরে হবে। নম্বর বলতেই মেয়েটা দেশলাইয়ের পোড়াকাঠি দিয়ে চট করে সিগারেটের প্যাকেটে নম্বরটা টুকে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দুশমন এসে ঘরে ঢুকল।

তার চেহারা তখন কপোতের মত তো নয়ই, বাজপাখীর মতও নয়, মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে, যেন চীনা ড্রাগন।

আর সে কী চীৎকার আর গালাগালি! আমি তার বান্ধবীকে বদমায়েশি করে, ধড়িবাজের ফেরেব্বাজি দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি। একই টেবিলে ওয়াইন খেয়ে, বন্ধুত্ব জমিয়ে এরকম ব্ল্যাকমেলিং, ব্যাকস্ট্যাবিং—আল্লা জানেন, আরো কত রকম কথা সে বলে যাচ্ছিল। সমস্ত বিয়ারখানার লোক তার চতুর্দিকে জড়ো হয়ে গিয়েছে। আমি হতভম্বের মত ঠায় দাঁড়িয়ে। মেয়েটা তার আস্তিন ধরে টানাটানি করে বার বার বলছে, 'হান্স্, হান্স্, চুপ করো। এখানে সীন করো না। ওঁর কোনো দোষ নেই—আমিই—'

কনুই দিয়ে মেয়েটার পেটে দিল এক গুঁতো। চেঁচিয়ে বললে, 'হটে যা মাগী' —অথবা তার চেয়েও অভদ্র কি একটা শব্দ ব্যবহার করেছিল আমার ঠিক মনে নেই। চটলে নাৎসিরা মেয়েদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে সেটা না দেখলে বোঝবার উপায় নেই। হারেমে বুখারার আমীর তাদের তুলনায় কলসী-কানার বোষ্টম। গুঁতো খেয়ে মেয়েটা কোঁক্ করে, অদ্ভুত ধরনের শব্দ করে একটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল।

এই বকাবকি আর চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগন আস্তিন গুটোয় আর বলে, 'আয়, এর একটা রফারফি হওয়া দরকার। বেরিয়ে আয় রাস্তার বাইরে।' '

চাচা বললেন, 'আমি তো মহা বিপদে পড়লুম। অসুরদের মত এই দুশমনের হাতে দুটো ঘুষি খেলেই তো আমি উসপার্। ক্ষীণ কণ্ঠে যতই প্রতিবাদ করে বোঝাবার চেষ্টা করি যে ফ্রলাইনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অনুরাগ নেই, আমার মনে কোনো রকম মতলব নেই, ছিল না, হওয়ার কথাও নয়, সে ততই চেঁচায় আর 'কাপুরুষ' বলে গালাগাল দেয়।'

আড্ডার চ্যাংড়া সদস্য গোলাম মৌলা শুধাল, 'আর কেউ মুখটাকে বোঝাবার চেষ্টা করল না যে, আপনি নির্দোষ?'

চাচা বললেন, 'তুই এদেশে নূতন এসেছিস তাই এ-সব ব্যাপারের মরাল অথবা ইমরাল কোডের খবর জানিসনে। এদেশে এসব বর্বরতাকে বলা হয়, 'অন্যলোকের ঘরোয়া মামেলা' Personal matter. এরা আসলে থাকে বিন্-টিকিটে মজা দেখবে বলে।'

চাচা বললেন, 'ততক্ষণে অসুরটা আবার নাৎসি বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছে। 'যত সব ইহুদি আর বাদ-বাকী কালা আদমি নেটিভরা এসে এদেশের মানইজ্জৎ নষ্ট করে ফেললো, এই করেই বর্ণসঙ্কর (অবশ্য একটা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছিল) হয়, এই করেই দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে, অথচ জর্মনির আজ এমন দুরবস্থা যে এরকম অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারছে না।' বিশ্বাস করবে না, দু'একজন ততক্ষণে তার কথায় সায় দিতে আরম্ভ করেছে আর আমার দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন আমি দুনিয়ার সব চেয়ে মিটমিটে শয়তান, আর কাপুরুষস্য কাপুরুষ।

মাপ চেয়ে নিলে কি হত বলতে পারিনে কিন্তু মাপ চাইতে যাব কেন? আমি দোষ করিনি এক ফোঁটা, আর আমি চাইতে যাব মাপ। ভয় পাই আর নাই পাই, আমিও তো বাঙাল। আমার গায়ের রক্ত গরম হয় না? দুনিয়ার তাবৎ বাঙালদের মানইজ্জৎ বাঁচাবার ভার আমার উপর নয় জানি, কিন্তু এই বাঙালটাই বা এমন কি দোষ করল যে লোকে তাকে কাপুরুষ ভাববে?'

চাচা বললেন, 'আমি বললুম, 'এসো তবে, যখন নিতান্তই মারামারি করবে বলে মনস্থির করেছ, তবে তাই হোক্।' মনে মনে বললুম, দুটো ঘুষি সইতে পারলেই চলবে, তারপর নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে যাব।'

এমন সময় হুঙ্কার শুনতে পেলুম, 'এই যে! সব ব্যাটা মাতাল এসে একত্তর হয়েছে হেথায়। এসো, এসো, আরেক পাত্তর হয়ে যাক্, মেলার পরবে—'

চাচা বললেন, 'তাকিয়ে দেখি অস্কার। একদম টং। এক বগলে খালি বোতল, আরেক বগলে ডানা-কাটা পরী। পরীটিও যেন শ্যাম্পেনের বুদ্বুদে ভর করে উড়ে চলেছেন। সেই উৎকট সঙ্কটের মাঝখানেও না ভেবে থাকতে পারলুম না, মানিয়েছে ভালো।

অস্কারকে দুনিয়ার কুল্লে মাতাল চেনে। আমার কথা ভুলে গিয়ে সবাই তাকে উদ্বাহু হয়ে 'আসতে আজ্ঞা হোক, 'বার'-এ দাঁড়াতে আজ্ঞা হোক' বলে অকৃপণ অভ্যর্থনা জানালো।

ওদিকে আমার মোষটা বাধা পড়ায় চটে গিয়ে আরো হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'তবে আয় বেরিয়ে।'

তখন অস্কারের নজর পড়ল আমার দিকে। আমাকে যে কি করে সে-অবস্থায় চিনতে পারল তার সন্ধান সুস্থ লোক দিতে পারবে না। পারবেন দিতে অস্কারের মত সেই গুণী যিনি মৌজের গৌরীশঙ্কর চড়ে জাগরণসুষুপ্তিস্বপ্নতুরীয় ছেড়ে পঞ্চমে পৌঁছতে পারেন। কাইজারের জন্মদিনের কামানদাগার মত

আওয়াজ ছেড়ে বললে, 'ঐ রেঃ। ঐ ব্যাটা কালা ইণ্ডার, মিশ্ শয়তানও এসে জুটেছে। যেখানেই যাও, শয়তানের মত সব জায়গায় উপস্থিত। বিয়ার ধরেছিস নাকি? এক পাত্তর হয়ে যাক্। আজ তোকে খেতেই হবে। মেলার পরব।'

ষাঁড় আবার হুঙ্কার ছেড়েছে। অস্কার তার দিকে তাকিয়ে আর তার আস্তিন-টানা মারমুখো তসবির দেখে আমাকে শুধালো, 'ইনি কিনি বটেন?'

আমি হামেহাল 'জেণ্টিলম্যান'। শাস্ত্রসম্মত কায়দায় পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু দুশমন অস্কারকে চেঁচিয়ে বললে, 'তুমি বাইরে থাকো, ছোকরা। ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে'

অস্কার প্রথমটায় এরকম মোগলাই মেজাজ দেখে একটুখানি থতমত খেয়ে গেল। খালি বোতলটায় একটা টান দিয়ে অতি ধীরে ধীরে মিনিটে একটা শব্দ উচ্চারণ করে বলল, 'এর—সঙ্গে—আমার—বোঝাপড়া—আছে? কেন বাবা, এত রাগ কিসের? এই পরবের বাজারে? তা ইণ্ডারটা ঝগড়াটে বটে। হলেই বা। এস, বেবাক ভুলে যাও। খেয়ে নাও এক পাত্তর। মনে রঙ লাগবে সব ঝগড়া কপ্পূর হয়ে যাবে।'

বলে জুড়ে দিল গান। অনেকটা রবিঠাকুরের 'রঙ যেন মোর মর্মে লাগে' গোছের।

দুশমন ততক্ষণে আমার দিকে ঘুষি বাড়িয়ে তেড়ে এসেছে।

'হাঁ হাঁ করো কি, করো কি?' বলে অস্কার তাকে ঠেকালো। অস্কার আমার সপত্নের চেয়ে দু'মাথা উঁচু। আমাকে জিজ্ঞেস করল. 'কি হয়েছে? নাৎসিদের ফের গালাগাল দিয়েছিস বুঝি?'

আমি যতটা পারি বোঝালুম। শেষ করলুম, 'কী মুশকিল!' বলে।

অস্কার বলল, 'তা আমি কি তোর মুশকিল-আসান নাকি, না তোর ফ্যুরার। আর দেখছিস না ও আমার পার্টির লোক।' আমি হাল ছেড়ে দিলুম।'

কিন্তু অস্কারকে বোঝা ভার।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সেই ষাঁড়কে জিজ্ঞেস করল, 'ইণ্ডারটা তোমার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরেছিল?' আমি বললুম, 'ছিঃ অস্কার!' সপত্ন বলল, 'চোপ্!'

অস্কার শুধাল, 'চুমো খেয়েছিল?' আমি বললুম, 'অস্কার!' সপত্ন বলল, 'শাট আপ্!'

তখন অস্কার সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েটিকে দু'হাত দিয়ে চেয়ার থেকে দাঁড় করাল। বললে, 'খাসা মেয়ে।' তারপর বলা নেই কওয়া নেই তাকে জড়িয়ে

ধরে বমশেলের মত শব্দ করে খেল চুমো।

সবাই অবাক! আমিও। কারণ অস্কারকে ওরকম বেহেড মাতাল হতে আমিও কখনো দেখিনি। কিন্তু আমারই ভুল।

আমাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে ফেলে সে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল সেই ছোকরার। একদম সাদা গলায় বলল, 'দেখো বাপু, আমার বন্ধু ইণ্ডারটি তোমার বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরেনি, চুমোও খায়নি। তবু তুমি অপমানিত বোধ করে তাকে ঠ্যাঙ্গাতে যাচ্ছিলে। ও রোগা টিঙটিঙে কিনা। ওঃ, কী সাহস! কিন্তু আমি তোমার বান্ধবীকে চুমো খেয়েছি। এতে তোমার জরুর অপমান বোধ হওয়া উচিত। আমিও সেই মতলবেই চুমোটা খেলুম। তাই এসো, পয়লা আমাকে ঠ্যাঙাও তারপর না হয় ইণ্ডারটাকে দেখে নেবে।'

হুলুস্থূল পড়ে গেল। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কয়, কিছু বোঝবার উপায় নেই। ছোকরা পড়ে গেল মহা বিপদে। অস্কারের সঙ্গে বক্সিং লড়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। গেল বছরই এ অঞ্চলের চেম্পিয়ন হয়েছে ঐ সামনের শরাব-খানাতেই। ছোকরা পালাতে পারলে বাঁচে কিন্তু অস্কার না-ছোড়-বান্দা। আর পাঁচজনও কথা কয় না—এরকম রগড় তো পয়সা দিয়েও কেনা যায় না। সব পার্সনাল ম্যাটার কি না!

কিন্তু আমি বাপু ইণ্ডার, কালা আদমী। আমি ছুটে গিয়ে ডাকলুম পুলিস। ফিরে দেখি ছোকরা মুখ বাঁচাবার জন্য মুখ চুন করে কোট খুলছে আর শার্টের আস্তিন গুটোচ্ছে। অস্কার যেন খাসা ভোজের প্রত্যাশায় জিভ দিয়ে চ্যাটাস্ চ্যাটাস্ শব্দ করছে।

পুলিস নিতান্ত অনিচ্ছায় বাধা দিল। ট্যাক্সি ডেকে কপোত-কপোতীকে বিদেয় করে দিল।

অস্কার বলল, 'ওরে কালা শয়তান, কোথায় গেলি? আমার বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।'

বান্ধবী সোহাগ ঢেলে শুধালেন, 'আপনি কোন্ দেশের লোক।' পয়লা কপোতীও ঠিক এই প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ করেছিল।

আমি দিলুম চম্পট। অস্কার চেঁচিয়ে শুধালো, 'যাচ্ছিস কোথায়?' আমি বললুম, 'আর না বাবা। এক রাত্তিরে দু'দুবার না।'

সত্যপীরের কলমে

এই অংশে অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলি সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৪৫ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় সত্যপীর ছদ্মনামে লিখেছিলেন। এগুলি এতাবৎকাল কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে জানা যায় নি। 'সত্যপীর' ছদ্মনামে লিখিত হয়েছিল বলেই এই অংশ 'সতপীরের কলমে' নাম অভিহিত হল। —সম্পাদক

লাক্ষাদ্বীপ

বহু বৎসর পূর্বে আমি মাদ্রাজ শহরে এক বন্ধুর বাড়িতে বাস করতুম। তখন চিনি বড্ড রেশনড্ ছিল। যে-ঘরের বারান্দায় বসেছিলুম সেখানে বন্ধুপত্নী কাগজে মোড়া চিনি একটা বোয়ামে রেখে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন। সেই কাগজের টুকরোটা হাওয়ায় ভেসে ভেসে এসে আমার পায়ের কাছে ঠেকল। আমার চোখ গেল যে, কাগজটাতে আরবী হরফে কী যেন লেখা। আশ্চর্য। এই মাদ্রাজ শহরে চিনির দোকানে আরবী কাগজ এল কোথা থেকে? কৌতুহল হল। কাগজটি তুলে ধরে পড়বার চেষ্টা দিলুম। তখন দেখি আরবী হরফে যেসব ভাষা লেখা হয় এটা তার কোনোটাই নয়। আরবী নয়, ফারসী নয়, উর্দু নয়, সিন্ধী নয় (সিন্ধী আরবী হরফে লেখা হয়), কিছুই নয়। তুর্কী ভাষা আমি জানি না। কিন্তু তুর্কী ভাষা এই মাদ্রাজে এসে পৌঁছবে কী প্রকারে? একটি পাতার তো ব্যাপার; ধৈর্য সহকারে পড়ে যেতে লাগলাম এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ শব্দটি দেখি "মুদরায়ে" অর্থাৎ মদুরা। তাহলে ইটি ভারতীয় ভাষা। তখন ছিন্ন পত্রখানা ফের সযত্নে পড়ে দেখি, খাস আরবী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মিশে আছে মালায়লাম ও তামিল শব্দও। হঠাৎ মাথায় খেলল, এটি তাহলে মপলাদের ভাষা। এরা আরব ও মালায়লমের বর্ণসঙ্কর। পরের দিন বন্ধু যখন কর্মস্থলে গেলেন তখন ছিন্ন পত্রটি তাঁর হাতে দিয়ে আমার অনুমানটি কনফার্ম করিয়ে নিলুম। এবং অনুসন্ধান করে আরো জানলুম, লাক্ষা-দ্বীপকে নিয়ে যে দ্বীপপুঞ্জ গঠিত সেগুলোর ভাষাও নাকি মোটামুটি ঐ একই।

হালে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী এই দ্বীপপুঞ্জটির সফরে গিয়েছিলেন। আমি আশা করেছিলুম, এই সুবাদে আমাদের দেশের ঐ অংশটি সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানতে পাবো। তা জেনেছি নিশ্চয়—এঁদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সাংবাদিক সবিস্তর বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু আমার কৌতূহল ছিল এঁদের প্রাচীন ইতিহাস জানবার। সে-বাবদে "যে তিমিরে সে তিমিরেই" রয়ে গেলুম।

প্রথম প্রশ্ন লাক্ষাদ্বীপ কথাটার অর্থ কি? ইংরিজিতে বানান করা হয় Laccadive এবং এর শেষাংশ "দীব" যে দ্বীপ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আরবী ভাষায় "প" অক্ষরটি নেই বলে সে স্থলে "ব" বা "ওয়া" (অর্থাৎ ইংরিজি V অক্ষর) ব্যবহৃত হয়: তাই "দীব" বা "দীও" নিশ্চয়ই দ্বীপ। কিন্তু প্রশ্ন "লাক্ষা" শব্দের অর্থ কি? পণ্ডিতেরা বলেন, ওটা সংস্কৃত লক্ষ (১,০০,০০০)

থেকে এসেছে। অথচ লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জে দ্বীপের সংখ্যা মাত্র চোদ্দটি। এমন কি এই দ্বীপপুঞ্জের সংলগ্ন, মাত্র আশী মাইল দূরে অবস্থিত মালদ্বীপের (এ-এলাকা ভারতের অংশ নয়) চতুর্দিকে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে তার সংখ্যাও তিন শত (এর মধ্যে মাত্র সতেরোটিতে লোকাবাস আছে এবং এদের ভাষা আরবী মিশ্রিত সিংহলী)। এই তিনশ এবং লাক্ষাদ্বীপের চৌদ্দটি (বসতি আছে সাকুল্যে তাহলে বাইশটি দ্বীপে) নিলেও তাকে লক্ষ সংখ্যায় পরিবর্তিত করতে হলে এদেরকে হাজার হাজার ডবল প্রমোশন দিতে হয়। তবে কি না, কী হিন্দু পুরাণকার কী মুসলমান পর্যটক ঐতিহাসিক গণনা করার (শুমার করার) সময় বেশ-কিছুটা কল্পনাশক্তির আশ্রয় নিয়ে ১০০ বা ১০০০-র পিছনে গোটা তিনেক শূন্য বসিয়ে দিতে কার্পণ্য করতেন না। এরই একটি উদাহরণ পাওয়া যায় বাঙলা দেশের কেচ্ছাসাহিত্যে: "লোক মরে লক্ষ লক্ষ, কাতারে কাতার।/ শুমার করিয়া দেখি আড়াই হাজার॥" তবু এ কবিটির কিঞ্চিৎ বিবেক-বুদ্ধি ছিল। উৎসাহের তোড়ে প্রথম ছত্রে "লক্ষ লক্ষ" বলে শেষটায় মাথা ঠাণ্ডা করে বললেন, "না, পরে গুনে দেখি, আড়াই হাজার।" অতএব আড়াই হাজার যদি লক্ষ লক্ষ হতে পারে তবে তিনশো দ্বীপকে মাত্র এক লক্ষে পরিণত করতে আর তেমন কি "ভয়াঙ্কর অস্থবিস্তে"! তদুপরি মূল পাণ্ডুলিপির কপি করার সময় নকলনবীসরা শূন্য সংখ্যা বাড়াতে ছিলেন বড়ই উদারচিত্ত।

এতসব "যুক্তি" থাকা সত্ত্বেও আমি অতিশয় সভয়ে একটি নিতান্ত এমেচারি (ফোক ইটিমলজি) শব্দতাত্ত্বিক "গবেষণা" পেশ করি।

লাক্ষা শব্দের অর্থ গালা। "পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের শাখায় পুঞ্জীভূত কীট-বিশেষের দেহজ রস হইতে ইহা উৎপন্ন হয়" (হরিচরণ)। এর রঙ লাল। হিন্দীতে এর নাম লাক এবং ইংরিজি ল্যাক এর থেকে এসেছে।···লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ নির্মিত হয়েছে এক প্রকারের কীটের রস থেকে। এর নাম প্রবাল এবং এর রঙ লাল, গোলাপি, সাদা ইত্যাদি হয়। কিন্তু প্রবাল বলতে সংস্কৃতে সর্বপ্রথম অর্থ: অঙ্কুর, কিসলয়, নবপল্লব—অতএব বৃক্ষের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।

তাই আমার মনে সন্দেহ জাগে সেই প্রাচীন যুগে যখন লাক্ষাদ্বীপের নামকরণ হয় (এবং আর্যরা ঐ প্রথম প্রবালদ্বীপ, কোরাল্ আইল্যাণ্ড-এর সংস্পর্শে আসেন) তখন তাঁরা হয়তো "লক্ষ" সংখ্যার কথা ভাবেননি, তাঁরা এর নামকরণ করেছিলেন লাক্ষার সঙ্গে এর জন্মগত, বর্ণগত, রসাগত রূপ দেখে॥

সিন্ধুপারে

লাক্ষা দ্বীপ নিয়ে বড্ড বেশী তুলকালাম করার কোনই প্রয়োজন থাকত না, যদি না তার সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বিজড়িত থাকতো।

প্রথম প্রশ্ন : পশ্চিমদিকে ভারতীয়রা কতখানি রাজত্ব বিস্তার করেছিল? কোন্ কোন্ জায়গায় তারা কলোনি নির্মাণ করেছিল?

আমার সীমাবদ্ধ ইতিহাস ভূগোল জ্ঞান বলে, পশ্চিম দিকে, ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারী থেকে প্রায় দু' হাজার মাইল দূরে, আদন বন্দরের প্রায় ছ' শ মাইল পূব দিকে সোকোত্রা দ্বীপে। ম্যাপ খুললেই দেখা যায়, এ-দ্বীপ যার অধিকারে থাকে সে তাবৎ লোহিত সাগর, আরব সমুদ্র এবং পার্শিয়ান গাল্‌ফের উপরও আধিপত্য করতে পারে।

এই সোকোত্রা দ্বীপের গ্রীক নাম 'দিয়োস্‌করিদেস্' এবং পণ্ডিতেরা বলেন এ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'দ্বীপ-সুখাধার' থেকে। মনে হয়, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত থেকে নৌকোয় বেরিয়ে, দু' হাজার মাইল ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যে-কোনো জায়গায় পৌঁছলেই মানুষ সেটাকে 'সুখাধার' বলবেই বলবে। কিন্তু এ-দ্বীপের পরিষ্কার ইতিহাস জানবার তো উপায় নেই। প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিকরা বলছেন, এ দ্বীপে বাস করতো ভারতীয়, গ্রীক ও আরব বণিকরা। পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকরা বলছেন, এটা তখন ভারতীয় বম্বেটেদের থানা। তারা তখন আরব ব্যবসায়ী জাহাজ লুটপাট করতো।

মনে বড় আনন্দ হল। এদানির 'অহিংসা' 'অহিংসা' শুনে শুনে প্রাণ অতিষ্ঠ। আমরাও যে একদা বম্বেটে ছিলুম সেটা শুনে চিত্তে পুলক জাগলো। বম্বেটেগিরি হয়তো পুণ্যপন্থা নয়, কিন্তু এ-কথা তো সত্য যে-দিন থেকে আমরা সমুদ্র-যাত্রা বন্ধ করে দিলুম সেইদিন থেকেই ভারতের দুঃখ দৈন্য, অভাব দারিদ্র্য আরম্ভ হল।

সোকোত্রা দ্বীপকে মিশরীরা নাম দিয়েছিল 'সুগন্ধের সারিভূমি'—অর্থাৎ সারি কেটে কেটে যেখানে সুগন্ধ দ্রব্যের চাষ হয়। এবং এখনো সেখানে ঘৃতকুমারী (মুসব্বর), মস্তকি (myrrh), গুগ্‌গুল এবং আরো কি একটা উৎপাদিত হয়। মামি তৈরী করার জন্য মিশরীয়দের অনেক-কিছুর প্রয়োজন হত। এবং খুশ-বাইয়ের প্রতি ওদের এখনো খুবই শখ। খৃষ্টপূর্ব হাজার বৎসর আগে রচিত রাজা 'সুলেমানের গীতে' বিস্তর সুগন্ধের উল্লেখ আছে। এদের অধিকাংশই

যেত ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং সোকোত্রা থেকে। এবং এই সোকোত্রাই ছিল ভারত ও আরব বণিকদের পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের মিলনভূমি। আরবদের মারফতে সে-সব গন্ধদ্রব্য বিলেত পর্যন্ত পৌছত। তাই শেকসপীয়র ভেবেছিলেন এ-সব গন্ধদ্রব্য বুঝি আরব দেশেই জন্মায়—লেডি মেকবেথ বলছেন, "অল দি পারফিউমজ অব আরাবিয়া উইল নট স্থইটেন দিস লিটিল হ্যাণ্ড"। এই গন্ধের ব্যবসা তখন খুবই লাভজনক ছিল। এবং কাঠিয়াওয়াড়ের গন্ধবণিকরা এর একটা বড় হিস্যা পেতেন। মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকীতে এই সুবাদে স্মরণ যেতে পারে যে তিনি জাতে গন্ধবণিক—সেই 'গন্ধ' থেকে তাঁর পরিবারের নাম গাঁধী।

ভারতীয় বণিকরা লাক্ষাদ্বীপ বা মালদ্বীপ থেকে তাদের শেষ রসদ—এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস জল—নিয়ে এখান থেকে পাগের নৌকায় করে দু হাজার মাইলের পাড়ি দিতেন।

* * *

সচরাচর বলা হয়, আরব নাবিকরাই প্রথম মৌসুমী বায়ু আবিষ্কার করে। আমি কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করি। আমার ধারণা ভারতীয়রাই প্রথম লক্ষ্য করে যে শীতকালে বাতাস পশ্চিমবাগে বয়। তারই সুবিধে নিয়ে পাল তুলে দিয়ে পণ্যসম্ভার নিয়ে তারা যেত সোকোত্রা। ফিরে আসত গ্রীষ্মারম্ভে—যখন সোকোত্রা থেকে পূব বাগে বাতাস বয়। ভারতীয় নাবিক যদি কোস্টাল সেলিংই (পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে) করবে তবে তো তারা সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্থান, ইরানের পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে দক্ষিণ আরবিস্থানে পৌছে যেত। অর্থাৎ আদন বন্দরের কাছাকাছি। সেখান থেকে আবার ছ' শ মাইল পূব বাগে সোকোত্রা আসবে কেন?

তারপর কর্তারা সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করে দিলেন।

সে-কথা আরেকদিন হবে।

প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ

সঠিক বাঙলা অনুবাদ হল কিনা তাই নিয়ে অনেকেরই মনে ন্যায্য সন্দেহ হতে পারে। ইংরিজিতে একে বলে "অল্ ইনডিয়া অরিএনটাল কনফারেন্স।" আমার এতদিন বিশ্বাস ছিল এর নাম "অল্ ইনডিয়া অরিএনটালিসটস কনফারেন্স"। দুটো নামই আমার কাছে কেমন যেন সামান্য বেখাপ্পা ঠেকে। "অল্ ইনডিয়াই"

যদি হবে তবে তার সঙ্গে "অরিএনটাল" জোড়া যায় কী প্রকারে? পক্ষান্তরে দ্বিতীয় নাম "অল্ ইনডিয়া অরিএনটালিসটস"ও কেমন যেন মনে সাড়া জাগায় না। অরিএনটালিসট বলতে বোঝায়, অরিএনট সম্বন্ধে যিনি বিজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু রূঢ়ার্থে বোঝায়, যে সব ইয়োরোপীয় পণ্ডিত অরিএনট নিয়ে চর্চা করেন। এই নিয়ে যখন আমি আমার এক দর্শনে সুপণ্ডিতা বান্ধবীর সঙ্গে আলোচনা করছি তখন তিনি বললেন, "হ্যাঁ। কেমন যেন ঠিক মনে হয় না। মাকসম্যুলার অরিএনটালিসট আবার রাধাকৃষ্ণনও অরিএনটালিসট?" আমার মনে হল, তাঁর মনে ধোঁকা জেগেছে, দুজনার মাহাত্ম্য কি একই? রাধাকৃষ্ণন তাঁর আপন দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শনের চর্চা করেছেন, সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ যে সাত সমুদ্রের ওপারের মাকসম্যুলার ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শনের চর্চা করলেন— এ দুজনাতে তো একটা পার্থক্য আছে। তুলনা দিয়ে বলি, আপনি ভারতীয়, তাই আপনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিলেন। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সাতসমুদ্রের ওপারের পুণ্যশ্লোকা এ্যানি বেসানত, দীনবন্ধু এ্যানড্রুজ যখন এ-আন্দোলনে যোগ দিলেন, সে দুটো কি একই?

যদ্যপি জরমন ভাষা কাঠখোট্টা তবু প্রাচী = অরিএনট এবং প্রতীচী = অকসি-ডেনট নিয়ে কথা বলতে গেলে ওরা ঐ দু ভূখণ্ডের জন্য দুটি বড়ই সুন্দর নাম দেয়। এই প্রাচ্যভূমিকে বলে "মরগেন লানট" = "ভোরের দেশ" "সূর্যোদয়ের দেশ"— জরমন ভাষায় "মরগেন" শব্দের অর্থ "সকাল" "ভোর"। তাই তারা সকালবেলা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে বলে "গুটেন মরগেন" = গুড মরনিং। পক্ষান্তরে তাদের নিজের দেশ তথা ইয়োরোপকে বলে "আবেনট লানট" অর্থাৎ "সূর্যাস্তের দেশ"। তাই বিকেল বেলা সন্ধ্যে বেলা, এমন কি রাত্রেও দেখা হলে বলে "গুটেন আবেনট"।

খুব সম্ভব এই কারণেই ভারতবর্ষের প্রতি জরমন পণ্ডিতদের একটা বিনয়নম্র ভাব-শ্রদ্ধা আছে। ইংরেজ ফরাসী ডাচদের সে শ্রদ্ধা নেই। কারণ তারা প্রাচ্যভূমি এশিয়াতে রাজত্ব করতো। তাই এনারা যখন ইয়োরোপের কোনো "অরিএনটালিসটস কনফারএনসে" যান তখন কেমন যেন মুরুব্বিয়ানা করেন। ভাবটা এই, তাঁরা যে ভারতের ব্যাপারে ইনটরেসট দেখাচ্ছেন সেটা যেন, অনেকটা মুনিব তার চাকরের বউবাচ্চার সম্বন্ধে পলাইট বাট ডিসটেনট খবর নিচ্ছেন (পাছে না দু' টাকা খসাতে হয়)।

এই মুরুব্বীয়ানাটা আমাকে ঈষৎ পীড়িত করে। হপ্তা তিনেক পরে পূর্বে আমি বলেছিলাম আমি অত সহজে অপমানিত হই না। ইতিমধ্যে খান আবদুল গফফার বাদশা মিঞা বলেছেন, ভারত যে রাবাতে গিয়েছিল সেটা অনুচিত

হয়নি। কিন্তু পত্রান্তরে জনৈক সম্পাদক অতিশয় ভদ্র ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, "কিন্তু সকলেই এ মত পোষণ নাও করতে পারেন" (নট এভরিবডি শেয়ারজ ইট) এবং এই আনন্দবাজারেই জনৈক পত্রলেখক আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কঠোর আপত্তি জানান। ধর্ম সাক্ষী করে বলছি, এঁদের বিরুদ্ধে আমার কোনো ফরিয়াদ নেই। কে কোন আচরণে অপমানিত হবেন না হবেন সেটা তাঁর স্পর্শ-কাতরতার উপর নির্ভর করে। এঁরা স্পর্শকাতর। কিন্তু আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া। মরক্কো লেদার তার তুলনায় ধুলিপরিমাণ—লস্থি লস্থি।

মূল বক্তব্যে ফিরে আসি।

ইওরোপীয়রা বিশেষ করে ইংরেজ ফরাসী ডাচ যদি আমাদের প্রতি মেহের-বাণী দেখায় তবে আমরাই বা তাদের প্রতি মেহেরবাণী দেখাবো না কেন ?

অতএব আমি প্রস্তাব করি এই ভারতবর্ষে যেন "অকসিডেনটালিসট কন-ফারেন্স্ নির্মিত হয়। ইয়োরোপের ইংরেজ ফরাসী ডাচ অরিএনটালিসটরা যে রকম আমাদের সতীদাহ, বহুবিবাহ নিয়ে আলোচনা করেন আমরা ঐ কনফারেনসে সাহেবদের কল গার্ল, কীলার প্রফুমো ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবো। কিন্তু বিপদ এই : আমাদের ভারতীয় সভ্যতা যায় নিদেন খৃ. পূ. দু' হাজার বছর পূর্বে। ইয়োরোপীয়দের সভ্যতা মেরে কেটে ছ'শ বছর পূর্বে। যতই প্রাচীন সভ্যতা হয়, ততই তাকেই আঘাত করা যায় বেশী। বুড়ো-ঠাকুরদাকে গাঁট্টা মারা খুবই সহজ।

এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার জন্য আমি সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীরদ সি চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করি। ইয়োরোপীয় কাণ্ডকারখানা উনি বিলক্ষণ বিচক্ষণরূপে জানেন। তদুপরি তিনি সংস্কৃত ভাষা এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে উত্তমতমরূপে সুপরিচিত। শেয়ানা পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ শুদ্ধুমাত্র ইয়োরোপীয় গুণীজ্ঞানীরই উদ্ধৃতি দেন।

পুনরপি প্রাচ্য

না আর রসিকতা না। এবারে আমাকে সিরিয়স হতে হবে। স্বর্গত প্রমথ চৌধুরীও প্রতি বৎসরে এই শপথ নিতেন এবং সে-লিখিত শপথের কালি শুকোতে-না-শুকোতেই সেটি পরমানন্দে ভঙ্গ করতেন। আমি সেই মহাজনপন্থাই অবলম্বন করছি।

প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে কি-সব সমস্যা কি-সব বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয়েছে

তার কিছু কিছু বিবরণ খবরের কাগজে বেরিয়েছে এবং কয়েকদিন পূর্বে হিন্দুস্থান স্ট্যানডারডের সম্পাদক মহাশয় সে সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত তথা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। কিন্তু যে-সব বিষয়বস্তু কনফারেনসে আলোচিত হয়নি সে-সংবাদ জানবো কি প্রকারে? তাই আমার মনে দুটি সমস্যা জেগেছে। এ-দুটি নূতন নয়। আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনে আমি যাই তিরু অনন্তপুরমে বরদা সরকারের প্রতিভূরূপে ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি। সেই থেকে।

প্রথম: এই যে গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইয়োরোপীয়রা এশিয়াতে রাজ্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন—ইংরেজ ফরাসী অস্ট্রিয়ান ডাচ পর্তুগীজ ইত্যাদি ইত্যাদি—এদের মহাফেজখানাতে (আর্কাইভে) বিস্তর দলিলপত্র রয়েছে। এগুলোর সাহায্য বিনা ভারতের গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস সর্বাঙ্গসুন্দর হয় না। কিন্তু এসব দলিলদস্তাবেজ নিয়ে গবেষণা করে সেগুলোকে প্রকাশিত করাতে স্বভাবতই আজ এদের আর কোনো ইনটরেস্ট্ নেই। যতদূর মনে পড়ে, একমাত্র ডাচ সরকারই বছর কয়েক পূর্বে এ-কর্ম করার জন্য ভারতীয়দের আমন্ত্রণ জানান এবং দুটি ভালো স্কলারশিপ দিতে চান। এর ফল কি হয়েছে জানিনে। অতএব এ-সব ভিন্ন ভিন্ন দেশের মহাফেজখানার অমূল্য দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে গবেষণা করার দায়িত্ব আমাদেরই—ভারতীয়দের।···এ-ছাড়া এদের আরকাইভে আছে, ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, পাঠ্যপুস্তক, অনুবাদ ইত্যাদি। সেগুলোও মহামূল্যবান। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"—না কি যেন নাম—অনেকেই জানেন।

দ্বিতীয়: এবং এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা। নমস্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা তো অগাধ গবেষণা করেছেন, যথা মহাভারত রামায়ণের প্রামাণিক পাঠ প্রকাশ করেছেন, করছেন এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদির জন্যও ঐ পদ্ধতিতে তৎপর! এ-কর্মের প্রশংসা অজ্ঞ বিজ্ঞ তাবজ্জন করবেন। কিন্তু প্রশ্ন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে প্রতিদিন ভারতীয়দের ইনটরেস্ট্ কমে যাচ্ছে, সেটা ঠেকানো যায় কি প্রকারে? অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তম উত্তম ধন মূল সংস্কৃতে যত না হোক, অনুবাদ মারফৎ কোন্ পদ্ধতিতে সাধারণজনের সামনে আকর্ষণীয়রূপে দিতে পারি? এক কথায় সংস্কৃত, অর্ধমাগধী, পালি, প্রাকৃত, সান্ধ্য ইত্যাদিতে লিখিত প্রকৃত হীরাজওহর পপুলারাইজ করি কি প্রকারে? তারা যে কলচরড পাব্‌ল, প্ল্যাসটিক চাম্ব। এবং এটা না করতে পারলে যে প্রাচ্যবিদ্যা তথা প্রাচ্যবিদ্বজ্জনের মহতী বিনষ্টি হবে সে-বিষয়ে অন্তত আমার মনে

কণামাত্র সন্দেহ নেই। কারণ, তুলনা দিয়ে বলি; জনগণ যেন দেশ-গাছের শিকড়, বিদ্বজ্জন ফুল। শিকড় যদি শুকিয়ে যায় তবে ফুলের, ফলের তো কথাই নেই, মরণ অনিবার্য।...যেমন আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নাভিশ্বাসের সময়ে আমাদের চৈতন্য হল এবং আমরা এখন সেটিকে পপুলারাইজ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছি।

ইয়োরোপীয়দের ঐ একই সমস্যা। আমরা যেমন সংস্কৃতাদি একাধিক সাহিত্যের উপর এতকাল নির্ভর করে এসেছি, তারা করে দুটি সাহিত্যের উপর —গ্রীক এবং লাতিন। এবং চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এ-ভাষাগুলোর পড়ুয়া দিন দিন কমে যাচ্ছে। বিলেতের কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক লাতিন শেখার জন্য প্রতি বৎসর পাঁচটি এমনই দিলদরাজ বৃত্তি দেয় যে, যে-কোনো বৃত্তি-ধারী সে-অর্থে হস্টেলের খাইখরচা দিয়ে উত্তম বেশাদি পুস্তকাদি ক্রয় করার পর একাংশ দরিদ্র পিতামাতাকে পাঠাতে পারে। তথাপি, কাগজে পড়েছি, বছর তিনেক পূর্বে সেই পাঁচটি বৃত্তির জন্য মাত্র তিনটি ছাত্র দরখাস্ত পাঠায়!! বছর পঞ্চাশেক পূর্বে আসতো দুশো!!

এবং এহ বাহ্য। জনসাধারণও গ্রীক লাতিন সাহিত্যের অমূল্য অমূল্য সম্পদও ইংরিজি ফরাসী জর্মন অনুবাদে—যথা যার দেশ—পড়তে চায় না। তাই ইয়োরোপের বিদ্বজ্জন এসব সম্পদের নবীন নবীন অনুবাদ করছেন—দেশোপ-যোগী কালোপযোগী করে। এমন কি বাইবেলেরও।

আমাদের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবরা এ-বিষয়ে কি করছেন?

আমার মনে হয় কবি কালিদাস বাঙালী। প্রমাণ? একমাত্র বাঙালীই যে-ডালে বসে আছে সেটা কাটে। কালিদাসও তাই করতেন। অতঃ কালিদাস বাঙালী। প্রাচ্যজ্ঞরা ডালটা কাটছেন না বটে কিন্তু ডালটা যে শিকড়োত্থিত রসাভাবে শুষ্ক হয়ে ভেঙে পড়ছে সেদিকে খেয়াল নেই।

সিলেটী সাগা

১

অ ডুরা! কুনার সাব্‌রে আরক্ কট্‌য়া ছালন দেও।

অতিশয় বিশুদ্ধ সিলেটী উচ্চারণে বাক্যটি উচ্চারিত হল। আমি অবশ্য তার জন্য প্রস্তুত ছিলুম। যদ্যপি দেশ: লণ্ডনের টিলবারি ডক; কাল: ১৯৩১; পাত্র:

রেস্তোরাঁর মালিক। সে আমলে খাঁটি বিলিতি হোটেল-রেস্তোরাঁতে যে অখাদ্য নির্মিত হত সেটা হটেনটটীয় পর্যায়ের। কথায় বলে, ওট নামক বস্তুটি স্কটল্যাণ্ডে খায় মানুষ, ইংলণ্ডে খায় ঘোড়া। কিন্তু ঐ আমলে লণ্ডনের পোশাকী খানাও স্কটল্যাণ্ডের ঘোড়া পর্যন্ত খেতে রাজী হত না—এই আমার বিশ্বাস। তাই আমি লণ্ডনের 'লাঞ্চকে' বলতুম 'লাঞ্ছনা' আর সাপারকে বলতুম 'suffer'!

রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে এসেছেন শুনে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে যখন রাস্তায় নেমেছি তখন হঠাৎ এক সিলেটী দোস্তের সঙ্গে মোলাকাৎ। আলিঙ্গন কুশলাদির পর দোস্ত শুধালে, "অত রোগা কেন?" "একে দুর্দান্ত শীত, তদুপরি লণ্ডনের গুষ্টির-পিণ্ডি-চটকানো রান্না।" সংক্ষেপে বললে, "চলো"। এতদিন পরে সব ঘটনা আর মনে নেই—তবে বাসে করে যে অনেক অনেকখানি পথ যেতে হয়েছিল, সেটা স্পষ্ট মনে আছে। মোকামে পৌঁছে ভালো করে বেয়ারিং পাবার পূর্বেই দেখি, একটি ছোটখাটো রেস্তোরাঁর মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে এবং কানে গেল পূর্বোক্ত "অ ডুরা—ইত্যাদি", যার অর্থ, "ও ডোরা, কোণের সাহেবকে আরেক বাটি ঝোল দাও।"

হালে কাগজে পড়লুম, বিলেতে যে সব পাক ভারতের রেস্তোরাঁ আছে তার শতকরা ৮০ ভাগ সিলেটীরা চালায়। অবশ্য ঐ চল্লিশ বৎসর পূর্বে বিলেতে অত ঝাঁকে ঝাঁকে পাক ভারতীয় রেস্তোরাঁ ছিল না; তবে সে-রাত্রেই জানতে পাই, যে-কয়টি আছে তার পনেরো আনা সিলেটীদের। এমন কি লণ্ডনের নাম-করা হতচ্ছাড়া তালু-পোড়া দামের এক ভারতীয় রেস্তোরাঁর শেফ্ও সিলেটী।

ইতিমধ্যে দোস্ত শশাঙ্কমোহন "অটলালার" (হোটেলওয়ালার) সঙ্গে বে-এক্কেয়ার গালগল্প জুড়ে দিয়েছেন—আহা, যেন বহু যুগের ওপার হতে লণ্ড লস্ট্ ভ্রাতৃদ্বয়ের পুনর্মিলন। শশাঙ্ক আমাকে অটলালার পাশের একটা টেবিলের কাছে বসবার ইঙ্গিত দিয়ে আবার তার ভ্যাচর ভ্যাচরে ফিরে গেল। একটা দরজা খুলে যেতে দেখি, বেরিয়ে এল একটি প্রাপ্তবয়স্কা মেম। হাতের ট্রের উপর রাইস, কারি, ডাল, ভাজাভুজি। আমাদের দিকে নজর যেতেই মৃদুহাস্য করে গুড ঈভনিং বলে বয়সের তুলনায় অতি স্মার্ট পদক্ষেপে গট-গট করে প্রথম অন্যান্য খদ্দেরদের রাইসকার‍্যাদি দিয়ে সর্বশেষে "কোণের সাহেবের" টেবিলের উপর তার "ছালনের কট্রা" রাখলো। ইনিই তা হলে ডোরা।...জনা আষ্টেক খালাসী পরম পরিতৃপ্তি সহকারে সশব্দে, ছুরি কাঁটার তোয়াক্কা না করে খেয়ে চলেছে। আর দুজন গোরা একান্তে বসে ঐ খাদ্যই রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছে। ডোরা ফিরে আসতে অটলালা তার ক্যাশ ছেড়ে এল। আমরা চার-

জন এক টেবিলে বসলুম। অটলালা সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'আমরা তো বেশী পদ রাঁধি না—আমাদের গাহক তো সবই খালাসী, তু'একজন গোরা মাঝে মধ্যে। কিন্তু আপনারা অতদূর থেকে মেহেরবাণী করে এসেছেন। ভালোমন্দ কিছু করতে হয়।" আমাদের আপত্তি না শুনে তুজনা রান্নাঘরে চলে গেল। শশাঙ্ক বললে, "আশ্চর্য, কুড়ি বছর হয়ে গেল এই আম্বরউল্লা এ-দেশে আছে, তবু এক বর্ণ ইংরিজি শিখতে পারেনি। ওদিকে ওর বউ ডোরা দিব্য সিলেটী বলতে পারে। খালাসী গোরা সব খদ্দের ও-ই সামলায়। তবে ওর ইংরিজি বোঝাটাও চাট্টিখানি কথা নয়। একদম খাস খানদানী ককৃনি।" আমি শুধালুম, "বিয়েটা—মানে সিলেটী খালাসী আর লণ্ডনী মেমেতে হল কি প্রকারে?" "কেন হবে না? তুমি কি ভেবেছ ডোরা কোনো অক্সফরড ডন-এর মেয়ে এবং কেমব্রিজের রেঙলার? আর হক্ কথাই যদি কই, তবে বলি, সামাজিক পদমর্যাদায় আম্বর মিয়া তাঁর মাদামের চেয়ে ঢের ঢের সরেস। মিয়া চাষীর ছেলে আর ডোরা মু'চর মেয়ে। অবশ্য ডোরার মত লক্ষ্মী মেয়ে শতেকে গোটেক। আমাদের যে কী আদর করে, পরে দেখতে পাবে। আর—" এমন সময় আম্বর মিয়া সহাস্য আস্যে প্রত্যাবর্তন করে বললে, "আমাদের সুখদু:খের কথাতে মাঝে মাঝে বাধা পড়বে, স্যর। ডোরাই খদ্দেরদের কাছ থেকে হিসেবের কড়ি তোলে। এখন রাঁধছে। ওটা আমাকে সামলাতে হবে।" আমি ভয় পেয়ে মনে মনে বললুম, মেমের হাতের রান্নায় আবার সেই "লাঞ্ছনা", আবার সেই "সাফার"! আমরা তো গাঁটের রোক্কা সিক্কা ঝেড়ে হেথায় পৌঁছলুম, আর ঐ হতভাগা লণ্ডনী লাঞ্ছনা-সাফার কোথেকে বাস-ভাড়া যোগাড় করে আমাদের পিছনে ধাওয়া করলে? প্রকাশ্যে "রোস্টোমোস্টো রাঁধবে নাকি?"

হেসে বললে, "তাও কি কখনো হয়, স্যর! রাঁধবে খাঁটি সিলেটী রান্না।"

"শিখলো কার কাছ থেকে?"

"আমার কাছ থেকেই সামান্যই।" কিন্তু আমার গাহক খালাসী-ভাইদের ভিতর প্রায়ই বাঢ়িয়া বাঢ়িয়া বাবুর্চী থাকেন। তাঁদের কাছ থেকে সিলেটের পোশাকী খানা থেকে মামুলী ঝোল-ভাত সব-কিছু শিখে নিয়েছে—"। এমন সময় কোণের গোরা রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে সামান্য গলা চড়িয়ে বললে, "ও মিসিস উল্লা, আজকের কারিটাতে একদম ঝাল নেই। তুটো গ্রীন চিলি—সরি—সে তো এই গড ড্যাম দেশে নেই। তা হলে একটু টাবাস্কো চিলি সস্ দাও না।" বলে কি ব্যাটা! ডোরা যখন রাইস-কারি নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে-কারির কটকটে লাল রঙ দেখে আঁৎকে উঠে আমার মত খাস সিলট্যাও মনস্থির করেছিল

ঐ বস্তু কম মেকদারে খেতেহবে—চাটনির মত, আ লা চাটনি। আর এ-গোয়া হট, হট, ডবল হট মাদ্রাজী আচার দিয়ে তার ঝোলের ঝাল বাড়ালে।... একে একে, দুয়ে তিনে সব খদ্দের কড়ি গুনে চলে গেল। আমার চোখে একটুখানি ধাঁধাঁর ভাব দেখে বললে, "ঠিক ধরেছেন, স্যর। সক্কলের জেবে কি আর রেস্ত থাকে? ইনশাল্লা, দিয়ে দেবে কোনো এক খেপে। আর নাই বা দিলে।"

আমরা খেয়েছিলুম, বেগুন-ভাজা, মুড়িঘণ্ট, মটরপোলাও, মাছ ভাজা, মুর্গী কারি—বাকি মনে নেই। অসম্ভব সুন্দর রান্না। কিন্তু আর শুধোবেন না। আহারাদির আলোচনা আরম্ভ হলে আমার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। রাতও তখন অনেক। মোকা পেয়ে শশাঙ্ককে কানে কানে বললুম, "বিল?"

"চোক্কোরো। ও-কথা তুললে আম্বর-উল্লা ভ্যাক করে কেঁদে ফেলবে।"

শুধু কি তাই। বিদায় নেবার সময় ভোরা দোস্ত শশাঙ্কের হাতে তুলে দিলে একটা বাস্কেট। পথে নেমে সেটাকে প্রিয়ার গণ্ডদেশে হাত বুলোবার মত আদর করতে করতে বললে, "তিন দিনের দু-বেলার আহারাদি হে দোস্তো দুজনার —তিনজনারও হতে পারে॥"

২

ঠিক কোন্ সময়ে হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করেন ঠিক বলা যায় না। তবে এর ফল যে বিষময় হয়েছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই চট্টগ্রাম এবং সিলেটের (সিলেট সমুদ্রতীরবর্তী নয়, কিন্তু সিলেটে বিরাট বিরাট হাওর থাকায় মাঝিরা অন্ধকারে তারা দেখে নৌকা চালাতে পারে—লিণ্ডসে সাহেব গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে কম্পাসের সাহায্যে একাধিক হাওর পেরিয়ে চাল-ভর্তি মহাজনী নৌকা মাদ্রাজ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন—এবং সী-সিকনেস তাদের হয় না) লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী মাঝিমাল্লা অন্নহীন হয়ে যায়। এরপর আরব বণিকরা সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে ব্যবসা করতে এলে এরা প্রধানত পেটের দায়ে মুসলমান হয়ে গোড়ার দিকে আরব জাহাজে খালাসীর চাকরি নিয়ে পূর্বে ইন্দোনেসিয়া ও পশ্চিমে জেদ্দা, সুয়েজ বন্দর অবধি পাড়ি দেয়। কিছু দিনের মধ্যেই চট্টগ্রামের সদাগর সম্প্রদায় আপন আপন পালের জাহাজ নির্মাণ করে বর্মা মালয়ের সঙ্গে ব্যবসা চালাতে থাকে এবং এ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ইংরেজের কলের জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দেয়।

প্রধানত সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির মাঝিমাল্লা চাষাভূষোই গোড়ার দিকে ইয়োরোপীয় জাহাজে কাজ নেয় এবং এদের খালাসী বলা হত (এ স্থলেই

উল্লেখ করি সংখ্যায় প্রায় আশী হাজারের মত যে-সব সিলেটি বর্তমানে ইংলণ্ডে কলকারখানায় কাজ করে—শুনেছি সিলেটিদের তুলনায় পুব পাকের অন্যান্য জেলার লোকসংখ্যা নগণ্য—দেশের সিলেটবাসীরা এদের নাম দিয়েছেন 'লণ্ডনী', যদিও এদের বড় আড্ডা বোধ হয় নটিংহামে)। বহু বৎসর ধরে খালাসীরা ডাঙায় বাসা বেঁধে কলকারখানায় ঢোকেনি। কিন্তু বেশ-কিছু সংখ্যক সিলেটি ক্যানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে কলকারখানায় ঢুকে প্রচুর পয়সা কামিয়ে দেশে ফিরতো—ওখানে চিরতরে বাসভূমি নির্মাণ করতো না।

খালাসীবৃত্তি থেকে কবে কি করে এরা দক্ষিণ ও মধ্য ইংলণ্ডের কলকারখানায় ঢুকে পড়ে 'লণ্ডনী' খেতাব পায় তার কোনো লিখিত বিবরণ আমি পড়িনি। তবে আমার মনে হয়, ১৯২৯-৩৩-এর পূর্বে নয়, কারণ ঐ সময়ে ইয়োরোপ আমেরিকার কারখানাকর্মীদের ভিতর প্রচুরতম বেকারি। এরপরে, প্রধানতঃ যুদ্ধের সময় বিস্তর সস্তা লেবারের প্রয়োজন হল। আজ যে আপনি আমি লণ্ডন নটিংহামের যে-কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরিজি রেস্তোরাঁতেও 'পাটনা রাইস এবং কারি' পাচ্ছি তার গোড়াপত্তন হয় ঐ সময় ('পাটনা রাইস' বলে বটে, কিন্তু সেটা দেরাদুন, বাসমতী সব-কিছুই হতে পারে। বহু গবেষণা করে সন্ধান পেলুম কোম্পানির আমলে এ-দেশ থেকে যে-চাল বিলেত যেত সেটা প্রধানত সংগ্রহ করা হত পাটনার আড়তে যে-হরেক প্রদেশের চাল জড়ো হয়েছে তার থেকে; তাই এর অমনিবাস নাম হয়ে যায় 'পাটনা রাইস') সৈন্যদের এবং 'লণ্ডনীদের' ক্ষুধা নিবারণের জন্য। আজ এদেশ থেকে প্রতিদিন মণ মণ চাল, ডাল, শুঁটকি, মসলা ইত্যাদি তো যাচ্ছেই, তার উপর হাজার হাজার বোতল আম, নেবু, জলপাইয়ের আচার। গত বৎসর সিলেটে এক বিরাট আচার ফ্যাকটরি দেখে আমি স্তম্ভিত। পরে সে কারখানার অমায়িক মালিকের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, 'যা তৈরী হয় তার প্রায় বেবাক মাল চলে যায় লণ্ডনীদের খেদমতে। চাহিদাও বেড়ে চলেছে। আমি পেরে উঠছি না।' অবশ্য আমি জানতুম, মালদার ম্যাংগো স্লাইজ এবং মিষ্টি-টক (সুঈট-সাওয়ার) আমের আচারের এক বৃহৎ অংশ লণ্ডনী-দের তরেই যায়। কারণ সিলেটের আম জঘন্য। তার থেকে ভালো আচার হয় না—স্লাইস মাথায় থাকুন অবশ্য সিলেট থেকে সর্বোৎকৃষ্ট আনারস-স্লাইস বিলেত যায়। মার্কিন হাইনৎস ফিফটি সেভনের (বা অন্য সংখ্যাও হতে পারে) মত সিলেটি আচার কারখানা ৪৭ রকমের আচার, স্লাইস ইত্যাদি তৈরী করে। বুঝুন যে সিলেটি দেশে ভাত, লাল লঙ্কা পেশা, আর কিম্বৎ নিতান্তই মেহেরবান হলে একটি কাঁচা প্যাঁজ খেত—তাও দু বেলা নয় এবং সে-ও পেট ভরে নয়—সে কি না

আজ সিলেটের জমিদার-ছেলেরও যা জোটে না বিলেতে বসে তাই খায়। এস্তেক পান তক। পান যায় প্লেনে। তাই নাকি একটা খিলির দাম সিক্‌স্ পেন্‌স্ থেকে এক শিলিং!

সিলেটীরা বিলেতে চাকরি পায় কেন? কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন, সাদা আর কালো মজুরে সেখানে নিত্য লড়াই। আমি এ-বিষয়ে সরজমিনে তদন্ত-তাবাশ করিনি। যা শুনেছি, তাই বলছি: (১) কালোরা—বিশেষ করে সিলেটীরা—কম মাইনেতে কাজ করতে রাজী; নিগ্রোরা মদ খায়, জুয়া খেলে বলে তাদের খাঁই বেশী। (২) তুই শিফটে এবং রবিবারেও কাজ করতে রাজী—নিগ্রোরা খৃষ্টান, রবিবারে সাবাৎ মানে। (৩) ট্রেড ইউনিয়ন এড়িয়ে চলে, স্ট্রাইক করতে চায় না। (৪) রাত ভর মদ খেয়ে পরের দিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে না বলে কাজকর্মে কামাই দেয় কম।

এই সিলেটীরা অনেকেই মেম বিয়ে করে ওদের একটা দু-আঁসলা সমাজ গড়ে তুলেছে এবং ঘটকালি করে এই মেয়েরা নবাগত সিলেটীকে তাদের বোন ভাগ্নী বিয়ে দেবার জন্য। বোন ভাগ্নীও "লণ্ডনী"র বউয়ের কাছ থেকে জেনে গিয়েছে (১) সিলেটী মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বউকে ঠ্যাঙায় না (২) ঘোড়ার রেস, কুকুরের রেস, এমন কি কড়ি খর্চা করে ফুটবল খেলা দেখতেও যায় না, মদে পয়সা ওড়ায় না এবং কোনো প্রকারের জুয়োও খেলে না বলে বউ স্বচ্ছন্দে সংসার চালা-বার জন্য স্বামীর মাইনের একটা বড় হিস্সে পায়। বিয়ের পূর্বে বা পরে সে অন্য মেয়ের সঙ্গে পরকীয়া করে না—সে তো ধলা মেম পেয়েই খুশ! এ দুটো সেকু-রিটি পৃথিবীর সর্বত্রই রমণীমাত্রই খোঁজে। এবং কেউ কেউ তৃতীয় সেকুরিটিও দিতে পারে—আপন পয়সায় কেনা নিজস্ব কটেজ। আমার পরিচিত এক চৌধুরীর ছেলে তো নটিংহামে তিনখানা চেন্ হোটেল-রেস্তোরাঁর মালিক (আজকাল সিলেটী মুসলমানদের উচ্চশ্রেণীর লোকও নানা ধান্দায় "লণ্ডনী" হচ্ছেন)। তিনি তো অনায়াসে তৃতীয় সেকুরিটি দিতে পারেন। এছাড়া ছোট-খাটো আরো অনেক আরাম আয়েস আছে। বাচ্চা রাত্রে কেঁদে খাস-সায়েব মজুরের ঘুম ভাঙালে সে ধমক দিয়ে বউকে বাচ্চাসহ রান্নাঘরে খেদায়; "লণ্ডনী" গায়ে পড়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করে। দেশে ছেলেবেলা থেকেই সে কত ভাতিজা-ভাতিজী ঠাণ্ডা করেছে।…পাব-এ যায় না বলে প্রায়ই তার ফুরসৎ থাকে এবং বউকে প্রেম করে বলে প্র্যাম-এ করে বাচ্চাকে হাওয়াতী খাওয়ায়।

৩

"অ ভাই, জলদি আও, বেটিয়ে ডাকে।"

একদম ন'সিকে খাঁটি সিলেটী উচ্চারণ। অবশ্য আমি খুব-একটা হকচকিয়ে উঠিনি, কারণ ঢাকার এ্যার-পরূটে হরহামেশাই সিলেটী উচ্চারণ শোনা যায়। কিন্তু যে প্রৌঢ় লোকটি এই মধুর আহ্বান শোনালেন, তাঁর পরনে দেখি উত্তম বিলিতি কাট্-এ অত্যুত্তম ১০০% বিলিতি উলের নেভি ব্লু স্যুট। ওদিকে গলকম্বল মানমুনিয়া চাপ দাড়ি। যাকে ডাকছিলেন তারও ঐ বেশ, তবে বয়সে যুবক। কিন্তু ঐ "বেটিয়ে ডাকে" অর্থাৎ "মেয়েছেলে ডাকছে"—এর বিগলিতার্থটা কি? তখন এ্যার-পরূটের প্রধান লাউনজে ঢুকে দেখি একপাল লোক : প্রায় সক্কলেরই পরনে একই ধরনের নেভি ব্লু স্যুট। বুঝে গেলুম এরা "লনডনী"। বাড়িতে এসে দাদাকে তাবৎ হাৎ বয়ান করলুম। দাদা বললে, লনডনীরা ঈদের পরবে প্লেন চারটার করে দেশে যায়। সে ঢাউস প্লেন সিলেটে নামতে পারে না বলে ঢাকা অবধি এসে থেমে যায়। তারপর সাধারণ সারভিসে আপন আপন মোকামে যায়। শ্রীমঙ্গল, শমসের নগরের মত ছোট ছোট জায়গায়ও প্রধানত এদেরই জন্য এ্যার স্ট্রিপ করা হয়েছে। আর ঐ যে চাপ দাড়ি-ওলা লোকটাকে দেখলি সে খুব সম্ভব লনডনীদের বিলেতের মসজিদের ইমাম। এ-ই এদের বিলেত থেকে আপন আপন মোকাম অবধি দেখ-ভাল করে পৌঁছিয়ে দেয়। এদেরই একজন বোধ হয় ছিটকে পড়েছিল, ইতিমধ্যে তরুণী এনাউনসার মাইকে বলেছে সিলেটীগামী প্লেন এখ্খুনি ছাড়বে। তাই ইমাম হাঁকছিল. "বেটিয়ে ডাকে, জলদি আও"। সিলেটী মাত্রই জানেন, সে-ভাষায় "বেটী" ঠিক "দুহিতা" বা "মেয়েছেলে" নয়। বরঞ্চ "মেয়েমানুষ" এমন কি "মাগী" অর্থেও ধরে। পশ্চিমবঙ্গে যখন কেউ বলে "বেটির কাণ্ড দেখ!" তখন যে অর্থ ধরে। এখন পাঠক বুঝুন, সেই খাবসুরৎ তরুণীকে "বেটি" বললে কোন্ রস সৃষ্ট হয়!

লনডনীরা প্রতি বৎসর সিলেটে কত টাকা পাঠায় তার হিসেব কেউ দিতে পারে না। কারণ এরা কালোবাজারে খুব ভালো রেট পায় বলে এদের পাঠানো টাকার খুব বড়-একটা হিস্তের কোনো সন্ধানই কেউ জানে না। শুনেছি কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক কালোবাজারে লনডনীদের কাছ থেকে পাউন্ড কিনে তাদের নারায়ণগঞ্জস্থ আপন পাট গুদোম জুট মিলকে কোড-এ হুকুম দেয়। অমুক সিলেটীকে অত টাকা পাঠাবে। আরো শুনেছি, তার পর ঐ পাউন্ড দিয়ে বিলিতি জিনিস কিনে, কিছুটা আইনত, বেশীর ভাগ কালোয় প্রাচ্যে পাচার করে।

কত টাকা লনডনীরা পাঠায় তার হিসেব না-জানা থাকলেও সিলেট জেলাতে সে টাকার সুদূরপ্রসারী গভীর প্রভাব সর্বসিলেটীর চোখে যেন ঘুষি মেরে আপন মাহাত্ম্য অহরহ প্রচার করে। সস্তা সেকেনহ্যানড বিদেশী ট্র্যানজিসটার, পারকার কলম, ক্যামেরা ইত্যাদির কথা বাদ দিচ্ছি—একমাত্র সিলেট শহরেই নাকি গণ্ডা দুই সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ট্র্যাভেল এজেনসি আছে—কল্পনা করতে পারেন এ-জিনিস বর্ধমানে? মহকুমা শহরের কথা বাদ দিন, বড় বড় থানায়—বিশেষত যে-সব পকেটে লনডনীদের আদি নিবাস—পর্যন্ত বড় বড় ব্যাঙ্কের ব্রানচ আপিস খোলা হয়েছে। আর ডাকঘরের তো কথাই নেই। যে-ডাকঘরে দিনে তিন-খানা চিঠিও আসে কি না, সেখানে আসে পাঁচশ', হাজার টাকার মনিঅরডার। কিন্তু এহ বাহ্য। যে-সিলেট শহরের বন্দর-বাজারে মাছের কখনো অভাব হয়নি সেই বাজারে দর আগুন এবং শৌখিন মাছ বিরল। আমার এক মুরুব্বি বললেন, "আসবে কোত্থেকে? লনডনীর পাঠানো টাকাতে এখন গাঁয়ের লোক মাছ খায়। জেলে তকলীফ বরদাস্ত করে শহরে আসবে কেন? বললে প্রত্যয় যাবে কি, পাঁচখানা গাঁয়ের মাঝখানে যে-হাট, সেটা এই কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত বসতো সপ্তাহে এক দিন এক বেলা। এখন বসে রোজ, প্রতিদিন, দু'বেলা।"

এটা আবার কনফারম করলো আমার এক বোন। গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে তার বিয়ে হয়েছে এবং লনডনীরা যখন দেশে আসে তখন প্রায়ই ব্যাঙ্কের চিঠি-পত্রাদি পড়াবার জন্য জমিদার বাড়িতে আসে। বোন বললে, "এক লনডনী দেশে এসেছে ঈদ করতে। মাছ কিনতে গেছে ভিন গাঁয়ের হাটে। একটা ভাল মাছ দেখে দাম শুধোলে। জেলে বললে ওটা বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সেটা কিনেছে ঐ গাঁয়েরই এক লনডনী, এবং দুই গাঁয়ে দারুণ আড়াআড়ি। ভিন গাঁয়ের লনডনীর এক দোস্ত প্রথম লনডনীকে খোঁচা দিয়ে যা বললে তার অর্থ তোমাদের গাঁয়ে এ-মাছ খাবার মত রেস্ত আছে কার? প্রথম লনডনী বড় নিরীহ, কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু তার গাঁয়ের সঙ্গী-সাথীরা চটে গিয়ে তাকে বললে, "আল্লার কসম, এই, এই মাছটাই তোকে কিনতে হবে।" তখন মাছ চড়লো নিলামে। দশ, বিশ, শ', দু'শ চড়চড় করে চড়ে গেল। কবিগুরুর ভাষা একটু বদলালে দাঁড়ায়,

"দশ মাথা দিব আমি"
কহিলা লনডন-ধামী,
"বিশ মাথা" অন্য জনে কয়।
দোঁহে কহে "দেহো দেহো",

হার নাহি মানে কেহ—
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।

আমার বোনটি অতিরঞ্জনে অভ্যস্ত নয়। শেষটায় বললে, "আখেরে মাছটা বিক্রি হল এক হাজার এক টাকা মূল্যে। কিনলো প্রথম লনডনী। এবং আশ্চর্য নগদ টাকা তার ওয়াস্‌কিটের পকেট থেকেই বের করল। তার পর বিজয়ী গ্রাম মাছটাকে নিয়ে প্রসেশন করে গ্রামে এসে আপন গাঁ প্রদক্ষিণ করলো। বিস্তর জিন্দাবাদ জিগিরের পর মাছটাকে ব্লেড দিয়ে প্রায় ডাকটিকিটের সাইজে টুকরো টুকরো করে গাঁয়ের সব্বাইকে বিলোলো। এখন এরা হাটে গিয়ে দেমাক করে, 'আজার টেকি (হাজার টাকা দামের) মাছ খাই আমরা'।"

কিন্তু এহ বাহ্য। সমাজবিদ্‌দের কান খাড়া হবে শেষ তত্ত্ব এবং তথ্যটি শুনে। লনডনী যত টাকা নিয়েই গ্রামে ফিরুক না কেন, জমিদার মিরাশদারের (যদ্যপি এখন আর জমিদারী নেই) বৈঠকখানায় শব্দার্থে এখনো তারা কলকে পায় না। অথচ তারা "জাতে উঠতে" চায়। তাই তারা হন্যে হয়ে উঠেছে সদরে, মহকুমা টাউনে বাড়ি কিনতে। সেখানে কে কার খোঁজ নেয়? এক বা দু'পুরুষে সবাই ভুলে যাবে তাদের উৎপত্তি, পেশা, জন্মস্থল। ফলে সিলেট শহরে যে-বাড়ির দাম পাঁচ বছর আগে ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা, এখন লনডনী দেড় লাখ হাঁকছে। একাধিক পেনশনার ভাবছেন সিলেটের বাড়ি বিক্রি করে ঐ টাকা দিয়ে ঢাকাতে ঐরকম বাড়িই যখন পাবো (সিলেট জেলার বাইরে লনডনী বাড়ি চায় না) তখন ছেলে-নাতির পড়াশুনোর সুবিধের জন্য—ক্যাপিটালে বাস করার আরও সুবিধে—সেখানেই যাই না কেন? যিনি আমাকে এ-ব্যাপারটির কথা বললেন, তিনি প্রাগুক্ত ঐ "মছলী-কহানীও" জানতেন। শেষ করলেন এই বলে—"আগে প্রবাদ ছিল 'মাছ খাবি তো ইলিশ, লাং ধরবি তো পুলিশ', এখন হয়েছে 'মাছ খাবি ন'মণী, লাং ধরবি লনডনী'। কিন্তু এটা চালু হবে না। লনডনীরা সচ্চরিত্র।"

৪

এই পর্যায়ের কীর্তনকাহিনী (সাগা)-র কালি ভালো করে শুকোবার পূর্বেই দেখি হঠাৎ আমি সিলেটীদের মাঝখানে। তবে খাস সিলেটে নয়, লণ্ডনে। এবং বিরাট লণ্ডনের সব কটা সিলেটী রেস্তরাঁ চষতে হলে পুরো পাক্কা ছটি মাস লাগার কথা।

প্রথম যেটিতে গেলুম, সেটা নিতান্তই যোগাযোগের ফলে। লণ্ডনে যে এ্যারপর্টে নাবলুম সেখান থেকে খাস লণ্ডন নিদেন ত্রিশ মাইল দূরে। তিনজন পরিচিতের ঠিকানা নোটবুকে টোকা ছিল। এক সহৃদয় ইংরেজকে সে-তিনটে

দেখিয়ে শুধোলুম, সবচেয়ে কাছে পড়ে কোন্‌টা। এক ঝলক দিঠি হেনেই বললে, "গঙ্গা" রেস্তরাঁ। তাই সই। গেল বছরে যখন ওর মালিক পঁচিশ বছর লণ্ডনে কাটিয়ে বাপ-মাকে দেখতে দেশে আসে তখন আমাকে জোর নিমন্ত্রণ জানিয়ে বলে, তার রেস্তরাঁ আছে, ফ্ল্যাট আছে; আমি যদি দয়া করে পদধূলি—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

কোথায় কি? আমি ভেবেছিলুম, সেই যে চল্লিশ বছর পূর্বেকার টিলবারি ডকের সিলেটী রেস্তরাঁ—যার কাহিনী আপনাদের শুনিয়েছি—সেই ধরনের গরীবগুরবোর "অটল"ই (হোটেলের সিলেটী উচ্চারণ; তবে সিলেটীতে এ্যাক্‌সেন্‌ট্‌ আছে বলে সেটা পড়বে "অ"-র উপর) হবে। তবে কি না, নিতান্ত মহারানীর আপন নগরের মধ্যিখানে থানা গেড়েছে যখন, তবে হয়তো দেয়াল ছাদে দু'এক পলস্তরা পাউডার-রুজ মাখিয়ে নিয়েছে।

কোথায় কি? পরিপাটি ছিমছাম পশ্‌, শিক্‌। বাদবাকি সব-কিছু পর্যবেক্ষণ করার পূর্বেই দূর থেকে মালিক ("অটলালা" = হোটেলওয়ালা) আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসেছে। "আউকা, আউকা; বউকা বউকা" (আসুন, আসুন; বসুন, বসুন)। তারপর দিলে ছুট রেস্তরাঁর গর্ভগৃহের দিকে—পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বউকে নিয়ে আসতে।

টেবিল-ক্লথ, ন্যাপকিন মুরমুরে পয়লা নম্বরী আইরিশ লিনেনের, ফুলদানীতে যেন বাগান থেকে সদ্য তোলা, শিশির-ভেজা গোলাপ, ছুরি-কাঁটা তথা যাবতীয় কাটলারি যেন মোগল আমলের খাঁটি রূপোর, আর গেলাস-বৌল এমনই স্বচ্ছ যে ভয় হল যে দুর্যোধনের মত স্ফটিককে জল ভেবে, আমিও এ-গুলোর দু'একটা দেখতে না পেয়ে ভেঙে ফেলি!

ডান দিকে কাঁচে ঘেরা একটি চৌকো কুঠরি। ভিতরে সারি সারি শেলফে সাজানো দুনিয়ার খাসা খাসা মদ্যাদি। বোতলের আকার-প্রকার রঙ-লেবেল দেখেই বোঝা যায়। কুঠরির মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি খাপসুরৎ জোয়ান ছোকরা ন্যাপকিন দিয়ে ওয়াইন শ্যাম্‌পেন; বিয়ার-মাগ্‌ সাফসুৎরো করছিল এবং মাঝে মাঝে আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছিল। ছোকরার মুখের আদল দেহের গঠন সিলেটীর মত। কিন্তু রঙটা? গোরাদের মত ফর্সা নয়, আবার সিলেটীর মত শ্যাম-হলদেও নয়। সমাধান কিন্তু সহজ। গলা বাড়িয়ে সিলেটীতে শুধোলুম, "ভাই সাহেব, আপনার দেশ কোথায়?"

গোটা কয়েক গেলাস ভেঙে ফেলে ছিল আর কি! গলার আওয়াজ হোঁচট খেতে খেতে, খাবি খেয়ে খেয়ে, পড়িমরি হয়ে বললে, 'জী, জী, জী; আমি সিলেটের, ফেচুগঞ্জের।......এখানে যারা কাজ-কাম করে সবাই সিলেটী।"

(আমরা মারওয়াড়িদের দোষ দি ; তারা শুধু দেশের ভাইয়াদেরই চাকরি দেয়। সমস্যাটার সমাধান এখনো করতে পারিনি।)

ইতিমধ্যে মালিক এসে গেছেন। তাঁর গৃহিণীর—মেমসাহেবার—প্রথম কথা কটি শুনেই আমার মনে সন্দেহ হল, যদিও এঁর ইংরিজি উচ্চারণ উত্তম—অন্তত আমার চেয়ে ভালো—তবু ইনি বোধ হয় কন্টিনেনটাল। ভারী মিষ্টি স্বভাবের, লাজুক, স্বল্পভাষী রমণী। মালিকের মাথায় হঠাৎ কি যেন আচমকা ভাবোদয় হল। বললে, "আপনি তো একদা জরমনিতে পড়াশুনো করেছিলেন ; এখনো নাকি ঐ দেশের ভাষা বলতে পারেন। ইনি (বউয়ের দিকে তাকিয়ে) খাঁটি জরমন।"

এ্যাতক্ষ্যাণ ব্যাললেই হত। মেমও সঙ্গে সঙ্গে জরমন বলতে আরম্ভ করলো। ওর উচ্চারণ থেকে মনে হল সে ভ্যুর্‌টেম্‌বের্গ প্রদেশের মেয়ে।

সোমদেবের চরম কৃপাই বলতে হবে! যে-প্লেনে জরমনি থেকে লণ্ডন এসেছিলুম সেটাতে ঐ ভ্যুর্‌টেম্‌বের্গ প্রদেশের মোলায়েম ওয়াইন সস্তায় বিক্রী হচ্ছিল। লণ্ডনে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ডেরা পাবো, তা তো জানিনে। যদিস্যাৎ কাজে লেগে যায়। তাই এক বোতল কিনে নিয়েছিলুম। আর যাবে কোথা! এক কোণে ডাঁই করে রাখা লাগেজ থেকে বোতলটি বের করে ম্যাডামের সামনে রেখে বললুম, "এই নিন। ৎস্থম ভোলজাইন, আ ভৎর্‌ সাঁতে-হিয়ার ইজ্‌ টু ইউ'—এসব তান্ত্রিক মন্ত্রের অর্থ আমি এখনো সঠিক জানিনে। তবে মোটামুটি দাঁড়ায় "ইটি পান করে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হোক, "আপনার সর্বমঙ্গল হোক" ইত্যাদি। উভয় পক্ষ উভয়ের একই মঙ্গল কামনা করেন। মদ্য পান করে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় কি না জানিনে—শুনেছি গত যুদ্ধে ফ্রান্‌স্ হেরে যাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট পের্তাঁ যখন প্রথম বক্তৃতা দেন, তখন তিনি বলেন, "অত্যধিক মদ্য পান হেতু ফরাসী সেপাই ঠিকমত লড়তে পারেনি"—কিন্তু এটাই রেওয়াজ এবং ম্যাডামের চোখ ছল ছল করে উঠলো। কোথাকার কোন্ ইণ্ডিয়ান—তার দেশের জিনিস, এ স্থলে প্রতীক বলতে হবে, এনেছে। এটা কি কম কথা। ভাবুন, আপনি নিউজীল্যাণ্ড বা ওসলোতে। সেখানে কেউ নিয়ে এল আপনার জন্য পাটিসাপটা ক্ষীরের মালপো দেদো সন্দেশ! তদুপরি সে বাঙালী নয়।

ইতিমধ্যে দুটি একটি করে খদ্দের আসতে আরম্ভ করেছে। তার থেকে বুঝলুম, রাত হয়ে আসছে। আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হয় যে আমরা সূর্যচন্দ্র দেখে সময়টা কি এবং তার চেয়েও বড় কথা মানুষের আচরণ তার কাজ-কারবার

স্থির করি। যেমন সূর্য অস্ত যাচ্ছেন; অতএব এখন রাস্তায় ভিড় কমতির দিকে। আর বিলেতে জানলার পর্দা সরিয়ে দেখলেন রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। নিশ্চয়ই লাঞ্চের সময়, অতএব দুপুর।

ক্রমে ক্রমে রেস্তরাঁ ভর্তি হয়ে গেল। কিং কি আশ্চর্য। সব গোরার পাল। একটি মাত্র ইণ্ডিয়ান নেই। চল্লিশ বছর পূর্বে টিলবারির রেস্তরাঁয় দেখেছিলুম বেশীর ভাগ সিলেটী খদ্দের; মাত্র দু'একটি গোরা। এখানে দেখি "সব্ লাল হো গিয়া।"

মালিক ওয়ার্ল্ড্ এট্লাসের মত বিরাট একখানা মেনু এগিয়ে দিয়ে বললে, "কি খাবেন, হুকুম দিন।" আমি বললুম, "প্লেনে বিস্তর ঝাঁকুনি খেয়েছি আর কি খাবো, কও। বমি করেছে বেশ কয়েকজন। তুমি আমি নিতান্ত সিলেটের লোক। জন্ম থেকে হাওর-বিলে নৌকর ভিতরে-বাইরে নাগর-দোলার দোল খেয়ে শিলঙ যাবার সময় আচমকা পাহাড়ী মোড, হেয়ার-পিন টার্ন হজম করে করে সী সিক এ্যার সিক, ল্যাণ্ড সিক হইনে। কিন্তু এবারে আম্মো কাবু। গা গুলোচ্ছে, বমি না করলেই রক্ষে। প্লেনে ওঠার আগে যা-সব খেয়েছিলুম সেগুলো যেন রিটার্ন টিকিট নিয়ে গিয়েছিল; এখন ফিরি ফিরি করছে। উপস্থিত থাক। বরঞ্চ খাটের পাশে দু'খানা স্যানউইচ রেখে দিয়ো। ক্ষিধে পেলে খেয়ে নেব।"

মেনুটার উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলুম, খেয়াল না করে, মালিককে ভদ্রতা দেখাবার জন্য, আলতো আলতো ভাবে। বিরয়ানি, কোর্মা, কালিয়া, কাবাব, কোফতা, চিকেনকারি গয়রহ গয়রহ। এ তো ডালভাত কিন্তু শব্দার্থে বলছি না। আই মীন, এগুলো তো এ-রকম ফেশনেবল রেস্তোরাঁতে থাকবেই। ইংরিজিতে যাকে বলে, "মাস্টট্স্"। কিন্তু কি একটা মামুলী আইটেমের দাম দেখতে গিয়ে আমি যেন আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। বলে কি? দশ শিলিং! মানে? দশ টাকা। তখন মেনুর ডান দিকে তাকিয়ে দেখি, সব মালেরই প্রায় ঐ দাম। অর্থাৎ, দু'পদী আহারাদির জন্য আপনার খসে যাবে পৌণ্ড খানিক। পনরো, বিশ, পঁচিশ টাকা! ও! তাই ইণ্ডিয়ানরা আসেনি। ওদের বেশীর ভাগই তো ছাত্রসম্প্রদায়। ওদের জেবে অত রেস্ত কোথায়?……মনে পড়ল, চল্লিশ বছর পূর্বে ছ' পেনিতে (পাঁচ আনাতে) রাইসকারি পাওয়া যেত টিলবারি ডক্-এ!

পরে খবর নিয়ে শুনলুম, "গঙ্গার" ভাও মোটেই আক্রা নয়। এটাই নর্মাল। এমন কি, ঐ পাড়ার চীনা, হাঙ্গেরিয়ান, স্প্যানিশ রেস্তোরাঁতে আহারাদি আরো

আক্রা। আর, এরপর, খাস বিলিতি ডাঙর ডাঙর রেস্তোরাঁতে কি ভাও, সেটা শুধোবার মত হিম্মৎ আমার জিগর কলিজায় ছিল না, সেটা আমার হাফ-সিঙ্গল-চা, দুটো-ফল্স্ পীনেওলা বেরাদর পাঠক নিশ্চয়ই দিব্য-দৃষ্টিতে দেখে ফেলেছেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। কোন্ দেশে কোন্ বস্তুর কি দর, "বিভিন্ন দেশের রেস্তোরাঁর তুলনাত্মক দরদাম" সম্বন্ধে ডকটেরেট থিসিস লিখে ধৈর্যশীল পাঠককে, এ-অধম নিপীড়িত করতে সাতিশয় অনিচ্ছুক। তবে কেন ?

সেটা পরে হবে।

নটিংহাম

আমাদের ছেলেবেলায় ঘটি বাঙালে রেষারেষি ঠাট্টা-মস্করা ছিল ঢের ঢের বেশী। একটা মস্করা আমার মনে পড়ল নটিংহাম যাবার ট্রেনে বসে। বাঙালের সঙ্গে (বাঙাল "সাথে" বলে এবং গদ্যেও লেখে "সাথে"; রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে সেটা কিঞ্চিৎ অনিচ্ছায় স্বীকার করে নেন) লিলুয়া স্টেশনে দেখা এক ঘটির। বাঙাল শুধোলে, "কোথায় চললেন, দাদা ?" ঘটি বললে, "চললুম, দাদা, পশ্চিমে। গায়ে এট্টুখানি গত্তি লাগিয়ে আসি।" বাঙাল আমেজ করলে, দাদা বুঝি হিল্লী দিল্লী বিজয় করতে চললেন। কারণ সে যখন প্রথম দেশ ছেড়ে শেয়ালদায় নামে তখন গান রচেছিল,

> "লাম্যা ইশ্টিশানে
> গাড়ির থনে
> মনে মনে আমেজ করি
> আইলাম বুঝি আলী মিয়ার রঙ-মহলে
> ঢাহা (ঢাকা) জেলায় বশ্শাল (বরিশাল) ছাড়ি ॥"

তার তরে বরিশাল ছেড়ে ঢাকা যাওয়াটাই একটা মস্ত কসরত। এবং শেয়ালদা আসাটা তো রীতিমত গামার সঙ্গে লড়াই দেওয়া !···অবশেষে ধরা পড়লো ঘটি দাদা যাচ্ছেন লিলুয়া।

সবই পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপার। লণ্ডন থেকে নটিংহাম সোয়া শ' মাইল হয় কি না হয়। আমাদের কাছে লস্যি। অথচ লণ্ডনের ইংরেজ দোস্তেরা যে ভাবে আমাকে ওখানে যেতে নিরুৎসাহ করছিলেন তার থেকে মনে হল ওরা ও-মুল্লুককে প্রায় দুশ্মনের পুরী বলে ধরে নিয়েছেন। একাধিক জন বললেন,

"ওখানে—অপরাধ নিয়ো না এই এই, অর্থাৎ সেখানে ইণ্ডিয়ানদের ঠ্যাঙানো হচ্ছে।" আমি বললুম, "যেতে যখন হবেই তখন অত ভেবে কি হবে। তদুপরি আমাদের পোয়েট টেগোর বলছেন,

মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে॥"

ট্রেনে বসে চিন্তা করে দেখি, আমি নটিংহাম সম্বন্ধে যা জানি সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। (১) আমার একজন আত্মীয় সেখানে আছেন। আমার আপন আত্মীয় হলে না গেলেও চলতো কিন্তু তিনি আমার ছোট বোনের দেবর। তিনি আবার তালেবর লোক। আমি যখন হামবুর্গে তখন কি করে কোথায় থেকে খবর পেয়ে তিনি নটিংহাম থেকে আমাকে ট্রাঙ্ক কল্ করে সাতিশয় অনুরোধ জানালেন, আমি যদিস্যাৎ ইংলণ্ডে যাই তবে অতি অবশ্য আমাকে নটিংহাম যেতেই হবে, যেতেই হবে—তিন সত্যি। (২) ছেলেবেলায় রবিনহুডের কেচ্ছা পড়েছিলুম। তাঁর কর্মস্থল ছিল নটিংহাম। পাশে ছিল শারউড বন। সেইটেই ছিল তাঁর স্থায়ী আস্তানা।...এদানির কলকাতার ছেলেছোকরারা আর রবিন-হুডের কাহিনী তেমন একটা পড়ে না। কলকাতার গলিতে গলিতে এন্তের রবিন-হুড। তবে অতি সামান্য একটা তফাৎ রয়েছে। রবিনহুড নাকি ডাকাতি করে যে-কড়ি কামাতো সেটা গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিতো। অদ্যকার কল-কাতার রবিনহুডরা চাঁদার নামে, হ্যানাত্যানার নামে যে-টাকা, প্রায়-ডাকাতি করে কামান, সেটা ঠিক ঠিক কোন্ জায়গায় যায়, এ-মূর্খ সে-বাবদে বিশেষজ্ঞ নয়। ঈশ্বর সুকুমার রায় তাঁর একটি কবিতাতে, "উপবেশন" কি করে করতে হয়, সে সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন,

"তবে দেখো, খাদ্য দিতে অতিথির থালে
দৈবাৎ না পড়ে যেন কভু নিজ গালে।"

বাকিটা বলার কোন প্রয়োজন নেই। চালাক মাত্রই মূর্খকে কথা বল্তে দেয়। আমি বিশ্বাস করি, "যদল্পং তন্মিষ্টং"। (৩) আমাদের যে-রকম বিদ্রোহী কবি শ্রীযুত নজরুল ইসলাম, ইংরেজের বিদ্রোহী কবি বায়রন। এবং তাঁর বাস্তভিটে নটিংহামের অতি কাছে। ইংরেজ সরকার তাঁর মৃতদেহ বড় বড় মহৎ মহৎ কবির সঙ্গে লণ্ডনে গোর দিতে চায়নি বলে তাঁকে গোর দেওয়া হয় তাঁর বাস্তভিটের গোরস্থানে।

"নটিঙম্! নটিঙম্!! নটিঙম্!!!" কলরব চিৎকার।

আরেকটু হলেই পৌঁছে যেতুম নর্থ পোলে। প্রফেটরা বার বার বলেছেন,

"নিজেকে চিনতে শেখো। আত্মচিন্তা করো।" তা আপনারা যত খুশী আত্মচিন্তা করুন। কিন্তু রেলগাড়িতে না। কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে পৌঁছে, দু' ডবল ভাড়া, জরিমানা দিয়ে, মোকামে ফিরবেন বরঞ্চ সেইটেই চিন্তা করুন।

২

তনু, দেহ, শরীর, বপু, কলেবর কোন্‌টা ঠিক মধ্যিখানে বলা ভার। আমার আত্মীয় যিনি আমাকে নটিঙাম স্টেশনে রিসীভ করতে এলেন তিনি ঐ মধ্যিখানে। বাইরে বেরিয়ে দেখি, তাঁর ঢাউস মোটরগাড়ি। বাড়ি যাবার সময় অলস-নয়নে এদিক-ওদিক তাকালুম। ইংরেজ বিদেশে যদি বিশেষ কোনো নতুন চীজ না দেখতে পায় তবে বলে "নাথিং টু রাইট হোম এবাউট।" অর্থাৎ এমন কিছু দেখিনি যা চিঠিতে লিখে বাড়ির লোককে তাক লাগানো যায়। আমার হল তাই। এক জায়গায় লক্ষ্য করলুম, পর পর দুটো দোকানে যেন কিছু ভারতীয় সামান-আসবাব আছে। শুধোলুম, "এ দোকানগুলো কাদের?" চৌধুরী বললেন, "এক শিখ ভদ্রলোকের। বেশ দু পয়সা কামান। বড়লোক বলা যেতে পারে।" চৌধুরীর বাড়ি পৌঁছে দেখি তিনিও কিছু কম যান না। তেতলা বাড়িতে বাস করেন। তিনটেই তাঁর। তার পর গেলুম তাঁর রেস্তোরাঁ দেখতে। সেও এলাহি ব্যাপার। উপরের তলা নিচের তলা দু' তলা নিয়ে পেল্লাই কাণ্ড।

কিন্তু এ সব কথা অন্য দিন হবে।...খবরের কাগজে পাঠক হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে ইংলণ্ডের বর্তমান সরকার আইন পাশ করতে যাচ্ছেন, এখন থেকে ওঁদের দেশে যেতে হলে কমনওয়েলথ নাগরিক—যেমন ভারতীয় পাকিস্তানী—এবং পাক্কা বিদেশী—যেমন ফরাসী জরমান—আর কোনো তফাৎ রইল না। বিগলিতার্থ: ভারত-পাকিস্তানীর পক্ষে এখন ও-দেশে গিয়ে দু পয়সা কামানো প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। আত্মাভিমানী পাঠক হয়তো ঈষৎ রাগত কণ্ঠে শুধোবেন, "কী দরকার রে বাপু, বিদেশে গিয়ে এরকম হ্যাংলামো করার? কিন্তু আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, আজ ঐ বাংলা দেশেই হাজার হাজার ছেলে—এবং মেয়েও আছে যারা বিলেত, বিলেত কেন হটেনটটের মুল্লুকেও যেতে রাজী আছে পেটের ভাতের তরে। এতে অভিমান করার কী আছে?...কিন্তু সেই কথায় ফিরে যাই। নটিঙামে গিয়েছিলুম গেল বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানে গিয়ে শুনি, ওরা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে, নতুন কনজারভেটিভ সরকার কোন্ তালে আছেন। বিশেষ করে সিলেটিরা আমাকে তাদের দুশ্চিন্তার কথা

শোনাতে গিয়ে বললে, "দেশ থেকে নতুন লোক যে আর আসতে পারবে না, শুধু তাই নয়, হুজুর। দেশে যাওয়া-আসা যে প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। আমাদের বেশীর ভাগেরই বউ-বাচ্চা তো ওখানে।" আমি বললুম, "আচ্ছা, এখানে তো ভারতের লোকও রয়েছে। তাদের সঙ্গে 'পরামিশ-সুপারিশ' করে দেখেছ? উভয় পক্ষের বিপদ তো একই।" উত্তরে যা বললে সেটা, পাঠক, একটু মন দিয়ে শুনুন। বললে, "হুজুর ওদের সঙ্গে আমাদের ঠিক বনে না। ওদের বেশীর ভাগই শিখ। ওরা হিন্দুস্থানী বলেই যে আমাদের সঙ্গে বনে না সেটা ঠিক না—বিশ্বাস করুন হুজুর। আপনিও তো হিন্দুস্থানী। আপনাকে তা হলে এ সব দরদ জানাই কেন? ছুটিছাটায় যখন লণ্ডন যাই, তখন পূব-পচ্ছিম দুই বাংলার লোকের সঙ্গেই দেখ-ভাল মোলাকাৎ-মহব্বৎ হয়—হিন্দু-মুসলমান দুইই। তারার লগে কথা কইতে কুনু অসুবিস্তা অয় না, তারা আমরার দুশকো (দুঃখ) বুঝে, আমরাও তারার দুশকো বুঝি। আর এই শিখদের সঙ্গে আমাদের আরেকটা ডাঙর ফারাক আছে। ওরা এদেশেই বসতি গাড়তে চায়, দেশে ফিরে যেতে চায় না। তাই তারা দেশের গাঁয়ে টাকাকড়ি পাঠায় না। আর আমাদের পনরো আনা দেশে ফিরে যেতে চায়। তাই আমরা দেশে টাকা পাঠাই—যাতে করে দেশের ভাই-বেরাদর সুখে থাকে, পুরানো বাড়ি-ঘরদোর মেরামতীতে রাখে, নয়া উমদা বাড়ি বানায়। আর দেশে টাকা পাঠানোতেও বিস্তর মুশকিল। ব্যাঙ্কের মারফতে পাঠালে দেশের লোক পাবে কম, কালো বাজারে—"

বাকিটা আমি শুনিনি।...আমি মনে মনে ভাবছিলুম (১) বাঙালী বাঙালীতে কী প্রণয়! (২) বাঙালী দেশকে বড্ডই ভালবাসে। এই নটিঙামের বাঙালী মুসলমান—তার প্রাণ-জিগর-কলীজা পড়ে আছে সিলেটে।

হাওর

বাংলাদেশের প্রথম ইতিহাস লেখেন জনৈক মোল্লা নাথন, নাথতু। বইখানার নাম বহার-ই-স্তান-ই-গায়েবী অর্থাৎ 'অজানা চির বসন্ত ভূমি'—ফার্সীতে লেখা। নাথু মিঞা দিল্লীর লোক। ভাগীরথী পার না হওয়া পর্যন্ত তিনি এমন কোন 'স্থান' দেখেননি যেখানে ঘোরতর গ্রীষ্মকালেও ঘাস সবুজ থাকে। তাই কেতাবের নাম দিয়েছিলেন "চির বসন্ত ভূমি"। মিঞা সাহেব এসেছিলেন 'বাংলা দেশে' জাহাঙ্গীরের রাজ সেনানীর সঙ্গে শেষ পাঠান রাজা ওসমানকে

পরাজিত করার জন্যে। জাহাঙ্গীরের পিতা আকবর বাদশাহ পুরো বাংলা দেশ জয় করতে পারেননি। তার একমাত্র কারণ মোগলরা শুকনো দেশের লোক; নৌযুদ্ধ কারে কয় জানে না। জাহাঙ্গীরের প্রধান সেনাপতি বেশীর ভাগ ভয় দেখিয়ে কিছুটা ঘুষ দিয়ে কয়েকটি মীরজাফর যোগাড় করে নৌযুদ্ধ খানিকটা শিখল। তার পর তারা ওসমানের পিছনে ধাওয়া করল। ওসমানের প্রধান দুর্বলতা ছিল যে তার কাছে যে সব কামান বন্দুক ছিল, সেগুলো মোগলদের তুলনায় নিকৃষ্টতর। তদুপরি জাহাঙ্গীরের সেনাপতি যে প্রচুর সৈন্যদল নিয়ে এসে-ছিলেন তার সামনে দাঁড়ানো ওসমানের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল।

ঐ সময়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীর চিঠি লিখলেন ওসমানকে: আত্মসমর্পণ করো। ওসমান অতি সংযত ভদ্র ভাষায় উত্তর দিলেন, যার মর্মার্থ, আপনি দিল্লীশ্বর, আপনার দেশ-দেশব্যাপী বিরাট রাজত্ব। আমি তো তার তুলনায় সামান্য একটি চিড়িয়া। কিন্তু সামান্যতম পাখিটিও স্বাধীন ভাবে থাকতে চায়।·· ওসমান জানতেন মোগলরা এতদিনে বেশ কিছুটা নৌ-যুদ্ধ শিখে নিয়েছে। তদুপরি সেটা শীতকাল (ইয়াহিয়া খানের কপাল ভালো যে শেখ মুজিবের সঙ্গে তার ঝগড়াটা চরমে পৌছায় মার্চ মাসে; বর্ষা নামলেই চিত্তির। তাই তিনি তিলব্যাজ না সয়ে মারলেন তাঁর হাতুড়ি ঐ মোকাতেই)। তাই তিনি স্থির করলেন মোগলদের নিয়ে যেতে হবে সিলেটে। সেখানে যে সব হাওর আছে তার প্রধান ভাগ শীত-কালেও শুকোয় না। কারণ বৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধতম স্থল চেরাপুন্‌জী। তার কুল্লে পানি নেবে আসে সিলেট জেলায়, ডাউকি হয়ে জইন্তা হয়ে—অসংখ্য নদনদী খাল নালা দিয়ে। এই সব হাওরে সামান্যতম ঝড় উঠলে ঐ দেশেরই বহু কিশোর তরুণ তক বমি করতে থাকে—অর্থাৎ বাংলা কথায় সী-সিক হয় (পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে 'ডীডে' ল্যাণ্ডিঙের সময় প্রচুর সৈন্য নরমাণ্ডির বেলাভূমিতে নেমে সেখানে শুয়ে পড়ে। বমি করতে করতে তাদের পেটে তখন আর কিছু ছিল না যে লড়াই করে করে জরমনদের ঘাঁটি দখল করে। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, এন আমি মার্চেজ অন ইটস স্টমাক। অন্যার্থে। কিন্তু এস্থলে এটা প্রযোজ্য)। এবং ঢাকা থেকে সিলেটের হাওর অবধি একেবারে ফ্ল্যাট। সিলেট পৌছলেই আরম্ভ হয় টিলা, কোনো কোনো টিলাকে পাহাড়ও বলা যেতে পারে। ঘন বন জঙ্গল এবং প্রচুর সুপুরি গাছ।···ওসমান তাই পৌছলেন সিলেটে। 'রিয়ার গার্ড একশন' করতে করতে। অর্থাৎ তিনটে সুপুরি গাছ জড়িয়ে বেঁধে তার সর্বোচ্চতম প্রান্তে একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে সেখানে কামান তুলে নিয়ে দুশমনের উপর কামান দাগতে দাগতে। মিয়াদের তখন তাজ্জব নয়া অভিজ্ঞতা

হল। করে করে ওসমান সিলেট জেলার প্রায় আধখানা পেরিয়ে মিয়াদের নিয়ে গেলেন, আজ ম্যাপে যেখানে মৌলবী বাজার, তার তিন মাইল দূরে দুল্লভমপুরে (অধুনা নাম দুর্লভপুর)। তারই পরে হাইল হাওর। ওসমান ও তাঁর সৈন্যদল হাওরের হাঁটুজলে পায়ে হেঁটে ওপারে চলে গেলেন। তিনি জানতেন, মোগলরা এ অঞ্চল কখনো আসেনি। তারা জানে না, কোন জায়গায় হাঁটুজল আর কোন্ কোন্ জায়গায় অথৈ জল। মোগলরা এপারে দাঁড়িয়ে।...তারপর শুভ লগ্নে ওসমান ওপার থেকে হাওর পেরিয়ে আক্রমণ করলেন—মোগল সৈন্যদের। তারা লড়েছিল প্রাণপণ। কিন্তু পরাজয় অনিবার্য বুঝতে পেরে তারা পালাতে আরম্ভ করলো। এমন সময় হাতির-পিঠে-বসা অগ্রগামী ওসমানের চোখে এসে ঢুকলো একটা উটকো তীর। মাহুত ভয় পেয়ে হাতি ঘোরালো। ওসমান বুঝতে পেরে চেঁচাচ্ছেন, এগিয়ে চলো চলো। ওদিকে মোগল সৈন্যদের ভিতর বিজয়ধ্বনি আরম্ভ হয়েছে—'ওসমান পালাচ্ছে, ওসমান পালাচ্ছে।' মোগলরাই জয়ী হল। সে এক করুণ কাহিনী। সুযোগ পেলে আরেকদিন সবিস্তর বলব।

কিন্তু আমি জালা জালা পুরনো কাসুন্দী ঘাঁটছি কেন? যারা বাংলা দেশ থকে আসছেন, তাঁরাই বলছেন গেল সাড়ে দুই মাস ধরে সব চেয়ে মোক্ষম লড়াই দিয়েছে—সিলেটের লোক। তাদের কি সুবিধে—টিলাবন হাওর—অর্থাৎ 'তেরা'—পূর্বেই বলেছি।

ওসমান যুদ্ধে হারেন শীতকালে মার্চ মাসে।‌ এবারে দেখি ঘন বরষায় তারা হাওরের কি সুযোগ নেয়।

এপিলোগ: আকবর বাদশা মারা যান আমাশাতে। বাংলা বিজয় অভিযানে বেহারে। সে আবার আমাশা! ঢাকার আমাশা অলিম্পিক। পিণ্ডির জাঁদরেল যে এই বর্ষায় ঢাকায় আসছেন, তাঁর যদি ভালো মন্দ কিছু একটা হয়ে যায়! সম্পাদক মহাশয়, আপনি সহৃদয় লোক। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, পিণ্ডির খান সাহেবকে জানিয়ে দিতে, প্রতিদিন ৬টো এনটেরো ভায়োফর্ম এবং এক বড়ি ত্রিফলাকস, তদভাবে ইসপগুল তিনি যেন সেবন করেন। যদি তিনি এ যাত্রায় নিস্তার পান তবে ইতিহাস হয়ত আপনার প্রতি কটুকাটব্য করবে। সাধু সাবধান।

মহাভারত

পয়লা ফেব্রুয়ারি দিবস, কলকাতার এশিয়্যাটিক সোসায়েটির বার্ষিক সম্মেলনে লাটসাহেব শ্রীযুত শান্তিস্বরূপ ধাওন যা বলেন তার বিগলিতার্থ—আমি তিনখানা খবরের কাগজের রিপর্টের উপর নির্ভর করে আমার নিবেদন জানাচ্ছি—এতাবৎ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারতের তথা ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যা (ইণ্টারপ্রিট) করেছেন তাঁদের পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিকোণ দৃষ্টিবিন্দু ("উয়েসটার্ণ আইজ") দিয়ে। এখন আমাদের—ভারতীয়দের—উচিত, ভারতীয় সভ্যতা (শ্রীযুত ধাওন "সভ্যতার"—সিভলিজেশন-এর সঙ্গে 'কালচার' বলেছিলেন কি না সেটা খবরের কাগজ উল্লেখ করেনি। এটা গুরুত্বব্যঞ্জক। কারণ যে কোনো একটা জাতি, দেশ, নেশন অতিশয় সিভিলাইজড না হয়েও কালচার, বৈদগ্ধ্যের উচ্চাসন গ্রহণ করতে পারে। আমি ধরে নিচ্ছি শ্রীযুত ধাওন দুটোই বলতে চেয়েছেন) ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা।

এ অতি উত্তম প্রস্তাব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের অজানা নয় যে, যবে থেকে ইংরেজ আপন স্বার্থের জন্য ভারতবর্ষে এসেছে সেই থেকেই এ দেশের নিন্দাবাদ করেছে। গোড়ার দিকে মৃদুকণ্ঠে, মোলায়েম মোলায়েম ভাবে। পরে যখন বণিকের মানদণ্ড পুরোপাক্কা রাজদণ্ডে পরিণত হল তখন ভারত বাবদে তার অন্যতম প্রধান "কর্তব্য" হয়ে দাঁড়ালো বিশ্বজনের সামনে সপ্রমাণ করা: ভারতবর্ষ অতিশয় অশিক্ষিত, অসভ্য, অনকলচরড দেশ এবং এ দেশকে সভ্য ভদ্র সত্যধর্মে-খৃষ্টধর্মে-দীক্ষিত করার জন্য ইংরেজ নিতান্ত পরোপকারার্থে, প্রতি খৃষ্টজনের যা কর্তব্য, অর্থাৎ বর্বরদের সভ্য করার জন্য এ দেশে এসেছে, এবং এই পাষণ্ড, নেমকহারাম দুশমনের কলকাতা শহরের জলাভূমির আমাশা, নানাবিধ জ্বর রোগে সাতিশয় ক্লেশ "ভুঞ্জিয়া" সদাপ্রভুর পদপ্রান্তে আপন আত্মা নিবেদন করছে, সেক্রিফাইস করছে, এক কথায় মার্টার বা শহীদ হয়েছে। এই যে ইংরেজের দম্ভোলিদম্ভ—এরই ঘৃণ্য ভণ্ডনাম "হোয়াইট মেনস বার্ডেন"। তদর্থ, গড ধবলাঙ্গদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, সে যেন শ্যামাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, রক্তাঙ্গ (রেড ইণ্ডিয়ান), পীতাঙ্গ পৃথিবীর কুল্লে জাতকে "শিক্ষিত সভ্য" করার গুরুভার (বার্ডেন) আপন স্কন্ধে তুলে নেয়। এ বার্ডেন বইতে গিয়ে ইংরেজাদি শ্বেতাঙ্গদের কি পরিমাণ মুনাফা হয়েছে সে তত্ত্ব আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। "থ্রী মেন ইন এ বোট"-এর প্রখ্যাত রসাচার্য ভারতপ্রেমী লেখক জেরোম কে জেরোম এই বার্ডেন

ভণ্ডামিকে তীব্রতম ভাষায় ব্যঙ্গ করে এই শতকের গোড়ায় একটি প্রবন্ধ লেখেন: "হোয়াইট মেনস বার্ডেন —হোয়াই শুড ইট বী সো হেভি?"—কিংবা ঐ ধরনের। তিনি নানা প্রকারের ঠাট্টামসকরা ব্যঙ্গবিদ্রূপ সারার পর বক্রোক্তি করেন, হোয়াইট মেনস বার্ডেন বইতে গিয়ে আমরা যে আত্মত্যাগ, পরার্থে প্রাণ দান করলুম তাতে করে আমাদের কি ফায়দা হয়েছে? এই নেমকহারাম ইণ্ডিয়ানরা (বলা বাহুল্য, ইংরেজের "আত্মত্যাগ", ভারতীয়ের 'নেমকহারামী' জরোম আগাপাশতলা উল্টো বুঝলি রামার্থে নিয়েছেন) যদি আমাদের বার্ডেন বওয়ার মূল্য না বুঝে এখন নিজের বার্ডেন নিজেই বইতে চায় (ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন জোরদার—জরোম তার প্রতি অনুরাগী) তবে ফেলে দে না, বাবা, ঐ মূর্খদের স্কন্ধে ওদের আপন বার্ডেন। চলে আয় না ওদেশ ছেড়ে। বয়ে গেছে আমাদের!

এ তো গেল। ও'দিকে আরেক শিরঃপীড়া। ইংরেজের বাক্যরীতিতেই বলি, সে একাই তো বেলাভূমিতে একমাত্র উপলখণ্ড নয়। আরো মেলা চিড়িয়া রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায়নি।" '

এস্থলে দেখা গেল ইতিমধ্যে ইয়োরোপের অন্যান্য জাত ভারতের অনেক অনেক উত্তম উত্তম গ্রন্থ—অবশ্য অধিকাংশ অনুবাদে—পড়ে ফেলেছে। দারাশীকূহ-কৃত উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ কিংবা তাঁর আদেশে কৃত অনুবাদ ('মুজমা'-ই-বহরেন'—'দ্বিসিন্ধু মিলন') লাতিনে অনূদিত হয়েছে। ইংরেজ পড়লো বিপদে। উপনিষদ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ। তার ফার্সী অনুবাদ করলো এক মুসলমান। তার লাতিন অনুবাদ করলো এক খৃষ্টান পাদ্রি এবং তার উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গাইলো সেদিনকার--সর্বোত্তম বললেও অত্যুক্তি করা হয় না—সর্বসংস্কারমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ দার্শনিক শোপেনহাওয়ার।

ইতিমধ্যে, শেকসপীয়রের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর নাম অনেকেই করে থাকেন সেই কবি গ্যোটে শকুন্তলা নাট্যকে প্রশংসা প্রশংসায় স্বর্গে তুলে দিয়েছেন—না, ভুল বললুম,—তিনি বললেন, এই নাট্যেই স্বর্গ এবং পৃথিবী সম্মিলিত হয়েছে।

ইংরেজ জাত ঘড়েলস্য ঘড়েল। সে সুর পালটালে। অবশ্য আমার বক্তব্য এ-নয়, যে নিরপেক্ষ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কোনো ইংরেজ কস্মিনকালেই ছিল না। কিন্তু কে পরোয়া করে তাদের?

তাই আজ যখন প্রশ্ন উঠেছে, মহাভারত কাল্পনিক না ঐতিহাসিক তখন ইংরেজ পণ্ডিতেরই বরাত দেওয়া প্রকৃষ্টতম পন্থা। উওশবর্ন হপকিনস তাঁর

একাধিক প্রামাণিক গ্রন্থে বলেছেন (যে কারণে, অধমের জানা মতে, ধর্ম বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট এনসাইক্লোপীডিয়ায় তিনি মহাভারত সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ রচনা করার জন্য সম্মানিত আমন্ত্রণ পান), "নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে মহাভারত কাব্যে কোনো সত্যকার সংঘর্ষ প্রতিবিম্বিত হয়েছে—"ইট্ (মহাভারত) অনডাউটেডলি রিফলেক্‌ট্‌স সম্ রিয়েল কনটেসট"। পুনরপি তিনি বলছেন, সত্য ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আমরা যদি পুরাণে উল্লিখিত রাজবংশসমূহের তালিকা (লিস্‌টস্) মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তবে পাই যে মহাভারতের নানা প্রকারের কিংবদন্তির পশ্চাতে সত্য ইতিহাস বিম্বিত হয়েছে। স্বর্গত গিরীন্দ্রশেখর ঠিক এই মতটিই তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে সপ্রমাণ করেছেন ; এ-পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তার উল্লেখ হয়েছে।

সব থাক্, সব যাক্। পাঠক, তোমার কমনসেনস কি বলে ? কোনো কিছু ঘটেনি, কোনো কিছু হয়নি, এ যেন হাওয়ার-কোমরে দড়ি বাঁধা !

ঠিক তেমনি, খোঁড়াখুঁড়ি করে কিছু পাওয়া যায়নি বলে সব ঝুট হ্যায় ? তবে একটি "ছোটাসী চুটকিলা" পেশ করি। এক রেড ইণ্ডিয়ান বললে তার দেশে খোঁড়াখুঁড়ির ফলে বেরিয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের টেলিগ্রাফের তার। অতএব সে-যুগেই তারা টেলিগ্রাফি জানতো। উত্তরে এসকিমো বললে, তার দেশে খোঁড়াখুঁড়ি করে কোনো প্রকারের তার পাওয়া যায়নি। অতএব তারা বেতার ওয়্যারলেস ব্যবহার করতো।

কিন্তু আমার শিরঃপীড়া ভিন্ন। মহাভারতের মত কোনো গ্রন্থই বারবার পুনর্বার আমি পড়িনি। অথচ প্রতিবার নব নব সমস্যা দেখা দেয়। সে কথা আর এক দিন হবে।

৫৭০-১৯৭০/১৪০০ বৎসর

হজরৎ মুহম্মদ (দ)-এর চতুর্দশ জন্মশতবার্ষিকী

হজরতের জন্মদিন নিয়ে বিস্তর আলোচনা, সবিস্তর তর্কাতর্কি মোটামুটি এই চোদ্দশ' বছর ধরে চলছে, এবং চলবেও।

আজ ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ই মে, শুক্লপক্ষের দ্বাদশী। আরবী চান্দ্র মাসের গণনায় আজ রবীউল্ আউওল মাসের ১২ তারিখ। দ্বাদশ শব্দের ফার্সী : দোওয়াজ-দহম্। দো = দ্ব = দুই ; দহম্ = দশম্ = দশ। অর্থাৎ দ্বিদশ। বলা হয়, হজরৎ মুহম্মদ এইদিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই চান্দ্রমাস রবীউল্ আউয়ল্-এর বারো

তারিখকে বলা হয়, ফৎহ্-ই-দো ওয়াজ্দহম্। দোওয়াজ্দহম্ শব্দের অর্থ এই মাত্র নিবেদন করেছি। ফৎহ্ শব্দের অর্থ জয়। এই আরবী শব্দটি আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়। শিখেরা "গুরুজীকী ফতেহ্" জয়ধ্বনি করেন; বাদশা আকবর নির্মিত ফতেহ্পুর সীক্রী অনেকেই দেখেছেন।

কবি মরহুম গোলাম মোস্তফা তাঁর "বিশ্বনবী" গ্রন্থে এই মত পোষণ করেছেন।

পক্ষান্তরে সুপণ্ডিত মরহুম মওলানা মোহম্মদ আকরম খান তাঁর "মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে বিস্তর গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করেছেন, হজরতের জন্ম হয়, ৯ই রবীউল আউওল; ১২ই নয়।

কিন্তু বাঙলা দেশের জনসাধারণ, তথা উভয় বাঙলার সরকার মেনে নিয়েছেন যে হজরতের জন্ম হয় ১২ তারিখে। কিন্তু সেটা চাঁদ দৃশ্যমান হবার উপর নির্ভর করছে। কাজেই কেউ কেউ ১৮ই মে, অন্যেরা ১৯ মে হজরতের জন্মদিবস (ঈদ্-ইদ-মিলাদ্-উন্-নবী; ঈদ্ = আনন্দদিবস, মিলাদ = জন্মক্ষণ—ও-ল-দ ধাতুর অর্থ "জন্ম দেওয়া", তার থেকে মওলিদ্, মিলাদ্, মওলুদ্ অনেক শব্দই প্রায় একই অর্থে এসেছে, এমন কি আরবের খৃষ্টানরা বড়দিনকে বলেন "ঈদ্ উল্ মিলাদ্"—তাই পাঠক নির্ভয়ে আজকের পরবকে "মিলাদ্ শরীফ"—শরীফ = উচ্চ, সম্মানিত, ভদ্র—"মওলুদ শরীফ", "ঈদ্-ই মিলাদ" যা খুশী বলতে পারেন। কিংবা পূর্বোল্লিখিত আরবী ফার্সীর সংমিশ্রণে ফৎহ্-ই-দোওয়াজ্দহম্ও বলতে পারেন।

নবী, পয়গম্বর, রসুল ইত্যাদি শব্দ একই ব্যক্তি, অর্থাৎ হজরৎকে বোঝায়।

হজরতের জন্মদিন নিয়ে দেশের জনসাধারণ যা মেনে নিয়েছেন আমরাও তাই মেনে নিলুম। এখন প্রশ্ন তাঁর জন্ম কোন্ বৎসরে?

কেউ বলেন ৫৬০ খৃষ্টাব্দ, কেউ বলেন ৫৬৯ খৃষ্টাব্দ, কেউ বলেন ৫৭০ খৃষ্টাব্দ।

মোদ্দা কথা এই;—যখন কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন তখন তো মানুষ জানে না, তিনি একদিন মহাপুরুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। তদুপরি হজরৎ জন্মগ্রহণ করেন বিত্তহীন অনাথের গৃহে। সে-কালে মক্কা শহরে লেখাপড়ার খুব একটা চর্চা ছিল না (হজরৎকে লেখাপড়া শেখবার কোনো চেষ্টা তাঁর বাল্যবয়সে করা হয়নি; বস্তুত তিনি নিরক্ষর ছিলেন)—কে লিখে রাখবে তাঁর জন্মদিন?

এটা শুধু হজরতের বেলায়ই নয়। বুদ্ধদেব, মহাবীর, জরথুস্ত্র, খৃষ্ট এঁদের সকলেরই জন্মদিবস এমন কি জন্মবৎসর নিয়েও পণ্ডিতেরা আদৌ একমত নন।

হজরতের পরলোকগমন দিবস সম্বন্ধে কোনো মতানৈক্য নেই। তিনি মরধাম

ত্যাগ করেন ৭ই জুন, ৬৩২ খৃষ্টাব্দে। এবং হিজরী তারিখ অনুযায়ী ১২ই রবী উল্-আউওল। অর্থাৎ তাঁর জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন একই দিবসে। এতে ভক্ত মুসলমান মাত্রই আল্লাতালার অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেত দেখতে পান।

পূর্বেই নিবেদন করেছি হজরতের জন্মবৎসর ৫৬০, ৫৬৯, ৫৭০ বলা হয়। আমরা ছেলেবেলা থেকেই ইস্কুলে পড়েছি ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। সেই জনমতই আমরা আবার মেনে নিলুম। এখন যাচ্ছে ১৯৭০। তাহলে এই বৎসর, এই মাসে, এই দিনে হজরতের ১৪০০ জন্মদিন। তাই বহু মুসলমান এদিনটিকে বিশেষ সম্মান দেখাচ্ছেন। কিন্তু এখানে কিঞ্চিৎ মতভেদের সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে। মুসলমানদের বৎসর গণনা চন্দ্র নিয়ে। চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরের চেয়ে হ্রস্বতর। তদুপরি গণনাতে আরেকটা অসুবিধা আছে। মুসলমানের বৎসর হিজরী, গণনা আরম্ভ হয় জুলাই ১৬, ৬২২ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু তার পূর্বে আরবরা বৎসর গণনা করতো সৌর বৎসরে। হিসেব তাই কঠিনতর হয়ে যায়। এবং সর্বশেষ বিপদ, যে খৃষ্টান ক্যালেনডার নিয়ে আমরা সন তারিখ গণনা করি তারও পরিবর্তন সংস্কার একাধিকবার হয়েছে।

অতএব এ-সব হিসেব আপনার আমার মত সাধারণ জনের কর্ম নয়। আমরা সরল বিশ্বাসী। ইস্কুলে পড়েছি ৫৭০ খৃষ্টাব্দে হজরৎ মহম্মদের জন্ম হয়। আজ তাঁর জন্মদিন। এবং উপস্থিত ১৯৭০। অতএব আজ তাঁর ১৪০০ বৎসরের জন্মদিন। আজ আনন্দের দিন। ঈদের দিন। মুসলমান হিন্দু, খৃষ্টান, জৈন, (মারওয়াড়ি) সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করতে হয়।*

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ভারতবর্ষের সর্বত্র যে রূপে প্রকাশ পায়, বাংলাদেশে সে রূপ গ্রহণ করে না। উত্তর ভারতের অন্যত্র হিন্দুরা হিন্দী বলেন পড়েন, মুসলমানরা উর্দুর সঙ্গে যুক্ত। তেজবাহাদুর সপ্রু ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু জাতীয় উর্দু ভাষাভাষী হিন্দুর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। এককালে বিহারে বহু মুসলমান হিন্দী শিখিতেন ; শুনিতে পাই, তাঁহারাও নাকি হিন্দী বর্জন আরম্ভ করিয়াছেন।

* এই সামান্য লেখনটি লেখার উদ্দেশ্য : বহু হিন্দু এবং অনেক মুসলমান হজরতের জন্মদিন, পরলোকদিবস সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল নন বলে মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করেন। পণ্ডিতরাই যে-বিষয়ে মনস্থির করতে পারেননি, সে-স্থলে আমাদের অযথা কুণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

কিন্তু বাংলাদেশের অধিবাসী—তিনি হিন্দুই হউন আর মুসলমান হউন বাংলা বলেন ও পড়েন। কাজেই ভাষার কল্যাণে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান একে অন্যকে চিনিবার সুযোগ পায়। মিশরে কপ্ট-রা ক্রীশ্চান ও বাদবাকী বাসিন্দা আরব মুসলমান। কিন্তু উভয়ের ভাষা এক বলিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মিলনের সুবিধা হইয়াছে। প্যালেস্টাইনে নবাগত ইহুদীরা হয় ইউরোপীয় কোন ভাষা বলে নতুবা মৃতপ্রায় ইয়েডিশ ভাষাতে। কলহ লাগিয়াই আছে।

বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর কৃষ্টি-সভ্যতা সাধারণ বাঙালী হিন্দু যতটুকু (পরিতাপের বিষয় সে ধূলপরিমাণে) জানেন ইচ্ছা করিলেই ততটুকু অক্লেশে জানিতে পারেন ও অনেকেই জানেন। সাধারণ বাঙালী হিন্দু যেটুকু বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-ভাগবত, ষড়দর্শন, কাব্য-নাটক পড়েন, তাহা বাঙলা অনুবাদে ও বাদবাকী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব, রামপ্রসাদী, পরমহংসদেবের রচনামৃত তো মূল বাঙলাতেই আছে। ফলিত-গলিত জ্যোতিষের জন্য বিরাট পঞ্জিকা আছে। বলিতে কি, গ্রামাঞ্চলে পঞ্জিকা বেদ-উপনিষদ গীতাকে হার মানাইয়াছে। আশ্চর্য হইবারই বা কি আছে? ভবানীকে যখন মহাকাল এক বৎসরকালের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া শুধু ঐ বৎসরেরই ফলাফল নিবেদন করেন, তখন তাঁহাকে উপেক্ষা করিবে কোন্ নাস্তিক? আমরাও করি না। বস্তুতঃ সরকারী আবহাওয়া দপ্তরের ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষা ক্ষণা দেবীর উপর অন্ততঃ আমার বিশ্বাস ভরসা বেশী।

সে যাহাই হউক। আসল কথা এই যে, অনুবাদ সাহিত্যে বাঙলা এখন এতটা সমৃদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা সাধারণ বাঙালী নিজেকে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত রাখিতে পারেন। বাঙালী মুসলমানও এই সাহিত্য হইতে অনেক কিছু পারেন। উপায় নাই। এই সব অনুবাদ, মূল বৈষ্ণব পদাবলী, মেঘনাদ বধ কাব্য, কৃষ্ণচরিত্র ইত্যাদি বাদ দিলে প্রাক্ রবীন্দ্র-সাহিত্যে রইল কি?

এখন প্রশ্ন, বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের অথবা হিন্দুর দ্বারা লিখিত মুসলমানী সাহিত্যের কতটা খবর রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন?

বাঙালী হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা লিখিত পুস্তক যে পড়েন না বা কম পড়েন, তাহার জন্য তাঁহাকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ মুসলমানদের ভিতর শক্তিমান লেখক বড় কম। একবার ভাবিয়া দেখিলেই হয় যে, আজ যদি কোন মুসলমান শরৎবাবুর মত সরল ভাষায় মুসলমান চাষী ও মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি আঁকেন, তবে কোন্ হিন্দু না পড়িয়া থাকিতে পারিবেন। আরব্যোপন্যাসের বাঙলা তর্জমা এখনও হাজার হাজার বিক্রয় হয়—যদিও তর্জমাগুলি অতি জঘন্য

ও মূল আরবী হইতে একখানাও এযাবৎ হয় নাই। আবু সঈদ আইয়ুবের লেখা কোন্ বিদগ্ধ বাঙালী অবহেলা করেন? কিন্তু তিনি সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন; মুসলমান জীবন অঙ্কিত করা বা মুসলমানী কৃষ্টি বা সভ্যতার আলোচনা তিনি করেন না। বাঙালী কবীরকে কে না চিনে?

মুসলমানদের উচিত কোরাণ. হদীস, কিকাহ, মহাপুরুষ মুহম্মদের জীবনী (ইবণে হিশামের উপর প্রতিষ্ঠিত) মুসলিম স্থপতি শিল্পকলা ইতিহাস (বিশেষ করিয়া ইবণে খলুদন), দর্শন কালাম ইত্যাদি ইত্যাদি কত বলিব—সম্বন্ধে প্রামাণিক, উৎকৃষ্ট সরল সস্তা কেতাব লেখা। লজ্জার বিষয় যে, ফার্সীতে লিখা বাঙলার ভূগোল ইতিহাস বাহার-ই-স্তানে গাঈবীর বাঙলা তর্জমা এখনও কেহ করেন নাই।

শুনিতে পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'ইসলামিক কালচর' বিভাগ আছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু অধ্যাপকেরা নানা রকম পুস্তক প্রবন্ধ বাঙলায় লিখিয়া 'বিশ্ব বিদ্যালয়' নাম সার্থক করেন। মুসলমান অধ্যাপকেরা কি লেখেন? লিখিলে কি উজবেকীস্থানের ভাষায় লেখেন?

মুসলমানদের গাফিলি ও হিন্দুদের উপেক্ষা আমাদের সম্মিলিত সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরায় হইয়াছে। দুইজন একই ভাষায় বলেন; কিন্তু একই বই পড়েন না। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

গুরুজনদের মুখে শুনিয়াছি গিরিশবাবুর কোরানের তর্জমা এককালে নাকি বহু হিন্দু পড়িতেন এবং তখন নাকি সে তর্জমার কদর হিন্দুদের মধ্যেই বেশী ছিল; কারণ মুসলমানরা তখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই যে, কোরানের বাংলা অনুবাদ করা শাস্ত্রসম্মত কি না।

পরবর্তী যুগে মীর মশারফ হুসেন সাহেবের বিষাদসিন্ধু বহু হিন্দু পড়িয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন (পুস্তকখানা প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থ নহে; অনেকটা পুরাণ জাতীয়, বিস্তর অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ)। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ লালন ফকীরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। পরবর্তী যুগে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গঙ্গোপাধ্যায় আরবী-ফারসী শব্দযোগে তাঁহাদের লেখায় কিঞ্চিৎ মুসলমানী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা লোকপ্রিয়তা হারাইলেন। তারপর আসিলেন নজরুল ইসলাম। সাধারণ বাঙালী হিন্দু তখন প্রথম জানিতে পারিলেন যে, মুসলমানও কবিতা লিখিতে পারেন; এমন কি উৎকৃষ্ট কবিতাও লিখিতে পারেন। কাজী সাহেবের কবিতার ব্যঞ্জন বুঝিবার জন্য প্রচুর হিন্দু তখন মুসলমান বন্ধুদের 'শহীদ' কথার অর্থ, 'ইউসুফ' কে, "কানান" কোথায় জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাজী সাহেব তাঁহার ধূমকেতু কাগজে মুসলমান সমাজের পঙ্কিল দিকটা যত না আক্রমণ করিলেন, তাহার অপেক্ষা বহু কম করিলেন ইসলামের সুন্দর ও মঙ্গলের দিকের বর্ণনা। ইতিমধ্যে মৌলানা আকরম খান প্রমুখ মুসলমান লেখকেরা ইসলাম ও তৎসম্বন্ধীয় নানা পুস্তক লিখিলেন। খুব কম হিন্দুই সেগুলি পড়িয়াছেন। এখনও মাসিক মোহাম্মদীতে ভালো ভালো প্রবন্ধ বাহির হয়, কিন্তু সাধারণ হিন্দু মোহাম্মদী কিনেন না; বিশেষতঃ পদ্মার এপারে। সুখের বিষয়, মৌলবী মনসুরউদ্দীনের 'হারামণিতে' সংগৃহীত মুসলমানী আউল-বাউল-মুরশিদিয়া গীত হিন্দু-মুসলমান গুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লইয়া সঞ্চয়নখানি প্রকাশিত হয়।

২

সর্বজাতি-ধর্মবর্ণ মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিবে ও সেই সম্মিলিত শক্তি পৃথিবীর মধ্যে স্থায়ী আসন লইয়া সত্য ও ধর্মের পথে চলিবে, কংগ্রেসের ইহাই মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে কংগ্রেস কখনও বিশ্বাস হারাইবে না, ও আজ যদি কোনো বিশেষ বর্ণকে নির্যাতন করিয়া অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বলি দিয়া কংগ্রেস স্বরাজ পাইবার সম্ভাবনা দেখিতে পান, তবুও তাহা গ্রহণীয় মনে করিবে না।

উপস্থিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। 'রাজনৈতিক চিন্তাধারায়' বলিতেছি, কারণ আপামর জনসাধারণ এই সমস্যা দ্বারা কতটা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহার পরিমাণ দ্বিধাহীনরূপে আমাদের কাছে এখনও প্রকাশ পায় নাই।

মুসলমানদের কোন কোন নেতা বলেন, 'আমাদের ধর্ম পৃথক, আমাদের আদর্শ পৃথক, আমাদের অনুভূতির জগৎ পৃথক, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুই পৃথক, এক কথায় আমরা আলাদা জাতি বা নেশান।'

কংগ্রেস ইহা স্বীকার করেন না; বহু মুসলমানও করেন না। প্রায় সকল বিদেশী মুসলমানও ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তুর্কী মুসলমানেরা। তাবৎ প্রাচ্য শক্তিরই বাসনা যে, ভারতবর্ষের সর্বজাতি মিলনের ফলে উপজাতি মহতী শক্তিই প্রাচ্য তথা বিশ্বের মঙ্গল আনয়ন করিবে।

হিন্দু মুসলমান দুই পৃথক নেশন কি না তাহা দুই দৃষ্টিবিন্দু হইতে দেখা যাইতে পারে। এক, হিন্দু-মুসলমানের উপস্থিত চিন্তা অনুভূতি ও জীবনীধারার পার্থক্যের হিসাবনিকাশ করিয়া মীমাংসা করা, তাহারা দুই পৃথক নেশন কি না;

অথবা (দুই) ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়া সিংহাবলোকন করা,—অর্থাৎ ইতিহাস কি এই সাক্ষ্য দেয় যে অতীতে ভারতবর্ষের মুসলমানরা হিন্দু ও অন্যান্য জাতির সাহায্য-বর্জিত স্বকীয় বিশেষ কৃষ্টি, ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া আপন নেশনত্ব উপভোগ করিতে-ছিলেন; আপন ভুবনে বাস করিতেছিলেন? ইংরাজ যে রকম আজ এই দেশে দুই শত বৎসর কাটাইয়াও আপন ভাষায় কথা বলে; আপন আহার করে ও করি-বার সময় দেশের 'হ্যাম-বেকনের' স্মরণে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; আপন সঙ্গীত দেশের লোকের কর্ণকুহর প্রপীড়িত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গায়, এ দেশের প্রখর আলো উপেক্ষা করিয়া নির্বিকার চিত্তে তাহার অন্ধকার দেশের মানানসই তীব্র বর্ণযুক্ত ওয়েলপেন্টিং দ্বারা এদেশের প্রাচীর প্রলেপন করে, অবকাশ পাইলেই উর্ধ্বশ্বাসে কালবিলম্ব না করিয়া 'হোম' ছোটে, নয়াদিল্লীতে শিরঃপীড়া ও হৃদিত্রাস সঞ্চার স্থাপিত সৃষ্টি করে; নগরীর যত্রতত্র বেমক্কা মানুষকে ঘোড়ায় বসাইয়া 'প্রতিমূর্তি' নির্মাণ করে; যতদূর সম্ভব আপন 'কাস্ট ক্লব' করিয়া দেশের সামাজিক জীবন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখে; ও বিশেষ প্রাত্যহিক নিত্যকর্ম এমন ভাবে করে যে, তদ্দর্শনে তাবৎ ভারতবাসী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ সকলেই সচকিত হয়। নিন্দা করিতেছি না—পার্থক্য দেখাইতেছি মাত্র।

স্বীয় উক্তিতে মুসলমানরা নিজেকে যত পৃথকই ভাবেন না কেন, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, তাঁহারা সায়েবদের মত 'পাণ্ডববর্জিত' পার্থক্য ধরেন না।

পার্থক্য আছে এবং অঙ্গাঙ্গি বিজড়িত সম্মিলিত সাহিত্য-কাব্য-ধর্ম প্রচেষ্টাও আছে। প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টি দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই দুইটির বিচার করা কর্তব্য। তৎপর দ্রষ্টব্য, ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ সর্বাঙ্গীণ মিলনের জন্য কোন্ আনন্দলোকের দিকে দিঙনির্ণয় করে।

ধর্মে দেখা যায় হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য আছে—অনৈক্য আছে কি না, তাহা পরে বিচার্য। ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুর মত উদার জাতি পৃথিবীতে আর নাই। হিন্দু বহু দেবতা মানিতে পারে, নাও মানিতে পারে; উপনিষদের আত্মন ব্রহ্ম একাত্মা-নুভূমিতে তাহার মোক্ষের সাধন করিতে পারে, নাও পারে, গীতার পরমপুরুষকে উপেক্ষা করিয়া বৃন্দাবনের রসরাজকে হৃদয়আসনে বসাইতে পারে, নাও পারে; সর্বভূতে দেবীকে শান্তিরূপে দেখিতে পারে, নাও পারে; পূর্বজন্ম পরজন্ম মানিতে পারে নতুবা স্বর্গনরকে বিশ্বাস করিতে পারে অথবা উভয়ের সম্মিলনও করিতে পারে। এক কথায় হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস কয়েকটি বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ সংকীর্ণ তত্ত্ব বা তথ্যে গণ্ডীবদ্ধ নহে। কিন্তু তবু আমরা অনায়াসে দৈনন্দিন জীবনে জানি—কাহার ধর্মবিশ্বাস হিন্দুর ন্যায়, কাহার নহে।

মুসলমানরা ধর্মবিশ্বাসে কঠোর নিয়মের বশবর্তী। আল্লা এক কি বহু সে সম্বন্ধে কোন মুসলমান আলোচনা করিতে সম্মত হইবেন না, মহাপুরুষ মুহম্মদ যে সর্বশেষ নবী (prophet) সে বিষয়ে কোন মুসলমানের সন্দেহ করিবার উপায় নাই। মৃত্যুর পর বিচার ও স্বর্গ অথবা নরক, এই তাহার নিঃসন্দেহ বিচার। ইহার যে কোন একটি সিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিলে সে ধর্মচ্যুত বা কাফির হইয়া যায়।

ফল এই দাঁড়ায় যে, ধর্মসিদ্ধান্ত লইয়া পণ্ডিত যখন জ্ঞান সঞ্চয়ার্থে মৌলানার সঙ্গে তর্ক করিতে চাহেন, তখন তিনি কবুল জবাব দেন। (মৌলানার ঔদার্য অন্য স্থলে—তাহার আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে হইবে।)

ইহাই একমাত্র কারণ, কেন মুসলমান আগমনের পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমান ধর্ম-দর্শনের প্রভাব, চিহ্ন-নিশানা কিঞ্চিৎ মাত্র নাই। প্রক্ষিপ্ত অল্লোপ-নিষদ শুধু সাধারণ নিয়মের দিকে রূঢ় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাদের পরিতাপ বাড়াইয়া দেয়। অন্যদিকে মুসলমানদের ধর্মদর্শন আলোচনা এই ষড়দর্শনের দেশে এই—মধুর ধর্মের দেশে নির্বিকার চিত্তে আপনার ঐতিহ্যানুসরণ করিল, অবহেলা করিয়া কি বিত্ত হারাইল বুঝিল না।

দুনিয়ার এই দুই বিরাট ধর্ম সাতশত বৎসর পাশাপাশি কালযাপন করিল অথচ একে অন্যকে সমৃদ্ধ করিল না—এ যেন জলের মধ্যে মীন তৃষ্ণায় কাতর রহিল!

কিন্তু পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্য আছে। খ্রীষ্টধর্ম তাহার নাম দিয়াই খ্রীষ্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ইসলাম তাহার অত্যন্ত সরল অর্থের দিকে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সে অর্থ সকলেই জানেন। তাঁহাকে স্বীকার করিয়া স্পেন হইতে জাভা পর্যন্ত বহু মানব যুগে যুগে আত্মার শান্তি পাইয়াছে—ইসলাম অর্থাৎ শান্তির ধর্ম।

হিন্দুরাও সর্ব তর্ক, সর্ব আলোচনা, সর্ব পূজা, সর্ব উপাসনার পর বলেন শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। নতমস্তকে বলেন, পৃথিবীতে শান্তি হউক, অন্তরীক্ষে শান্তি হউক ; মুসলমানেরা বলেন ইহলোকে (দুনিয়া) শান্তি হউক, পরলোকে (আখিরা) শান্তি হউক।

তরবারীর জোরে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল এই হিংস্র নিন্দা ভারতবর্ষে প্রচার করে একদল দুষ্ট স্বার্থান্বেষীরা। সে আলোচনা অবান্তর বলিয়াই বারান্তরে।

হিন্দু-মুসলমানে সম্পূর্ণ, অখণ্ড মিলন হইয়াছিল অন্যান্য বহু প্রচেষ্টায় ; সেগুলি

ধর্ম ও দর্শন অপেক্ষা হীন তো নহে। বরঞ্চ কেহ কেহ বলেন, মানব সমাজে অধিকতর প্রয়োজনীয় বিশেষতঃ অন্ধকার যুগে। ভাষা নির্মাণ, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থপতি, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র রাজনীতি অর্থনীতি বসনভূষণ, উদ্যাননির্মাণ, আমোদ-আহ্লাদ, কত বলিব। এই সব প্রচেষ্টার পুণ্য, পূর্ণ ইতিহাস কেন, আংশিক ইতিবৃত্তও হয় নাই। যেদিন হইবে সেদিন সেই সুদর্শন পূর্ণাঙ্গ দেব-শিশুকে হিন্দু-মুসলমান কর্তন করিতে চাহিবে এ বিশ্বাস আমাদের কিছুতেই হয় না।

আসল কথাটির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। সেটি এই : হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস কয়েকটি বিশেষ সংজ্ঞাবদ্ধ সংকীর্ণ তত্ত্ব বা তথ্যে গণ্ডিবদ্ধ নহে বলিয়া তিনি সে বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রস্তুত। মুসলমানের দ্বিধাহীন একমত বলিয়া তিনি অসম্মত। ফলে উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সংমিশ্রণ হয় নাই।

তবুও হয়ত কিঞ্চিৎ হইত যদি সামাজিক ক্ষেত্রে উভয়ে মিলিত হইতে পারিতেন। সামাজিক ব্যাপারে মুসলমান উদার। হিন্দুর সঙ্গে এক গৃহে বসবাস করিতে মুসলমানের কোন আপত্তি নাই, একই পাকের ভাত, ডাল, মাছ, কাসুন্দা সকাল সন্ধ্যা পরমানন্দে খায়—প্রশ্ন করে না কে রন্ধন করিয়াছে—একই সরোবরে স্নান করে, একই যানে ভ্রমণ করে এবং রুগ্ন হইলে বৈদ্যরাজকে ডাকা সম্পর্কে তাহার সম্পূর্ণ স্বরাজ। মৃত্যুর পর তাহাকে শ্মশানে গোর দিলেও তাহার ধর্মচ্যুতি হয় না।

অর্থাৎ মুসলমান বলে, 'শাস্ত্রচর্চা করিতে অসম্মত বটি, কিন্তু আইস একসঙ্গে বসবাস করি। হিন্দু বলে, 'বসবাস করিতে পারিব না, কিন্তু শাস্ত্রালোচনা করিতে প্রস্তুত।' এক কথায় হিন্দু যেখানে উদার মুসলমান সেখানে সঙ্কীর্ণ ও মুসলমান যেখানে উদার হিন্দু সেখানে সঙ্কীর্ণ। অর্থাৎ উভয়ের জন্য বারোয়ারী চাঁদোয়া অথবা সর্বজনীন চন্দ্রাতপ নাই।

(দোষাদুষির কথা হইতেছে না। আমরা ইতিহাসের যে শিখরে দাঁড়াইয়া দিকনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এমনি বিজড়িত যে, একে অন্যকে ধাক্কাধাক্কি করিলে উভয়েরই পতন ও অস্থিভঙ্গের সমূহ বিপদ অবশ্যম্ভাবী।)

উপরোল্লিখিত রোগনির্ণয় সাধারণ মোটামুটি ভাবে করা হইল। কিন্তু ইহার ব্যত্যয়ও আছে ও সেই সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য যে, উপরোল্লিখিত রোগ মৌলানা ও শাস্ত্রীমণ্ডলীর। দেশের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ শাস্ত্র লইয়া অত্যধিক শিরঃপীড়ায় ব্যতিব্যস্ত হয় না; পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক চাপে পড়িয়া একে অন্যের

সঙ্গে মিলিতে ও এমন কি বসবাস করিতেও বাধ্য হয়—কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এখনও উত্থাপিত করিবার সময় হয় নাই। দ্বিতীয় এই যে, শাস্ত্রালোচনা করিবার ঔদার্য শাস্ত্রীর আছে সন্দেহ নাই কিন্তু ভারতবর্ষে ট্রেড সিক্রেট জাতীয় একটি নিন্দনীয় ঐতিহ্য অর্ধ-পণ্ডিতদের ভিতরে আছে। যোগ ও তন্ত্র শিক্ষা করিতে যাঁহারাই চেষ্টা করিয়াছেন—হিন্দু-মুসলমান যিনিই হউন—তাঁহারাই জানেন যে, গুণীরা জ্ঞানদানে কি পরিমাণ পরাঙ্মুখ। ফলিত-জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, প্রতিমা-নির্মাণ, সঙ্গীত জাতীয় অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও প্রয়োজনীয় বিদ্যার কথা বাদই দিলাম। অবশ্য একটি কারণও আছে, তাহাকে শাস্ত্রাধিকার বলে। অপক্ক পাত্রে যোগের ন্যায় অত্যুষ্ণ ঘৃত রাখিলে যে সে সহ্য করিতে পারিবে না তাহাতে আর কি সন্দেহ? কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্রই অকপটচিত্তে স্বীকার করিবেন যে এই শাস্ত্রাধিকার লইয়া অর্ধদগ্ধ পণ্ডিতেরা—সত্যকার বিদগ্ধেরা নহেন—অনেক সময় মাত্রাজ্ঞান হারাইয়াছেন ও যোগ্য ব্যক্তিকেও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

গজনীর বিখ্যাত মহমুদের সভাপণ্ডিত গুণিজন দ্বারা মহমুদ অপেক্ষা অধিক সমাদৃত অল-বীরুণী তাঁহার ভারতবর্ষ পুস্তকে এই লইয়া পুনঃ পুনঃ পরিতাপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য ও জ্ঞানতৃষ্ণার প্রশংসা করিতে হয় ও যে-সব পণ্ডিতের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ হইয়াছিল, তাঁহাদের কয়েকজনকে তসলীম করিতে হয় যে, তাঁহারা অকৃপণ ভাবে জ্ঞানদান করিয়াছিলেন। না হইলে অল-বীরুণী ষড়দর্শন, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ জ্যোতিষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে লিখিতেন কি প্রকারে? (এই প্রসঙ্গ হয়ত পুনর্বার উত্থাপিত হইবে না, তাই একটি জিনিসের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না; অল-বীরুণী তাঁহার পুস্তকে মহাভারতের যে পর্ববিভাগ ও তাহাদের শিরোনামা দিয়াছেন, সেগুলির সঙ্গে অদ্যকার প্রচলিত মহাভারতের বিস্তর অনৈক্য দৃষ্ট হয়। এ বিষয় লইয়া কোন গবেষণা এযাবৎ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই বলিয়া গুণিজনের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। Sachau-এর India নামক ইংরজি অনুবাদ দ্রষ্টব্য।)

দুই ধর্মের চরম নিষ্পত্তি সম্মিলিত করিয়া হিন্দু-মুসলমানকে উচ্চাঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রে মিলিত করিবার আর একটি প্রক্ষিপ্ত উদাহরণ দৃষ্ট হয়। সে উদাহরণটি এমনি ছন্নছাড়া, যূথভ্রষ্ট যে, বিশ্বাস হয় না এমন সাধনা সে-যুগে কি করিয়া সম্ভব হইল।

প্রাতঃস্মরণীয় রাজকুমার দারাশীকুহ'র কথা স্মরণ করিতেছি। কী অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ উপলব্ধির সম্মেলনে তাঁহার 'মজ্‌মা'-ই বহরেন' বা দ্বিসিন্ধু-

মিলন সৃষ্ট হইল। ১৮২০-৩০-এর সময় রাজা রামমোহন উপনিষদকে লোকচক্ষুর সম্মুখে আনিয়া ভারতে প্রখ্যাত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণসন্তান—কার্যটি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহার প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সর্বাধিক বিলাসব্যসান মুগল রাজপরিবারের ফারসী-ভাষাভাষী সুকুমার রাজকুমার যৌবনের প্রারম্ভে কি করিয়া সংস্কৃতের বিরাট ভাণ্ডার হইতে এই অক্ষয়, অনাদৃত খনিটি কোন যোগবলে আবিষ্কার করিলেন? ব্রাহ্মণপণ্ডিত রাখিয়া তাহার অনুবাদ ফারসীতে করাইলেন—পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি মূল পাণ্ডুলিপিতে নাকি দারার স্বহস্তে কৃত শুদ্ধি সম্মার্জন মার্জিনে আছে। সেই ফরাসী তর্জমা জেস্যুইয়ট দু পেরোঁ লাতিনে অনুবাদ করেন এবং সেই অনুবাদ জানি না কি করিয়া জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাণ্টের দেশের লোক, প্লেটোর ঐতিহ্যে সঞ্জীবিত, হেগেলের সমসাময়িক এই দর্শনার্ণবের জর্মন কর্ণধার বলিলেন, উপনিষদ আমার জীবনে শান্তি আনয়ন করিয়াছে। তারপর জর্মনী ও পরে ইউরোপে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। উপনিষদের খেই ধরিয়া নানা পণ্ডিত নানা সংস্কৃত জর্মনে তর্জমা করিলেন—সর্বত্র ভারতীয় বিদ্যা ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সে কথা আজ থাক অনুসন্ধিৎসু এই লোমহর্ষক, লুপ্তগৌরব প্রত্যর্পণকারিণী কাহিনী জর্মন পণ্ডিত বিণ্টারনিৎস (Winternitz) ও শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণনের 'ঈস্টার্ণ আইডিয়ালিজম্ ও বেস্টার্ণ থট' পুস্তকে পাইবেন।

দারাশীকূহ্'র দ্বিসিন্ধুমিলনে তিনি ইসলামের সাধনামণি সুফীতত্ত্ব ও হিন্দু দর্শনের চিন্তামণি বেদান্ত তাঁহার জ্ঞানকাঞ্চনাঙ্গুরীয়তে একাসনে বসিয়া যে রশ্মি-ধারার সম্মেলন করিলেন, হায়, তাহা দেশের তমসান্ধকারকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না।

কিয়ৎকাল পরেই 'প্রলয় প্রদোষে মোগলের উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিত' হইতে লাগিল, শবলুব্ধ গৃধ্রীদের বীভৎস চিৎকারের মধ্যে সেই যোগাঙ্গুরীয় কোন্ অন্ধকারে বিস্মৃত বিলুপ্ত হইল।

পুনর্বার ক্ষীণচেষ্টা দেখা গেল—সুভাষচন্দ্র তাঁহার পুস্তকে সে প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তখন বিদেশী আসিয়াছে। সেই কথার উল্লেখ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম।

তারপর? তারপর লজ্জা ঘৃণা পাপ
অপমান; প্রকাশিল অন্তহীন শাপ

হিন্দু-মুসলমান ক্ষত্রিয়েরা যখন ১৮৫৭ সালে পুনরায় সম্মিলিত হইয়া সফল হইলেন না তখন তাহাই উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিলাম।

যুগ্ম ক্ষাত্রতেজে তার পাপ প্রক্ষালন
চেষ্টা হল ব্যর্থ যবে। করিল বরণ
ভেদমন্ত্র ছিদ্রান্বেষী পরম্পরাঘাত
হইল বিজয়টিকা সে অভিসম্পাত॥

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই
না
ভাই ভাই এক ঠাঁই ?

ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা সবপ্রথম করেন অল-বীরুণী ও পরবর্তী যুগে হিন্দু-মুসলিম উভয় সাধনার যে চরম উৎকর্ষ বেদান্ত ও সুফী মতবাদে বিদ্যমান, তাহাদের মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করেন রাজকুমার দারাশীকূহ। আমরা বারান্তরে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

এক্ষণে যে স্থলে উপস্থিত হইয়াছি সেখানে প্রশ্ন ওঠে, আর কি 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' বলা চলে, না এখন বরঞ্চ বলিব 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' ?

এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ নিবেদন করি।

খৃষ্টানরা যে রকম এদেশে সিরিয়ন ক্যাথলিকবাদ, রোমান ক্যাথলিকবাদ এবং প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের নানা চার্চ বা মতবাদ স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাসানুয়ায়ী প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন, মুসলমানরাও সেইরূপ সুন্নি, শীয়া ও অন্যান্য নানা রকম মজহব (Seeds) প্রচলন করার চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষে পাঠান রাজত্ব সর্বত্র পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে মুসলিম অবৈতনিক মিশনারীরা এদেশে স্ব স্ব ধর্মমত প্রচার করিবার প্রয়াস করেন ও বেশীর ভাগ সমুদ্রযোগে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে, অর্থাৎ সিন্ধু দেশ হইতে কেপ কমরিণ পর্যন্ত কর্মস্থল বিস্তৃত করেন।

যাঁহারা ফিটজিরাল্ড কৃত ওমর খৈয়ামের ইংরাজী অনুবাদের উপক্রমণিকাটি মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের স্মরণ থাকিবে যে, ওমর খৈয়ামের বন্ধু হিসাবে আরেকটি লোকের নাম তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে—সে নাম হাসন বিন্ সব্বার। এই হাসন সব্বা স্বধর্ম ও স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে পারস্যে এক ভয়ঙ্কর গুপ্তঘাতকদের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন ; সেই ঘাতকদের নাম হশীশিয়ুন এবং হশীশিয়ুনরা ক্রুসেডের নাইটদের মধ্যে এমনই আতঙ্কের সৃষ্টি করে যে, সেই হশীশিয়ুন শব্দ ল্যাটিনের ভিতর দিয়া ইতালীর assassino হইয়া, ফরাসী assassin-এ রূপান্তরিত হইয়া ইংরিজিতে সেই বানানেই প্রচলিত

আছে। হানন সব্বা পারস্তে আপন কর্মভূমি সীমাবদ্ধ করেন নাই। বিদেশে স্বমত সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনায় গুজরাটে তিনি মিশনরী প্রেরণ করেন। তাঁহাদেরই একজন লোহানা রাজপুতদিগের মধ্যে অ্যাসাসিনদের শীয়া ধর্ম প্রচার করেন। ইঁহারা বর্তমানে পশ্চিম ভারতে 'খোজা' সম্প্রদায় নামে সুপরিচিত। কলিকাতার রাধাবাজারে ইহাদের কাহারো কাহারো কাপড়ের দোকান আছে।

এস্থলে শীয়া-সুন্নি মতবাদ লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। ততোধিক নিষ্প্রয়োজন শীয়াদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাহাদের পার্থক্য লইয়া বাক্যব্যয় করা। শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, হাসন সব্বার মতবাদী খোজা মুসলমানরা উত্তর ভারতের শীয়া হইতে ভিন্ন ; উত্তর ভারতের শীয়ারা ইসনা আশারী অর্থাৎ বারোজন গুরুতে বিশ্বাস করেন, 'খোজারা' ইসমাঈলি অর্থাৎ ইসমাঈলকে শেষ প্রধান গুরু হিসাবে বিশ্বাস করেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই সব বিভিন্ন মতবাদের আংশিক ইতিহাস এনসাইক্লোপীডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিকস এবং পূর্ব ইতিহাস এনসাইক্লোপীডিয়া অব ইসলামে পাইবেন।

লোহানা রাজপুতরা বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাস করিতেন ও সম্ভবতঃ পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (Schrader-এর আডিয়ার হইতে প্রকাশিত পাঞ্চরাত্র সিস্টেম দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বৈষ্ণব যে ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কারণ তাঁহারা বিষ্ণুর দশ অবতারে বিশ্বাস করিতেন।

অদ্যকার খোজাদের মধ্যে কুরাণ শরীফের প্রচলন নাই। তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ-গুলি আংশিক কচ্ছের উপভাষায় ও আংশিক গুজরাতিতে লেখা। সেগুলি 'গিনান' (সংস্কৃত 'জ্ঞান') নামে প্রচলিত ও তাহাদের মধ্যে 'দশাবতার' পুস্তক বা 'গিনান' সর্বাধিক সম্মান পায়। লোহানা রাজপুতদিগকে যে মিশনরী ইসমাঈলি শীয়া মতবাদে দীক্ষিত করেন সেই নূর-সৎ-গুর ('নূর' আরবী শব্দ 'রশ্মি' অর্থে ও 'সৎগুর' 'সৎগুরু' হইতে) দশাবতারের প্রণেতা। খোজারা সাধারণ মুসলমানদের মসজিদে যান না, তাঁহাদের স্বতন্ত্র 'জমাতখানা' বা 'সম্মেলন গৃহে' জমায়েত হন। বিশেষ পর্ব উপলক্ষে 'দশাবতার' পঠন হয়, প্রথম নয় অবতার মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি তাঁহারা উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করেন ; কিন্তু দশমাবতারের কাহিনী আরম্ভ হইলে তাঁহারা দণ্ডায়মান হন।

এই দশমাবতার লইয়া বৈষ্ণবে ও খোজায় পার্থক্য। বৈষ্ণবমতে দশমাবতার কল্কি, খোজামতে দশমাবতার বহুকাল হইল মক্কায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি মহাপুরুষ মুহম্মদের জামাতা হজরত আলী। (পাঠককে এইস্থলে স্মরণ করাইয়া

দেই যে, গোঁড়া শীয়ারা আলীকে মহাপুরুষ মুহম্মদ অপেক্ষা সম্মান প্রদর্শন করে ও আদালুসের ইবনে হাজমের মতে এমন শীয়াও আছেন যাঁহারা বলেন, "দেবদূত—ফিরিস্তা জিবরঈল—Gabriel 'ভ্রমবশতঃ' কুরাণ শরীফ হজরত আলীকে না দিয়া হজরত মুহম্মদকে দিয়া ফেলেন" !!! এবং আরও বিশ্বাস করেন যে, হজরত আলীর মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মা তাঁহার পুত্র হাসন তৎপর তাঁহার ভ্রাতা হুসেন, তৎপর জয়ন উল-আবেদীন তৎপর তাঁহার পুত্র হইয়া বংশানুক্রমে চলিতে চলিতে বর্তমান জীবিত ইমাম বা গুরুতে বিরাজমান—বর্তমান গুরুর নাম পরে উল্লেখ করিব।

খোজারা অর্ধ-কচ্ছী-উপভাষা ও অর্ধ-গুজরাতিতে উপাসনা করেন—তাহাকে 'নামাজ' বলিলে ভুল বোঝানো হইবে। রমজান মাসে খোজারা উপবাস করেন না। হজ করিতে মক্কায় যান না—বর্তমান ইমাম বা গুরুদর্শনে হজের পুণ্যসঞ্চয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। গরীব দুঃখীকে 'জকাত' বা ধর্মাদেশানুযায়ী 'ভিক্ষা' দেন না, সে অর্থ গুরু দ্বারা প্রচলিত প্রতিষ্ঠানকে দেন। খোজারা পাঁচবারের পরিবর্তে তিনবার উপাসনা করেন এবং সুন্নি ও শীয়া মত হইতে তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসে অন্যান্য বহু অনৈক্য দৃষ্ট হয়।

খোজাদের 'গিনান' বা ধর্মগ্রন্থগুলি পড়িলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ্যাসাসিন মিশনারিরা হিন্দু এবং শীয়া মতবাদের সম্মেলনে এক নূতন ধর্ম সৃষ্টি করিয়া তাহাতে তাবৎ ভারতীয়দিগকে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করেন। এই দৃষ্টান্তটি বিশেষ উল্লেখ করিলাম কারণ ইহা শীয়াদের পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল। ইহার পর ভাষা নির্মাণে কাব্য সৃষ্টিতে বিভিন্ন রসবস্তু সম্মেলনে যে সব প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহা অধিকাংশ সুন্নিদের দ্বারা।

গুজরাতে 'মতিয়া' সম্প্রদায়ও বিবাহের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু মৃত্যুর পর শব কবরস্থ করিবার জন্য মোল্লার কাছে আরজী পেশ করেন। পশ্চিম উপকূলে এইরূপ নানা সংমিশ্রণের চিহ্ন সর্বত্র পাওয়া যায়।

এইসব চেষ্টার ফলেই ১৭৫০ সালে লিখিত গুজরাতের ফারসী ইতিহাস মিরাত-ই অহমদীতে দেখা যায় যে, হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক কলহ তখন প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। লেখক আলী মুহম্মদ খান তাঁহার হাজার পাতার (মুদ্রিত) পুস্তকে যে দুই একটি কলহের উদাহরণ দিয়াছেন সেগুলি তিনি সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় রূপেই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

খোজাদের বর্তমান গুরু হিজ হাইনেস দি আগা খান।

ভাই ভাই এক ঠাঁই

১

বারান্তরে হিন্দু-মুসলিম শাস্ত্রীয় মিলনের ফলে উপজাত 'খোজা' মতবাদের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে যেস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার সম্মুখে মিলনের সুধা-শ্যামলিমদিগ্ দিগন্ত বিস্তৃত—তাহার পুণ্য পরিক্রমা আরম্ভ করিব, এমন সময় একটি অতি আধুনিক ঘটনার দিকে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। কালানুপূর্বের ধারাবাহিকতার প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠা প্রদর্শন না করিয়া অসময়ে প্রসঙ্গটির অবতারণা করিব, কারণ বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিবিন্দু হইতে অসাময়িক হইলেও অবান্তর নহে।

গত মঙ্গল-শুক্রবারে* যখন কলিকাতার ছাত্রসমাজ ও বহু বাঙালী-অবাঙালী স্বৈরতন্ত্রের প্রতিবাদ করিয়া আন্তরিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, তখন অনেকেই হয়ত আশা করিবার সাহস রাখেন নাই যে, মুসলমানেরা, বিশেষতঃ মুসলমান ছাত্রসমাজ ইহাতে যোগদান করিবেন। আমরা নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় স্তম্ভটি পাঠকের গোচর করিতেছি।

A large number of Muslim students participated in the recent disorders in Calcutta. One of them lost his life, and many received injuries, serious and light. The student of the Islamia College went on strike in sympathy with their Hindu fellow students and in protest against the firing and lathi charge by the police. The vice-president of the College Union presided over a huge meeting which passed appropriate resolutions. Large numbers of Mulims, other than students, also took part in the demonstrations. Many non-Muslims wonder why these Muslims have taken this attitude. The answer is not difficutt to find. It is the Muslim way, the result of over 13 centuries of teaching expressed in the practice of the precepts laid down in the holy Qur'an and the traditions of the prophet Muhammad: Love your neighbours, side with him that is weak, oppressed

* ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ

or ill-used, serve Allah by serving his creatures ; the true Muslim is represented in his two little things, his heart and his tongue.

এতদিন ধরিয়া আমরা ঠিক এই কথাটিই বলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সর্ব ধর্মের মূলতত্ত্ব সমান, আমরা সকলে একথা স্বীকার করি ; কিন্তু আচার-ব্যবহারে অশন-বসনে সেই তত্ত্বগুলি যখন প্রকাশ পায়, তখন অনেক সময় এমন বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া পীড়াদায়ক হইয়া ওঠে যে, তখন মানুষ শুধু সেই মানুষগুলির আচরণের নহে তাঁহাদের ধর্মের উপরও দোষারোগ করিতে থাকে। সবিস্তর নিবেদন করি :—

ইংরেজরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম আনয়ন করেন। খ্রীষ্টধর্ম মৈত্রী ও ক্ষমার ধর্ম। কিন্তু দেড়শত বৎসর খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পরও এদেশে দেখি, দিশি খ্রীষ্টানের স্বতন্ত্র ধর্মালয়, শ্বেত খ্রীষ্টানের স্বতন্ত্র ধর্মালয়, আহার-বিহার সামাজিক গণ্ডি স্বতন্ত্র, এমন কি মৃত্যুর পাণ্ডুহস্ত স্পর্শেও কৃষ্ণ-খ্রীষ্ট ধবল হয় না ;—তাহার জন্য স্বতন্ত্র গোরস্তান। ইংরেজ শাসকের স্বৈরতন্ত্র মুসলমান শাসকের 'এখতেয়ারী' অপেক্ষা সর্বাংশে অধিক চর্মদাহে মর্মদাহে তাহা বার বার অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের সর্বপ্রকার সাহায্য সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্মের ন্যায় উদার ধর্ম, এদেশে সসম্মানে বরিত ও নন্দিত হইল না। ধর্মপিপাসু মন বার বার শুধায়, ক্রটি কোন্‌-খানে ? হয়ত যাঁহারা বাহকরূপে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্মের সত্য সেবক ছিলেন না।

তাই বলি এদেশের মুসলমান ধার্মিক। ব্যাপক অর্থে ধার্মিক। তিনি আরব-তুর্ক-মোগল বিজেতাদের জন্য স্বতন্ত্র ধর্মাগার, ভোজনাগার, অনন্ত-শয্যাগার নির্মাণ করেন নাই। তিনি স্বধর্ম পালন করিয়া হিন্দুর প্রতিবাসী হইয়াছেন। বিদেশী-শকট-যুগ্ম যখন হিন্দু-মুসলিমের যুগ্ম-স্কন্ধকে চরম মর্দনে প্রপীড়িত করিল, তখন বর্ণ-ধর্ম ভুলিয়া দুই নিরীহ বলীবর্দ যুগ্ম-পদাঘাতে শকটারোহীকে সচেতন করিয়া দিল।

উপরোদ্ধৃত সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখক ইসলামের মূলনীতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন, সজোর লেখনী সঞ্চালনে প্রকাশ করিয়াছেন।

"We do not blame the action of the students, for that matter, the action of the other Muslims who took part in the demonstrations ; but it is the students in particular whom we are addressing. We commend their action and

admire it. Furthermore, we thoroughly understand the noble motives which have actuated them."

এ সত্য মুসলমানের কথা। এ সত্য মানুষের কথা! ধর্মের কথা ন্যায়ের কথা! এই ভাই কোন ভিন্ন ঠাঁই যাইবে?

কিন্তু,

The Muslim students know fully well that their life and future are in jeopardy in a country where though a hundred million, the Muslim are in a minority. They realise the designs against them as Muslims.

মুসলমানদের ভীত হইবার কারণ আছে কিনা সে প্রশ্ন আমরা কেন জিজ্ঞাসা করিব? কারণ লেখক নিজেই ভীত হন নাই—ভীত হইয়া স্বধর্মীয়দিগকে গণ অভিযান হইতে পশ্চাৎপদ হইতে বলেন নাই; নিজেই বলিতেছেন:

Still they have not hesitated to plunge into the fury, why? It is the Muslim way. Their hearts told them the I. N. A. trial was unjust. The lathi charges were brutal, the firing absolutely unjustified. It was their bounden duty to sympathise. Their hearts, brimful with the sublime teachings of Islam made them translate their sympathy into action. Some of them fell, side by side, with those who, perhaps not in person, represented the terrible menace to Islam and Muslim in India.

It was the Muslim way, most nobly expressed.

আমেন। তথাস্তু!

আমাদের তো বলিবার আর কিছুই নাই। সাহস পাইলাম, ভরসা পাইলাম, যে দিন স্বাধীনতা সংগ্রামের শঙ্খধ্বনি ভারতবর্ষ প্রকম্পিত করিবে, সেদিন তাহার রুদ্রদমন-চেষ্টা পুনর্বার ক্রুর বুধ-শুক্র রূপ ধারণ করিবে, সেই শুভদিনে প্রতিবাসী যখন প্রতিবাসীর দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে সেদিন তরুণ মুসলিম, প্রবীণ মুসলিম 'মুসলিম-ওয়ে' মুসলিম-পন্থায় দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইবে—তাহার বিরুদ্ধে কি 'design', কি 'menace' ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিবে না।

এতদিন যাবৎ হিন্দু-মুসলমান কৃষ্টির যে সব স্থলে যোগ হয় নাই তাহারই উল্লেখ করিতেছিলাম। দেখিলাম সাতশত বৎসর ধরিয়া ভট্টাচার্য টোলে সংস্কৃত ঐতিহ্য সঞ্জীবিত রাখিলেন, কিন্তু ইসলামের নিকট হইতে কোনো ঋণ গ্রহণ করিলেন না; মৌলানা আরবী-ফারসী জ্ঞানচর্চা করিলেন, কিন্তু ভট্টাচার্যের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

অর্থাৎ শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্ম, মুসলমান ধর্ম, হিন্দু দর্শন, মুসলমান দর্শন একে অন্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া জীবিত রহিল।

কিন্তু ইহাই কি শেষ কথা? ভারতবর্ষের কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান চাষা মজুর শতকরা কয়জন ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া জীবনযাপন করিয়াছে, তাহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আদর্শ একে অন্যের সাহায্য লইয়া তাহারা কি পণ্ডিত মৌলবীকে উপেক্ষা করিয়া প্রকাশ করে নাই? ভট্টাচার্য তাঁহার দেবোত্তর জমি ও মৌলানা ওয়াকফদত্ত সম্পত্তি উপভোগ করিতেন, উভয়ের উপর এমন কোনো অর্থনৈতিক চাপ ছিল না যে বাধ্য হইয়া একে অন্যের দ্বারস্থ হন। কিন্তু মুসলমান চাষা তো এ দম্ভ করিতে পারে নাই যে হিন্দু জেলেকে সে ধান বেচিবে না, হিন্দু জোলা তো এ অহংকার করিতে পারে নাই যে মুসলমানকে কাপড় না বেচিয়াও তাহার দিন গুজরান হইবে।

শাস্ত্রী ও মৌলানা যে সব কারণবশতঃ সর্বজনীন চন্দ্রাতপতলে একত্র হইতে পারিলেন না, সে সব কারণ তো চাষামজুরের জীবনে প্রযোজ্য নহে। ব্রহ্ম এক কি বহু, সগুণ কি নির্গুণ—তাহা লইয়া সে হয়ত অবসর সময়ে কিছু কিছু চিন্তা করে, কিন্তু এসব তো তাহার কাছে জীবনমরণ সমস্যা নহে—এমন নহে যে, ঐ সম্পর্কে কলহ করিয়া একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিবে না। তাহার উপর অর্থনৈতিক চাপ নির্মম চাপ, যাহাকে বলে অন্নচিন্তা চমৎকারা। তাই দেখিতে পাই মোল্লা-মৌলবীর বারণ সত্ত্বেও মুসলমান চাষা জানিয়াশুনিয়া হিন্দুকে বলির জন্য পাঁঠা বিক্রয় করে, পয়সা রোজগারের জন্য বিসর্জনে ঢোল বাজায়; হিন্দু গয়লা মুসলমান কসাইকে এঁড়ে বাছুর বিক্রয় করে। এই কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান শব্দার্থে পাশাপাশি বাস করিয়াছে। একে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগ লইয়াছে। আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পাইয়াছে। সে-সব কি তাহারা ধর্মে, লোকসাহিত্যে, গানে, ছবিতে প্রকাশ করে নাই? যদি করিয়া থাকে তবে তাহা পুস্তকাবদ্ধ নস্যসিক্ত শাস্ত্রালোচনা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধর্ম ও দর্শনালোচনা অপেক্ষা অনেক সত্য, অনেক জীবন্ত। লক্ষ কণ্ঠে গীত কবীরের ধর্মসংগীত, ষড়দর্শন ও ইলমুলকালাম

হইতে লক্ষগুণে নমস্ত।

হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের যুগ্ম চেষ্টায় ভারতবর্ষে গত সাতশত-আটশত বৎসর ধরিয়া যে-কৃষ্টি যে-সভ্যতা নির্মিত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব। কি ধর্মে, কি ভাষা-নির্মাণে, কি সাহিত্য-সৃষ্টিতে, কি সংগীতে, কি নৃত্যে, কি বিলাস-সামগ্রী নির্মাণে, তৈজসপত্রে—কত বলিব? ইহারা যে প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছে, দানে-গ্রহণে যে অকৃপণতা দেখাইয়াছে তাহা—আবার বিশেষ জোর দিয়া বলি—সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে অপূর্ব, সমগ্র জগতের কল্পনার অতীত। ভারতের হিন্দু-মুসলমান যাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা পৃথিবীর কোন দুই ধর্ম কস্মিন্‌কালেও করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত কথা তোলা অনুচিত, কিন্তু যে-বিষয়ে অধম গত পঁচিশ বৎসর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে তাহার সম্যক্ মূল্য বুঝিবার জন্য সে দেশে-বিদেশে সর্বত্র—সর্বপ্রকার লোকসংগীত ও অন্যান্য জনপদকলা আকণ্ঠ পান করিয়াছে, আকর্ণ-বিস্ফারিত চক্ষে দেখিয়াছে। সহৃদয় পাঠক ক্ষমা করিবেন, কিন্তু অধমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জনিত দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের লোকসংগীতের কাছে ইউরোপের তথা অন্যান্য প্রাচ্যদেশের (চীনের কথা বলিতে পারি না) কোনো লোক-সংগীত দাঁড়াইতে পারে না, না, না।

অতএব আমাদের কর্তব্য এই আটশত বৎসরের সর্বপ্রকারের জনপদ-প্রচেষ্টা খুঁটিয়া খুঁটিয়া চিরিয়া চিরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা, লিপিবদ্ধ করা, কলের গানে রেকর্ড করা, ইতিহাস লেখা ও সর্বশেষে তাহাকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিবিন্দু হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়া ইস্কুল-কলেজে পড়ানো।

আবার বলিতেছি ইস্কুল-কলেজে পড়ানো। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্থপতি যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তবে ইহাই হইবে তাহার সুদৃঢ়, অচল-অটল ভিত্তি। শিখর, মিনার কে নির্মাণ করিবেন, কোন্ দর্শন, কোন্ শাস্ত্রীয় ধর্ম দিয়া—সে আলোচনা পরে হইবে।

কিন্তু যে কর্মটির প্রতি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম তাহা তো একজন, শতজন, হাজারজনের অক্লান্ত পরিশ্রমেরও বাহিরে। এত লোকসংগীত, স্থপতি, চিত্র, সংগীত, নৃত্য ভারতের গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে সর্বত্র হৃতজ্যোতি হইয়া মৃতপ্রায়, তাহাকে সংগ্রহ করিবার জন্য নেতৃত্ব করিবেন কে?

আমাদের পরম সৌভাগ্য, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশ্বের সর্বত্র রাজাধিরাজের সম্মান পাইয়াও এই কবি লালন ফকীরকে উপেক্ষা করেন নাই, হাসন রাজার গান গাহিয়া বিদগ্ধ দার্শনিকমণ্ডলীর সম্মুখে

অবতরণ করিলেন।

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন,
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দীন
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদবয়
আমা হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয়।

(কাশীতে প্রদত্ত দার্শনিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ দ্রষ্টব্য)।

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের দৃষ্টি এদিকে পূর্বে আকৃষ্ট হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় উৎসাহে তিনি এই কর্মে আরও মনোযোগ করিলেন, বহু অমূল্য লুপ্তধন সঞ্চয় করিলেন। দেশের লোক তাহা প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান করুন।

ভারতবর্ষের লোকসংগীত লইয়া চর্চা করিতে হইলে উত্তর-ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা-উপভাষার পণ্ডিত হইতে হয় ও এই সব সংগীতের পশ্চাতে যে সংস্কৃত ও ফারসীতে লিখিত ও গীত ভক্তি-সুফী-বেদান্ত-যোগবাদ রহিয়াছে তাহার সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন।

অধমের নাই। বাহির হইতে যেটুকু সামান্য দেখিয়াছি তাহাই নিবেদন করিবার চেষ্টা করিব। সহৃদয় পাঠককে সাবধান করিয়া দিতেছি, আলোচনা অতি অসম্পূর্ণ ও দোষত্রুটিতে কণ্টকিত থাকিবে। এবং ইতিমধ্যে অন্য কেহ যদি আলোচনাটি আরম্ভ করেন তবে অধম তাঁহাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়া পরমানন্দে শ্রোতার আসনে গিয়া বসিবে।

৩

পূর্বের প্রবন্ধে সামান্য আভাস দিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষীয় লোকসংগীতের মূল্য ও তাৎপর্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বেদান্ত, যোগ, ভক্তিবাদ ও সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন।

সুফীবাদ (ভক্তি, যোগ ও mysticism-এর সমন্বয়) ভারতবর্ষে আসে পারস্য হইতে ও এদেশের দর্শন ও ভক্তিরস ইহাকে পরিপুষ্ট করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে আরেকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য আকর্ষণ করিব।

১৯১৮-র যুদ্ধে যখন ফ্রান্স ও জর্মনী ক্লান্ত, তখন পণ্ডিত-মহলে দ্বিতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যুদ্ধ সুফীবাদ লইয়া। একদিকে ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত মাসিন্নো, অন্যদিকে জর্মনীর তদপেক্ষা বিখ্যাত পণ্ডিত গল্‌ড্‌ৎসীহার ও তস্য শিষ্য

হর্তেন। মাসিন্নো পক্ষ বলিলেন, ইরানের সুফীবাদের উপর ভারতবর্ষীয় কোন প্রভাব পড়ে নাই, যেটুকু পড়িয়াছে তাহা সুফীবাদ ভারতবর্ষে আসিবার পর। অন্যপক্ষ নানা প্রকার যুক্তিতর্ক দলিলদস্তাবেজ দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে, ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেই অর্থাৎ ইরানের বর্ধিষ্ণু সুফীবাদ বেদান্ত ও যোগরস পুনঃ পুনঃ পান করিয়াছে।

তর্কটি পাত্রাধার তৈলজাতীয় আপেক্ষিক, নিরর্থক নহে। সুফীবাদ অনুসন্ধান করিলে যদি সপ্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষীয় দর্শনের লাঞ্ছন তাহার উপর রহিয়াছে তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি গম্ভীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব সপ্রমাণ হয়, সেটি এই যে, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন এককালে ইরান পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল।

এ সন্দেহ বহু পূর্বেই কোন কোন পণ্ডিত করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মদর্শন যে ইরান নহে, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সে সন্দেহ প্রথম জাগে পণ্ডিতমণ্ডলীর মনে, যখন তাঁহারা বাইবেলের প্রাচীন ও নবীন মাঙ্গলিকের (Old and New Testaments) তুলনাত্মক আলোচনা আরম্ভ করেন। ইহুদিদের প্রাচীন মাঙ্গলিকের যে হিংস্র নীতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে পীড়া দেয়, সেইরূপ খ্রীষ্টের ক্ষমা ও দয়ার নীতি নবীন মাঙ্গলিকে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আনন্দ ও সাহস দেয় (একদিকে An eye for an eye, and a tooth for a tooth ও অন্যদিকে Love thy neighbour, offer the left cheek ইত্যাদি তুলনা করুন)। পণ্ডিতমণ্ডলী জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্ট কি করিয়া শান্তি ও মৈত্রীর বাণী ঐ হিংস্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন ও প্রচার করিবার দুঃসাহস সঞ্চয় করিলেন ? তবে কী কোনো বৌদ্ধশ্রমণের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ হইয়াছিল ? বিশেষতঃ তাঁহার যৌবন কোথায় কি প্রকারে যাপিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বাইবেল যখন নীরব।

এ প্রশ্নের সমাধান অদ্যাপি হয় নাই, কখনো হইবে এ আশাও আমার নাই। কিন্তু সে সমস্যা উপস্থিত তুলিবার প্রয়োজন আমার নাই—সে বড় জটিল ও এস্থলে অবান্তর।

তবে একথা আমরা জানি যে, বৌদ্ধশ্রমণেরা ইরান, আরব পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন ও সেই তত্ত্ব জানি বলিয়া যখন সুফীবাদে মাঝে মাঝে এমন চিন্তাধারার সন্ধান পাই, যাহা অবিমিশ্র সনাতন ইসলামে নাই, অথচ শূন্যবাদের অত্যন্ত পাশ দিয়া বহিতেছে, তখন মন স্বতঃই প্রশ্ন করে, তবে কি উভয়ের কোথাও যোগ আছে ?

মাসিন্নো ও হর্তেনে এই তর্ক চলিয়াছিল বহু বৎসর ধরিয়া। পৃথিবীর বিদগ্ধ-জন সে তর্ক অনুসরণ করিয়া যে কী আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা কখনো বিস্মৃত হইবেন না। হর্তেন স্বীয় মত সমর্থন করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত একখানা পূর্ণাঙ্গ অভিধান লিখিলেন, তাহাতে সূফীবাদের সঙ্গে বেদান্ত শব্দে শব্দে মিলাইয়া বলিলেন, এ রকম সাদৃশ্য যেস্থলে বর্তমান, সেখানে প্রভাব মানিতেই হইবে।

এ তর্কও কথনো শেষ হইবে না। কারণ এ কথা ভুলিলে চলিবে না, মানবাত্মা যথন কর্ম ও জ্ঞানযোগে তাহার তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে পারে না, তথন সে ভক্তির সন্ধান করে। মানব যথন দুঃখ-যন্ত্রণায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়, তথন অকস্মাৎ তাহারই গভীর অন্তস্তল হইতে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁহাকে রহস্যময় ইঙ্গিত করেন। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া মানুষ তথন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষে সর্বচৈতন্য সংযোগ করে। তাহাই যোগ।

বহু ক্যাথলিক সাধু যোগী ছিলেন অথচ তাঁহারা ভারতের যোগশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। যুগে যুগে পৃথিবীর সর্বত্র উপযুক্ত সোপান আরোহণ দৃষ্ট হয়। কর্ম জ্ঞান ও তৎপর ভক্তি। আর যোগ তো অহরহ রহিয়াছে। ঘোর সংসারীও যথন অর্থশোক ভুলিবার চেষ্টা করে, তথন সে যোগের প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছে। শুধু দ্বিতীয় সোপানে সে যাইবার চেষ্টা করে না—হিরণ্ময় পাত্র দেখিয়াই সে সন্তুষ্ট—তাহাকে উন্মোচন করিয়া চরম সত্য দর্শন করিবার প্রয়াস তাহার নাই।

যোগ পৃথিবীর সর্বত্রই ছিল ও এখনও আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যোগকে বিশ্লেষণ করিয়া যেরূপ সর্বজনগম্য করা হইয়াছে, তাহাকে যুক্তিতর্ক ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ দর্শন করা হইয়াছে, সে রকম আর কোথাও করা হয় নাই—একমাত্র ইরান ছাড়া। সূফীরা ভারতবর্ষীয় যোগীর ন্যায় অন্তর্লোকে সোপানের পর সোপান অধিরোহণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এক সূফী অন্য সূফীর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন।

ফলে কথনো নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মবোধে বিলীন হইয়াছেন (ফানা), কথনো ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া সেই একাত্মবোধ রসস্বরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"মন্ তু শুদম, তু মন্ শুদি,
মন তন্ শুদম, তু জাঁ শুদি।
তা কসি ন গোয়েদ বাদ আজ ইন
মন দিগরম তু দিগরী॥"

"আমি তুমি হইলাম, তুমি আমি হইলে,
আমি দেহ হইলাম, তুমি প্রাণ,
ইহার পর আর যেন কেহ না বলে,
আমি ভিন্ন এবং তুমি ভিন্ন।"

ইহাই তো সত্য ধর্ম। এ মন্ত্র ব্রহ্মে বিলুপ্তির মন্ত্র এবং এ মন্ত্র বিবাহের মন্ত্র। খ্রীষ্টসাধু যীশুকে বিবাহ করে, চার্চকে বিবাহ করে, শ্রমণ সঙ্ঘকে বিবাহ করে আর আমাদের মত সাধারণ মানুষ প্রিয়াকে এই মন্ত্রে বরণ করিয়া সংসারপথে চলিবার শক্তি পায়।

৪

মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ এদেশে সূফী বা ইরানী ভক্তিমার্গ প্রচার করিলে পর হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের সম্মিলিত আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে যে সব সাধক মধুরকণ্ঠে আত্মার রহস্য-লোকের অভিজ্ঞতার গান গাহিলেন তাহার সঙ্গে আমাদের সকলেরই অল্পাধিক পরিচয় আছে। কবীরের নাম শোনেন নাই এমন লোক কম ও যাঁহারাই ভারতীয় কৃষ্টির সত্য, বহুমুখী প্রতিভার প্রতি সিংহাবলোকন করিয়াছেন, তাঁহারাই অন্যান্য নানা সাধকের ভজন দোহার সঙ্গে সুপরিচিত।

উত্তর ভারতে যে-সব সাধক জনগণের হৃদয়মন ভক্তিরসে প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আংশিক পরিচয় মাত্র দিতে হইলেও বহু বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন। সংবাদপত্রের বিক্ষিপ্ত স্তম্ভের উপর সে বিপুল সৌধনির্মাণ করা সম্ভবপর নহে। অনুসন্ধিৎসু ও রসজ্ঞ পাঠক সে সৌধের সন্ধান পাইবেন শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের 'দাদু' পুস্তকের ভূমিকায়, পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁহার স্টেফানস নির্মলেন্দু বক্তৃতায়।

উত্তর ভারতে এই সাধনার দ্বারা পূর্ব ভারতে সপ্রকাশ হয় আউল, বাউল, মুর্শিদিয়া, সাঁই, জারীগানের ভিতর দিয়া। সে-সব গীতের সঙ্কলন এযাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করা হয় নাই। দুইজন গুণী এই কর্মে লিপ্ত আছেন ও রসিক-জনের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক মৌলবী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও শ্রীহট্টের মৌলবী আশরফ হোসেন বহু পরিশ্রম করিয়া নানা সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছেন। (এই মহান্ ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া দ্বিতীয়োক্ত মহাশয় কয়েক মাস পূর্বে আসাম সরকারের নিকট হইতে যে কি উৎকট প্রতিদান পাইয়াছেন সে সম্বন্ধে আরেক দিন আলোচনা করিবার বাসনা রহিল)।

লালন ফকীর, শীতালং শাহ, রাধারমণ, গোলাম হুসেন শাহ, হাসন রাজা,

ভেলা শাহ, সৈয়দ জহরুল হোসেন, সৈয়দ শাহ নূর প্রভৃতি সাধকমণ্ডলীর পরিচয় এই সব সঙ্কলনে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জগতে ইঁহাদের অধিকার দৈনন্দিন জীবনের নিম্নতম কঠিন কঠোর অভিজ্ঞতা হইতে আত্মার উচ্চতম রহস্যলোকের প্রতি ইঁহাদের অভিযান যে কি পরম বিস্ময়জনক, লোমহর্ষক তাহা বর্ণনা করিবার মত অভিজ্ঞতা তো আমার নাই। গ্রহচন্দ্রে, তারায় তারায় অনন্তের যে সুগম্ভীর বীণাধ্বনি প্লাবন মন্দ্রে মুখরিত, রুদ্রের ত্রিকাল ত্রিকোলস্পর্শী দক্ষিণ হস্তে যে রুদ্রাক্ষ জন্মমৃত্যু সৃষ্টিপ্রলয়ের অন্তহীন চক্রে ঘূর্ণায়মান তাহারই স্পন্দন নমস্য সাধকেরা অনাবিল চৈতন্যগোষ্পদে শতরাগে বিম্বিত করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। পুনরাবৃত্তি করি, প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, উপনিষদের ঋষি যে প্রকারে দর্শন করিয়াছিলেন, মু'তাজিলা সুফী পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যোগে পরমাত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন।

সে রহস্যলোকের ব্যঞ্জনা সাধকেরা দিয়াছেন মধুর কণ্ঠে, ছন্দগানে। রসিকজন শ্রবণমাত্র ভাবরসে আপ্লুত হইয়াছেন। নীরস গদ্যে অরসিকজন তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেন বিড়ম্বিত হইবে?

আমাদের পক্ষে শুধু সম্ভব সাধকগণের রসস্রোতধারার ভৌগোলিক উৎপত্তি-স্থলের অনুসন্ধান করা। কোন্ পর্বত-কন্দরে তাহার উৎপত্তি, কোন দেশে-প্রদেশের উপর দিয়া তাহার গতি, কোন মহাসমুদ্রে তাহার নিবৃত্তি সে অনুসন্ধান ভূগোল আলোচনার ন্যায়; তাহাতে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, রসাস্বাদনের প্রত্যক্ষ আনন্দ তাহাতে হয় না। গঙ্গার উৎপত্তি নিলয় জানিয়া তাপিত দেহে গঙ্গাবগাহন-জনিত স্নেহসিক্ত শান্তিলাভ হয় না, পুণ্যলাভ তো সুদূরপরাহত।

রসিকজন এই অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় বিড়ম্বনাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন,

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি, আ মরি।

স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, তৎসত্ত্বেও মনে পড়িতেছে, পরমহংসদেবও বলিয়াছেন, মদ শুঁকিলেই নেশা হয় না, চাখিলে নেশা হয় না, এমন কি সর্বাঙ্গে মাখিলেও নেশা হয় না, নেশা করিতে হইলে মদ খাইতে হয়। অর্থাৎ সে রসসায়রে নিমজ্জিত হইতে হয়, পারে দাঁড়াইয়া সে অমৃতের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা পণ্ডিতের পণ্ডশ্রম। তাই বাউল বলিয়াছেন,

যে জন ডুবল, সখি, তার কি আছে বাকি গো?

তখন তো তাহার আর দুঃখ-যন্ত্রণা নাই, সে তো জন্ম-মৃত্যুর অতীত। রাজসিক কবি শ্রীমধুসূদন পর্যন্ত বলিয়াছেন:

মক্ষিকাও গলে না গো সে অমৃত হ্রদে

সৈয়দ শাহনুর গাহিয়াছেন :

রসিক দেখে প্রেম করিয়ো যার দিলেতে ফানা,
অরসিকে প্রেম করিলে চোখ থাকিতে কানা।
ওজুদে মজুদ করি লীলার কারখানা,
সৈয়দ শাহনূর কইন দেখলে তনু ফানা॥

যিনি ব্রহ্মানন্দে আত্মনিলয় (ফানা) করিতে সমর্থ হইয়াছেন, একমাত্র সেই রসিকের সঙ্গে প্রেম করিবে। তদভাবে তুমি চক্ষুষ্মান অন্ধ। এই দেহেই (ওজুদ) লীলার কারখানা মজুদ। তাহা যদি দেখিতে পারো তবেই তুমি দেহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ (ফানা) করিবে।

(শব্দতাত্ত্বিক লক্ষ করিবেন ভাষার দিক দিয়াও এই চৌপদী 'রুবাইয়াৎ'টি হিন্দু-মুসলীম আধ্যাত্মিক সাধনার কি অপূর্ব সংমিশ্রণে গঠিত—রসিক, প্রেম, লীলা শুদ্ধ সংস্কৃত, চোখ, কানা বাঙলা; ফানা ওজুদ মজুদ শুদ্ধ আরবী; কারখানা ফারসী কইন বাঙাল।)

অরসিক, অপ্রেমিককে এইসব সাধক কখনো করজোড়ে নিবেদন করিয়াছেন যেন ভৌগোলিক শব্দতাত্ত্বিক তর্কবিতর্ক করিয়া রসভঙ্গ না করেন, কখনো নিরুপায় হইয়া কাতরকণ্ঠে দিব্যিদিলাসা দিয়াছেন। তাই ক্ষমাভিক্ষা করিয়া অদ্যকার সভার 'রসভঙ্গ' করি, কবিগুরু কর্তৃক নন্দিত সেই হাসন রাজার গীতি সংকলন 'হাসন-উদাসের' সর্বপ্রথম গীতিটি উদ্ধৃত করিয়া এবং তৎপূর্বে এই মাত্র নিবেদন করি যে, সাধারণতঃ বাউলরা পরমাত্মা মহাপুরুষ ও গুরুর বন্দনা সমাপ্ত করিয়া রস সৃষ্টি আরম্ভ করেন। কিন্তু হাসন রাজা অপ্রেমিক, রবাহূতের আগমন ভয়ে আল্লা-রসুল বন্দনার পূর্বেই বলিতেছেন,

"আমি করিয়ে মানা, অপ্রেমিকে গান আমার শুনবে না।
কিরা দেই, কসম দেই, আমার বই হাতে নিবে না॥
বারে বারে করি মানা বই আমার পড়বে না।
প্রেমের প্রেমিক যে জনা এ সংসারে হবে না॥
অপ্রেমিকে গান শুনলে কিছুমাত্র বুঝবে না।
কানার হাতে সোনা দিলে লাল-ধলা চিনবে না॥
হাসনরাজায় কসম দেয়, আর দেয় মানা
আমার গান শুনবে না, যার প্রেম নাই জানা॥

সাক্ষরকে নিরক্ষরতা হইতে রক্ষা করিবার পন্থা

১

জনসাধারণের শিক্ষাবিস্তার সমস্যা লইয়া যাঁহারা তথ্য সংগ্রহ করেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে শতকরা দশজন লিখিতে পড়িতে পারিত ও আজ নাকি দশের পরিবর্তে বারোয় দাঁড়াইয়াছে। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, শিক্ষাবিস্তারের কর্মটি সদাশয় সরকার সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে। স্বরাজপ্রাপ্তি আমরা যেমন সদাশয় সরকারের হাতে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেই নাই, ঠিক সেইরূপে শিক্ষাবিস্তার সমস্যায় আমাদেরও ভাবিবার ও করিবার আছে। শিক্ষানবীশরাও বলেন যে, আমাদের মত অর্ধশিক্ষিত লোকের সাহায্য পাইলেও নাকি নিরক্ষর দেশকে সাক্ষর করার পথ সুগম হইবে।

সমস্যার জটিল গ্রন্থি এই যে যদিও প্রতি বৎসর বহু বালক পাঠশালা-পাস করিয়া বাহির হয়, অর্থাৎ সাক্ষর হইয়া সামান্য লেখা-পড়া করিতে শিখে, তবুও কয়েক বৎসর পরেই দেখা যায় যে, ইহারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর হইয়া গিয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পাঠশালা-পাসের পর পড়িবার মত কোনই পুস্তক তাহারা পায় না। আমার এক স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে কৈবর্ত, নমঃশূদ্র ও মুসলমান জেলেদের ছেলেরা যত শীঘ্র পুনরায় নিরক্ষর হয়, অপেক্ষাকৃত ভদ্রশ্রেণীতে ততটা নয়। তাঁহার মতে কারণ বোধ হয় এই যে, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বাড়ীতে রামায়ণ-মহাভারতের প্রচলন কম ও মুসলমানদের জন্য বাঙলায় সরল কোন ধর্মপুস্তক নাই।

মধ্য ইউরোপের তুলনায় বল্কান শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। বল্কানের গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধান করিয়া আমিও ঠিক এই তত্ত্বই আবিষ্কার করি। বল্কানের গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের লেখাপড়ার সঙ্গে যোগ তাহাদের "উপাসনা পুস্তিকা"র মধ্যবর্তিতায়। পাঠকের অবগতির জন্য নিবেদন করি যে, ক্যাথলিক ক্রীশ্চানরা শাস্ত্রাধিকারে বিশ্বাস করেন। গ্রামের পাদ্রী সাহেবের অনুমতি বিনা যে কেহ বাইবেল পড়িতে পারে না, তাহাদের জন্য বরাদ্দ 'উপাসনা পুস্তিকা' বা "প্রেয়ার বুক", যেমন শূদ্র স্ত্রীলোককে বেদাভ্যাস করিতে আমাদের দেশেও নিষেধ ছিল। তাহাদের জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত পদাবলী।

প্রত্যেক ক্যাথলিকের একখানা উপাসনা পুস্তিকা অতি অবশ্য থাকে। গ্রামের

বুড়ী উপন্যাস পড়ে না, খবরের কাগজ পড়ে না, এমন কি চিঠিপত্র লিখিবার প্রয়োজনও তাহার হয় না। কিন্তু প্রতিদিন সে উপাসনা পুস্তিকা হইতে কিছু না কিছু পড়ে ও রবিবারে গীর্জায় বেশ খানিকটা অধ্যয়ন করে।

প্রোটেসট্যাণ্ট দেশগুলিতে বাইবেল পড়া হয়। এই উপাসনা পুস্তিকা ও বাইবেল ইউরোপের কোটি কোটি লোককে পুনরায় নিরক্ষর হইবার পথে জোড়াকাঁটা।

আমাদের উচিত রামায়ণ-মহাভারতের আরও সস্তা সংস্করণ প্রকাশ করা ও সম্ভব হইলে পাঠশালা-পাস করার সঙ্গে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর প্রত্যেক বালককে একখণ্ড রামায়ণ অথবা মহাভারত বিনামূল্যে দেওয়া। আমি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারতের প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছি।

কিন্তু প্রশ্ন, তাহাতে লাভ কি? ধর্মচর্চা (?) তো আমরা বিস্তর করিয়াছি, আর না হয় নাই করিলাম। তবে কি দেশের লোককে নিরক্ষরতা হইতে আটকাইবার অন্য কোন উপায় নাই, অথবা ধর্মপুস্তকের উপর আরও কিছু দেওয়া যায় না?

যায়। এবং সেই উদ্দেশ্যেই খবরের কাগজের শরণাপন্ন হইয়াছি। এই খবরের কাগজই তাহার উপায়।

রামায়ণ-মহাভারত সস্তায় অথবা বিনামূল্যে বিতরণ করিবার মত অর্থ কোন গৌরী সেনই দিতে রাজী হইবেন না। কিন্তু তিনদিনের বাসি খবরের কাগজ বিলাইয়া দিতে অনেকেই সম্মত হইবেন। আমাদের কল্পনাটি এইরূপ—প্রথমতঃ, বড় ও ছোট শহরে যুবক ও বালক লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাদের কাজ হইবে বাসি দৈনিক সাপ্তাহিক (ও পরে মাসিক) কাগজ জড়ো করা। পরে সেগুলি ডাকযোগে প্রতি পাঠশালায় পাঠানো। যে সব ছেলেরা পাঠশালা-পাস করিয়াছে, বিশেষ তাহাদেরই নিজের নামে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পাঠাইতে হইবে। ইহাতে ডাকখরচা লাগবে। উপস্থিত সে পয়সা তুলিতে হইবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্ধরা যে রকম বিনা ডাকখরচায় পড়িবার জিনিস পান, ঠিক সেই রকম যথারীতি আন্দোলন করিলে ও বিশেষতঃ যদি প্রথম দিকে পয়সা খরচ করিয়া কাগজ বিতরণ করিয়া সপ্রমাণ করা যায় যে, পরিকল্পনা বিশেষ প্রাথমিক কেন্দ্রে সফল হইয়াছে, তাহা হইলে ডাকখরচও লাগিবে না।

রোজই যে কাগজ পাঠাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। প্রথম দিকে সপ্তাহে একবার অথবা দুইবার পাঠাইলেই চলিবে।

কিন্তু সংবাদপত্র ইহারা পড়িবে কি? এইখানেই আসল মুস্কিল। কাজেই—

দ্বিতীয়তঃ, পাঠশালার শেষ শ্রেণীতে ছেলেদের পত্রিকা পাঠ শিখাইতে হইবে। গোড়ার দিকে শিক্ষক তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া ছেলেদের জন্য যে সব লেখা বাহির হয়, তাহা পড়াইবেন। পরে নানারকম দেশী খবর, খেলার বর্ণনা, জিনিসপত্রের বাজার দর, আইন-আদালতের চাঞ্চল্যকর মামলা, সাহিত্যিক প্রবন্ধ, যুদ্ধের খবর, সম্পাদকীয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাঁহারা নৈশ ইস্কুল চালান প্রথম দিকে তাঁহারা এই প্রচেষ্টা করিলে ভাল হয় পরে—

তৃতীয়তঃ, গুরু ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষকদের শিখাইতে হইবে কি করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে ও পড়াইতে হয়। ইহার জন্যও আন্দোলনের প্রয়োজন হইবে।

আমি অতি সংক্ষেপে খসড়াটি নিবেদন করিলাম। আমার বিশ্বাস, খবরের কাগজ পড়িবার সখ সৃষ্টি করা কঠিন কাজ নহে। আর কিছুটা সুখ পাইলেই বালক সপ্তাহে দুইবার দুইখানা কাগজ স্বনামে পাইবার গর্বে নিশ্চয় পড়িবে।

আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ হইবে যে, গণ আন্দোলনের জন্য আমরা গ্রামবাসীকে প্রস্তুত করিতে পারিব।

পরিকল্পনাটির স্বপক্ষে বিপক্ষে নানা যুক্তিতর্ক আমরা অনেকদিন যাবৎ ভাবিয়াছি ও আমি নিজে বাড়ীর চাকরদের কাগজ পড়িতে শিখাইবার চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছি। পাঠকবর্গ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করিলে পরিকল্পনাটি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে পারিব।

২

বিপদ এই যে, চতুর্দিক হইতে রাশি রাশি খবর রোজ খবরের কাগজের আপিসে উপস্থিত হইতেছে, অথচ কাগজের অনটন। অর্থাৎ খবর আছে, কাগজ নাই। কাজেই খবর-কাগজ সমাসটি সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? এদিকে আবার দেশহিতৈষীরা নিরক্ষরতা দূর করিবার অন্যান্য উপায় জানিতে চাহিতেছেন। বিষয়টি গভীর—আলোচনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ত্রৈমাসিকের উপযুক্ত; অথচ খবরের কাগজের ভিতর দিয়া হাজার হাজার লোককে সমস্যাটি না জানাইলে প্রতিকারের সম্ভাবনাও নাই।

পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, চীন যে জনসাধারণের শিক্ষাপ্রসার ব্যাপারে এত পশ্চাৎপদ তাহার প্রধান কারণ চীনভাষার কাঠিন্য। সে ভাষায় বর্ণমালা নাই। প্রত্যেকটি শব্দ একটি বর্ণ। শব্দটি যদি না জানা থাকে তবে উচ্চারণ পর্যন্ত করিবার উপায় নাই; কারণ উচ্চারণ তো করি বর্ণে বর্ণ জুড়িয়া।

প্রত্যেকটি শব্দই যখন বর্ণ তখন হাজার হাজার বর্ণ না শিখিয়া চীনা পড়িবার বা লিখিবার উপায় নাই। ৪৭টি স্বরব্যঞ্জন শিখিতে ও শিখাইতে গিয়া আমরা হিমসিম খাইয়া যাই। চীনা সাক্ষররা কি করিয়া হাজার হাজার ও পণ্ডিতেরা কি করিয়া লক্ষ লক্ষ বর্ণ শিখেন সে এক সমস্যার বিষয়। শুনিয়াছি চৌদ্দ বছরের বাঙালী ছেলে যে পরিমাণ বাঙলা জানে ততটুকু চীনা শিখিতে গিয়া নাকি সাধারণ চৈনিকের বয়স ত্রিশে গিয়া দাঁড়ায়। শুধু একটি কথা নিশ্চয়তার সঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। পুনা ফার্গুসন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত বাসুদেব গোখলে (বিখ্যাত গোখলের আত্মীয়) শান্তিনিকেতনে ১৯২৪ সালে চীনা শিখতে আরম্ভ করেন; পরে জর্মনীতে ডক্টরেট পান। ভদ্রলোক এখনও চীনা ভাষার অক্টোপাস-পাশ হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার সতীর্থরা ফরাসী, জর্মন, ইতালিয়ন নানা ভাষা শিখিয়া বসিয়াছেন। শ্রীযুত গোখলের পাণ্ডিত্যে সন্দেহ করিবার কারণ অবশ্য নাই; চীনা ছাত্র এদেশে আসিয়া তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট চীনা বৌদ্ধশাস্ত্র পালিশাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িতে শিখে।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, নূতন বর্ণমালা না চালাইলে চীনের জনসাধারণ কখনও সাক্ষর হইতে পারিবে না। জাপানীদের বর্ণমালা আছে।

বাঙলা বর্ণমালা সংস্কৃত নিয়মে চলে বলিয়া তাহার শ্রেণী বিভাগ সরল ও যুক্তিযুক্ত। ইংরাজী ও অন্যান্য সেমিটিক বর্ণমালার সঙ্গে তুলনা করিলেই তথ্যটি স্পষ্ট হইবে। কিন্তু, এইখানেই সমস্যার জগদ্দল 'কিন্তু' উপস্থিত—লেখা ও পড়ার সময় বাঙলা বর্ণমালা যে কি অপূর্ব কাঠিন্য সৃষ্টি করে তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখি না। দুইটি 'ই'কার কেন, দুইটি 'উ'কার কেন—উচ্চারণে যখন কোন প্রভেদ নাই তখন মনে রাখি কি করিয়া, 'কই' যখন লেখা যায় তখন 'কৈ'র কি প্রয়োজন? 'বউ' যখন লেখা যায় তখন 'বৌ'কে বরণ করিবার কি দরকার? 'গিআ', 'গিএ'র পরিবর্তে কেন 'গিয়া' 'গিয়ে'? এই সব প্রশ্ন শিশুমনকে বিক্ষুব্ধ করে ও সে সমস্ত ব্যাপারটার কোন হদিস পায় না—কারণ সংস্কৃতে তার হদিস আছে, বাঙলা লিখন-পঠনে নাই। দ্বিতীয়ত অযৌক্তিকতা; 'কা' লিখিতে 'আ'কার জুড়ি পশ্চাতে, কিন্তু 'ই'কার জুড়ি অগ্রভাগে, আর 'ঈ'কার জুড়ি পশ্চাতে, দুইটি 'উ'কার জুড়ি নীচে। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক 'ও'কার ও 'ঔ'কার। প্রথম 'ে' লাগাই, তারপর লাগাই 'া'। ছোট ছেলেকে নিশ্চয়ই পড়িতে শুনিয়াছেন 'ঘ' একারে ঘে; উহুঁ ঘ আকারে আ, উহুঁ ঘে? ঘা? তখন তাহার মনে পড়ে 'ও'কারের কথা; বলে 'ঘো'—'ঘোড়া'। 'ঔ'কার তো

আরো চমৎকার। 'আ'কার 'ই'কার 'উ'কার, 'ঋ'কার সব কয়টি হয় আগে, নয় পশ্চাতে লাগাইলে যে কি আপত্তি ছিল, তাহা আমি বহু গবেষণা করিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। শিশুর পক্ষে সরল হইত, বয়স্ককে পুনর্নিরক্ষরতা হইতে রক্ষা করিত। ইংরাজিতে ব্যাপারটা কানুনমাফিক ও সরল।

তবুও শিশুরা সাধারণতঃ সামলাইয়া লয়, কিন্তু যুক্তাক্ষরে আসিয়া তাহাদের বানচাল হয়।

আমার সবইনসপেকটর বন্ধুটি বলিয়াছেন যে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় কৈবর্ত জেলের ছেলে বেশীর ভাগ পাঠশালা পালায় যুক্তাক্ষরের যুগে, দ্বিতীয় ভাগ পড়িবার সময়। যুক্তাক্ষর হইয়াছিল সংস্কৃত বানানের অনুসরণে। নিয়ম এই, কোনো ব্যঞ্জন যদি একা দাঁড়ায় তবে ধরিয়া লইতে হইবে তাহার সঙ্গে 'অ' স্বর যুক্ত আছে। তাই 'কর-ভ'তে তিনটি 'অ' যোগ দিয়া পড়ি। কিন্তু যদি কোনো ব্যঞ্জন স্বরের সাহায্য ছাড়া দাঁড়াইতে চাহে, তবে তাহাকে পরের ব্যঞ্জনের সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হইবে—অন্যথায় পূর্ব নিয়মানুসারে 'অ'কার লাগিয়া যাইবে। তাই 'সন্তপ্ত' বলিতে তাহার 'ন' আধা অর্থাৎ হসন্ত, 'প' আধা অর্থাৎ হসন্ত। উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু বিপদ এই যে, যুক্তাক্ষর হওয়া মাত্রই অনেকেই এমন চেহারা বদলায় যে, তাহাদিগকে চিনে তখন কার সাধ্য—লাইনো টাইপের অর্থাৎ 'আনন্দবাজারে'র ছাপার কথা হইতেছে না, প্রচলিত ছাপা ও লেখার কথাই বলিতেছি। দ্বিতীয় বিপদ, এই আইন সংস্কৃতে অতি প্রাঞ্জলভাবে চলে বটে, বাঙলায় চলে না। লিখিতেছি 'রামকে' অর্থাৎ রা+ম+অ+কে অর্থাৎ 'রামোকে' (কারণ ব্যঞ্জন একা দাঁড়াইলে 'অ' বর্ণ যুক্ত হইবে—'অ' ছাপায় আলাদা বুঝাইবার উপায় নাই বলিয়া 'ও' কার ব্যবহার করিয়াছি), অথচ পড়িতেছি এমনভাবে যে 'ম' ও 'ক' যুক্তাক্ষরে লেখা উচিত; যথা 'রাম্কে'। 'সরব না'র যে উচ্চারণ করি তাহাতে তো লেখা উচিত 'সর্ব না'; 'যাক সে'র যে উচ্চারণ করি তাহাতে লেখা উচিত 'যাক্ষে' অথবা 'যাক্সে'। 'কখন জাগলি' = 'কখন জাগ্লি'; 'কাঁপলেই' = 'কাঁপ্লেই' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাপার এই যে, লিখিতেছি 'সূক্ষ্ম', বলিতেছি 'শুকর্থ'; লিখিতেছি 'আত্মা' বলিতেছি 'আত্তাঁ'; লিখিতেছি 'ঊর্দ্ধ', বলিতেছি 'উর্দো' বা 'উর্ধো'—'দ' 'ব' অথবা 'ধ' 'ব' বৃথাই লেখা হইতেছে। শিশু যখন পড়ে স+উ+ক+ষ+ম, সে উচ্চারণ করিতে চাহে—শুদ্ধ সংস্কৃতে যে রকম করা হয় —সূকষম। কিন্তু বেচারাকে চোখের জলে নাকের জলে 'শুদ্ধ' উচ্চারণ শিখিতে হয়। সংস্কৃতে যাহা যুক্তিযুক্ত, বাঙলাতে তাহা খামখেয়ালি।

তাই দেখা গিয়াছে, দ্বিতীয় ভাগ হইতে বেশীর ভাগ ছেলে যুক্তাক্ষরের ধাক্কা সহিতে না পারিয়া অক্কা পায়। তাই দেখা গিয়াছে, বয়স্ক সাক্ষর বহুদিন লেখাপড়া চর্চা না করিয়া যদি পুনরায় পড়িতে বা লিখিতে যায়, তখন সেই এককালীন সাক্ষর টক্কর খায় যুক্তাক্ষরে।

আমাদের লিখন ও উচ্চারণের বৈষম্য এত বিকট যে, ইহাই নিরক্ষরতা ও সাক্ষরের নিরক্ষরতায় পুনরায় ফিরিয়া যাওয়ার দ্বিতীয় প্রধান কারণ।

কিন্তু উপায় কি?

অদ্যকার লেখা শেষ করিবার পূর্বে একটি কথা না বলিয়া শান্তি পাইতেছি না। যখন গড়িমসী করিতেছিলাম, এ বিষয় লইয়া আর আলোচনা করিব কি না, তখন হঠাৎ দেখি সোমবারের 'আনন্দমেলা'য় একটি বালক—বালক মাত্র—বলিতেছে যে, সে 'নিরক্ষরকে সাক্ষর করা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ, আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে। বালকটিকে আমার আশীর্বাদ, সে আমাকে মনের জোর দিয়াছে।

৩

গত আগস্ট* মাসে উপর্যুক্ত শিরোনামায় দুইটি রচনা নিবেদন করিয়াছিলাম। সত্যপীরের বয়স তখন অতি অল্প; তাহার বালসুলভ চপলতা কেহই লক্ষ্য করিবে না, এই ভরসায় উপযুক্ত বিষয় লইয়া তখন অত্যধিক বাক্যাড়ম্বর করি নাই। কিন্তু বাংলা দেশে সহৃদয় পাঠকের অভাব নাই। তাঁহারা লেখা দুইটি পড়িয়া এযাবৎ অধমকে বহু পত্রাঘাত করিয়াছেন। তুলসীদাসের চৌপদীটি মনে পড়িল:—

জো বালক কহে তোতরী বাতা
স্নুনত মুদিত নেন পিতু অরু মাতা
হসিহহি কুর কুটিল কুবিচারী
জো পরদোষভূষণধারী

"বালক যখন আধ আধ কথা বলে, তখন পিতা এবং মাতা মুদ্রিত নয়নে (সন্তোষ সহকারে) সে বাক্য শ্রবণ করেন, কিন্তু ক্রূরকুটিল কুবিচারীরা শুনিয়া হাসে—তাহারা তো পরদোষ ভূষণধারী"।

---

* ১৯৪৬-এর আগস্ট মাস।

(তুলসীজীর রামায়ণখানা হাতের কাছে নাই; সদাশয় সরকারের ন্যায় দুর্ভিক্ষের সময় সঞ্চিত পচা চাউল অর্থাৎ আমার ক্ষীণ স্মৃতিভাণ্ডার হইতে চৌপদীটি ছাড়িলাম—হাজরা লেনের শ্রীমতী—ঘোষের সহযোগের উপর নির্ভর করিয়া)।

সহৃদয় পাঠকেরা 'মুদিত নেন' শুনিয়া এখন মুক্তকণ্ঠে আমাকে বহুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

আমি বলিয়াছিলাম ;—

প্রথমতঃ বড় ও ছোট শহরের যুবক ও বালক লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাদের কাজ হইবে বাসি দৈনিক, সাপ্তাহিক (ও পরে) মাসিক কাগজ জড়ো করা। পরে সেগুলি ডাকযোগে প্রতি পাঠশালায় পাঠানো। যে সব ছেলেরা পাঠশালা পাস করিয়াছে, বিশেষ করিয়া তাহাদেই নিজের নামে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পাঠাইতে হইবে। ইহাতে ডাক-খরচা লাগিবে। উপস্থিত সে-পয়সা তুলিতে হইবে কিন্তু আমার বিশ্বাস, অন্ধেরা যে রকম বিনা ডাক-খরচায় পড়িবার জিনিস পান, ঠিক সেই রকমই—যথারীতি আন্দোলন করিলে, ও বিশেষতঃ যদি প্রথম দিকে পয়সা খরচ করিয়া কাগজ বিতরণ করিয়া সপ্রমাণ করা যায় যে, পরিকল্পনাটি বিশেষ প্রাথমিক কেন্দ্রে সফল হইয়াছে—ডাক-খরচাও লাগিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, পাঠশালার শেষ শ্রেণীতে ছেলেদিগকে পত্রিকা পাঠ শিখাইতে হইবে। গোড়ার দিকে শিক্ষক তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া ছেলেদের জন্য যে-সব লেখা বাহির হয় ('আনন্দমেলা' জাতীয়) তাহা পড়াইবেন। পরে নানা রকম দেশী খবর ইত্যাদি ইত্যাদি।

খবরের কাগজের মাধুকরী করা ও তৎপর বণ্টনকর্ম সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা কেহ কেহ চাহিয়াছেন।

প্রথমেই নিবেদন করি যে, এই প্রকার সম্পূর্ণ নবীন প্রচেষ্টা আরম্ভ করিবার পূর্বে আটঘাট বাঁধিয়া ফুলপ্রুফ কোন স্কীম বা প্ল্যান করা ঠিক হইবে না। শহর ও গ্রামের বাতাবরণ বিভিন্ন, কাজেই একই প্ল্যান দুই জায়গায় বলবৎ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ. প্রথম প্রচেষ্টা ডিনেমিক, চলিষ্ণু বা প্রাণবন্ত হইবে অর্থাৎ কাজ করিতে করিতে ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, উনিশ-বিশ ফেরফার করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সহৃদয় পাঠক যদি কিছু মনে না করেন, তবে বলি যে, আমাদের দেশে সর্বপ্রচেষ্টায় আমরা বিলাতি ফিটফাট তৈয়ারী মডেল খুঁজিয়া তাহার অনুকরণ চেষ্টা করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের ট্রেন-জাহাজ,

আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন, আমাদের নৃত্যগীতের পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টা ইস্তেক জাতীয় সংগীত শুনিবার সময় দণ্ডায়মান হওয়া সর্বত্রই অনুকরণ-প্রচেষ্টা, মডেল খোঁজা—বাতাবরণের সঙ্গে মিলাইয়া দেশের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া চলিষ্ণু ক্রমবর্ধমান শিশু-প্রচেষ্টাকে বলিষ্ণু করিতে শিখি না। আমাকে দোষ দিবেন না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের কি রকম অন্ধানুকরণ করে, তাহা দর্শাইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই মর্মে অনেকগুলি মর্মন্তুদ সত্য বলিয়াছিলেন।

আমার মনে হয়, উপর্যুক্ত বাক্যটি স্মরণ রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করা প্রশস্ত।

প্রথমতঃ, কর্মী যুবকগণ মিলিত হইবেন ও কে কে বাসি কাগজ দিতে সম্মত হইবেন তাহার ফর্দ প্রস্তুত করিয়া যে খবরের কাগজ সরবরাহ করে তাহারই দ্বারা তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া কাগজ জমায়েত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, স্কুল সব-ইনস্পেক্টর মহোদয়কে আক্রমণ করা। অতি সবিনয়ে তাঁহার সম্মুখে প্ল্যানটি উপস্থিত করিতে হইবে—অতি সবিনয় অতি সভয়। তিনি সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলে অর্ধেক কেল্লা ফতেহ। তাঁহার সহযোগিতায় যে যে পাঠশালায় প্রধান শিক্ষক শুধু বেতন কমাইয়াই (সে কত অল্প আমি জানি, কাজেই ব্যঙ্গ করিতেছি না) সন্তুষ্ট নহেন তাহার ফর্দ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শহরে একটি সভা করিয়া বিষয়টি আলোচনা করিতে হইবে।

তখন যে কর্মপদ্ধতি স্থির করা হইবে তাহাতে যত ভুলচুকই থাকুক তাহাই ঠিক। অধমের পদ্ধতির প্রতি তখন যেন কোনো অহেতুক করুণা না দেখানো হয়।

সন্তর্পণে 'ঝোপ দেখিয়া কোপ' মারিতে হইবে, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ট্যাক্ট সহযোগে মাস্টার মহাশয়দের সদয় সহযোগ না পাইলে সব গুড় মাটি হইয়া যাইবে।

যদি সব-ইনস্পেক্টর মহোদয়ের সাহায্য না পাওয়া যায়, তবে বোর্ডের চেয়ার-ভাইস-চেয়ারম্যান তদভাবে কোনো মুরুব্বী মেম্বরের সাহায্য লইয়া কাজ করা যাইতে পারে; কিন্তু আমি নিজে সব-ইনস্পেক্টর মহোদয়গণের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা রাখি। যে সব-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়কে স্মরণ করিয়া প্রথম প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, এ বিষয়ে আপ্রাণ সাহায্য করিবেন ও আমার অন্ধ বিশ্বাস, তাঁহার মত জীবন্ত কর্মী বাঙলা দেশে আরও আছেন।

কাহারো সাহায্য না পাইলেও কাজ আরম্ভ করা যায় শুদ্ধ গুরুমহাশয়কে

যদি দলে টানা সম্ভবপর হয়। তিনি রাজী হইলে বাকী সব কিছুই সরল।

যাঁহারা নৈশ বিদ্যালয় চালান তাঁহাদের পক্ষে কর্মটি তো সরলই।

এতটা কাজ আগাইলে পর কর্মীরা যদি আমাকে পত্র লিখিয়া সুবিধা অসুবিধার কথা জানান, তবে আমি তাঁহাদিগকে সোজা উত্তর দিব ও সম্ভব হইলে দুর্বল শরীর সত্ত্বেও সরজমিনে উপস্থিত হইয়া যেটুকু সামান্য সাহায্য সম্ভব তাহা নিবেদন করিব।

কি পড়াইতে হইবে, কোন্ কায়দা পড়াইতে হইবে, সে আলোচনা বারান্তরে করিব। ইতোমধ্যে এই শীতকালই কাজ আরম্ভ করার পক্ষে প্রশস্ত।

সর্বশেষে আমাদের কাগজের 'আনন্দমেলা' হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"কামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য (১৪৪১৬) দর্শনা মণিমেলা, নদীয়া—গত ১৭ই অগস্টের আনন্দবাজারে 'সত্যপীরে'র লেখা নিরক্ষরদের অক্ষর পরিচয় করানোর যে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—তা তুমি পড়েছ জেনে খুশী হলাম। 'মণিমেলা'র অন্যান্য বন্ধুরা ঐ লেখাটি পড়ে এদেশের নিরক্ষরতা দূর করবার সহজ কতকগুলি পন্থা ধরে কাজ করার চেষ্টা করবে, এ বিশ্বাস আমি রাখি।"

বালক কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তবে আমরা অতশত দুর্ভাবনা করি কেন।

উচ্চারণ

প্রবাদ আছে, বঙ্গদেশে সংস্কৃত উচ্চারণ এককালে এমনই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মহারাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ (কেহ কেহ বলেন ক্ষিতীশ, মেধাতিথি) ইত্যাদি পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এদেশে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন। তাঁহারা এদেশের লোককে শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ কতটা শিখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই। ইহার পর আমাদের জানামতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এদেশে আবার সেই চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে শত শত বৎসর ধরিয়া বহু বাঙালী বিদ্যার্থী কাশীতে সংস্কৃত শিখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উচ্চারণও এদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এমন কি কাশী প্রত্যাবৃত্ত কোনো কোনো বাঙালী পণ্ডিতকে আমরা খাঁটি বাংলা উচ্চারণে সংস্কৃত পড়িতে শুনিয়াছি। সন্দেহ হইতেছে খাস কাশীতেও বাঙালী চালিত টোলে বাংলা কায়দায় সংস্কৃত উচ্চারণ শিখানো হয়।

বাংলা কায়দায় সংস্কৃত উচ্চারণ ব্যাপারটা যে কতদূর মারাত্মক তাহা একটি সামান্য উদাহরণ হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে

ইতালির খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক তুচ্চি কলিকাতার তৎকালীন এক বিখ্যাত পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন। কথায় কথায় পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নাম উচ্চারণ করেন। বাঙালী যে কায়দায় করে, সেই কায়দায়ই করিলেন, অনেকটা 'জাগেগাঁবোল্কোর' ন্যায়। তুচ্চি তো কিছুতেই বুঝিতে পারেন না কাহার কথা হইতেছে। পণ্ডিতের চক্ষুস্থির যে তুচ্চির মত লোক যাজ্ঞবল্ক্যের নাম শোনেন নাই। তুচ্চি প্রত্যাশা করিতেছেন যাজ্ঞবল্ক্যের শুদ্ধ উচ্চারণ, অনেকটা Yajnyavalkya-র ন্যায়, শুনিতেছেন Jaggonbolko, বুঝিবেন কি প্রকারে যে একই ব্যক্তি!

বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ এতই কর্ণপীড়াদায়ক যে, আমাদের পরিচিত দুইটি পশ্চিম-ভারতীয় ছাত্রকে বাধ্য হইয়া কলিকাতা কলেজে সংস্কৃত অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হইল। 'পরশুরামে'র 'গণ্ডেরীজী' মেঘনাদবধকাব্য উচ্চারণ করিলে আমাদের কর্ণে যে পীড়ার সঞ্চার হইবে, আমাদের সংস্কৃত উচ্চারণ পশ্চিম ও উত্তর ভারতীয়দের সেই রকমই পীড়া দেয়।

বাঙালী সংস্কৃত ব্যঞ্জনের ঞ, ণ, য, অন্তস্থ ব, ষ, স উচ্চারণ করিতে পারে না ও যুক্তাক্ষরের (আত্মা, যক্ষ ইত্যাদি) উচ্চারণে অনেকগুলি ভুল করে। স্বরবর্ণের অ, ঐ, ঔ ভুল উচ্চারণ করে ও সর্বাপেক্ষা মারাত্মক এই যে স্বরের উচ্চারণে দীর্ঘস্বরের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। তাহাতে বিশেষ করিয়া 'মন্দাক্রান্তা' পড়িলে মনে হয় ভগবানের অপার করুণা যে, কালিদাস জীবিত নাই।

বাঙালী যখন আরবী উচ্চারণ করে, তখন এই মারাত্মক অবস্থার পুনরাবৃত্তি হয়। বাঙালী (কি হিন্দু কি মুসলমান) আরবী বর্ণমালার সে, হে, জাল, স্বাদ, দ্বাদ, ত্বয়, জ্বয়, আইন, গাইন, কাফ, হামজা, অর্থাৎ বর্ণমালার ৪, ৬, ৯, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২১ ও ২৯ ভুল উচ্চারণ করে ও সংস্কৃতে হ্রস্ব দীর্ঘ যেমন অবহেলা করিত, সেই রকমই আরবীতেও স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘের কোন পার্থক্য করে না। কিন্তু শুধু কোরান পাঠের জন্য এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ আছেন। তাঁহাদিগকে 'কারী' বলে; দ্রাবিড়ে যেমন সামবেদ গাহিবার জন্য এক শ্রেণীর বিশেষ আইয়ার—আয়ঙ্গার ব্রাহ্মণ আছেন। বাঙালী কারীরা দীর্ঘ-হ্রস্ব মানেন ও ব্যঞ্জনে শুধু ৪, ৯, ১৫-তে ভুল করেন।

আমরা সংস্কৃত উচ্চারণে ভুল করি তাহার প্রধান কারণ, আমরা আর্য-সভ্যতার শেষ সীমা-প্রান্তে বাস করি। (আর্য-সভ্যতা বাংলা ছাড়াইয়া বর্মায় যাইতে পারে নাই ও বালী জাভায় বিকশিত হইল বটে, কিন্তু প্রাণধারণ করিতে পারিল না)। আমাদের ধমনীতে আর্য-রক্ত অতি কম বলিয়াই আর্য উচ্চারণ

করিতে অক্ষম হই। আমরা যে আরবী উচ্চারণ করিতে পারি না, তাহাও ঠিক সেই কারণেই। আরবী সেমিতি ভাষা, তাহার যে সব কঠিন উচ্চারণ মুখের নানা গোপন কোণ হইতে বহির্গত হয়, তাহা বাল্যকাল হইতে না শুনিলে আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব।

গত শুক্রবারে রেডিয়োতে কুরান পাঠ ও শনিবারে সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ ও উভয়ের বাঙলা অনুবাদ ও টিপ্পনী শুনিয়া উপরোল্লিখিত চিন্তাধারা মনের ভিতর তরঙ্গ খেলিয়া গেল। রেডিয়োর কুরান পাঠ মুসলমানদের কাছে আদর পাইয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহারা যে কান দিয়া শুনেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক বৃহৎ মুসলমান পরিবারে লক্ষ্য করিয়াছি, বুড়া কর্তারা রেডিয়োটা দুই চক্ষে দেখিতে পারেন না, দুই কানে শুনিতে পারেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস ইসলামে সংগীত অসিদ্ধ ও ঐ যন্ত্রটি সেই সব শয়তানী জিনিস লইয়া কারবার করে, ছোকরাদের বিগড়াইয়া দেয়। অথচ শুক্রবার সকালবেলা দেখি গুড়িগুড়ি রেডিয়োঘরের দিকে চলিয়াছেন তাবৎ বুড়া-বুড়ীরা। আধ ঘণ্টা পূর্ব হইতে কলিকাতা ছাড়া অন্য কোন বেতারকেন্দ্রে রেডিয়ো জুড়িবার উপায় নাই। তারপর মুদ্রিত চক্ষে ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হৃদয়ে অতি নীরবে কোরান পাঠ শ্রবণ করেন। অনুবাদ ও টিপ্পনী কেহ শোনেন, কেহ শোনেন না।

এই সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রতি কলিকাতা কেন্দ্রের কর্তব্য আছে।

যে-কারী সাহেব কুরান পাঠ করিলেন, তাঁহার উচ্চারণ সাধারণ বাঙালী কারী অপেক্ষা ভালো সন্দেহ নাই। তাঁহার দীর্ঘ হ্রস্ব দুরস্ত, তাঁহার 'আইন কাফ হে' ঠিক, কিন্তু তাঁর 'সে' 'জাল' ও 'দ্বাদ' (ৎ, ২, ৫) বারে বারে দুঃখ দেয়, বিশেষ করিয়া 'সে' ও 'জাল', কারণ 'ইজা' (যখন) ও 'সুম্মা' (তৎপর) দুইটি কথা আরবীতে এবং সর্বভাষাতেই ঘন ঘন আসে।

কারী সাহেবের বাঙলা উচ্চারণে আরবীর গন্ধ পাওয়া যায়—পাদ্রী-সাহেবের বাঙলাতে যে রকম ইংরিজি গন্ধ আমাদিগকে পীড়িত করে আমরা বাঙলায় বলি 'যখন' (যখোন), কারী সাহেব বলেন 'য্যাখ্যান' যেন 'য' ও 'খ'-র ভিতরে আরবী আকার বা জবর রহিয়াছে।

শাস্ত্র যিনি পাঠ করিলেন তাঁহার উচ্চারণ সাধারণ বাঙালী অপেক্ষা শতগুণে ভালো সন্দেহ নাই কিন্তু কোনো মারাঠী বা যুক্তপ্রদেশীয় পণ্ডিত সে উচ্চারণের প্রশংসা করিবেন না। তাহার প্রধান কারণ যে শাস্ত্র-পাঠকের হ্রস্ব-দীর্ঘ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রস্ব ও যথেষ্ট পরিমাণে দীর্ঘ নহে। হ্রস্ব দীর্ঘে তিনি এত সামান্য পৃথক করেন যে, বানান জানা সত্ত্বেও কানে ঠিকঠিক বাজে না। তাঁহার বাঙলা

উচ্চারণও পণ্ডিতী অনেকটা কথক-ঠাকুরদের মত।

দুইজনেরই অনুবাদ ও টীকা নৈরাশ্যজনক। প্রভু ইসা (খৃষ্ট) ও হাওয়ারিগণের বর্ণনা বাঙলার মুসলমান কি প্রকারে বুঝিবে, তাহাকে যদি বেশ কিছুদিন ধরিয়া প্যালেস্‌টাইনের ইতিহাস ও ভূগোল না শোনানো হয়। সকলেই তো শূন্যে ঝুলিতে থাকিবেন ও শাস্ত্র শোনা হইবে বটে, কিন্তু বোঝা বা আলোচনা তো হইবে না।

শাস্ত্র-পাঠক যে উধ্বর্শ্বাসে অনুবাদ ও টীকা করিয়া গেলেন তাহাতে আমার মত মূর্খ কিছুই বুঝিতে পারিল না। টোলে কৃতবিদ্য ছাত্রকে যে ধরনে দ্রুতগতিতে টীকা শোনানো হয়, ইহার অনেকটা তাই। সাধারণ বাঙালী ধর্মতৃষিতকে আরো সরল, আরো সহজ করিয়া না বুঝাইলে টীকাদান পণ্ডশ্রম হইবে।

কারী সাহেব ও শাস্ত্রী মহাশয়ের নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে ; আমরা জানি তাঁহারা যে কোনো মসজিদ-মাদ্রাসা, যে কোন টোল-চতুষ্পাঠীতে সম্মান ও আদর পাইবেন—আমরাও দিব। কিন্তু অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর উচিত আরো ভালো আরো উত্তম, এক কথায় সর্বোত্তম কারী সর্বোত্তম শাস্ত্র পাঠক আনয়ন করা। ইংরাজিতে বলে, 'সর্বোত্তম উত্তমের শত্রু'।

তাবৎ বাঙলা ও কিছু কিছু বিহার উড়িষ্যা আসামকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যে উচ্চারণ পরিবেশন করা হয় তাহার জন্য রেডিয়ো কর্তাব দায়িত্বজ্ঞান ও বিবেকবুদ্ধি অনেক বেশী হওয়া উচিত ও তাঁহাদিগের অনেক পরিশ্রম করিয়া সর্বোত্তম কারী-শাস্ত্রী সন্ধান করা উচিত। অথবা অর্থব্যয় করিয়া উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করা উচিত।

শুনিয়াছি মিশরের কারী রেফাৎ রমজান মাসে কুরান পাঠের জন্য ১৩০০ টাকা পারিশ্রমিক পান ; কাইরো কলিকাতা অপেক্ষা ধর্মপ্রাণ একথা কে বলিবে?

সর্বশেষে বক্তব্য, পাঠক যেন না ভাবেন, মন্দ উচ্চারণে আমরাই একা। আর্যসভ্যতার অন্য প্রান্ত অর্থাৎ ইংলণ্ডের অবস্থাও তাই। সেখানে বড় বড় পণ্ডিতদের লাতিন উচ্চারণ শুনিলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। তবে ইংলণ্ডে উচ্চারণ শুদ্ধ করিবার জন্য জোর আন্দোলন চলিতেছে, এদেশে—থাক্ সে কথা।

২

উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিয়াছেন শ্রীযুত—মুখোপাধ্যায়, কাব্য-ব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী, ভূতপূর্ব অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ। পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, এহেন পণ্ডিতের সঙ্গে উচ্চারণ সম্বন্ধে আমি আলোচনায়

করিতে পারি, কিন্তু তর্ক করিবার মত যুগ্ম মস্তক স্কন্ধে নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শাস্ত্রী মহাশয়ের শেষ বাক্য আমাদের মতের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে বলিয়া তর্কাতর্কির বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। তাঁহার শেষ বাক্য "সকল কথার পর তবুও স্বীকার্য যে, বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ", কিন্তু তাহার পূর্বে 'সকল কথার' মাঝখানে শাস্ত্রী মহাশয় এমন কথাও তুলিয়াছেন যেখানে অধম কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিবে। শাস্ত্রী মহাশয় (এবং অন্যান্য সহৃদয় পত্র-প্রেরকও দর্শাইয়াছেন যে, অবাঙালী সংস্কৃত পণ্ডিত 'ষ' ও 'খ' তে পার্থক্য রাখেন না। কিন্তু তাহা হইতে কি সপ্রমাণ হয় ঠিক পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া বলেন নাই। ব্যঞ্জনায় বুঝিতেছি শাস্ত্রী মহাশয়ের বলার উদ্দেশ্য যে, যেহেতুক অবাঙালী পণ্ডিতও ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না, তবে বাঙালীরই বা দোষ কি ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মারাঠী, দ্রাবিড় ও কাশীর পণ্ডিত যখন সংস্কৃত উচ্চারণ করেন, তখন প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যবশতঃ কিছু কিছু পার্থক্য তাঁহাদের উচ্চারণের মধ্যে থাকে। ঐ সব পণ্ডিতের একে অন্যের উচ্চারণে যে পার্থক্য তাহা যেন একইরঙের পৃথক পৃথক ফিকা ভাব অথবা গাঢ়। বাঙালীর উচ্চারণ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙ। দক্ষিণের আইয়ার হয়ত যতটা দীর্ঘ করিলেন, উত্তরে কাশীবাসী হয়ত ততটা করিলেন না। এবং শেষ পর্যন্ত বাঙালী যে অত্যন্ত পৃথক কিছু উচ্চারণ করে তাহা এই তথ্য হইতে সপ্রমাণ হয় যে আইয়ার, নম্বুদ্রী, চিতপাবন, দেশস্থ, করাঢ় (এমন কি মহারাষ্ট্রের 'দেশস্থ' ও ঔপনিবেশিক 'দ্রাবিড়স্থ'), উদীচী, ভার্গব, নাগর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গণ ও তাঁহাদের শিষ্য অব্রাহ্মণগণও একে অন্যের উচ্চারণের পার্থক্য লইয়া ঈষৎ আলোচনা করিয়া একটি সাধারণ রূপ বা নর্ম (norm) স্বীকার করেন, কিন্তু বাঙালীর উচ্চারণ যে সম্পূর্ণ পৃথক এবং পরস্পর-বিরোধিতায় কণ্টকাকীর্ণ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন না।

(ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারণের পার্থক্য হয় প্রধানতঃ দীর্ঘস্বরের দৈর্ঘ্য, হ্রস্বস্বরের হ্রস্বতা, 'ঋ', 'ঌ', ও 'ষ' লইয়া। সব কয়টির আলোচনা এক কলমে ধরাইবার মত কলমের জোর অধমের নাই। উপস্থিত 'ষ' লইয়া আলোচনা করিব, পরে প্রয়োজন হইলে অন্যান্যগুলির হইবে। 'ষ' যে 'খ' নয় সে বিষয়ে তর্ক করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু 'স'-এর উচ্চারণ কেন 'খ' হইল তাহার আলোচনা করিলে মূল 'ষ'-এর কিঞ্চিৎ নির্দেশ পাওয়া যায়। প্রথম দ্রষ্টব্য 'ষ' স্থলে বিদেশী পণ্ডিত যখন 'খ' বলেন, তখন তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত ; কেহ কেহ উচ্চারণ করেন পরিষ্কার 'খ' অর্থাৎ 'ক' বর্গের মহাপ্রাণ 'খ' এবং কেহ কেহ উচ্চারণ করেন ঘর্ষণজাত আরবীর 'খ'—কাবুলীরা যে রকম 'খবর' বলে, স্কচরা

যে রকম 'লখ' 'LOCH' বলে, জর্মনরা যে রকম 'BACH' বলে। এই দ্বিতীয় 'খ' উচ্চারিত হয় পণ্ডিত যখন 'ষ'-কে 'শ' হইতে পৃথক করিবার জন্য অত্যধিক উৎকণ্ঠিত হইয়া জিহ্বা মূর্ধা হইতে সরাইয়া আরও পশ্চাৎ দিকে ঠেলেন। এই কারণেই আর্যভাষা পশতুতেও তাহা দেখা যায়—কেহ বলে 'পশুতু', কেহ বলে 'পখতু', কেহ বলে 'পেশাওয়ার', কেহ বলে 'পেখাওয়ার'। এই কারণে জর্মনে Becher-এর 'ch' 'ষ'-এর মত, অথচ Bach-এর 'ch' আরবী 'খ'-এর ন্যায়। 'ষ'-কে এই জাতীয় 'খ' করা অবশ্য ভুল, আমি মাত্র কারণটি ও নজীরগুলি দেখাইলাম। কিন্তু 'ষ'-এর আসল শুদ্ধ উচ্চারণ সম্বন্ধে মতানৈক্য হওয়া অনুচিত। অত্যধিক উৎকণ্ঠিত (উভয়ার্থে) না হইয়া মুখগহ্বরের যে স্থল অর্থাৎ মূর্ধা হইতে ট, ঠ, ড, ঢ ও পরে ঐ স্থলেই 'ষ' বলিলে মূর্ধণ্য 'ষ' বাহির হইবে।)

বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণের কৈফিয়ৎ দিয়াছেন হিন্দুস্থান পার্ক হইতে শ্রীআচার্য। তাঁহার বক্তব্য "কোনও ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে তাহার সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং ধ্বনিতত্ত্বে পারদর্শী হওয়া বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই"। আমাদের মতের সঙ্গে আচার্য মহাশয়ের মত মিলিল কিন্তু তিনি বলিতেছেন—

"কিন্তু জাতীয় অভ্যাসের প্রতিকূলতা নিবন্ধন যদি সেই ভাষার উচ্চারণে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহাতে কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করি না।"

আচার্য মহাশয় তাঁহার চিঠিতে নিজের কোনও উপাধির উল্লেখ করেন নাই, অথচ পত্রখানি গভীর পাণ্ডিত্যে পূর্ণ। তাই প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইতেছি না, অথচ উপরের নীতিটি এতই বিপজ্জনক যে, নিতান্ত অনিচ্ছায় করিতেছি। কারণ যদি এই নীতিই অনুসরণ করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে যেহেতু আমরা বাঙালী, আমাদের জাতীয় অভ্যাসের 'প্রতিকূল' হয় তাই আমরা F ও 'ফ'য়ের তফাৎ করিব না, th-এর শুদ্ধ উচ্চারণ শিখিব না, কুরান বঙ্গীয় ইসলামী কায়দায় পড়িব, মন্দাক্রান্তার হ্রস্বদীর্ঘ না মানিয়া উদয়াস্ত কালিদাসকে জবাই করিব। এই নীতি আরো অনুসরণ করিয়া বলিব, আমরা বাঙালী বাঙলা ভাষার লিঙ্গ নাই, সংস্কৃত লিখিবার সময় লিঙ্গভেদ করিব না, দ্বিবচন মানিব না; হিন্দী বলিবার সময় 'একঠো', 'দুইঠো' করিব, 'গাড়ী আতা হৈ' বলিব—এক কথায় 'জাতীয় অভ্যাসের' দোহাই দিয়া বিজাতীয় কোনও ভাষাই তাহার স্বরূপে গ্রহণ করিব না; সুকুমার রায়ের—হ য ব র ল-য়ের দর্জীর ৩২ ইঞ্চি ফিতা দিয়া মাপিলে যেমন সব কিছু ৩২ ইঞ্চি হইয়া যাইত। আমাদর 'জাতীয় অভ্যাসের' বকযন্ত্রে চোলাই করা সর্ব উচ্চারণ শুদ্ধ এলকহল হইয়া বাহির হইবে তাহার বর্ণগন্ধ

থাকিবে না।

'লজ্জা' বা শ্লাঘার কথা হইতেছে না; অভ্যাসটি বাঞ্ছনীয়। বেদমন্ত্র ঠিক কি প্রকারে উচ্চারিত হইত জানি না, কিন্তু চেষ্টা তো করিতে হইবে জানিবার জন্য। সেই চেষ্টাতেই তো পণ্ডিতে ও আমাদের মত সাধারণ লোকের তফাৎ। যুক্ত-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মদ্র, গুর্জর পার্থক্য সত্ত্বেও একটি (norm) মানিয়া লইয়াছেন, নিরপেক্ষ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণও সেটি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—তবে আমাদের কর্তব্য কি?

আচার্য মহাশয় ভুল উচ্চারণ চাহেন না, কিন্তু তাঁহার মত পণ্ডিত যদি সে উচ্চারণের সপক্ষে এককাঁড়ি অজুহাত দেন, তবে আমাদের মত সরল লোক 'জাতীয় অভ্যাসের' তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া আরামে নিদ্রা যাইব—এই আমার ভয়।

এস্থলে বলিয়া রাখা ভালো যে, যদিচ জাভার মুসলমান ও মক্কার মুসলমান এক রকম উচ্চারণে কুরান পড়েন না, তবু জাভার মুসলমান হামেহাল চেষ্টা করেন নর্মের (norm) দিকে অগ্রসর হইবার। পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের আরবী উচ্চারণ খারাপ, কিন্তু জাতীয় অভ্যাসের বিরুদ্ধে জেহাদ হামেসা চালু রাখেন বলিয়া তাহাদের আরবী উচ্চারণ বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ অপেক্ষা নর্মের (norm-এর) অনেক কাছে।

আচার্য মহাশয় দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতাজাত অন্যান্য মনোরম তথ্যও বলিয়াছেন। সেগুলি পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেরই জানা উচিত। সুবিধামত সেগুলি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব।

অন্যান্য চিঠিও পাইয়াছি, লেখকদের ধন্যবাদ। এ মূর্খকে জ্ঞানদান করিবার জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বার বার স্বীকার করি।

পরাজিত জর্মনী

জর্মনী হারিয়া গিয়াছে। দুঃস্বপ্ন কাটিয়াছে। সমর-নেতারা যুদ্ধের দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া আবার কুচকাওয়াজের সত্যযুগে ফিরিয়া যাইবার তালে পা ফেলি-বার চেষ্টায় আছেন।

কিন্তু রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তার অবসান হইল না। বরঞ্চ এতদিন যে মাথা-ব্যথা শুদ্ধ সামরিক মাথাকে গরম করিয়া রাখিয়াছিল সে আজ রাজনৈতিকদের আহার ও নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। সমস্যাটা এই, পরাজিত জর্মনীকে লইয়া কি করা যায়।

১৯১৮ সালে এ সমস্যা ছিল না। নির্বোধ রুশ তখন নিজের গৃহসমস্যা লইয়া ব্যস্ত। জর্মনী সম্বন্ধে সে তখন সম্পূর্ণ উদাসীন। ১৯৪৫ সালে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। রুশ জর্মনীকে লইয়া কি ভেল্কিবাজী খেলবে, তাহা মিত্রশক্তির কর্তারা ঠিক আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অথচ দাবা খেলায় অন্য পক্ষের চালের জন্য যে রকম অবিচলিত চিত্তে বসিয়া থাকা যায় এস্থলে তাহা সম্ভবপর নয়।

জর্মনীকে মিত্রপক্ষের কোন্ চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে বলি দিবেন আর রুশরা কোন্ দর্গায় শিন্নি চড়াইবেন সে বিষয়ে আমাদের দুর্ভাবনা নাই। কারণ প্রসাদ আমরা পাইব না, পাইবার ইচ্ছাও রাখি না। কিন্তু ঠিক এই কারণেই আমাদের এ বিষয়ে কিছু বলা নিতান্ত অশোভনীয় হইবে না। জর্মনী সম্বন্ধেই এযাবৎ যে কেতাবপত্র বাহির হইয়াছে ও হইতেছে, খবরের কাগজে যে বাত্রিশভাজার পরিবেশন হইতেছে তাহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয়—সকলেরই কিছু-না-কিছু স্বার্থ আছে। আমরা নিঃস্বার্থ, আমাদের মতামতে তাই কিঞ্চিৎ নিরপেক্ষতা থাকিবে, আর কিছু না থাকুক।

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভালো যে, জর্মনী বিশেষ করিয়া পরাজিত জর্মনী আমাদের শত্রু নয়, মিত্রও নয়। তবে নাৎসীদের আমরা চিরকালই অপছন্দ করিয়াছি। তাহার অন্যতম কারণ নাৎসীরা গায়ে পড়িয়া বহুবার ভারতবর্ষ ও তাহার সভ্যতার প্রতি কটূক্তি করিয়াছে। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রজেনবের্গ সাহেবের 'বিংশ শতাব্দীর মিথ' নামক কেতাবে বিস্তর পাওয়া যায়। রজেনবের্গ সাহেবের পরিচয় বিশদভাবে দিবার প্রয়োজন নাই। হিটলার তাঁহাকে জর্মনীর 'আধ্যাত্মিক গুরু' (গাইসটিস ফ্যুরার) বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

রজেনবের্গ সাহেব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর সভ্যতা ও কৃষ্টিতে বৃহত্তম দান করিয়াছে, (ক) আর্যরা, (খ) আর্যদের মধ্যে আর্যতম আর্য হইলেন নীল চোখওয়ালা, সোনালী চুলওয়ালা নর্দিক জর্মনরা।

প্রথম তথ্য সম্বন্ধে রজেনবের্গ সাহেবের মনে কোনো সন্দেহ নাই, কারণ রজেনবের্গের বহু পূর্বে ভিয়েনার খ্যাতনামা পণ্ডিত লেওপল্ড ফন শ্রোডার বহু যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রায় সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, আর্যরা সেমাইট (ইহুদী ও আরব) ও মঙ্গলীয়দের চেয়ে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু নর্দিক জর্মনরাই যে সর্বোৎকৃষ্ট আর্য এ বিষয়ে রজেনবের্গের মনে ধোঁকা ছিল। কারণ আর্যসভ্যতা লইয়া যাঁহারা লম্ফঝম্প করেন তাঁহাদের প্রথমেই খবর লইতে হয় আর্যের ইতিহাস কোথায় পাওয়া যায়। আর সে অনুসন্ধান

করিতে গেলেই স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক ভারতবর্ষের আর্যদের দ্বারস্থ হইতে হয়। কারণ ইউরোপীয় আর্যদের মাথার মণি গ্রীক সভ্যতার গোড়াপত্তনের পূর্বেই অন্ততঃ তিনখানা বেদের মন্ত্র রচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, উপনিষদের ঋষি সক্রেটিসের পরম বৃদ্ধ পিতামহের ন্যায় বয়সে ও জ্ঞানে। কাজেই ভারতবর্ষীয় আর্যরা যদি আর্য জাতির ঠিকুজিকুষ্ঠি লইয়া বসিয়া থাকে তবে নর্দিকদের কি গতি হয়? রজেনবের্গ বলিলেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্যদের এই বিষয়ে কৌলীন্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অদ্যকার ভারতবর্ষীয়রা সে আর্য নয়। "ইহারা জারজ, এখনও গঙ্গাস্নান করিয়া ইহারা নিজেদের বর্ণসংকর পাপের ক্ষালন করিবার চেষ্টায় সর্বদাই রত।" গঙ্গাস্নানের কি অপূর্ব অর্থ নিরূপণ ও সঙ্গে সঙ্গে নর্দিক কৌলীন্যের কি আশ্চর্য কুতুবমিনার নির্মাণ!

একথা আমরা আজ আর তুলিব না যে নর্দিক আর্যে বর্ণসংকর আছে কি না ও থাকিলে কি পরিমাণ। আমাদের বক্তব্য যে, রজেনবের্গ প্রমুখ নাৎসীরা যে আর্যামির বন্যায় জর্মন জাতকে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা আমাদের অজানা নহে। এ বন্যা আমাদের দেশেও এককালে বহিয়াছিল ও পরবর্তী যুগে আমাদের রাজনীতিকে গণ্ডিভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এ বিষয়ে পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৭ সালে কি বলিয়াছিলেন উদ্ধৃত করিতেছি। রজেনবের্গের তখনও জন্ম হয় নাই।

"ম্যাকসমূলার ভট্টের অভ্যুদয়ের পূর্বে আর্য বলিয়া যে একটি শব্দ অভিধানে আছে তাহা তাঁহারা (অর্থাৎ আর্যামির পাণ্ডারা) জানিতেন কি না সন্দেহ। তাহার পর ম্যাকসমূলার যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীময় আর্যমন্ত্রের বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন তখন তাহার দুই-এক রত্তি ছিটা তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র সেই মুহূর্ত হইতে তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে আর্যামির অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। বিলাত হইতে আর্যমন্ত্রের আমদানী হইল—আর আমাদের দেশশুদ্ধ সমস্ত কৃতবিদ্য যুবক আর্য আর্য বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন; তাঁহাদের সহস্র কণ্ঠে উদ্গীত আর্য নামের চীৎকার-ধ্বনিতে ইয়ং বেঙ্গলের গাত্রে থর থর কম্প উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণদেব দানোয়া-পাওয়া শবদেহের ন্যায় মৃত্যুশয্যা হইতে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া পৈতা মাজিতে বসিয়া গেলেন এবং ফিরে-ফিতি কোমর বাঁধিয়া সন্ধ্যাগায়ত্রী মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

আমরা যেরূপ একদিন পৈতা মাজিতে ও সন্ধ্যা-গায়ত্রী মুখস্থ করিতে বসিয়া গিয়াছিলাম, রজেনবের্গ সাহেবও সেই রকম নর্দিক নীল চোখকে নীলতর ও সোনালী চুলকে সোনালিতর করার চেষ্টায় মশগুল হইলেন। আমরা যে রকম

ভুলিয়াছিলাম যে—

কর্ত্তব্যমাচরন্ কার্যমকর্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য ইতি স্মৃতঃ।

অর্থাৎ কর্তব্য আচরণ করিয়া এবং অকর্তব্য অনাচরণ করিয়া যিনি প্রকৃত আচারে দৃঢ়নিষ্ঠ হন তিনি আর্য শব্দের বাচ্য।

রজেনবের্গ প্রমুখ নাৎসীরাও এই মহাবাক্য ভুলিলেন।

আমরা একদিন ভুলিয়াছিলাম বলিয়া আমাদের রাজনীতি সেদিন সম্প্রদায়-মুক্ত হইতে পারে নাই। পরবর্তী যুগে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন 'আর্যামির' হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। এই আবহাওয়ায় আমাদের নাভিশ্বাস উঠে বলিয়াই জিন্না সাহেব যখন বলেন, 'কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান', তখন আমরা আপত্তি জানাই। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি স্ব স্ব 'আর্যামি' লইয়া থাকুন; কিন্তু সাম্প্রদায়িক দম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত নাৎসী আন্দোলনের ভাগ্যচক্রগতি দেখিয়া যেন পদক্ষেপ করেন।

নাৎসীদের এই দম্ভের চরম প্রকাশ হইল পৃথিবী জয়ের বাসনায়। তাহার পূর্বে জর্মনী জয়ের কার্যে তাহারা নিযুক্ত হইলেন। ইহুদীদের নির্যাতন; নাৎসী সাম্প্রদায়িকতায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের উৎপীড়ন, এমন কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মন্দির হইতে হাইনে, আইনস্টাইন, মানী প্রভৃতি মৃত, জীবিত মনস্বীদের বহিষ্করণ।

বিচক্ষণ জর্মনরা যে ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলে নাই এমন নহে। শুধু বিচক্ষণেরাই যে নাৎসী-দর্শনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা নহে, জর্মনীর জন-সাধারণও তাহাদের ব্যঙ্গোক্তি আড়ালে অন্তরালে অনেকখানি প্রকাশ করিয়া-ছিল। একটি ধাঁধাঁর ভিতর দিয়া সে ব্যঙ্গোক্তি তাহারা বিদেশীদের কাছে প্রকাশ করিত ও তাহাদের নাৎসী তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা লইত।

ধাঁধাঁটি এই—

প্রশ্ন: আদর্শ আর্য কে?

উত্তর: তাহার জন্ম হইবে ফ্যুরারের দেশে, সে বীর প্রস্থে হইবেন গ্যোরিঙের ন্যায়, দৈর্ঘ্যে গ্যোবেলসের ন্যায়, নামে রজেনবের্গের ন্যায়, কার্যক্ষেত্রে ফন রিবেনট্রপের ন্যায়। (সকলেই জানেন হিটলারের জন্মভূমি জর্মনী নয়, গ্যোরিঙ ও গ্যোবেলসের একজন মোটা একজন বেঁটে; রজেনবের্গের নামে আছে ইহুদী নামের বোটকা গন্ধ ও রিবেনট্রপ শৌণ্ডিক।)

তবু স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্যামি জর্মনীতে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া

পড়িয়াছিল; পরে সে আর্যামির দম্ভ চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি বিজিত দেশে, এমন কি ইতালীর ন্যায় মিত্ররাজ্যে (কাউন্ট চানোর অধুনা-প্রকাশিত রোজনামচা দ্রষ্টব্য) তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। আজ যে রুশেরা বল্কানে অনেকটা সুবিধা পাইতেছে, তাহার কারণ এই নহে যে বল্কানরা সকলেই ভাবে যে, রুশ তাহাদের পরম মিত্র, বরঞ্চ যুক্তিধারা অনেকটা এই রকম: শত্রুর শত্রু মিত্র নাও হইতে পারে, কিন্তু মিত্রবৎ।

জর্মনীর নাৎসী কর্তারা কি রাজরাজেশ্বরের হালে দিন কাটাইতেন, সে সকলেই জানেন। গাঁজার নেশাটা করিলেন কর্তারা, মাথাধরাটা পাইল জনসাধারণ। তাহারা প্রাণ দিল রুশিয়ার দুস্তর প্রান্তরে ক্ষুধায় শীতকষ্টে অথবা রুশনগরদ্বারে, রাস্তায় গলিতে গুলিতে বিস্ফোটকে; অথবা নরমাঁদিতে সামনে মিত্রশক্তির ট্যাঙ্ক, কামান, উপরে বোমারু, পিছনে ফরাসী গেরিল্লা—মাতা বসুন্ধরা তাহাদের আবেদন শুনিবার পূর্বেই বোমারু জাহাজ মাতার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিতেছিল, কিন্তু হায়রে, সেখানেও আশ্রয় কোথায়?

দেশের কথায় বলে, 'খেলেন দই রমাকান্ত বিকারের বেলা গোবর্ধন'। আজ সমস্ত জর্মনী জুড়িয়া যে বিকার ও ভবিষ্যতে যে কি সান্নিপাতিক জ্বর হইবে, তাহার কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে শক্ত। ইংরাজ, আমেরিকান, রুশ ত্রিদোষ হইয়া জর্মনীর 'গোবর্ধন'গুলিকে কোন্ শ্মশানযাত্রায় লইয়া যাইতেছেন, তাহার খবর কে রাখে।

এতদিন খবর পাইতেছিলাম যে, রমাকান্তগুলিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা হইতেছে ও তাহারা যে বিকার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এমন নহে। তাহাদের জন্য বিশেষ গারদ, বিশেষ বিচার, এমন কি বিশেষ হাড়িকাঠও নির্মিত হইতেছে। ফাঁসী অথবা গুলির কর্ম নয়, খাস জর্মন কায়দায় তাহাদিগকে গিলোটিনে গলা দিতে হইবে। আমরা শোক প্রকাশ করিতেছি না, আনন্দিতও হইতেছি না। আমরা ভারতবাসী; কর্মফলে বিশ্বাস করি। দই খাইলে বিকার হইবেই। কিন্তু ইতোমধ্যে হঠাৎ একটি খবর পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। খবরটি এই—শ্লেজবীক-হলস্টাইনে নাকি প্রায় সোয়ালক্ষ জর্মন সৈন্য ও অফিসারকে জিয়াইয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের নিরস্ত্র করা হয় নাই। পাছে বিশ্বসুদ্ধ লোক খবর পাইয়া আঁতকাইয়া উঠে, তাই অত্যন্ত সান্ত্বনাপূর্ণ এই খবরটিও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের কাছে রসদ মাত্র দশ রোঁদ চালাইবার মত। যে অঞ্চলে এই নোনা ইলিশরা বিরাজ করিতেছেন, সেখানে তাঁহারা সর্বময় কর্তা, এমন কি সে অঞ্চলে যদি তাঁহাদের খানাপিনার অসুবিধা হয়, তবে পার্শ্ববর্তী জর্মনী ও

সম্ভবতঃ ডেনমার্ক হইতে আহারাদি যোগাড় করিতে পারিবেন। হেমলেটি ভাষায় বলি, 'ইহারা যে পাঁড় নাৎসী, সেকথা জানাইবার জন্য দৈববাণীর প্রয়োজন নাই।'

সঙ্গে সঙ্গে এই খবরও পাইলাম যে, প্রায় ৪৫ মিলিয়ন পাউণ্ড খরচা করিয়া (প্রতি বৎসরে না প্রতি তিন বৎসরে এ কথাটা রয়টার কাজের হিড়িকে ঘুলাইয়া ফেলিয়াছেন) একটি পাকাপোক্ত পোলিশ বাহিনী ইংলণ্ডে মজুদ রাখা হইয়াছে। ইহারাও জনবুল মার্কা ষাঁড় লাল রঙের কট্টর দুশমন।

এই যে ইংলণ্ডের হাঁড়িতে জিয়ানো যশোরে কই শ্লেজবীক হলস্টাইনে জমানো পদ্মার নোনা ইলিশ, ইঁহারা লাগিবেন কোন্ কর্মে কোন্ পরবে? নূতন রাজনীতির জন্মদিনের দাওয়াতে, না ইয়োরোপের দ্বিতীয় কাপালিক শ্রাদ্ধবাসরের ভোজে?

২

পেটুক ছেলেকে যা কিছু করিতে বলা হউক না কেন, সে আহারাদির আলোচনায় ঠিক পৌঁছিবে। এমন কি একং দশঙের মত রসকসহীন জিনিস মুখস্থ করিতে বলিলেও সে ঠিক লুচি মণ্ডায় পৌঁছিবে। কায়দাটা দেখার মত: একং, দশং, শতং, সহস্র, অযুত; লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রায়ণ, পৌষ, মাগ (মাঘ) ছেলেপিলে, জ্বর, সর্দি, কাশি; গয়া, বৃন্দাবন, পুরী, রসগোল্লা, সন্দেশ, মিহিদানা, লেডিকিনী ইত্যাদি ইত্যাদি।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে নড়ায় কাহার সাধ্য।

ইংরাজ, ফরাসীর দৃঢ় বিশ্বাস যে জর্মনী পেটুক ছেলের মত। তাহাকে যে কোন কায়দার সরকার দাও না কেন, সে রাজতন্ত্রই হউক আর গণতন্ত্রই হউক, জর্মনরা ঠিক স্বৈরতন্ত্র ও কুচকাওয়াজতন্ত্রে পৌঁছিবেই। য়ুঙকার ও রূঢ়ের ধনপতিরা মিলিয়া পৃথিবী জয়ের প্ল্যান আঁটিবেই। ফন পাপেন ও ট্যুসেনে বন্ধুত্ব হইবেই ও পৃথিবী জয়ের জন্য বিদেশী, টুথব্রাস-গোঁপওয়ালা, নিরক্ষর উজবুকেরও যদি প্রয়োজন হয় তাহাও সই—যদি সে উজবুক ঠিক ঠিক বক্তৃতা ঝাড়িয়া টেবিল ফাটাইতে পারে ও শান্তিপ্রিয় দেশী-বিদেশীর মাথাও এলোপাতাড়ি ফাটাইতে পারে। ইংরেজ ফরাসী বলে, "দেখো না, ১৯১৮-১৯ সালে আমরা জর্মনীকে কি রকম সরেস একখানা বাইমার রিপাবলিক দিয়াছিলাম; কিন্তু সেই একং দশং পড়িতে গিয়া তাহারা ঠিক নাৎসী গুণ্ডামিতে পৌঁছিল। ইহাদের বিশ্বাস নাই, ইহাদের "রোম রোম মে বদমায়েশী"।

পরাজিত জর্মনীকে লইয়া সমস্যাটা তাহা হইলে এই, তাহাকে স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায় কিনা। যদি না দেওয়া যায় তবে পিটুনি পুলিস দিয়া তাহাকে আদবকায়দা শিখাইতে হইবে।

১৯৩৯ সালে আমার এক জর্মন বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন: 'লড়াই শীঘ্রই লাগিবে। আমরা যদি জিতি, তবে দুনিয়ার রাজত্ব আমাদের হাতে আসিবে আর যদি হারি তাহা হইলেও। কারণ আমাদের পরাজয় অর্থই রাশিয়ার জয়। আমরা তখন লাল হইয়া যাইব। আমাদের প্রতিনিধিরা মস্কোতে যাইবে, সেখানে ভোঁতা রাশিয়ানদের তিন দিনে কাবু করিয়া তামাম ইউ এস এস আর আমাদের প্রতিনিধিরাই চালাইবে। রাশিয়ানরা বর্ণবিচার করেন না, তাহাদের বীজমন্ত্র 'সর্বোত্তম ব্যক্তি বড়কর্তা হইবে হউক না সে জর্জিয়ন'। যে রকম মুসলমানরা একদিন বলিত, 'সর্বোত্তম ব্যক্তি খলিফা হইবে, হউক না সে হাবসী'। কাজেই কিছুদিনের ভিতরই দেখিতে পাইবে এক জর্মন ক্রেমলিনে বসিয়া দুনিয়া চালাইতেছে। হাঁ তামাম দুনিয়াটা, কারণ জর্মনী ইউ এস এস আরের গুষ্টিতে যদি ঢোকে, তবে বাদবাকী ইউরোপ তিন দিনেই তার খপ্পরে পড়িবে। ইংরেজ, মার্কিন কেউ ঠেকাইতে পারিবে না। তারপর পটপট করিয়া চীন, ভারতবর্ষ, ইরাণ, ইরাক, মিশর। তারপর? তারপর আর কি? এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এক অখণ্ড রাজ্য হইলে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াকে একঘরে করিয়া তিন দিনের ভিতর সমাজের সামনে নাকে খত দেওয়াইব"। দেখিবে 'সব লাল হো জায়েগা', তবে রঞ্জিতি মর্মে নহে।'

শুনিয়া বলিয়াছিলাম, 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোমার কথাই যদি ফলে, তবে আমরা ভারতবাসীরাই দুনিয়ার রাজত্ব করিব। ভারতবাসীও না, আমরা বাঙালীরাই ক্রেমলিনে বসিয়া নিয়েভা নদীর ইলিশ মাছ খাইব ও দুনিয়ার রাজত্ব করিব।'

বন্ধু বলিলেন, 'সে কি কথা? তোমরা বাঙালীরা এমন কী গুণে গুণবান?'

আমি বলিলাম, 'বিলক্ষণ, আমরা লড়াই করিয়া দেশের স্বাধীনতা জিতিতে না পারি, কিন্তু মস্কোর কৌন্সিল-ঘরে আমাদের বক্তৃতা জলতরঙ্গ রুধিবে কে, হরে মুরারে।'

কিন্তু সে কথা উপস্থিত ধামাচাপা থাকুক; গোঁফে তেল দিবার সময় এখনও হয় নাই।

আমার জর্মন বন্ধুর যুক্তিতে মার্কিনিংরাজ বিশ্বাস করে। তাহাদের মাথায় ঢুকিয়াছে যে, জর্মন জিঙ্গো যে রকম পাগলা হিটলারকে কার্য উদ্ধারের জন্য দলে

নিয়াছিল, জাতধর্ম, কৌলীন্য আভিজাত্য বিসর্জন দিয়া, ঠিক সেই রকম তাহারা লাল হইয়া স্টালিনকে হিটলারের তখতে বসাইয়া দুনিয়ার বাদশাহী করিবে। অর্থাৎ নাৎসী গুণ্ডামির বদলে স্টালিনি গুণ্ডামি চালাইবে। দুই গুণ্ডামিই মার্কিনিংরাজের পক্ষে মারাত্মক, মহতী বিনষ্টি। সেই মহাপ্রলয় হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় জর্মন জিঙ্গোকে বোঝানো যে, তাহারা লাল হইয়া কেন মস্কো দরবারে কুনিশ দিতে যাইবে। মার্কিনিংরাজ সাহায্য করিতে প্রস্তুত, জিঙ্গোরা লাল রক্তস্রোতের উপর ভরাপালে মস্কো পৌঁছিবে রাজবেশে। উপস্থিত কোনগতিকে রুশকে ঠেকাইয়া রাখ ; জর্মনী যেন মনের দুঃখে লাল গেরুয়া পরিয়া বিবাগী হইয়া মস্কো তপোবনে চলিয়া না যায়। অর্থাৎ সেই অতি প্রাচীন চেম্বেরলিন নীতি "যতক্ষণ রুশে জর্মনে লড়াই চলে আমাদের পৌষ মাস, দুই দুশমনে মিলিলেই আমাদের সর্বনাশ"।

যদি বলা হয়, এক কাজ করো না কেন, নাৎসীদের শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া রাজ্যশাসন দেশের জনগণের হাতে ছাড়িয়া দাও। তাহারা যে লাল হইয়া যাইবেই, এ স্বতঃসিদ্ধ পাইলে কোথায় ?

মার্কিনিংরাজ বিজ্ঞের ন্যায় মৃদুহাস্য করিয়া বলে, 'ইতিহাস পড়ো। বাইমার রিপাবলিক যখন জর্মন জনগণকে ভেট দেওয়া হইল তখন তাহারা করিল কি ? কোথায় না বাদশাহী মসলন্দে বসিয়া শাহেনশাহীগিরি করিবে তাহা নয়, সেই কাইজারকে তাহার জমিদারীর আমদানি কিস্তি খিলাপ না করিয়া হামেহাল পাঠাইল—এদিকে নিজে খাইতে পায় না। মুচি-মেথরকে বলা হইল, রাজা তো হইতে পারিবে না, সিংহাসন নাই, প্রেসিডেণ্ট হ', তা নয় ডাকিয়া আনিল সেই যুঙ্কার পালের গোদা হিণ্ডেনবুর্গটাকে। তারপর সেই পাগলা জগাইকে। সে ব্যাটা কালাপাহাড় জাতে অস্ট্রিয়ান হইল জার্মান। মোদ্দা কথা এই, জর্মন আপামর জনসাধারণ যা, যুঙ্কারও তা, নাৎসীও তা। সব শিয়ালের এক রা। বরঞ্চ কট্টর নাৎসীরা ভালো। শক্তির উপাসক। জাতবর্ণহীন স্টালিনি নেড়া-নেড়িদের বিরুদ্ধে ইহাদের কোনো না কোনো দিন শভিনিজম-কারণ খাওয়াইয়া লড়ানো যাইবে। আপামর জনসাধারণ তো কাছাখোলা, লাল গেরুয়া পরিয়া ধেই ধেই করিয়া স্টালিনি সংকীর্তন নাচিবার গাইবার জন্য তৈয়ার হইয়া আছে। তাই শ্লেজবীক-হল্স্টাইনে নাৎসী জিয়াও আর গোরাদের কড়া বারণ করিয়া দাও যেন জর্মন জনগণের সঙ্গে রাখী না বাঁধে (নন-ফ্রেটারনাইজেশন)। গোরাদেরই বা বিশ্বাস কি ? দুষ্টলোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদেরও নাকি গোলাপী আমেজ লাগিয়াছে।

ঠিক এইখানটায় মার্কিনিংরাজের সঙ্গে আমার মত মিলে না। আমার বিশ্বাস, জর্মন জনসাধারণ আপন মুক্তি আপন ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া খুঁজিয়া পাইতে চায়। স্টালিন-দত্ত গুরুমন্ত্র জপিয়া নয়। আমার মনে আছে ১৯৩২ সালে যখন জর্মনীতে নাৎসী-কম্যুনিস্টে জোর ষাঁড়ের লড়াই চলিতেছিল তখন নাৎসীরা পথেঘাটে একে অন্যকে অভিবাদন করিত 'হাইল হিট্লার' বলিয়া, কম্যুনিস্টরা 'হাইল মস্কো' বলিয়া। গুণীদের বলিতে শুনিয়াছি এই মস্কোমার্কা বিদেশী ভদকা জর্মন বিয়ার ঐতিহ্য-গর্বিত জনসাধারণ আদপেই পছন্দ করিত না। কে জানে হয়ত এই কথা স্মরণ করিয়াই রুশরা আজ বার্লিনাঞ্চলে জোর করিয়া জর্মনদের 'হাইল মস্কো' বলাইতেছে না। অবান্তর হইলেও একটি কথা বলিবার লোভ হইতেছে। আমাদের দেশী কম্যুনিস্টরা কিন্তু মস্কোবাগে না তাকাইয়া কোনো কর্মই করেন না, কোনো বাক্যই বলেন না। স্টালিন যদি জর্মনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন তাও ভালো, যদি লড়েন তাও ভালো, যদি ফিনল্যাণ্ডের কান মলেন তাও ভালো, যদি ফিন্ কম্যুনিস্টদের তত্ত্বতাবাশ না করিয়া পাসিকিভির সঙ্গে দোস্তি করেন তাও ভালো, ইরাণ তেল দিল না বলিয়া যদি তাকে ধমক দেন তবে তাও ভাল, গ্রীক দেশসেবীদের গাছে চড়াইয়া যদি মই কাড়িয়া লন তবে তাও ভালো। কারণ বাতুশ্‌কা (ছোট বাপা) স্টালিন সর্ববিশারদ, ভগবানের (রাম রাম!) ন্যায় সর্বজ্ঞ। বিরিঞ্চিবাবার ন্যায় তিনি চন্দ্রসূর্য ওয়েল না করিলে আকাশ পাতালের বন্দোবস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবার নিদারুণ সম্ভাবনা। অতএব 'হাইল মস্কো'। আমাদের এ ধর্ম পছন্দ হয় না। আতাতুর্ক পছন্দ করিতেন না বলিয়াই নব্যতুর্কের স্কন্ধ মক্কাবাগ হইতে ফিরাইয়া আঙ্কারাবাগে ইস্ক্রু টাইট করিয়া দিয়াছিলেন।

কথা হইতেছিল যে, জর্মন জনসাধারণ আপন মুক্তি আপন ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া খুঁজিয়া লইতে চায়। তাই যদি হয় তবে বাইমার রিপাবলিকের বানচাল হইল কি করিয়া?

৩

সোশাল ডিমোক্রেটদের হাতে রাজ্য চালনার ভার সমর্পণ করাই যে প্রশস্ত ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। তাহার কারণ আমরা পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। বাইমার রিপাবলিককে সাফল্যমণ্ডিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন সোশাল ডিমোক্রেটরা। জর্মনীর খ্যাতনামা পণ্ডিত, অধ্যাপক, গুণীজ্ঞানী—এক কথায় যাঁহারা জর্মনীর গর্বস্বরূপ, তাঁহারা প্রায়

সকলেই ছিলেন বাইমারের পিছনে, সোশাল ডিমোক্রেটরূপে। আমরা বিশেষ করিয়া ইঁহাদের চিনিতাম, কারণ ইঁহাদের ভিতর আর্যামি গোঁড়ামি ভণ্ডামি ছিল না।

জর্মনীর দুর্দিনে সোশাল ডেমোক্রেটরা আপামর জনসাধারণকে এক পতাকার নীচে সম্মেলিত করিয়া ইন্‌ফ্লেশন, বেকারী, নাস্তিক্য, উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পৃথিবী জয় করার উদ্দেশ্যে নূতন সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার স্বপ্ন তাঁহারা দেখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "মানব সংসারে ভালো লোকের দেয়ালি উৎসব চলিতেছে, প্রত্যেক জাতি আপন প্রদীপ উঁচু করিয়া তুলিলে তবে সে উৎসব সমাধা হইবে"। পৃথিবীর শান্তি ও মঙ্গল তাঁহারা কামনা করিয়াছিলেন বলিয়া ঠিক ঐ সময়ে (১৯২০) রবীন্দ্রনাথকে তাঁহারা বিপুল সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। জর্মন জনসাধারণ তখন রবীন্দ্রনাথের বাণীতে নিজের মূক আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিল। কে না জানে ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বপ্রেমের কবি, শান্তির প্রতীক, পদদলিতের পরিত্রাণ।

তথাপি ইংরাজ ফরাসীর ভয় ছিল যে সময়কালে সোশাল ডিমোক্রেটরা বলশিদের সঙ্গে যোগদান করিবে। তাই যখন দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উদ্ধার করিবার জন্য সোশাল ডিমোক্রেটরা ইংরাজ-ফরাসী ধনপতিদের সাহায্য চাহিল তাহারা সাফ জবাব দিল। ফলে বেকারি বাড়িল, ব্রনিঙ হাল সামলাইতে পারিলেন না। তারপর ফন পাপেন; শ্লাইশার গর্ভাঙ্কের ভিতর দিয়া নাৎসী যবনিকা পতন। ইংরাজের কথা ফলিল না, সোশাল ডিমোক্রেটরা কম্যুনিস্টদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও নাৎসী অবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করিতে রাজী হইলেন না।

* * *

সোশাল ডিমোক্রেটরাই যে দেশের মেরুদণ্ড তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, রুশেরা তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলে ইঁহাদেরই প্রধান শক্তি স্বীকার করিয়া নিয়াছে। ইঁহাদেরই সঙ্গে আছেন ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও লিবারেল ডিমোক্রেটিক পার্টি। কম্যুনিস্টরাও আছেন, ও বেশ জোর আছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং ভিতরে ভিতরে রুশ সরকার যে তাহাদেরই সব চেয়ে বেশী সাহায্য করিবে তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রুশরা জানে যে, সোশাল ডেমোক্রেটরা যদি বাঁকিয়া বসিয়া থাকে, তবে কম্যুনিস্টরা শুধু গায়ের জোরে তাহাদের প্রোগ্রাম চালু করিতে পারিবে না। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, রুশের চাল হইল সোশাল ডেমোক্রেটদের নটমঞ্চের সম্মুখে রাখিয়া দেশের প্রথম দুর্দিনের

ধাক্কা তাহাদের দিয়া সহানো। রুশদের যথেষ্ট সাহায্য না পাইয়া যখন ব্যনিভ সরকারের মত তাহাদের পার্টি-নৌকা বানচাল হইবে তখন কম্যুনিস্টরা আসরে নামিয়া "দেশোদ্ধার" করিবেন, অর্থাৎ গোটা রুশাধিকৃত অঞ্চলকে ইউ এস এস আরের অঙ্গীভূত করিবেন। সে বিপদকালে সোশাল ডিমোক্রেটরা যে কোনো কট্টর লাল-বিরোধী দর্গায় ধর্ণা দিবে তাহার উপায় নেই, কারণ রুশরা কট্টরদের নির্মমভাবে বিলোপ করিয়াছে ও করিতেছে। রুশরা জানে যে, উপস্থিত সোশাল ডিমোক্রেটদের লোকচক্ষে অপমানিত করার প্রয়োজন তাই তাহাদের সভামঞ্চে আনিবার পূর্বে বেশ করিয়া মুসোলিনী-কায়দায় জোলাপ দেওয়া হইতেছে।

অস্ট্রিয়ায় রুশরা যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহাতেও ঐ চাল। বিস্তর সোশাল ডিমোক্রেটদের হরেক রঙের পোর্টফোলিও দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পুলিস অর্থ প্রোপাগাণ্ডা আভ্যন্তরীন মন্ত্রীর হাতে ও তিনি কম্যুনিস্ট। অর্থনৈতিক দিক দিয়াও রুশের বালাই কম। যে অঞ্চল দখল করিয়া বসিয়াছে সেখানে খানা-পিনা আছে, তাহার উপর উক্রাইন আছে। সে অঞ্চলের সমস্ত কলকারখানা সরাইয়া রাশিয়ায় লইয়া গেলেও ইহাদের অন্ততঃ অস্থিচর্মসার করিয়া রাখিতে কোনো বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

* * *

মার্কিন-ইংরাজ কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করিতে পারিতেছেন না। কর্তাদের বুদ্ধির বহর কতটুকু তাহা নিম্ন খবরটুকু হইতে বিলক্ষণ বোঝা গেল।

"জর্মনীর কলকব্জা যদি কাড়িয়া লই (অর্থাৎ ডিসইনডাসট্রিয়ালাইজ) তবে তাহারা না খাইয়া মরিবে, আর যদি না কাড়ি তবে চর্বচোষ্য লালিত হইয়া পুনর্বার মস্তকোত্তলন করিয়া আমাদিগকে প্রহার করিবে।"

এই তথ্যটুকু কি বিজ্ঞের ন্যায় প্রচার করা হইল! ঘোড়াকে দানাপানি না দিলে সে মরিবে, তাহাতে আর নূতন কথা কি? আর দিলে সে গাড়ী টানিতে পারিবে (অর্থাৎ গায়ের জোরে রুশকে ঠেকাইতে পারিবে), কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাকে লাথিও মারিবে। গাড়ী যদি চালাইতে চাও, তবে তেজী ঘোড়া কিঞ্চিৎ দুরন্তপনা তো করিবেই। তুমি ভালো লাগাম কেনো না কেন?

দ্বিতীয় উদাহরণ পণ্য!

"কাঠের অভাব হইয়াছে বলিয়া বার্লিনের যে সব অঞ্চলে ইংরাজ-মার্কিন প্রবেশ করিয়াছে, সেখান হইতে স্টালিনি সাইনবোর্ড সরানো হইয়াছে।" খদ্দের যখন অশ্ব-বিক্রেতাকে বলিল, "বাড়ী গিয়া দেখিলাম, তোমার ঘোড়া খোঁড়া", তখন সে বলিল, "আপনার বাড়ী তো বাজারের উত্তর দিকে, ওদিকে চলিলে

আমার ঘোড়া খোঁড়া হয়ই।" খদ্দের বলিল, "তোমার যুক্তিটা তোমার ঘোড়ার মতই খোঁড়া।"

তৃতীয় উদাহরণ,

'কোনো কোনো জর্মন মেয়ে ইংরাজ সিপাহীদের নিকট হইতে চকলেট লইয়াই চম্পট দেয়।' আশ্চর্য! কিন্তু আমাদের এতদিন বিশ্বাস ছিল যে, সবদেশের মেয়েরাই এ রকম করে। আর মেয়েদেরই বা দোষ দেই কেন? তোমাদের সন্তুষ্টিকরণ (এপিজমেণ্ট) অস্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া চকলেট পকেটস্থ করিয়া হিটলার তো এই সেদিন তোমাদের বিশেষ অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়াছিল। রাজনৈতিক স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়, কিন্তু এতটা ক্ষীণ!

অধিকৃত জর্মনী চালনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত খবর হইতে বোঝা যায়, বরঞ্চ বলা উচিত বোঝা যায় না ইংরাজ-মার্কিনের নীতি কি।

'কম্যুনিস্টরা রাজ্যশাসনে কোথাও নাই। বেভেরিয়া ও নিম্নরাইনে দক্ষিণ-পন্থী ক্যাথলিকরা সর্বময় কর্তা। হামবুর্গ ও হানোফারে পার্টিমতামতহীন বণিক ও দক্ষিণপন্থী আমলারা গুছাইয়া লইতেছেন, যদিও অন্য কেউ কেউ বখরা পাইতেছেন। হেস্সে ও মধ্য রাইনে সোশাল ডেমোক্রেটরা রাজ্য-চালনার পুরোভাগে ও উত্তরপন্থী ক্যাথলিকদের আওতায় বেস্টফালিয়েন ও ওল্ডেনবুর্গে কিছুটা রাজত্ব করিতেছেন। তদুপরি বড় বড নগরে ইঁহারাই মেয়ার হইয়া বসিয়াছেন।

উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। এ রকম পঁচিশ জায়গায় বত্রিশভাজা করিবার কি প্রয়োজন? এরকম দো-আঁসলা, তিন-আঁসলা জানোয়ার পয়দা করিবার এক্সপেরিমেণ্ট কেন? ইংলণ্ডে একবার টার্কি ও হেন্ (মুরগী) পক্ষীতে সংমিশ্রণ করাইয়া যখন টার্কিন পাখী পয়দা করা হয়, তখন ফ্রান্স বলিয়াছিল, "আমেরিকার এক আস্তাবলে গাধা ও একখানা ভাঙা বাইসিক্ল একসঙ্গে রাখার ফলে ফোর্ড গাড়ীর জন্ম হয়েছিল। সাধু সাবধান!"

তাই বলিতেছি যে, প্রকৃষ্টতম পন্থা, সোশাল ডেমোক্রেটদের শুধু রাজ্য সমর্পণ করাই নয়, তাঁহাদের সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন সাহায্যদান। রুশরা যেমন তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলে সোশাল ডেমোক্রেটদের বোকা বানাইতে চাহে, তোমরা তেমনি তাঁহাদের সফলতার পথে লইয়া চল। জর্মন বড় জাত্যাভিমানী, পারতপক্ষে সে কখনও তাহার জাতীয়তাবোধ ত্যাগ করিতে চাহে না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মুক্তির পথ তাহারই ঐতিহ্যের তাহারই বৈদগ্ধ্যের ভিতর দিয়া। সে বলশির ধামাধরা হইতে চাহে না, তোমাদের গোলাম হইতে চাহে না। তাহাকে

যদি স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে দাও তবে সে সকল শত্রুকে রোধ করিয়া শান্ত জীবনযাপন করিবেই। সোশাল ডেমোক্রেটরা শান্তি চায়।

আর শেষ কথা তো এই যে, স্বায়ত্তশাসনে সর্বজাতির অধিকার। সোশাল ডেমোক্রেটরা জর্মনজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা বরণীয় তাহারই প্রতীক।

প্যালেস্টাইন

গোড়ার দিকে ইহুদি-আরবে প্যালেস্টাইন সম্পর্কে তর্ক উপস্থিত হইলেই প্রথম প্রশ্ন এই উঠিত, সে দেশটা কাহার। ইহুদিরা বলিত, 'এই পবিত্র দেশ আমাদের পিতৃভূমি, মূসা (মোজেস) আমাদিগকে এই দেশে পথ দেখাইয়া আনেন; আমাদের গর্বস্থল রাজা সুলেমন (সলমন), দায়ুদ (ডেভিড) এই দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, আমাদের প্রপিতামহ ইব্রাহীমের (আব্রাহামের) কবর এই মাটিতে। এই দেশ আমাদের পুণ্যভূমি, এখন এ দেশকে আমাদের কর্মভূমিতে পরিণত করিতে চাহি।' (সত্যেন দত্তের 'তীর্থসলিলে' রাজা সুলেমন ও দায়ুদের গীতি দ্রষ্টব্য)।

উত্তরে আরব বলে, 'তোমাদের মত আমরাও সেমিটি, যে সব মহাপুরুষদের নাম করিলে তাঁহারা আমাদেরও পূর্বপুরুষ। তাঁহাদের গোর আমাদের তীর্থস্থল-দরগাহ। ইহাদের মহৎ কার্যকলাপ কুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু জেরুজালেম (বয়ত উল-মুকদ্দস পবিত্রালয়) আমাদিগের কাছে মক্কার পরেই সম্মানিত। কিন্তু এসব ধর্ম-সম্বন্ধীয় হার্দিক আলোচনা উপস্থিত স্থগিত রাখো। আসল কথাটা এই, তোমাদের স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই (খৃষ্টের বহুপূর্বে) তোমরা এ দেশ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করো; খৃষ্টের পর তোমাদের অধিকাংশ জাতভাই খৃষ্টান হইয়া যায়—তাহারা আজ আমাদের দলে, পরবর্তী যুগে তাহাদিগের অধিকাংশ আবার মুসলমান হইয়া যায়—এবং সর্বশেষে ক্রুসেডের আমলে যখন যুদ্ধ, অরাজকতা, ও অনাবৃষ্টির ফলে দেশটা উচ্ছন্ন গেল, তখন তোমরা সকলেই 'পোড়া' দেশকে ছাড়িয়া কারবারে পয়সা করিবার জন্য পৃথিবীর সবত্র ছড়াইয়া পড়িলে। আমরা এই দেশের মাটিকে ভালোবাসিতাম—সেই মাটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আটশত বৎসর কাটাইলাম, এখন পয়সার জোর হইয়াছে বলিয়া আমাদিগকে ভিটা-ছাড়া করিতে চাও? তোমাদের বেশভূষা বিজাতীয়, তোমাদের আচার-ব্যবহার এদেশের প্রাচীন ইহুদি পন্থানুযায়ী নহে (অর্থাৎ যে কয়টি ইহুদি দুর্দিনে এদেশ ত্যাগ করিয়া যান নাই, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের আজ মিলে বেশী), তোমরা বার্লিন প্যারিসের

নৈতিক চরিত্র ও দুষ্ট রোগ সঙ্গে আনিয়াছ, আর সর্বশেষ কথা, আমাদের দুশমন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তোমরা বন্ধুত্ব করিয়াছ।'

এই তর্কাতর্কি আমি ছয় মাসকাল উদয়াস্ত শুনিয়াছি—লিখিতে গেলে একখানা ছোটখাটো বই লেখা যায়। কিন্তু এসব তর্ক আজকাল কম হয়।

১৪-১৮ যুদ্ধের সময় ইংরাজ প্যালেস্টাইনের আরবকে কথা দেয়—তখন সেখানে ইহুদির সংখ্যা নগণ্য—যে, তোমরা যদি তুর্কীর হইয়া না লড়ো তবে যুদ্ধের পর তোমাদিগকে স্বরাজ (সেলফ ডিটারমিনেশন) দিব। সঙ্গে সঙ্গে আরবদের অজানাতে, প্রধানতঃ মার্কিন ইহুদিদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল যে, তাহারা যদি কাইজারকে অর্থ সাহায্য করা বন্ধ করিয়া সেই অর্থ ইংরাজকে দেয় ও বিশ্ব-ইহুদি (ওয়ালর্ড জিউয়ারী) অন্যান্য সাহায্য প্রদান করে, তবে যুদ্ধের পর ইহুদিদিগকে প্যালেস্টাইনে 'ন্যাশান্যাল হোম' নির্মাণ করিতে দেওয়া হইবে। ('ন্যাশান্যাল হোম' কথাটার বাঙলা আর করিলাম না, ইংরাজিতেই তাহার অর্থ কি, সে লইয়া বাগবিতণ্ডার অন্ত নাই। নিরক্ষর আরব ইংরাজীর এক বর্ণ বোঝে না, কিন্তু 'ন্যাশান্যাল হোম' যে 'ন্যাশান্যাল স্টেট' নয় সে কথা বুঝাইতে তাহার তৎপরতার অন্ত নাই। বারে বারে আরবী কথাতে শুধু চারিটি ইংরিজি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, 'ন্যাশান্যাল হোম' আর 'ন্যাশান্যাল স্টেট'। আমি যদি 'ন্যাশান্যাল হোমের' অনুবাদ 'জাতীয় ভবন' বা 'জাতীয় সদন' দিয়া করি, তবে ইহুদিরা আমাকে খুন করবে, আরবরা আমাকে খয়রাতি দিবে।)

যুদ্ধের পর যখন 'ন্যাশান্যাল হোমের' খবরটা বাহির হইল, তখন আরবরা হুঙ্কার দিয়া উঠিল। অতিকষ্টে তাহাদিগকে বুঝানো হইল যে, ঐ বস্তুটি অত্যন্ত নিরীহ ঢোঁড়া সাপ। জনকয়েক ইহুদি প্যালেস্টাইনে বসবাস করিবার জন্য আসিতেছে, বিস্তর পয়সা সঙ্গে আনিবে, নিজের খাইবে পরিবে, ধর্মচর্চা করিবে, 'কলচর' করিবে, আরবের আপত্তি করিবার কি আছে। ২৬ সেপ্টেম্বরে (৭৫) প্রকাশিত বাইৎসমান্ সাহেবের এই মর্মে বুলি যে, ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে 'জুইশ মেজরিটি' ও 'জুইশ স্টেট' চায়। সেকথা তখনকার দিনের ইংরাজ সরকার মানেন নাই—লেবার পার্টি লাস্কি প্রভৃতি ইহুদিদের প্রতাপে আজ মানেন।

সে যাহাই হউক, যুদ্ধাবসানে যখন এই সব আলোচনা হইতেছে, তখন হঠাৎ দেখা গেল যে, যে-সব ইংরাজ সৈন্য আরবদের সহায়তায়, লরেন্সের ধূর্তামিতে, জেরুজালেমে একটি বুলেটমাত্র খরচ না করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা সেখানে থাকিবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় ও অভিনব বস্তু। ১৯১৪ সালের

পূর্বে কোন রাজা গায়ের জোরে বা অন্য কোনো কায়দায় কোনো দেশ জয় করিলে সে-রাজা দুনিয়ার লোককে ডাকিয়া বলিতেন না যে, তোমরা সকলে আমাকে আশীর্বাদ করিয়া রাজ্যটি সোনার থালাতে করিয়া তুলিয়া দাও, আমি গ্রহণ করিয়া তোমাদিগকে কৃতার্থম্মন্য করিব। এ কায়দাটা আবিষ্কার করিলেন ইংরাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা। লীগ অব নেশনস গড়িয়া তামাম দুনিয়ার দেশপতিদের ডাকিয়া বলা হইল যে, তাহারা যেন ইংরাজকে রাজনৈতিক পূতজলে বাপ্তিস্ম করিয়া প্যালেস্টাইন, ইরাক, মিশরের 'মেনডেটরী' প্রভু বা 'অছি' নিযুক্ত করে। বিশ্বজন যেন স্বস্তিবচন ঝাড়িয়া বলে, তুমি ন্যায়তঃ ধর্মতঃ আইনতঃ দেশটা পাইলে। পৃথিবীর নৈতিক ইতিহাসের ক্রমবিকাশ লইয়া যাঁহারা নাডাচাড়া করেন, তাঁহারা যেন এই পর্যায়ে নূতন পরিচ্ছেদ পাডেন।

'অছি' কথাটি শুনিলে আমাদের মত প্রাচীনপন্থীদের 'ধর্মপিতা' সমাসটি মনে পড়ে। তুর্কী ভাষায় 'অছি' অর্থ জ্যেষ্ঠভ্রাতা। নাবালক শিশুর জন্য যখন অছি নিযুক্ত করা হয় তখন এই কথা অছিকে মানিয়া লইতে হয় যে, সে নিঃস্বার্থ-ভাবে শিশুর তত্ত্বাবধান করিবে। আইনকানুন ভালো জানি না, তবে শুনিয়াছি যে, অছি নিয়োগের পূর্বে দেখিতে হয় যে, ঐ শিশুর স্বার্থে যেন অছির লোভ না না থাকে—থাকিলে অছিত্ব রদ-বাতিল। 'লীগে'র কর্তারা সকায়দায় এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মৃত হইলেন। ইংরাজ তখন বলেন নাই। কিন্তু হালে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, প্যালেস্টাইন আইসাক্ পাক আর রহিম নিক, সেখানে ইংরাজ স্বার্থ বরাবর অচল-অটুট থাকিবে—সেখানে বিমানঘাঁটি, পণ্টন-গোয়াল থাকিবেই। লীগ-কর্তারা শুধু তম্বি করিয়া অছিদের বলিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর শাসিত দেশের কার্য-প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে। সে ব্যঙ্গ-নাট্যের কথা আরেক দিন স্মরণ করাইয়া দিবেন। আসল কথা, বিশেষ লম্ফমান প্রাণীকে ষোড়শোপচারে কদলীবৃক্ষের অছি নিযুক্ত করা হইল।

সেই অছিত্বের আওতায় তারপর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদি বুলবুলির পাল আসিয়া আরবের গমক্ষেতে পড়িল। কিন্তু ছেলে ঘুমাইল না, পাড়া জুড়াইল না। আরবরা এক হাতে ঠেকায় ইংরাজকে, আরেক হাতে মারে ইহুদিকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন ঠেকাইতে পারিল না। 'খাজনা দেব কিসে?' শ্মশান হইতে মশান হইতে ঝোড়ো হাওয়ায় হা হা করিয়া তখন উত্তর আসিল, 'আব্রু দিয়া, ইজ্জত দিয়া, ইমান দিয়া, বুকের রক্ত দিয়া।' (কর্তার ভূত, লিপিকা, রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু সে সমস্যা অর্থনৈতিক। বুলবুলিরা কি সঙ্গে কিছুই আনে নাই? তাহার আলোচনা আরেক দিন হইবে।

২

ইহুদিদের পক্ষে যাঁহারা যুক্তিতর্ক উপস্থিত করেন, তাঁহাদের প্রধান সাফাই এই যে, ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে আসিবার সময় প্রচুর অর্থ সঙ্গে আনিয়াছে ও এখনো মাসে মাসে সমস্ত পৃথিবীর ইহুদি ধনপতিরা সে দেশে টাকা পয়সা ও অন্যান্য নানা তৈজসপত্র পাঠাইতেছেন।

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু তলাইয়া দেখিবার মত। উপনিষদের ঋষি বলেন, 'হিরণ্ময় পাত্র মধ্যে সত্য লুকায়িত আছেন'। অধিকাংশ লোক সেই পাত্র দেখিয়াই আনন্দে আত্মহারা হয়, বলে না, 'হে পূষণ, পাত্রটি উন্মোচন করিয়া দেখাও ভিতরে কি আছে।'

শ্রীহট্ট বা উত্তর আসামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় দেখিবেন, দুই দিকে ঘন সবুজ টিলার গায়ে গায়ে সারি সারি, কাটাছাঁটা, সযত্নে বর্ধিত চায়ের গাছ। মাঝে মাঝে সরস সতেজ গোলমোহরের গাছ, শ্যামাঙ্গী কুলী মেয়েরা কাজ করিতেছে, দূরে ছবির মত সুন্দর কলকারখানা, ঝকঝকে তকতকে সায়েবদের বাঙলো, ক্লব হৌস, গলফ লিনকস্। এমন কি দূর হইতে কুলীদের ব্যারাকগুলি পর্যন্ত সুন্দর দেখায়।

ইংরাজ আমাদের চোখে আঙুল দিয়া বলে, 'দেখো, দেশের ধনদৌলত কি রকম বাড়াইয়াছি।'

ইহুদিরা যে অর্থ আনিল, তাহা দিয়া চাষের অনুপযুক্ত কোন কোন জলাভূমির জলকর্দম নিকাশ করিয়া সোনা ফলাইয়াছে। কিন্তু আসামের চা-বাগিচায় ও এই সব 'স্বর্ণভূমি'তে পার্থক্য এই যে, যদিবা আসামের চা-বাগানে কুলীরা এক বেলা খাইবার মত পয়সা রোজগার করিতে পারে, প্যালেস্টাইনের 'স্বর্ণভূমি'তে আরব চাষা-মজুরকে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। ট্রাক্টর পাঠাইয়াছে মার্কিন ইহুদিরা, চালাইতেছে জর্মন ইহুদিরা, ফসল কাটিতেছে পোল ইহুদিরা, বাজারে লইয়া যাইতেছে অস্ট্রিয়ান ইহুদিরা। আরব অপাংক্তেয়। কিন্তু তাহারা আপত্তি ওজর জানায় না, বলে, 'নিষ্কর্মা জমি যদি কাজে লাগাইতে পারো, তাহাতে আমার আপত্তি কি?'

কিন্তু মার খায় যখন ইহুদি সেই ফসল, সেই জাফা কমলালেবু বাজারে ছাড়ে। ইহুদি ক্ষেতখামার করিয়াছে, জাতভাই মার্কিন ধনপতিদের অফুরন্ত পয়সায়।

জায়োনিস্টদের চাপে ও কিছুটা স্বেচ্ছায় তাহারা আরো পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পুঁজি ঢালিতে প্রস্তুত। সে টাকার প্রতি প্যালেস্টাইনী ইহুদির বিশেষ দয়া-মায়া নাই—টাকাটা তো দিতেছেন গৌরী সেন। কাজেই ফসল নেবু বিক্রয় করিয়া যাহাই উঠে তাহাই তাহার লাভ। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যে জমি প্রস্তুত করা হইয়াছে, ফ্যাশেনবল ইহুদি মজুরকে বিস্তর অর্থ দিয়া যে ফসল ফলানো হইয়াছে, তাহা দিয়া লাভ করিতে হইলে বাজারের দর অপেক্ষা তাহার দর হইবে চারিগুণ, ছয়গুণ বেশী। সে দর তো ইহুদি কখনো পাইবে না, কাজেই বাজার দর অপেক্ষা আরো দুই পয়সা সস্তা করিয়া আরব চাষীকে ঘায়েল করিতে ক্ষতি কি?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে অর্থের অপব্যয়, কিন্তু দূরদৃষ্টি দ্বারা জায়োনিস্ট দল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, ইহাই প্রশস্ততম পন্থা। বাজারে যদি আরব চাষীকে ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর ফসল কম দরে বেচিয়া কাবু করা যায়, তবে সে আর জমি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে কয়দিন? পেট ভরিতে হইবে তো? বাবু যখন মনস্থির করিয়াছেন জমিটা লইবেনই, তখন উপেন ঘ্যান ঘ্যান করিয়া বাবুর পয়সা নষ্ট করেন ক্যান!

নিরুপায় হইয়া আরব জলের দরে ইহুদিকে জমি বেচিয়া আণ্ডাবাচ্চাসহ জেরুজালেম শহরে উপস্থিত হয়—দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত নরনারী যেমন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিল—ভাবে সেখানে গেলে রোজগারের ধান্দা জুটিবে। সেখানেও সেই অবস্থা। মার্কিন পুঁজির জোরে ইহুদি দোকানীরা আরব ব্যবসায়ীকে ঘায়েল করিতেছে আরো অল্পায়াসে, আরো কম খরচায়।

ইহুদিরা বলে, আরব চাষীরা জমি বেচে স্বেচ্ছায়, আপন খুশীতে, জমির বাজার দর কি তাহার তত্ত্ব-তাবাশ, তদ্বির-তদন্ত করিয়া। সত্যই তো আমরাও পাট বেচি স্বেচ্ছায় বাজার দর জানিয়া শুনিয়া, আমরাও ৩২-৩৩ সালে অধিকাংশ স্থলে ধান বেচিয়াছিলাম বহাল তবিয়তে খুশমর্জিতে। দুনিয়ার তাবৎ পাট আমাদের, তবু পাটের চাষী না খাইয়া মরে! ৩২-৩৩ সালে আঠারো আনা ফসল ফলাইয়াও চাষী না খাইয়া মরিল!

আরেক বিপদ, প্যালেস্টাইনে প্রজাস্বত্ব আইন নাই। আরব, তথা তুর্কী জমিদার মহাপ্রভুরা কাইরো, প্যারিসের বিলাস-বাসরের সর্দার। তালুকের পর তালুক বিক্রয় করিতেছেন পরমানন্দে, দুই পয়সা বেশী পাইয়া। যে জমিদার দেশে থাকে না, গরীব চাষার বেদনা সে বুঝিবে কি করিয়া, দরদ আসিবে কোথা হইতে? তারপর আরবদিগকে পুলিসের জোরে ভিটাজমি ছাড়া করা হয়, যে

মাটি তাহারা চাষ করিয়াছে বারো শত বৎসর ধরিয়া।

এতদ্দেশীয় সদাশয় সরকারও ব্যাপকভাবে এমন কর্মটি করেন নাই। তবু সাঁওতাল প্রজা-বিদ্রোহের করুণ কাহিনী যাঁহারা জানেন তাঁহাদের কাছে অবস্থাটা সরলই প্রতীয়মাণ হইবে।

তাই আরব লীগ, পিপলস্ পার্টি সকলেই একবাক্যে কাতর ক্রন্দন অনুনয়-বিনয় করিতেছে, আইন করা হউক ইহুদি যেন আরবের জমি কিনিতে না পারে। সর্বশেষে ভয় দেখাইয়াছে।

ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে এক অদ্ভুত অভিনব অর্থনৈতিক করদোঁ সানিতের (আরব ঠেকাইয়া রাখিবার বেড়া) সৃষ্টি করিয়াছে। আরব মজুরকে ডাকে নিতান্ত কালেভদ্রে, অত্যন্ত মুশকিলে পড়িলে, জিনিসপত্র কিনে ছয়গুণ মূল্যে জাতিভাইয়ের কাছ থেকে, বেচে আরবকে, আরবের হোটেলে যায় না, আরব কোম্পানীর বাসে চড়ে না, সমস্ত টেল আভিভ শহরে (প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীয় শহর) দশটি আরব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ বিদেশ হইতে যে লক্ষ লক্ষ পৌণ্ড ডলার মাসে মাসে অকৃপণভাবে প্যালেস্টাইনে ঢুকতেছে, সে অর্থ ইহুদিদিগের ভিতরই চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। যেটুকু বাহিরে যায়, সে আরবের জমি কিনিতে ও গলা-কাটা কারবারে আরবের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট করিতে। সেই টাকাটাও সূচ হইয়া ঢোকে, মুষল হইয়া বাহির হয়। আরবরা প্রায়ই ইহুদিদিগকে বলে, "বিদেশের পুঁজি না লইয়া আসো না একবার পাল্লা দিতে। আমরা যে রকম গরীব অবস্থায় সস্তায় কমলালেবু ফলাইতে পারি, তোমরা বাবুরা পারিবে? শুধু রুটি আর পেঁয়াজ খাইয়া কতদিন বাঁচবে?"

অথচ যে অজস্র অর্থ আসিতেছে তাহা দিয়া ব্যাপকভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান করিবার উপায় নাই—কাঁচা মালের অভাবে। ভারতবর্ষে কাঁচা মাল আছে, তাহার বহু পুঁজি লণ্ডন, নিউইয়র্কে পড়িয়া আছে, তবুও দুর্বোধ্য কারণে আমরা কারখানা-কারবার করিতে পারিতেছি না। ঠিক সেই দুর্বোধ্য কারণেই ইহুদিদিগকে প্যালেস্টাইনে ব্যাপকভাবে কলকারখানা করিতে যাহারা দিতে চায় না, মধ্যপ্রাচ্যে আজ তাহাদেরই প্রতাপ।

প্যালেস্টাইনে ধন বাড়িয়াছে, কিন্তু সে-ধন আরবের শ্যাম নহে, তাহার শূল।

বারান্তরে অন্যকার পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করিব।

নেটিভ স্টেট

স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে 'নেটিভ' শব্দটা ব্যবহার করিয়াছি, 'লেটিব' বলিলে আরো ভালো হইত। কারণ 'নেটিভ' বলিতে যাহা কিছু মন্দ, যাহা কিছু বীভৎস, যাহা কিছু পাশবিক ইঙ্গ-বঙ্গে বোঝায় ও বোঝানো উচিত তাহা বেশির ভাগ নেটিভ স্টেটে বর্তমান।

বাঙালীর উপর বিধাতার বহু অভিসম্পাত বর্ষিয়াছে; একমাত্র নেটিভ স্টেটরূপী গোদের উপর বিষফোঁড়া হইতে আমরা রক্ষা পাইয়াছি। যে দুইটি স্টেট আমরা চিনি তাহাদের সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধার প্রীতির বন্ধন আছে। কবিগুরুকে যখন বাংলাদেশও চিনিত না, তখন ত্রিপুরার মহারাজ বিশেষ দূত পাঠাইয়া কিশোর কবিকে জয়মাল্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন ও পরবর্তী যুগে তিনিও তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ শান্তিনিকেতন—ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীকে বহু প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, রাজপুত্র রাজপরিজন শান্তি-নিকেতনে কবিগুরুর পদপ্রান্তে শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও দেশে বিদেশে কবিকে সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

কুচবিহারও প্রাতঃস্মরণীয় কেশবচন্দ্রের আত্মীয়তা লাভ করিয়া কৌলীন্য-প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইদানীং কুচবিহারে যে গুণ্ডামি হইয়া গেল তাহা লইয়া দেশে আন্দোলন হইয়াছে ও হওয়া উচিত কিন্তু পশ্চিম ভারতে নিত্য নিত্য যে কাণ্ড হয় তাহা শুনিলে বাঙালীর চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে।

প্রথমতঃ কোনো নেটিভ স্টেটে কোনো প্রকার স্বায়ত্তশাসন নেই। কোনো কোনো অত্যন্ত "প্রগতিশীল' রাজ্যে 'ধারা' সভা থাকে। সে সভার প্রধান কর্ম রাজাকে সদুপদেশ দেওয়া। সে 'ধারাসভার' সভাপতি স্টেটের দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী। রাজা সাধারণতঃ স্টেটের বাহিরে দেশের কোনো বড় শহরে বা ইয়োরোপে বিলাস-ব্যসনে মগ্ন—আমাদের জমিদাররা যেরূপ কলিকাতায় নানা 'সৎ'কর্মে লিপ্ত থাকেন—প্রধানমন্ত্রী সর্বেসর্বা। তিনি সভাপতি। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহারই নিন্দা করিবার বুকের পাটা থাকে কয়জনের? রসিক-জনেরা তাই 'ধারাসভা'র নাম দিয়াছেন 'রাধা' সভা। রাধা যে রকম শাশুড়ী-ননদীর ভয়ে চোখের জল ফেলিতেও সাহস করিতেন না, ইঁহাদের সেই অবস্থা।

আমাদের জমিদারেরা যেরকম নায়েব-ডাকিনীর হাতে প্রজাপুত্র সমর্পণ করিয়া আরামে দূরে থাকেন, নেটিভ স্টেটেও তাই। শুধু নায়েবের অত্যাচারের সীমা আছে, কারণ হাজার হউক পুলিস আছে, ম্যাজিস্ট্রেট আছে। তাহাদিগকে

সব সময় রীতিমত 'ওয়েলিং' না করার ফলে মাঝে মাঝে কল বিগড়াইয়া যায়। নেটিফ স্টেটে সে ভয় নাই। পুলিস, ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ানের অতিভক্ত বাহন।

দেওয়ান যত বেশী টাকা তুলিতে পারেন, মহারাজ তত খুশী। তিনি দেশে বিদেশে যে ভূতের খর্পরে তেল ঢালিতেছেন সে ভূতের তৃষ্ণার শেষ নাই। দরিদ্র প্রজার রক্ত চুষিয়া, হাড় পিষিয়া, মেরুদণ্ড চূর্ণ করিয়া তৈল বাহির করিতেছেন দেওয়ান। আত্মীয়-স্বজন ইয়ার-বক্সী হুঙ্কার দিয়া বিদ্রোহীকে কাবু করিতেছেন; কণ্ট্রাক্টে, একচেটিয়া কারবারে অন্যান্য শত উপায়ে উদরপূর্তি করিতেছেন। সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজা সিংহের অংশ পাইতেছেন। যে দেওয়ান যত বেশী শোষণ করিতে পারে সেই তত 'কর্মদক্ষ'।

প্রজার নৈতিক চরিত্র যে তাহাতে কি পরিমাণ অধঃপাতে যায় বুঝানো অসম্ভব। যেখানে প্রভু স্বৈরাচারী, স্বাধিকারপ্রমত্ত সেখানে মানুষের বাঁচিবার উপায় কি থাকিতে পারে? একমাত্র পদলেহন ছাড়া তাহার অন্য কোনো পন্থা তো জানা নাই। বোম্বাই শহরে যদি দেখেন কেহ অতিরিক্ত বিনয় ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিতেছে তবে প্রশ্ন করিলে খুব সম্ভব জানিবেন যে, ভদ্রলোক নেটিভ স্টেটের লোক।

ধর্মসাক্ষী, আমরা কাহারো মনে আঘাত দিতে চাহি না কিন্তু সত্য নিরূপণে অপ্রিয় কথাও বলিতে হয়—আমরা নাচার।

আর যদি মহারাজা দেশে থাকেন তবে ব্যাপার আরও পেল্লাই। দেশী বিদেশী সায়েবসুবোতে সরকারী অতিথিশালা গম্‌গম করিতেছে। নর্তক আসিয়াছে, নর্তকী আসিয়াছে, বাঈজী আসিয়াছে, গণিকা আসিয়াছে। হাজার মুর্গী—বাড়াইয়া বলিতেছি না—হাজার মুর্গী কাটিয়া তাহারি নির্যাস দিয়া বিশেষ জুষ তৈয়ারী হইতেছে,—বহুতর ডাক্তার কবিরাজ হাকিম ডাকা হইয়াছে, তাহারা বহুতর ইনজেকসন-টনিক, অরিষ্ট-আসব-প্রাশ-মোদক, হালুয়াতরওগণ লইয়া উপস্থিত। বর্দোবার্গেন্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জাহাঙ্গীর-বাদশাহী ডবল ডেস্টিলড আরক, আফিঙ সব কিছু প্রস্তুত। সে কী বীভৎস শিবহীন দক্ষযজ্ঞ! দেশের অন্যান্য সরকারী কাজকর্ম বন্ধ। 'উদয়াস্ত' বলিব না, 'অস্তোদয়' দেওয়ান সাহেব প্রাসাদে চর্কীবাজীর মত তুর্কীনাচ নাচিতেছেন।

কোনো কোনো মহারাজা স্বরাজ্যে ফিরিলেই অরাজকতা আরম্ভ হয়। কলির কি বিচিত্র গতি! যে সব কাণ্ড তখন হয় তাহার বিবরণ খবরের কাগজে ছাপানো অসম্ভব। শুধু ডাক্তারী পুস্তকে তাহার বর্ণনা দেওয়া চলে। লজ্জাহীন উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব নৃত্য তখন যে কী চরমে উঠিতে পারে তাহার বর্ণনা 'সত্যপীর'

যতই সত্যপ্রিয় হউন না কেন দিতে অক্ষম। সদাশয় সরকার বাহাদুরের কাছে এ-সব কীর্তি অজানা নহে।

এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, কোনো কোনো স্টেটে সর্ব-সাকুল্য আয়ের অর্ধাপেক্ষা বেশী ব্যয় হয় 'মেহমানদারী খাতায়' অর্থাৎ এই সব ভূতের যজ্ঞে।

আমার একটি রাজপুত শিষ্যের বিবাহ উৎসবে আমাকে যাইতে হইয়াছিল ; যাহা দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম তাহা অবর্ণনীয়।

দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে অবশ্য এইসব অশ্লীলতার যোগ বিশেষ নাই। কিন্তু আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি সর্বদা মর্মাহত হইয়াছি। নেটিভ স্টেটের বালক-বালিকা ছাত্রছাত্রীদের দাস্যভাব।

এক অতি সম্ভ্রান্ত স্টেটে দেওয়ানের নাতি ইস্কুলের ছাত্র-মাস্টারের উপর ঠাকুরদাদার অপেক্ষাও কঠিন ডাণ্ডা চালাইত। মাস্টারদের ঘরের পাশে তাহার জন্য বিশেষ বসিবার জায়গা, সেইখানে সেই শাখামৃগ তাহার ইয়ার-বক্সীদের লইয়া অঙ্গদের রায়বার বসাইত। আর কী দাপট! হেডমাস্টারকে শাসায় ঠাকুরদাদাকে বলিয়া তাহাকে আন্দামান অর্থাৎ রাজধানী হইতে দূরে গণ্ডগ্রামে বদলি করাইবে। মাস্টার বৃদ্ধ—পেনসন-পেয়ালায় চুম্বন দিব-দিব করিতেছেন, ফস্কাইলেই সর্বনাশ। সব কিছু নীরবে সহিয়া যাইতেন।

ইস্কুল হইতে ছেলেমেয়ে বাছাই করিয়া রাজবাড়িতে রাজপুত্র রাজকন্যাগণের সঙ্গে পড়িবার জন্য লইয়া যাওয়ার রীতি কোনো কোনো স্টেটে আছে।

রাজা বিদেশে, কাজেই সে ইস্কুলের বড়া শয়তান যুবরাজের সেখানে সপত্নহীন রাজত্ব। কারণ রাজা ছাড়া যুবরাজকে তম্বী কে করিতে পারে? আর সকলেই দিন গুনিতেছেন, যুবরাজ কবে রাজা হইয়া তাহাদিগকে বড় বড় তঙ্কার নোকরি দিবেন। কাজেই যুবরাজের শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না, অন্য ছেলেমেয়েদের কি সাহস যে, যে-পাঠ যুবরাজ পড়িতে পারেন না তাহা তাহারা পড়িতে পারার দম্ভ করিবে। বাপ-মা ছেলেদের বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন যেন তাহারা ঐ সব লেখা-পড়ার মত অবান্তর বাহ্যবস্তুর প্রতি মনোযোগ না করে—সারবস্তু, যেন যুবরাজকে খুশী রাখা হয়। তিনি বড় হইয়া তাহাদের প্রতি নেকনজর দিলে তাহাদের তখন ভূগোল ইতিহাসের কি প্রয়োজন? আর লেখাপড়ায় ফপরদালালি করিয়া যদি এখন তাঁহাকে চটায় তবে পরে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে কোন্ জ্যামিতি কোন্ ব্যাকরণ? স্মরণ তো রাখিতে হইবে এযুগে চাণক্য প্রবচনের প্রথমার্ধ 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা' খাটে কিন্তু 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' আর খাটে না।

যুবরাজ বড় হইলে এই সব অকাল-কুষ্মাণ্ডেরা উজীর নাজীর কোটাল হয়।

তাহাদের না আছে শিক্ষা, না আছে শীল। কুলীনের যে নবধা কুললক্ষণ, সে সব তাবৎ কয়টির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি যদি কোনো ব্যক্তিতে পান, তবে বুঝিবেন, তিনি 'নেটিভ' স্টেটের রাজার বাঁদর-নাচের পুচ্ছহীন মর্কট, অর্থাৎ সেখানকার হোমরা-চোমরা অথবা বড় কর্মচারী।

কোনো কোনো খবরের কাগজে দেখিলাম, নেটিভ স্টেটগুলিকে মধ্য-যুগের সামন্ত রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে। তাহাতে মধ্যযুগের সামন্ত রাজ্যের প্রজাদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। আমি পশ্চিম ভারতের যেটুকু ইতিহাস পড়িয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি যে, মধ্যযুগে কোনো রাজা কাণ্ডজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খল-তায় মত্ত হইলে প্রজা বিদ্রোহী হইয়া রাজাকে তাড়াইয়াছে, অথবা অন্য সামন্ত রাজা প্রজাদের অসন্তোষের খবর পাইয়া সে রাজ্য আক্রমণ করিয়া নিজ রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন অথবা দিগ্বিজয়ী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। এখন প্রজা-বিদ্রোহেরও উপায় নাই। নানা রকম ট্রিটির জোরে মহারাজ বহিঃশক্তি আহ্বান করিয়া দুই মিনিটেই সব বিদ্রোহ ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারেন। প্রজারা কর্মে মগ্ন বলদের মত একদিকে খায় রাজার মার, অন্যদিকে খায় 'ট্রিটি'র মার।

তবু মাঝে মাঝে যখন অত্যাচার অসহ্য হয় তখন অনেক সুবিধাবাদী মকুবির জয়জয়কার আরম্ভ হয়। তাহারই একজনের সঙ্গে আমার বোম্বায়ে আলাপ হয়। তাঁহার পেশা নাকি জর্নালিজম। শুধাইলাম, 'মহাশয় কোন্ কাগজে লেখেন?' বলিলেন, 'আজ্ঞে, কোনো কাগজেই লিখি না, না লিখিয়া পয়সা কামাই।' আমি বলিলাম, 'সে কি মহাশয়, কালিদাসের 'নাই তাই খাচ্ছ' ব্যাপার নাকি?' বলিলেন, 'অনেকটা তাই; নেটিভ স্টেটে ফ্রেস কেলেঙ্কারির খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে উপস্থিত হইয়া নানা তদ্বির-তদন্ত করিয়া রাজা বা দেওয়ানের বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করি। তারপর দেওয়ানকে বলি, 'কত ওগরাবে কও।' দেওয়ান বেশ টু পাইস দেয়—অবশ্য অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা। তাই আর কেচ্ছাটা লেখার প্রয়োজন হয় না। আর লিখিয়াই বা হইবে কি? ফি কলম কুড়ি টাকা তো? তাহাতে আমার এক সন্ধ্যার ইয়ের খরচটাই উঠিবে না।' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিন্তু যাহাদের নানা ভরসা দিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিলেন, সে প্রমাণ দেওয়ানকে যে সমঝাইয়া দিলেন, তাহাদের কি?' পাষণ্ড কি বলিল জানেন? 'আণ্ডা না ভাঙিয়া কি আর মামলেট হয়!'

কোনো কোনো নেটিভ স্টেটে প্রজামণ্ডল আছে,—শুনিলাম কুচবিহারে নাই। প্রজামণ্ডল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া স্টেটের প্রজাবর্গের উন্নতির চেষ্টা করেন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন, 'ধারা সভায়' প্রবেশ করেন ও ব্রিটিশ

ভারতে ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইলে যোগদান করেন। লক্ষ্য করিয়াছি, যে স্টেটে অবিচার কম সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেওয়া আন্দোলনে জোশ কম থাকে। ব্রিটিশ ভারতে আমরা বিদেশী রাজের বিরুদ্ধে যে জোর পাই, ভালো স্টেটে প্রজারা সে জোর পাইবে কোথা হইতে? মন্দ স্টেটে আন্দোলন ভালো চলে, কারণ রাজা বা দেওয়ান তখন বিদেশী শাসনের প্রতীক হইয়া দাঁড়ান।

পশ্চিম ভারতের কংগ্রেস কর্মীরা প্রজামণ্ডলগুলির সঙ্গে সর্বদা যোগসূত্র রক্ষা করেন। পূর্ব ভারতে আমাদের অন্ততঃ খবর রাখা উচিত—না হইলে অখণ্ড সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের প্রতি রাজনৈতিক সিংহাবলোকন চক্রবালে পরিব্যাপ্ত হয় না।

কোনো কোনো স্টেটে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানও আছেন; কর্মীরা মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করিবার প্রয়াস করেন। খুব দরকার হয় না, কারণ দেশী স্টেটে হিন্দু-মুসলমানের দলাদলি কম।

এই একটিমাত্র গুণ দেশী রাজ্যে আছে। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সেখানে হয় না। কারণ হিন্দু-মুসলমানকে লড়াইয়া সেখানে রাজার কোনো ফায়দা নাই। কোনো কোনো স্টেটে হিন্দু-মুসলমানের হৃদ্যতা দেখিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ লইয়া মনে মনে সুখস্বর্গ গড়িয়াছি।

উত্তম রাজা যে দেশী রাজ্যে কুত্রাচ নাই, এমন নহে। বরদার ভূতপূর্ব মহারাজ স্বর্গীয় সয়াজী রাওয়ের মত প্রজাপালক দেশে-বিদেশে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। কিন্তু তিনিও তো বাল্যকাল কাটাইয়াছিলেন রাখাল ছেলেদের সঙ্গে। তিনি রাজা ছিলেন, কিন্তু কখনও যুবরাজ ছিলেন না—দত্তক পুত্ররূপে রাজা হন। দুই-একটি জনপ্রিয় রাজা যদি বা স্টেটে জন্মান তবু তাঁহাদের জন্য নেটিভ স্টেট রূপ জঞ্জাল রাখিবার প্রয়োজন নাই।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাধীন ভারতে দেশী রাজ্যের স্থান নাই।

ধবলদন্ত

'জজিক জাহাজে সেদিন ভারতীয়দের প্রতি যে অদ্ভুত ব্যবহার করা হইল তাহা ধবলদন্তের, স্বাধিকার প্রমত্ততার বিকৃত রূপ। এই সম্পর্কে আমার আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। সে অনেক দিনের কথা; কিন্তু বহু ভারতীয় বিদেশে যান, ঘটনাটি মনে রাখিলে তাঁহারা উপকৃত হইবেন।

১৯২৮ সালের প্রচণ্ড শীত কাবুলে প্রচণ্ডতর হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় আমানউল্লা বাচ্চা-ই-সকাওর হস্তে পরাজিত হইয়া রাতারাতি কাবুল ত্যাগ করিয়া কান্দাহার চলিয়া যান। বাচ্চা তখনও শহরে প্রবেশ করেন নাই। সেখানে তখন নির্মম বীভৎস অরাজকতা চলিয়াছে। রাজা নাই; পুলিস, মিলিটারি প্রাণরক্ষার্থে উর্দি ছাড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছে। শহরে রাস্তায় রাস্তায় প্রকাশ্য লুটতরাজ, খুন-খারাবী চলিয়াছে। বাচ্চার অগ্রগামী সৈন্যরাই প্রধান দস্যু, তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ অত্যাচার রুদ্ধ করিবার মত কোন প্রতিষ্ঠান তখন কাবুলে ছিল না।

দোকান-পাট বন্ধ। রাস্তায় বাহির হইবার উপায় নাই। ওভারকোটের লোভে যে কোনো দস্যু আপনাকে গুলি করিতে প্রস্তুত। চাহিলে পর দিলে গুলি করার রেওয়াজ আফগান দস্যুদের মধ্যে প্রচলিত নাই।

খাস কাবুলীরা এরকম বিদ্রোহ ও লুটতরাজ ব্যাপারে অভ্যস্ত। বিশৃঙ্খলতার গন্ধ পাইবা মাত্রই তাহারা বছর দুইয়ের খোরাক বাড়ীতে যোগাড় করিয়া রাখে। বিপদে পড়িলেন বিদেশী অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা। ইঁহারা সকলেই কাবুলে নবাগত—কাবুলী কায়দা জানেন না। আহারাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। পক্ষাধিককাল যাইতে না যাইতেই তাঁহাদের নিরম্বু একাদশী আরম্ভ হইল—কারণ কলের জল পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাচ্চা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথম 'সৎকর্ম' করিলেন—অধ্যাপক শিক্ষকদের বরখাস্ত করিয়া। প্রাপ্য বেতনও তাঁহাদিগে দেওয়া হইল না। সে-যুগে কাবুলে কোনো ব্যাঙ্ক ছিল না বলিয়া অধ্যাপক-শিক্ষকেরা সঞ্চিত অর্থ পেশাওয়ার বা লাহোরের ব্যাঙ্কে রাখিতেন। তাঁহারা তখন কপর্দকহীন; সে দুর্দিনে ধারই বা দিবে কে? কাবুলের সঙ্গে তখন বহির্জগতের কোনো যোগাযোগ নাই।

পরিস্থিতি আলোচনা করিবার জন্য ফরাসী, জর্মন ও ভারতীয় শিক্ষকেরা একত্র হইয়া জিরগা করিলেন। তখন প্রথম অসুবিধা হইল ভাষা লইয়া। সকলে জানেন এমন কোনো ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সে সভায় মাত্র একজন বাঙালী ছিলেন। তিনি ফারসী ফরাসী জর্মন তিনটি ভাষাই জানিতেন বলিয়া তাঁহাকেই সভাপতি করা হইল। সভায় স্থির হইল যে, যেহেতু অধ্যাপকেরাই সর্বাধিক বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য যদি সদাশয় ব্রিটিশ লিগেশন কোনো উপায় অনুসন্ধান করিয়া দেন, তবে তাঁহারা কৃতার্থম্মন্য হইবেন। এই মর্মে ডেপুটেশন পাঠানো স্থির হইল।

লিগেশন হইতে উত্তর আসিল ফরাসী-জর্মনরা যেন স্ব স্ব লিগেশনের দৌত্যে

নিজ নিজ অসুবিধা পেশ করেন। ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করিতে লিগেশন-কর্তা হিজ এক্সেলেন্সি লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্নেল শ্রীযুক্ত সর ফ্রান্সিস হমফ্রিস রাজী আছেন।

ইতোমধ্যে সর ফ্রান্সিস বাচ্চার সঙ্গে আলাপ করিয়া পেশাওয়ার হইতে কাবুলে রোজ একখানা, দুইখানা হাওয়াই জাহাজ আনাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ফরাসী জর্মন ইতালিয়দের সেই জাহাজগুলিতে করিয়া ভারতে পাঠানো আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

ডেপুটেশন নিবেদন করিল যে, ভারতীয় শিক্ষকেরা উপবাসে প্রায় মরিবার উপক্রম। ভারতে যাইবার অন্য সব পন্থা যখন রুদ্ধ তখন সায়েব যদি তাহাদিগকে হিন্দুস্থান পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সায়েব বলিলেন, "দেখুন কাবুলের ব্রিটিশ লিগেশন লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ সরকারের সিন জেমস (অথবা ঐ জাতীয় অন্য কিছু বিজাতীয়) কোর্টের মুখপাত্র (Representative)। ভারতীয়েরা হকের জোরে (as a matter of right) আমাদিগের নিকট হইতে কোনো সাহায্য দাবী করিতে পারেন না। মেহেরবানি-রূপে (as a matter of favour) চাহিতে পারেন।"

ডেপুটেশনের বাঙালী মুখপাত্রটি বলিলেন, "সে কি কথা সায়েব, এই যে হাওয়াই জাহাজ আসিতেছে সেগুলি তো ইণ্ডিয়ান আর্মির পয়সায় কেনা, পাইলট মেকানিক ভারতীয় তনখা খায়, যে জায়গায় গিয়া জাহাজখানা লইবে সেও তো ভারতের জমি।" "তুমি আবার পরের ধনে পোদ্দারী না হউক, পরের জাহাজে কাপ্তেনী কেন করিতেছ!" অবশ্য একথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই।

চোর বরঞ্চ ধর্মের কাহিনী শোনে—না হইলে বাল্মীকি উদ্ধার পাইতেন না—কিন্তু ধবলদন্ত হস্বড়াঙ্গীর দ্বিরদরদস্তম্ভে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। বাঙালীটি তখন লক্ষ্য করিলেন যে, ডেপুটেশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "সায়েব, এই যে হক্ আর মেহেরবানি লইয়া কথা বলিলাম, তাহা নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত মতামত। এখন জীবনমরণ সমস্যা। ডেপুটেশনের অন্যান্য সদস্যগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করুন।" সদস্যগণ একবাক্যে সায় দিলেন যে, হক্ মেহেরবানি লইয়া কথা-কাটাকাটি করা বাতুলতা। আত্মানাং সততং রক্ষেদ্ দারৈরপি ধনৈরপি।

বাঙালীটি বলিলেন, "বিলক্ষণ, কিন্তু সায়েব, আমি ভারতে, স্বদেশে মেহেরবানিরূপে যাইব না, যদি যাই, যাইব হক্কের জোরে। বন্ধুগণ, নমস্কার, সায়েব, সেলাম।"

সন্ধ্যাকালেই ভদ্রলোক খবর পাইলেন যে, তাঁহার নাম ভারত প্রত্যাগমন-কামীদের নির্ঘণ্ট হইতে নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খবরটি দিলেন ভদ্র-লোকটির বন্ধু, ব্রিটিশ লিগেশনের অরিয়েন্টল সেক্রেটারী, খান বাহাদুর শেখ মহবুব আলী খান, বন্ধুভাবে, সরকারী খবর হিসাবে নয়। তারপর সেই সব জাহাজে করিয়া ফরাসী গেল, জর্মন গেল, ইতালিয় গেল, তুর্ক গেল, ইরানি গেল, ব্রিটিশ লিগেশনের মেয়েরা গেলেন। তারপর সর্বশেষে ভারতীয় মেয়েদের খোঁজ পড়িল। তাঁহাদের অনেকেই পুরুষ অভিভাবক ছাড়া হাওয়াই জাহাজে চড়িয়া পেশোয়ার যাইবার হিম্মৎ পান না—কেহ কেহ গেলেন, কেহ কেহ রহিলেন। ভদ্রলোকটি রীতিমত জোর-জবরদস্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথের শিষ্য, (পরে) শান্তি-নিকেতনের অধ্যাপক, স্বর্গীয় মৌলানা জিয়াউদ্দিনের স্ত্রীকে হাওয়াই জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিলেন। তারপর অতি সর্বশেষে ভারতীয় পুরুষদের পালা আসিল। কিন্তু ভদ্রলোকটির নামে তো ঢেরা পড়িয়াছে; তিনি পেটে কিল মারিয়া কাবুলের মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে ভারতবর্ষে ভদ্রলোকের পিতা পুত্রের কোনো খবর না পাইয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন ও টেলিগ্রাফ আফিসে থানা বাঁধিয়াছেন। দিল্লী সিমলা যেখানে যাহাকে চিনিতেন, অহরহ তার করিতেছেন, আমার পুত্রের কি খবর! আসামের বর্তমান রাজস্বসচিব (?) মৌলবী আবদুল মতীন চৌধুরীও এক-খানা তার পাইলেন। সেইদিনই সর ডেনিস ব্রের সঙ্গে তাঁহার দেখা। ভোট সংক্রান্ত কি একটা ব্যাপারে সর ডেনিস মতীন সাহেবের কাছে যান। তিনি বলিলেন, "তোমরা যে কাগজে ছাপাইতেছ ভারতীয়দের আনা হইতেছে, অমুকের খবর কি?"

সর ডেনিস কাবুলে বেতার পাঠাইলেন সর ফ্রান্সিসকে, "অমুককে তার-পাঠ পাঠাও।" সাইমন কমিশন তখন আসিব-আসিব করিতেছে অথবা আসিয়াছে। সর ডেনিস সেনট্রাল এসেমব্লির সদস্যকে সস্তায় খুশ করিতে কেন নারাজ হইবেন। কোনো ভারতীয়কে বাঁচাইবার জন্য ঐ একটিমাত্র বেতার সেই সময় ভারতবর্ষ হইতে কাবুল যায়। পেশাওয়ার সরকার ও কাবুলের ব্রিটিশ লিগেশনে বেতার চলিত, বলা বাহুল্য যে, সে-বেতারের সুবিধা ভারতীয়দের দেওয়া হয় নাই। কাবুলে বসিয়া ভদ্রলোক অবশ্য এসব খবর পান নাই।

সে-বেতার লিগেশনে কি অলৌকিক কাণ্ড বা তিলিসমাত করিল তাহা স্থানা-ভাবে বাদ দিলাম। পরদিন ভদ্রলোক খবর পাইলেন, তাঁহার জন্য আগামী-কল্যের হাওয়াই জাহাজে একটি স্থান রিজার্ভ করা হইয়াছে। 'কেবার' না

'রাইট' তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আর হইল না।

সর্বস্ব কাবুল দস্যুদের জিম্মায় ফেলিয়া মাত্র দশ সের (অথবা পৌণ্ড) লগেজ লইয়া ভদ্রলোক হাওয়াই জাহাজে করিয়া পেশাওয়ার ফিরিলেন। বিমান-ঘাঁটিতে সর ফ্রান্সিস করমর্দন করিয়া বলিলেন, "আমরা ভারতীয়দের যথাসাধ্য সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি, আশা করি, আপনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া সব কথা বলিবেন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "নিশ্চয়ই সব কথাই বলিব।" দেশে ফিরিয়া তিনি জমিয়ত-উল-উলেমার নেতা মৌলানা হুসেন আহমদ মদনীকে আদ্যোপান্ত বলেন। আন্দোলনও হইয়াছিল কিন্তু কোনো ফল হয় নাই। লিগেশন-কর্তা প্রমোশন পাইয়া ইরাক না কোথায় চলিয়া গেলেন।

বর্ণনা শেষ করিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, কিন্তু আমার চরম শিক্ষা হইয়া গেল। কাবুল গিয়াছিলাম টাকা রোজগার করিয়া ইউরোপে পড়িতে যাইবার জন্য। কোন্ দেশে যাইব বহুদিন মনস্থির করিতে পারি নাই। এই ঘটনার পর নির্দ্বন্দ্ব মনে ইংলণ্ড বর্জন করিলাম। পড়িতে গেলাম অন্য দেশে—ও ফরাসী জাহাজে।

চতুরঙ্গ

পূব বাংলা যখন পাকিস্তানের অংশরূপে "স্বাধীন" হল তখন ঐ অঞ্চলের লোক সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারেন নি, তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি কৃষ্টি গবেষণা কোন্ পথে চলবে। "অখণ্ড পাকিস্তান" নির্মাণের সহায়তা করার জন্য তাঁরা উর্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন, না, যে বাংলা ঐতিহ্য উভয় বাংলা অনুকরণ করছে সেই পন্থা অবলম্বন করবেন? একটু সময় লাগলো।

(১) ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকার "বর্ধমান হাউসে"—"বাংলা অ্যাকাডেমি"। কিছুদিন পরেই তাঁদের প্রথম ত্রৈমাসিক বেরলো। দুই বাংলাতে তখনও পুস্তকাদি অনায়াসে গমনাগমন করতো। প্রথম সংখ্যা এ-বাংলায় পৌঁছনো মাত্রই তার আলোচনা "দেশ" পত্রিকায় বেরোয়। এ-বাংলা তাকে সানন্দ অভিনন্দন জানায়। আজ যদি দুষ্টজন বলে, পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিকরা "বাংলাদেশের" লোকজনকে অখণ্ড পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য যাবতীয় কারসাজি করছে, তবে অকুণ্ঠ ভাষায় বলবো,—যখন আমরা "দেশ" মারফৎ ঐ ত্রৈমাসিককে স্বাগত জানাই তখন আমাদের ভিতর কেউই রাজনৈতিক ছিলেন না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার তাঁদের পেটুয়া কিছু কিছু বাঙালী মোল্লা মুন্সীকে অ্যাকাডেমিতে ছলে-

বলে ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন, "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু বাংলা ভাষায় ইসলামের উত্তম উত্তম আরবী ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ নেই। অতএব আমাদের প্রথম কর্ম কুরান-শরীফের বাংলা অনুবাদ করা।" সভাপতি বললেন, "সে কি? আমারই জানা-মতে অন্তত পাঁচখানা বাঙলা অনুবাদ রয়েছে।" মোল্লারা: "তা হলে হদীসের (কুরানশরীফের পরেই হদীস আসে) অনুবাদ করা যাক।" আসলে মোল্লারা চান ঐ মোকায় বেশ দু পয়সা কামাতে। আর এদিকে বেচারী অ্যাকাডেমি সবে জন্ম নিয়েছে। অজাতশত্রু হতে চায়। স্বীকার করে নিল। সে কর্ম এখনও সমাপ্ত হয় নি। কারণ সমাপ্ত হলেই তো কড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। (এ টেক্‌নিক আমাদের এ দেশের ডাঙর ডাঙর আপিসাররাও জানেন।) বাঙলা অ্যাকাডেমির চেয়ারম্যান আমাকে বললেন, "এ যাবৎ তেনারা আশি হাজার টাকা গ্যাঁটস্থ করেছেন।" এই মোল্লাদের অনেকেই এখন খানকে সাহায্য করছেন —মীরজাফররূপে।

(২) কেন্দ্র বাংলা উন্নয়ন বোর্ড।

আপনারা বাঙালদের যত মূর্খ ভাবেন তারা অতখানি মূর্খ নয়। তারা তখন অন্য প্যাঁচ কষলে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানালে, "আমাদের পাঠশালা ইস্কুলে যে-সব টেকস্‌ট বই পড়ানো হচ্ছে সেগুলো বড়ই "অনৈসলামিক ভাবাপন্ন"। অতএব সেগুলো নাকচ করে দিয়ে নয়া নয়া কেতাব লেখা হোক।" গাড়োল রাওলপিণ্ডী সে ফাঁদে পা দিল। তখন সৃষ্ট হল "কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড।" কিন্তু ইয়া আল্লা ইয়া রসুল। কোথায় না তারা প্রস্তাবিত কর্মে লিপ্ত হবে, না তারা লেগে গেল বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পরিপূর্ণ পদ্য-গদ্য রচনা সম্পূর্ণাকারে প্রকাশ করতে। আমার মনে হয়, তখনই তারা ভিতরে ভিতরে আপন অজান্তে জেনে গেছে, ঝঞ্ঝা আসন্ন, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে একটা দফারফা করতেই হবে। অতএব বিদ্রোহী কবি কাজীই আমাদের ভরসা। কী সুন্দর তিন ভল্যুম এযাবৎ বেরিয়েছে। যিনি সম্পাদনা করেছেন তাঁর নাম বলবো না। পাছে না টিক্কা খানের লোক তাকে গুলি করে মারে। (টিক্কা অর্থ "টুকরো"— ফারসীতে বলে "টিক্কা টিক্কা মী কুনস্"—"তোকে টুকরো টুকরো করবো"। আমরা যে রকম "তিনকড়ি", "এককড়ি", "ফকীর" "নফর" নাম দিই যাতে করে যম তাকে না নেয়।)

(৩) এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ ঈস্ট্ পাকিস্তান স্থাপিত হল। (ঠিক কি নাম বলতে পারছিনে।) এতেও পশ্চিম পাকের খানরা চটে গেলেন। কারণ বাঙালরা তখন বগুড়ার মহাস্থান গড়, কুমিল্লার ময়নামতী-লালমাই (এই

ময়নামতী অঞ্চলেই এখন লড়াই চলছে)—যে সব স্থলে বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত ছিল, যে সবের বর্ণনা চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সং দিয়েছেন, সেই নিয়ে তারা লেকচর দিচ্ছে, সেমিনার করছে। "তোবা, তোবা"!

(৪) এবং এসবের বহু পূর্বেই আবদুল হাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ও সংস্কৃতির প্রধানতম অধ্যাপক, তাঁর সাংস্কৃতিক ত্রৈমাসিক বের করে যাচ্ছেন। এবং তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর ঐ পত্রিকায় আমাদের পশ্চিম বাংলার হরেন পাল মহাশয়ের অভিধান।

এই চতুরঙ্গে বাঙলা দেশ তার আপন পথে এগিয়ে যাচ্ছিল রাজনীতিকে উপেক্ষা করে। এমন সময় ইয়াহিয়া খান মারলেন ঐ প্রগতির উপর থাপ্পড়। এর উত্তরে আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি।

"রাহুর দম্ভ, রাহুর মতো,
একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে
সে এক-গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে
মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও
রয় না কোন ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা,
নতুন রাহু ভাবে
তবু হবে না মোর বেলা।
কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী
ফুকরে ওঠে ভয়ে,
অনন্তদেব শান্ত থাকেন
ক্ষণিক অপচয়ে।"

হ য ব র ল

১

তথাকথিত পণ্ডিতেরা বলেন, "আসাম দেশ অসমান বলিয়া ইহার নাম আসাম।" অথচ আদি বাসিন্দাদের নাম 'অহম'। ইহাদের নামেই দেশের নাম হওয়া উচিত 'অহম' দেশ। প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, 'আসাম' হইতে 'অহম' হয় নাই,

'অহম' হইতে 'আসাম' হইয়াছে। ফোক্ ফিললজিস্ট অর্থাৎ গাঁওবুড়ো শব্দ-তাত্ত্বিক মনে মনে তর্ক করিয়াছেন যে, যেহেতু শুদ্ধ বাঙলার 'সেপার' পূর্ববঙ্গে 'হেপার', 'সাগর' 'হাওর', 'সরিষা' 'হইরা' হয়, অতএব উল্টা হিসাবও চলে—অর্থাৎ 'স' যখন 'হ' হইতে পারে তখন 'হ'-ও 'স' হইতে পারে। এই নীতি চালাইলে যে 'হাসানো' আর 'শাসানো' একই ক্রিয়া হইয়া দাঁড়ায়, গাঁওবুড়োরা তাহা খেয়াল করিলেন না। স্থির করিলেন 'অহম'ই 'অসম'; তারপর 'অসম' হইতে 'আসাম' হইল। তখন তথাকথিত পণ্ডিতেরা আসিয়া সমাধান করিলেন, "এই দেশ অসমান বলিয়া ইহার নাম আসাম।"

গাঁওবুড়াদের মূর্খ বলিলে আমাদের অন্যায় হইবে। 'উল্টাপুরাণ' যে সর্বত্র চলে না—এ জ্ঞান এখনও বহু নাগরিকের হয় নাই। 'সায়েবরা হ্যাটকোট পরেন' অতএব 'হ্যাটকোট পরিলেই সায়েব হইয়া যাইব' 'গায়িকা সুন্দরী কাননবালা লম্বা হাতা জামা পরেন' অতএব 'লম্বা হাতা জামা পরিলে গায়িকা ও সুন্দরী হওয়া যায়' এই ভুলযুক্তিজনিত আচার তো হাটে-ঘাটে ট্রামে-বাসে সর্বত্র দেখা যায়।

* * *

এই আসাম হইতে প্রত্যাগত এক বন্ধু বলিলেন যে, এতদিন আসামে যে তিন দলে রাজনৈতিক রেষারেষি চলিত তাহার সঙ্গে এখন চতুর্থ দল আসিয়া জুটিয়াছে। এই তিন দলের প্রথম দল 'আসামী' বা 'অসমিয়া' (উচ্চারণ 'অহমিয়া'); ইহারা আসামী ভাষায় কথাবার্তা বলেন। আসামী ভাষা ও বাংলায় পার্থক্য ওড়িয়া বাঙলা অপেক্ষাও কম; আসামীদের গাত্রে আর্য ও অহম রক্তের সংমিশ্রণ, যেরকম বাঙালীর ধমনীতে আর্য ও মঙ্গোল-দ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ। দ্বিতীয় দল শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়ার অধিবাসী বাঙালী। ইঁহারা মূলতঃ বাংলা দেশেরই লোক, ইঁহাদের বাসভূমি বাঙলাদেশ হইতে কর্তন করিয়া আসামে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইঁহাদের অনেকেই চাহেন যে, ঐ সব জিলাগুলি যেন পুনর্বার বাঙলাদেশে ফিরাইয়া লওয়া হয়। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ 'অহম'। ইঁহারা আসামের আদিম বাসিন্দা, ইঁহাদের অনেকেই আর্যরক্ত দ্বারা 'অশুদ্ধ' বা 'শুদ্ধ'—যাহাই বলুন—না হইয়া আপন আভিজাত্য রক্ষা করিয়াছেন। চতুর্থ দল নূতন আসিয়া জায়গা চাহিতেছেন, ইঁহারা গারো, লুসাই, কুকী নাগা, আবর মিশমি ইত্যাদি পার্বত্য জাতি। ইঁহারা আসামের আদিমতম বাসিন্দা এবং আসামের রাজনৈতিক যজ্ঞশালায় ইঁহারা এতদিন অপাংক্তেয় ছিলেন।

* * *

যতদূর মনে পড়িতেছে ১৮৩২ সালে কাছাড় লর্ড বেনটিঙ্কের সময় ইংরাজ কর্তৃক অধিকৃত হয়। তাহার পর একশত বৎসর কাটিয়াছে। ধীরে ধীরে ইংরাজ গারো, লুসাই, নাগা অঞ্চলে আপন ডেরা ফেলিয়া ফেলিয়া দখল বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ইহাদের জন্য ইংরাজ সরকার কি উপকার করিয়াছেন তাহার ইতিহাস লিখিবার সময় আজও হয় নাই। মোগল পাঠানরা ইহাদের রাজত্ব দখল করেন নাই, ইহাদের প্রতি কোন দায়িত্ব তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু ইংরাজ সরকারকে একদিন উভয়ার্থে 'আসামী' ঐতিহাসিক গবেষণার কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিতে হইবে।

মধ্য আফ্রিকার বনেজঙ্গলে হস্তিদন্ত-ব্যবসায়ী মুসলমান ইসলাম প্রচার করেন, বেতনভোগী ইউরোপীয় মিশনরীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। নিগ্রো মুসলমানদের কথা আজ থাক, কিন্তু খ্রীষ্টান নিগ্রোদের কি অবস্থা হইয়াছে তাহা বার্নার্ড শ'র 'কৃষ্ণার ব্রহ্মান্বেষণ' পুস্তকে পাইবেন। অসভ্য সুরা-অনভ্যস্ত জনগণের ভিতর মদ্য চালাইলে কি নিদারুণ কুফল হয় ও সেই সুযোগ লইয়া বিবেকধর্মহীন পুঁজিপতিরা তাহাদের কি অনিষ্ট না করে, তাহা আঁদ্রে জিদের 'বেলজিয়স কঙ্গো' পুস্তকে পাঠক পাইবেন। ও অন্যান্য নিরপেক্ষ লেখকের অধুনা-খ্যাতিপ্রাপ্ত ফরাসী ডাকার অঞ্চলের বর্ণনায় পাইবেন।

* * *

খ্রীষ্টান মিশনরীরা লুসাই, গারো, খাসিয়া ও নাগা অঞ্চলে প্রবেশ করেন। সরকারের কতটা সাহায্য পান ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমান করি ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যত্র মিশনরীরা সচরাচর যে সাহায্য লাভ করেন, তাহাই পাইয়াছিলেন। অধুনা মুসলমানরা খাসিয়া পাহাড়ে ইসলাম প্রচারে লিপ্ত হইয়াছেন ও ব্রাহ্মরা কিয়ৎকাল ঐ স্থলে ধর্মপ্রচারের পর কয়েকটি পরিবারকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা বারান্তরে হইবে; উপস্থিত শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, যে কোনো মানুষ যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করুক আপত্তি নাই, কিন্তু যে ধর্মান্তর গ্রহণে সাহায্য করে সে যেন ঠিক এইটুকু বোঝে যে, ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বেশভূষা, আহার-বিহার সংক্রান্ত, দেশের অবস্থার সঙ্গে খাপ না খাওয়া, ছন্নছাড়া কোনো নূতন ক্ষতিকর পরিবেষ্টনীতে যেন টানিয়া লইয়া না যায়।

বাঙালী মুসলমান আরব বেদুইনের ন্যায় কাবাব-গোস্ত খায় না, রাইফেল লইয়া দল বাঁধিয়া হানাহানি করে না, কিন্তু এক জর্মন নৃতত্ত্ববিদ খ্রীষ্টান নাগাদের নূতন সামাজিক জীবনের সঙ্গে বসবাস করিয়া তাহাদের প্রচুর নিন্দা করিয়াছেন।

কোনো কোনো পার্বত্য অঞ্চলে স্বচক্ষে কড়া মদের মাতলামি দেখিয়াছি ও বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি কোনো কোনো অঞ্চলে গোপন বেশ্যাবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভয়, এই সব খ্রীষ্টানরা যেন আসামের চা-বাগিচার খ্রীষ্টান ম্যানেজারদের সঙ্গে জুটিয়া এক নূতন ক্রিশ্চান লীগ নির্মাণ না করে। ট্রাইবেল লীগ হউক, আমরা তাহার মঙ্গল কামনা করিব, কিন্তু ক্রিশ্চান লীগ করিলে পার্বত্য জাতিরা আখেরে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

২

উচ্চারণ সম্বন্ধে আর বাক্যবিন্যাস করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু তৎপূর্বে শেষবারের মত একখানি চিঠি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। হাজরা লেন হইতে শ্রীমতী ঘোষ লিখিতেছেন ;—

'আমার ধারণা, অল্প একটু চেষ্টা করলেই বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধতায় যে কোন ভারতীয় পণ্ডিতের সমকক্ষ হতে পারবে। প্রমাণস্বরূপ একটা উদাহরণ দিতে পারি,—যদিও সেটি এত তুচ্ছ যে বলতে সংকুচিত হচ্ছি। পাঞ্জাবী অধ্যাপকটির ক্লাসে আমরা যে কয়টি ছাত্রী ছিলাম, তাহাদের মধ্যে তিনি বাঙালীর উচ্চারণে কখনো কোনো ভুল তো ধরেনই নি ; এমন কি সময়ে সময়ে একটু বেশী প্রশংসা করতেন।' (লেখিকা দিল্লী কলেজ পড়িতেন।)

সর্বশেষ লেখিকার বক্তব্য—

"যদি কলকাতার স্কুলগুলির সংস্কৃত শিক্ষকেরা এ বিষয়ে একটু অবহিত হন, তাহলে বোধ হয় কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে।"

সবিস্তার মন্তব্য অনাবশ্যক। শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা যদি সত্যই কঠিন না হয়, তাহা হ'লে এই স্থলেই উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বন্ধ করা যাইতে পারে।

* * *

আমরা যখন সংস্কৃত শিখি, আরবী ফারসী শিখি, তখন আমাদের উদ্দেশ্য এই নহে যে, সংস্কৃত অথবা আরবীতে সাহিত্য সৃষ্টি করিব। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট সাহিত্য পড়িয়া হৃদয়মনকে সংস্কৃত ও ধনবন্ত করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ঐ সব সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, উহাদের পরশমণি দ্বারা যাচাই করিয়া করিয়া মাতৃভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করা। উদাহরণস্বরূপে বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত না জানিলে 'যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' কবিতাটি লিখিতে পারিতেন না, প্রথম চৌধুরী উত্তম ফরাসী ও বিশেষতঃ

আনাতোল ফ্রাঁস না পড়িলে কখনো বাংলাতে নূতন শৈলী প্রবর্তন করিতে পারিতেন না।

ইংরাজী, ফরাসী, জর্মন সাহিত্য আজ এত সমৃদ্ধ যে গ্রীক লাতিনের জ্ঞান না থাকিলেও ইহাদের যে কোনো ভাষাভাষী মাতৃভাষার সাতজন ভালো লেখকের শৈলী মিশ্রণ করিয়া নূতন সৃষ্টি করিতে পারে ; বিষয়বস্তু অনুসারে গড়িয়া পিটিয়া নূতন ঢং তৈয়ারী করিতে পারে। কিন্তু বাঙলাভাষা এখনো অত্যন্ত অপক্ব, সাহিত্য বড়ই দরিদ্র।

সংস্কৃতই যে জানিতে হইবে এমন কোনো কথা নহে। ইংরিজি ফরাসী বা আরবী যে কোনো সাহিত্যের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিলেই ভাষা ও সাহিত্যের মাপকাঠি পাওয়া যায়।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য না পড়িলে মনে হয় অধিকাংশ লেখকেরা যেন শুধু বাঙলার পুঁজিই ভাঙাইয়া খাইতেছেন। কিন্তু এককালে তো এ রকম ছিল না। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, সকলেই যে শুধু সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা সকলেই ইংরিজি বেশ ভাল করিয়া জানিতেন।

ভারতচন্দ্র ফারসী ও সংস্কৃত দুই ভাষাই জানিতেন, এবং কী প্রচুর আরবী ফারসী শব্দ যে তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল ও মোগল বিলাসের যে কী সন্ধান তিনি রাখিতেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড ১৮৭-৮ পৃষ্ঠা পশ্য।

(এস্থলে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, সাধারণ বাঙালী পাঠক এই দুই পৃষ্ঠায় উল্লিখিত তাবৎ আরবী ফারসী শব্দ বুঝেন ? না ইহাদের অর্থ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে--আমার কাছে দ্বিতীয় খণ্ড নাই।)

যে কবি অত্যন্ত সহজ সরল অনুভূতি গীতিকাব্যে প্রকাশ করিতে চাহেন তাঁহার জন্য হয়ত সংস্কৃতের প্রয়োজন নাই। চণ্ডীদাসের সংস্কৃত জানিবার প্রয়োজন নাই ; জসীমউদ্দীন চসার সেক্সপীয়র পড়িয়াছেন কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর।

যাঁহারা জটিল নভেল লেখেন ও উপন্যাস রচনা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধেই উপরের মন্তব্যগুলি করিলাম।

৩

আমরা সাধারণতঃ যখন ইয়োরোপে বা ইয়োরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করি, তখন প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে ইয়োরোপ সম্বন্ধে আমাদের প্রায়

সকল জ্ঞান ইংরিজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত এবং ইংরিজিতে যে সব ফরাসী জর্মন ইত্যাদি গ্রন্থ অনূদিত হয়, সেগুলি প্রায়শঃ ইংরেজ মনকে দোলা দিয়াছে বলিয়াই ঐ ভাষাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। অর্থাৎ বহুস্থলে সেগুলি খাস ফরাসী জর্মন নহে, ইংরাজকে খুশী করিতে পারিয়াছে, ঈষৎ ইংরাজ-ভাবাপন্ন বলিয়া।

অথচ ইংরেজ ও ফরাসী সে কী ভীষণ দুই পৃথক জাত সে সম্বন্ধে অন্তহীন আলোচনা চলিতে পারে। সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে নির্ভয়ে বলা যায় ফরাসী সাহিত্য ইংরাজি হইতে বিশেষ কিছু গ্রহণ করে নাই, কিন্তু ইংরাজি পদে পদে ফরাসীর হাত ধরিয়া চলিয়াছে। তামাম ফরাসী ভাষাতে একশতটি ইংরাজি শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না; ইংরাজিতে শুধু ফরাসী শব্দ নহে, গোটা বাক্য বিস্তরে বিস্তরে আছে। ইংরাজের পোশাকী রান্না বলিয়া কোনো বস্তু নাই —ভদ্র খাবারের "মেনু" মাত্রই আগাগোড়া ফরাসীতে লেখা। এমন কি ভিয়েনার "ভিনার স্নিৎসেল" পর্যন্ত ইংরাজ "মেনু"তে ফরাসীর মধ্যস্থতায় "এস্‌কেলপ দ্য ভ্য আ লা ভিয়েনেয়াজ" রূপে পৌঁছিয়াছে।

ইংরিজি সঙ্গীত বলিয়া কোনো বস্তু নাই—যাহা কিছু তাহার শতকরা ৯৯ ভাগ জর্মন-ফরাসী-ইতালীয়-রুশ। তামাম বৎসর চালু থাকে এ রকম অপেরা গৃহ একটিও লণ্ডনে নাই; উত্তম অপেরা শুনিতে হইলে ড্রেসডেন যাও, ম্যুনিক যাও, বন্ যাও, ভিয়েনা যাও, প্যারিস যাও।

ইংরেজ মেয়ে ফ্রক ব্লাউজ কিনিতে প্যারিস যায়, ছবি আঁকা শিখিতে প্যারিস যায়, ভাষা শিখিতে প্যারিস যায়, উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মদ্য আস্বাদ করিতে প্যারিস যায়, বোতল বোতল বর্দো-বার্গণ্ডী শ্যেম্পেন খরিদ করিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যায়—ফরাসী স্কচ-হুইস্কি খাইতেছে আর মারোয়াড়ী পাঁঠার কালিয়া খাইতেছে—একই কথা।

ফরাসী ইংরাজকে বলে "চরুয়া" অর্থাৎ চরের বাসিন্দা অর্থাৎ খানদানহীন ঔপনিবেশিক। পদ্মার পারের জমিদার পদ্মার চর-বাসিন্দাকে যে রকম অবহেলা করে, ভাবে—চর আজ আছে কাল নাই—খানদানের বনিয়াদ গড়িবে কি প্রকারে, ফরাসী ইংরাজ সম্বন্ধে সেই রকম ভাবে। চ্যানেল পার হইয়া তাহাকে লণ্ডন যাইতে হইলে, তাহার মস্তকে সহস্র বজ্রাঘাত হয়।

উপর্যুক্ত মন্তব্যগুলি করার উদ্দেশ্য এই যে আমরা যেন ইয়োরোপের তাবৎ কর্মকীর্তি ইংরেজের জমার খাতায় লিখিয়া তাহাকে অহেতুক ভক্তি না দেখাই। দ্বিতীয়তঃ ফরাসী ও জর্মন পড়াইবার ব্যাপক ব্যবস্থা যেন এদেশের স্কুল-কলেজে করা হয়। আমাদের মনে হয় কলিকাতার ছেলেরা এককালে যেটুকু ফরাসী-

জর্মন শিখিত এখন যেন সেইটুকুও শিখিতেছে না।

আমাদের ইস্কুল-কলেজে কি বিকট আনাড়ি কায়দায় ভাষা শিখানো হয় তাহার বিস্তৃত আলোচনা আরেকদিন করিবার বাসনা রহিল। উপস্থিত শুধু বলি চারি বৎসর ইস্কুলে ও চারি বৎসর কলেজে সংস্কৃত অথবা ফারসী পড়ার পরও ছাত্র ঐ সব ভাষাতে সড়গড় হয় না এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমি কোনো সভ্য দেশে দেখি নাই—শুনি নাই।

৪

এক প্রসিদ্ধ আরব লেখকের 'স্বগতঃ' পড়িতেছিলাম।

"ধনীরা বলে, 'অর্থোপার্জন করা কঠিন, জ্ঞানার্জনের অপেক্ষাও কঠিন।' পণ্ডিতেরা বলেন, 'জ্ঞানার্জন অর্থোপার্জনের অপেক্ষা কঠিন; অতএব জ্ঞানীরা ধনীর চেয়ে শক্তিমান ও মহৎ।' আমি বিস্তর বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, "আমরা—অর্থাৎ জ্ঞানীরা—যদি কখনও অর্থ পাই, তবে সে অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম এবং অনেক সময় ধনীদের চেয়েও সৎপথে অর্থ ব্যয় করি, কিন্তু ধনীরা যখন আমাদের সম্পদ অর্থাৎ পুস্তকরাজি পায়, তখন সেগুলির ব্যবহার বিলকুল করিতে পারে না। অতএব সপ্রমাণ হইল জ্ঞানীরা ধনীর চেয়ে শক্তিমান।"

বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আরব লেখকের কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

গত শনি, রবি, সোমবারে বোম্বাই বাজারে যে তুমুল কাণ্ড দেখিলাম, তাহাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ আর রহিল না।

একশত হইতে উপরের নোট আর যত্রতত্র ভাঙানো যাইবে না খবর প্রকাশ হওয়া মাত্র কালাবাজারীদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। ফালতু ট্যাক্স হইতে আত্মত্রাণ করিবার জন্য ব্যবসায়ীরা বিস্তরে বিস্তরে একশত, এক হাজার টাকার নোট গৃহে লোহার সিন্দুকে জমায়েত করিয়া রাখিয়াছিল, সে টাকা লইয়া তাহারা করিবে কি?

তখন কালাবাজারীরা ছুটিল ব্যাঙ্কারদের কাছে। 'দয়া করিয়া, ঘুষ লইয়া নোটগুলি লও, হিসাবে দেখাও যে বহুদিন ধরিয়া এই নোটগুলি তোমাদের ব্যাঙ্কে জমা ছিল। আমরা বাঁচি।' ব্যাঙ্কারদের জেলের ভয় আছে; কাজেই পন্থা বন্ধ।

কেহ ছুটিল সোনার বাজারে। সে বাজারে এমনি হিড়িক লাগিল যে, দাম হুশ হুশ করিয়া গগনস্পর্শী হইতে লাগিল। কর্তারা সোনার বাজার বন্ধ

করিয়া দিলেন।

কেহ ছুটিল তাড়া তাড়া নোট পকেটে করিয়া শরাবের দোকানে। এক টাকার মদ খাইয়া একশত টাকার নোট ভাঙাইবার চেষ্টা করে। আমি গিয়াছিলাম এক বোতল সোডা খাইতে, দোকানী সোডা দিবার পূর্বে সন্তর্পণে কানে কানে প্রশ্নবাণে প্রাণ হানে, 'একশত টাকার নোট নয় তো স্যার? ভাঙানি নাই।'

বিস্ময় মানিলাম। প্রায় ছয় মাস হইল আমার মত কারবারী-বুদ্ধি-বিবর্জিত মূর্খও বিলাতি মাসিকে পড়িয়াছিল যে, ইংলণ্ডে কালাবাজারের ফাঁপানো পয়সাকে কাবুতে আনিবার জন্য দশ পৌণ্ড নোটের উপর কড়া আইন চালানো হইয়াছে। সেই মাসিক কি এদেশের কারবারীরা পড়ে নাই? পড়িয়া থাকিলে ছোট নোটে ভাঙাইয়া রাখিলেই পারিত।

আরব ঠিকই বলিয়াছিলেন, ধনীরা পুস্তক (এমন কি মাসিক কাগজও) পড়িতে জানে না।

৫

বাঙলা ভাষায় একখানা অতি উপাদেয় গ্রন্থ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রে'র কথা স্মরণ করিতেছি। কি অসাধারণ পরিশ্রম, কি অপূর্ব বিশ্লেষণ, অবিমিশ্র যুক্তিতর্কের কি অদ্ভুত ক্রমবিকাশ এই পুস্তকে আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ভাষা ও শৈলী সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যুক্তিতর্কপূর্ণ রচনায় এই ভাষাকেই আজ পর্যন্ত কেহই পরাজিত করিতে পারেন নাই। অনেকের মতে বাংলা গদ্য রচনায় 'কৃষ্ণচরিত্রে'র পর উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয় নাই।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিস্ময় মানিতে হয়। বঙ্কিম কয়েকজন জর্মন পণ্ডিতের নাম এই পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই যুগে প্রত্যেকের নামের শুদ্ধ উচ্চারণ জর্মনে কি সে খবর লইয়া বাঙলায় বানান করিয়াছেন। আমরা নির্বিকার চিত্তে নিত্য নিত্য 'জওহরলাল', 'প্যাটেল', 'মালব্য' লিখি, 'পটৌডি'র নওয়াব ও 'ভিনু মনকদে'র কথা আর তুলিলাম না।

সে কথা থাকুক। কিন্তু বঙ্কিমের পুস্তকখানা বাঙলায় লেখা, বাঙলা লিপিতে। যদি পুস্তকখানা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইত, তবে বহু অবাঙালী অনায়াসে ইহা পড়িয়া উপকৃত হইতে পারিতেন।

পাঠক পত্রপাঠ শুধাইবেন বাঙলা, হিন্দী, গুজরাতি; মরাঠিতে কি এতই

সাদৃশ্য যে শুধু ভিন্ন লিপি বলিয়া, এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের রচনা পড়িতে পারে না ?

দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নলিখিত রচনাটি পাঠ করুন।

'ব্যায়ামচৰ্চা ভাৰতত অতি পুৰনি কালৰে পৰা প্ৰচলিত ; অসমতো নতুন নহয়। অহোম ৰজা সকলৰ দিনত অসমত ব্যায়ামৰ খুব আদৰ আছিল। বিশেষকৈ মহাৰাজ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত ইয়াৰ প্ৰসাৰ বেচী হয়। তেঁও অসমৰ জাতীয় উৎসব আদিত ব্যায়ামৰ দৃশ্য দেখুবাৰ নিয়ম কৰিছিল।'

একখানা আসামি পুস্তিকা হইতে এই কয়টি পংক্তি তুলিয়া দিলাম ; ইহার বাংলা অনুবাদ করিয়া সহৃদয় সরল পাঠককে অপমানিত করিতে চাহি না। যে লিপিতে লেখা হইয়াছে অক্ষরে অক্ষরে সেই রকম তুলিয়া দিলাম ; কেবলমাত্র বক্তব্য যে 'র' অক্ষর আসামিতে 'ব' অক্ষরের পেট কাটিয়া করা হয় এবং 'ওয়া' উচ্চারণ প্রকাশ করিতে হইলে 'ব' অক্ষরের উপরে একটি হসন্ত জাতীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

এই কয়টি পংক্তিই যদি কোনো বিজাতীয় লিপিতে লেখা হইত, তবে এ ভাষা যে না শিখিয়াও পড়া যায়, সে তত্ত্বটুকু শিখিতে আমাদের মত অনভিজ্ঞের এক যুগ কাটিয়া যাইত।

পুনরায় দেখুন :

'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে' বাক্যটি হিন্দীতে 'ভারতবর্ষকী অর্থ-নৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর নির্ভর করতী হৈ', এবং গুজরাতিতে 'ভারতবর্ষনী অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর নির্ভর করে ছে' বলিলে বিশেষ ভুল হয় না কিন্তু যেহেতু গুজরাতি ও হিন্দী ভিন্ন লিপিতে লেখা হয়, আমরা এই সব ভাষা দূরে রাখি ; ঐ সব ভাষা-ভাষীরাও একে অন্যের মধ্যে তাহাই করেন।

এই বাক্যটিই ফরাসীতে বলি :

Ie progres economique de I' Indedepend sur son Independance politique.

লিপি একই, অর্থাৎ ইংরাজি ; কাজেই ভাষাশিক্ষা ব্যাপারে অতি অথর্ব ইংরাজও তাড়াতাড়িতে ফরাসী শিখিতে পারে।

তাহা হইলেই প্রশ্ন, তাবৎ ভারতবর্ষে একই লিপি প্রচলিত হইলে ভালো হয় কি না ?

তাহা হইলে পুনরায় প্রশ্ন—শান্তিনিকেতন হইতে শ্রীযুত—সেন মহোদয়

জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাবৎ পৃথিবীর জন্য একই লিপি হইলে ভালো হয় কি না? অর্থাৎ লাতিন লিপি—যে লিপিতে লাতিন, ইংরাজি, ফরাসী, ইতালিয়, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, তুর্কী ও অধিকাংশ জর্মন পুস্তক লেখা হয়।

* * *

এই সম্পর্কে আরেকটি কথা মনে পড়িল। প্রথম যৌবনে এক গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করার চেষ্টা করি। সেই প্রাতঃস্মরণীয় গুরু অন্ততঃপক্ষে একশতটি ভাষা জানিতেন ও খুব সম্ভব একশত হইতে দুই শতের মধ্যেই ঠিক হিসাব পড়ে। এবং প্রত্যেকটি ভাষাই সাধারণ গ্র্যাজুয়েট যতটা সংস্কৃত বা ফারসী জানেন তাহা অপেক্ষা বেশী জানিতেন। সাধারণ গ্র্যাজুয়েট আট বৎসর সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। সেই হিসাবে গুরুর বয়স অন্ততঃপক্ষে ১৫০×৮=১২০০ বৎসর হওয়া উচিত ছিল; যদি তিন-তিনটি ভাষা একসঙ্গে শিখিয়া থাকেন, তবে তাঁহার বয়স ৪০০ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গুরু 'বিরিঞ্চি বাবা' নহেন ও ৬০ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন এবং শেষের দশ বৎসর খুব সম্ভব কোনো নূতন ভাষা শিখেন নাই।

তবেই প্রশ্ন এই অলৌকিক কাণ্ড কি প্রকারে সম্ভবপর হইল?

স্বীকার করি গুরু ভাষার জহুরী ছিলেন ও ভাষা শিখিতে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস ভালো গুরু পাইলে, অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি উত্তম হইলে অল্পায়াসে এক ডজন ভাষা দশ বৎসরে শিখা যায়। শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে আরেকটি জিনিসের প্রয়োজন, তাহা নিষ্ঠা। এবং তৃতীয়তঃ কণ্ঠস্থ করা অপ্রয়োজনীয়—এই অদ্ভুত বিজাতীয় অনৈসর্গিক পাণ্ডববর্জিত ধারণা মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাষণ করা।

* * *

আরেকটি প্রশ্ন। 'প্যারিস' লিখিব, না 'পারি'? 'ফরাসিস' লিখিব, না 'ফরাসী', না 'ফ্রেঞ্চ'; 'বেলিন' না 'বার্লিন'; 'এ্যাক্সলা শাপেল' না 'আখেন' (প্রথমটি ফরাসী উচ্চারণ ও আন্তর্জাতিক ভাষায় ইহাই চলে, কিন্তু দ্বিতীয়টি জর্মন ও শহরটি জর্মনীতে অবস্থিত)? 'মস্কভা', না 'মস্কৌ', না 'মস্কো'; 'শ্যাম' না 'সিরিয়া', 'যীশু', না 'য়েশু', না 'জীসস'? ১৮৭০-৮০ খৃষ্টাব্দে এই সব সমস্যা সমাধান করিবার জন্য কলিকাতায় একটি কমিটি নির্মিত হয়, তাহার রিপোর্ট এ যাবৎ দেখি নাই। কোনো পাঠক দেখিয়াছেন কি?

ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, প্রিয়ভাষীজনকে ধনহীন মনে করা দুর্জনের লক্ষণ। কিন্তু প্রিয়ভাষণেরও তো একটি সীমা থাকার প্রয়োজন। আমরা স্থির করিয়াছি বিলাতি কমিশন না আসা পর্যন্ত টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করিয়া রাজনৈতিক আবহাওয়া অহেতুক উষ্ণ করিব না, বিলাতি কর্তাদের গরমে কষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এই সুযোগে এ্যাটলি সাহেবের প্রিয়ভাষণ যে অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার পরিধান করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ হইতেছে—বধূটি খুব সম্ভব কুরূপা। তবু গুরুজনেরা বলিতেছেন, বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলয়। হইতে পারে; কিন্তু কন্যাকর্তাকে বিশ্বাস করিয়া সুরূপা বধূলাভের আশা নগণ্য বলিয়াই 'কনে দেখার' প্রথা এদেশে প্রচলিত।

সে যাহাই হউক, সর্বশেষ উপমা শুনিলাম নিউ ইয়র্কের কোনো এক খবরের কাগজের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতার নিকট হইতে। তিনি মনে মনে এক নদীর ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার একপারে এ্যাটলি সাহেব, হাতে নাকি বহুমূল্য স্বরাজ; অন্য পারে তাবৎ ভারতীয়। সংবাদদাতা বলিতেছেন, শুধু কংগ্রেস, শুধু লীগ, শুধু রাজসংঘ, শুধু হরিজন সন্তরণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেই হইবে না; সকলকে এক যোগে একসঙ্গে সে বৈতরণী পার হইতে হইবে।

বাল্যবয়সে বিস্তর ভারতীয় বিস্তর নদী সাঁতরাইয়া পার হয়, এবারেও চেষ্টা করিবে; কিন্তু প্রশ্ন—কে কে জলে নামিবেন? কংগ্রেস তো নামিবেনই, সায়েবের হাতে যখন স্বরাজ রহিয়াছে, লীগ নামিবেন কি? কারণ সংবাদদাতা বলিয়াছেন, সায়েবের হাতে স্বরাজ, পাকিস্তান আছে কি না বলেন নাই। না হয় লীগও নামিলেন; কিন্তু রাজারা তো কখনো সাঁতার কাটেন না। প্রজাদের পৃষ্ঠে বসিয়া যে যাইবেন তাহারও কোনো উপায় নাই; কারণ প্রথমতঃ প্রজাদের সে-সন্তরণে যোগ দিবার কোনো প্রস্তাবই হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহারা সরজমিনে উপস্থিত থাকিলে মণিটির হিস্যা পাইবার জন্য চেল্লাচেল্লি করিবে, হয়ত বা সাকুল্য মণিলাভের তালে থাকিবে। কাজেই মনে হইতেছে রাজারা দুইশত বৎসরের প্রাচীন খানদানি বাতরোগের অর্থাৎ সরকারের সঙ্গে কৃত সনাতন সন্ধিশর্তের দোহাই দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া রহিবেন অথবা শূন্যে হাত-পা ছুঁড়িয়া সাঁতারের ভান করিবেন। হরিজন নামিতে পারেন, কারণ কূপ অপবিত্র হইতে পারে, মা-গঙ্গার সে ভয় নাই।

কিন্তু একযোগে সাঁতার কাটিতে হইবে। বয়নাক্কাটা বিবেচনা করুন। রুশ

বাদ দিলে তামাম ইয়োরোপ ভারতের চেয়ে ক্ষুদ্র, তবু তথাকার কর্তারা সাঁতার কাটিবার সময় একে অন্যের গলা এমনি টিপিয়া ধরেন, যাহাকে বলে মহাযুদ্ধ। আর শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর আপামর জনসাধারণকে সেই নদীতে নামানো চাই, কি অস্ট্রেলিয়া, কি আমেরিকা, কি ভারত—কাহারও রেহাই নাই। এই এক জন্মেই দুইটি দক্ষযজ্ঞ দেখিলাম। তাহারই এক ছাগ-মুণ্ড তম্বি করিয়া বলিতেছেন, একযোগে সাঁতরাও।

না হয় সাঁতরাইলাম, কিন্তু তথাপি প্রশ্ন ক্রীপস-নদীতে যে হাঙর-কুমীর আমাদের পা কামড়াইয়া সব কিছু ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা ইতোমধ্যে বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছেন কি ?

সর্বশেষ প্রশ্ন, সায়েবের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। এ যেন 'ফোকা' 'ধোকা' খেলা। আমরা সকলে এক যোগে হাঙর-কুমীর এড়াইয়া নদী পার হইয়া এক বাক্যে চীৎকার করিয়া বলিব, 'আমরা ফোকা চাই' অথবা 'ধোকা চাই', তখন সায়েব হস্তোন্মোচন করিবেন।

তখন আমাকে দোষ দিবেন না।